প্রকাশ করিয়া রূপলাম্পট্যের প্রশ্রয় দিয়া থাকি। স্ত্রীজাতির বেশভূষার এমনই উন্নতি বিধান করিতেছি যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আর জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে স্মরণ হইবে না, কিন্তু ভোগবিলাসিনী কামিনী মূর্ত্তি স্মরণ পথে উদিত হইবে। বৃদ্ধও বহু সাধনায় যে কাম জয় করিতে অসমর্থ হন, আজ যুবকগণ যুবতীসঙ্গে বাস করিয়া অনায়াসে তাহা জয় করিতেছেন। চৈতন্যদেব 'কাষ্ঠের নারী মূর্ত্তি দেখিলে কামের উদ্রেক হয়' বলিয়া সাবধান করিতেন, আর আজ যুবতীসঙ্গে যুবকগণ অবাধে মেলামেশা খেলাধূলা করিতেছেন। তাঁহাদের চিত্তবিকার হয় না। চৈতন্যদেব প্রভৃতির চিন্তাকে চিত্তদুর্ব্বলতা বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। অধিক কি, আজকাল শিক্ষিতা যুবতীগণকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে তাঁহারা কুপিতা হন। পুরুষও নারীগণকে জননী দৃষ্টি করিতে চাহেন না ও নারীগণও পুরুষকে সন্তান দৃষ্টি করিতে চাহেন না। কিন্তু ইহাতেই আমাদের উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমরা তুষ্ট, ইহাতেও আমরা আমাদের উন্নতি কামনা করিয়া থাকি! হায় রে ক্রমোন্নতিবাদী, তুমি কোন্ পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছ। তাই বলি আমরা আর কতদিন?

এইরূপে এই শিক্ষার গুণে আমাদের জাতির সকল বিদ্যাই, সকল গৌরবই, সকল সিদ্ধান্তই, সকল উপদেশই, নানাদোষদুষ্ট এবং অপরের নিকট হইতে ধার করা বা পরের অনুকরণ করা বলিয়া বুঝিতেছি। যে যে বিষয়ে আমাদের গৌরব এ পর্য্যন্ত অন্য কোন জাতি অতিক্রম করিতে পারে নাই, এবং ভবিষ্যতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না, সেই সকল বিষয় আর আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি বলিতে চাহি না। সেইগুলি হূন গ্রীক পারস্য আরব বা মিশ্রদেশের কীর্ত্তি বলিতে চাহিতেছি। যেখানে এই গৌরবের মূলকে বিদেশে লইয়া যাইবার উপায় নাই, সেখানেও ইহাদিগকে অন্ততঃপক্ষে বৈদিক ধর্ম্মদ্বেষী জাতিদের কীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে উৎসাহিত হইতেছি। এই শিক্ষার গুণেই আজ স্ত্রীজাতি সতীত্বের আদরকে বর্ব্বরতা মনে করিতেছেন; পতিভক্তি পতিপ্রাণতা নির্বুদ্ধিতা ভাবিতেছেন; কর্ণের মত সন্তানলাভের জন্য কুন্তীর চরিত্রে ব্যভিচার আরোপ করিয়া স্বজাতির মধ্যে ব্যভিচার-প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত করিতে উপদেশ দিতেছেন! কিন্তু কর্ণই যে কুরুক্ষেত্রের মূল তাহা আর তাঁহারা ভাবেন না। সতীত্বই জাতীয় দুর্ব্বলতার কারণ, সতীত্বই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিদ্যার্থিগণ বিলাস ব্যসনে মত্ত হইয়া তাহাদের অনৈতিক প্রবৃত্তিকে চিত্তদৌর্ব্বল্য ভাবিতেছে এবং তাহার প্রতীকার-কল্পে তাহারা প্রচারকার্য্যে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা আজ আর জননী বলিয়া মোচন করিবার ইচ্ছা আমাদের হয় না, কিন্তু রমণী বলিয়া মোচন করিবার জন্য লালসা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকেই বলিতেছেন—ধর্ম্মই আমাদের যত অনিষ্টের মূল, নীতিই আমাদের যত অধোগতির কারণ—রুষজাতি ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াই এত অল্প দিনে আজ এত বড় হইতে পারিয়াছে, উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতিমধ্যে এই ধর্ম্ম এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত, ধর্ম্মই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল ইহাই আজ অনেকেরই ধারণা হইতেছে। এইরূপে আমাদের অবস্থার দিকে আমরা যতই দৃষ্টিপাত করিব—দেখিব—আমরা আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মহত্যার পথ বহুল পরিমাণে পরিষ্কার ও প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছি। পূর্ব্বাপর ভাবিলে মনে হইবে—আমাদের মহাপরিনির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই। গতির মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

এইবার এই কথাটী আর একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব, দেখিব—আমাদের ধ্বংসের বিষ

আমাদের সমাজশরীরের কতদূর অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি—যে সব ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, মত, সিদ্ধান্ত আমাদের নয়, আমাদের অনিষ্টকারক বলিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু যত্নে বহু চেষ্টায় বহু ত্যাগস্বীকারে, এমন কি বহু প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া বহু দিনের পর দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, দেশকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে সেইগুলিকে আমাদের গৌরব ভাবিয়া আমরা আবার মাথায় করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনিতেছি। শিক্ষার গুণে আজ আমরা আমাদের পরম শত্রুকে পরম মিত্র জ্ঞান করিতেছি, আমাদের নিজস্ব আজ পরস্ব বলিয়া ভাবিতেছি! আমাদের যাহা কিছু গৌরবের, আমাদের যাহা কিছু মহত্ত্বের, তাহা আমাদের নহে, তাহা অপরের নিকট হইতে ধার করা। আমাদের বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি আমাদের শাস্ত্র এবং তাহাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাদি—যাহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে এবং হইবার কথা, সেই বেদবেদান্তদর্শনাদি শাস্ত্র আজ আমরা বেদবিরোধীর সম্পত্তি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। কেবল কি তাহাই—কোন অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থী এ বিষয়ে যদি কোন নিবন্ধাদি রচনা করেন, স্বজাতি স্বধর্ম্মের হেয়তা ও অনুকরণতা প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলে তখনই তাঁহার বৃত্তির ব্যবস্থা, তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান, তাঁহার উন্নতির পথ পরিষ্কার প্রভৃতি সকল সুবিধাই আমরা তাঁহার করিয়া দিতেছি। তাঁহাকে ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিদ্বারা সম্মানিত করিতেছি। যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত সর্ব্ববিদ্যার আকর ছিলেন, সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান এখন আর শাস্ত্রচর্চ্চা করেন না, এখন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া ইতিহাস সঙ্কলনে ব্যস্ত। পুঁথি পুস্তিকা, শিলালেখ, তাম্রফলক প্রভৃতির সাহায্যে সভ্যতার ক্রমবিকাশ অনুশীলনে ব্যাপৃত। অথবা আমরা কোন্ মতের জন্য বৌদ্ধ জৈন গ্রীক পারস্য প্রভৃতির নিকট কতটা ঋণী তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। এই সব উচ্চ শিক্ষিতগণ আবার পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা করিয়া সেই পণ্ডিতের মূর্খতা সর্ব্বত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে খ্যাপন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহাদের কথা যে তাঁহারা বুঝেন না, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধিগম্য নহে, কিন্তু তাহা সেই শিক্ষক-পণ্ডিত মহাশয়ের দোষ। কোন কর্ম্মের জন্য একজন পণ্ডিত প্রার্থী হইলে তাঁহার বেতন, তাঁহার ছাত্রেরও অনুপযুক্ত একজন ইংরাজী শিক্ষিতের বেতনের দশভাগের একভাগও দিতে আজ আমরা কাতর হই।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপণ্ডিত আজ উদরান্নের জন্য ভিক্ষাও পান না, ভিক্ষার্থ তাঁহারা সাধারণতঃ ধনী মহাশয়দের নিকট উপস্থিত হইলে বিতাড়িত হন। ব্রাহ্মণগণ আর পুত্রকে শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন না, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ইংরাজী বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত করেন। আজ বহু পণ্ডিতের সন্তান উকীল হাকিম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা প্রোফেসার হইয়া ক্রমশঃ সাহেবী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপে পণ্ডিতকুল—আমাদের সমাজচিন্তকের দল আজ নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। আজ শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের জন্য পাশ্চাত্যে যাইতে হইতেছে। দেশের পুঁথিপত্র অধিক অর্থের লোভে আজ আমরা বিদেশে বিক্রয় করিতেছি। আজ কাশী কাঞ্চী নবদ্বীপের স্থান লণ্ডন প্যারিস ব্রুসেল্স্ বার্লিন অধিকার করিতেছে। বিলাতী শাস্ত্রবিদ্যারই আজ সম্মান অধিক। বিলাতীশাস্ত্রজ্ঞের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাচ্ছল্য অধিক। বিলাত-প্রত্যাগত পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ অথবা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তিই আজ আমাদের সমাজের বিধাতা বা নিয়ন্তা। সমাজ সংস্কারের কথায় তাঁহাদের কথাই বলবতী হয়, তাঁহাদের পরামর্শই গৃহীত হয়।

বস্তুতঃ এইগুলি কি শিক্ষার সাহায্যে জাতির পক্ষে আত্মহত্যার ব্যবস্থা নহে। আর এই শিক্ষার প্রচারকর্ত্তা কি আমরাই নহি? প্রবর্ত্তক না হইলেও কি প্রচারক নহি? এই শিক্ষার জন্যই আজ আবালবৃদ্ধবনিতা কি মুক্তহস্ত নহেন? এই শিক্ষার জন্য কি দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান হইতেছে না? কিন্তু যে শিক্ষার ফলে আজ পৃথিবীর সকল প্রাচীন জাতিই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হই নাই, যে উচ্চচিন্তার জন্য পাশ্চাত্যের বহু বিদ্বান্ ব্যক্তি আজও মস্তক অবনত করেন, সেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য আজ কে কোথায় কয়টী মুদ্রা দান করিতেছেন! ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এজন্য যেরূপ দান হইত, আজ তাহার শতাংশও হয় না বলিতে পারা যায়। আজ বিজ্ঞানের যুগ বটে, বিজ্ঞানবলেই পাশ্চাত্যগণ আমাদের দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থাকর্ত্তা হইয়াছেন বটে, অতএব সকলেই বিজ্ঞানের জন্য ব্যস্ত হইবেন ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞান, জাতির জীবন হয় না; বিজ্ঞান, জীবের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারে না। তাহার আবশ্যকতা যথেষ্ট থাকিলেও তাহাই সর্ব্বস্ব হওয়া উচিত নহে, এ বিষয়টী আজ চিন্তার বিষয়ও আর আমাদের হয় না। মুসলমান রাজত্বেও আমাদের ধর্ম্মানুরাগ যেরূপ ছিল, আজ তাহাও আর নাই। এত অল্পদিনে যে জাতির এত পরিবর্ত্তন, সে জাতির জীবনাশা আর কতদিন, সে জাতির আত্মহত্যা সম্পূর্ণ হইতে আর কত বিলম্ব?

স্বাধীনতা না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না—এই কথাই আজ অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখে শুনা যায়। কিন্তু ধর্ম্ম না থাকিলেও যে স্বাধীনতা হয় না—ইহা ত কেহ বলেন না। জাতিভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মহীন হইয়া যদি স্বাধীনতা হয়, তবে সে স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা! সে স্বাধীনতা কি বাঞ্ছনীয়? আজ যদি আমরা ক্রিশ্চান হইয়া ইংরাজের সহিত মিশিয়া যাই, আর তজ্জন্য ইংরাজ জাতির স্বাধীনতা আমাদের লাভ হয়, তাহা হইলে সেটা কি আমাদের স্বাধীনতা। সেটা কি আমাদের জাতির সমূল ধ্বংসের অবস্থা নহে? কিন্তু তাহাতেও কি আমাদের দুঃখ দূর হইবে? ইহা আমরা ইউরেসিয়ান দেখিলেই বুঝিতে পারি। অথচ আজ আমরা এই পথেই দ্রুত গতিতে চলিয়াছি। আজ জাগতিক উন্নতির জন্য আমরা ধর্ম্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু ইহাদের সামঞ্জস্যবিধানই যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাহা আর ভাবিবার আমাদের সময়ও নাই। তাই মনে হয়—আমাদের আত্মহত্যা-যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে আর কতদিন অবশিষ্ট?

আজ পাশ্চাত্য প্রত্যাবৃত্ত সন্ন্যাসী বা ধর্ম্ম প্রচারকের সম্মান দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারক বা সন্ন্যাসী হইতে অধিক হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ যতদিন পাশ্চাত্যে যান নাই ততদিন তাঁহাকে আমরা চিনি নাই। পাশ্চাত্যে তাঁহার বিজয়-নিশান যেদিন উড্ডীন হইল, সেই দিনই আমরা তাঁহাকে চিনিলাম। ম্যাক্সমূলর যেদিন পরমহংস-দেবকে মহাপুরুষ বলিলেন, সেইদিন আমরা তাঁহাকে চিনিলাম, রোঁমারোঁলা যেদিন স্বামীজির ও পরমহংসদেবের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন, সেইদিন আমরা তাঁহাদিগকে অবতারের আসনে বসাইলাম। এইরূপ স্বামী রামতীর্থ, বাবা ভারতী, ভাই প্রতাপ, ভাই কেশব, মহাত্মা রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। বিলাতি ছাপ পড়িলেই আমরা আদর করি, নচেৎ তিনি উপেক্ষা বা উপহাসের পাত্র হন! আত্মহত্যার ইহা অপেক্ষা আর উত্তম দৃষ্টান্ত আছে কি? কেহ হয়ত মনে করিবেন, আমরা খৃষ্ট-বুদ্ধের প্রতি দ্বেষ করিতেছি, কিন্তু তাহা একেবারেই নহে। আমরা চাই নিজত্ব রক্ষা করিয়া অপরকে আদর করিতে, আমরা ঋণ করিয়া দানের পক্ষপাতী নহি। এইসব দেখিয়া

মনে হয়, আমাদের আত্মহত্যা-যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। যাগবিশেষের ন্যায় এই যাগের ফল পরলোকে গিয়া লাভ করিতে হইবে না, এইখানেই সত্যসদ্যই সে ফল লাভ হইবে। তাই বলি ভগবান্ আমরা আর কতদিন।

যাহা হউক, এইবার আমাদের ধর্ম্মে হাত পড়িয়াছে, এইবার আমাদের মর্ম্মস্থলে আঘাত হইতেছে। আর এই আক্রমণে বলপ্রয়োগ নাই। এই আক্রমণ আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এবার আত্মরক্ষা অতি দুরূহ ব্যাপার। এরূপ আর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। সত্যযুগে দেবাসুরসংগ্রাম দেব ও অসুর এই দুই পৃথক্ দলে হইয়াছিল, ত্রেতায় ইহা রাম রাবণ প্রভৃতি রূপে দুই দলে হয়। এ সময় সেই পার্থক্য আরও কমিয়া যায়। দ্বাপরে অসুরগণ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ণদুর্য্যোধনাদিরূপে এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তখনও দেবাসুর প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার যোগ্যতা অনেকেরই ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অসুরাত্মা আমাদের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, আমাদের সে পার্থক্য বুঝিবার শক্তিও প্রায় নাই। এজন্য এবার এই সংগ্রাম অপূর্ব্ব ও ভীষণ সংগ্রাম। এ সময় একমাত্র ভগবৎশরণ ভিন্ন আর গতি নাই। আত্মপ্রচেষ্টা আজ ভগবচ্চরণেই পর্য্যবসিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই সুযোগ মত আমরা যত্নবান্ হইলে সুফলের আশা। আজ আমাদের ইষ্ট-পূজার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কল্যাণ কামনা করিতে হইবে। আত্মকল্যাণে জাতীয় কল্যাণের যুগ আর নাই। আজ জাতীয় কল্যাণের জন্য পৃথক্ উপাসনা, পৃথক্ প্রার্থনা প্রয়োজন। সময়ের প্রভাব বলিয়া একটা বস্তু আছে। সময় অনুসারে কার্য্য করিলে ফল হয়, অসময়ে সে ফলের আশা করা যায় না। অতএব আজ আমাদিগকে গোপনে ভগবচ্চরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। প্রার্থনার ফল ব্যর্থ হয় না। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া বুক বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আত্মসত্তা মাত্রই বজায় রাখিতে হইবে। সময়ে আবার অভ্যুদয় অনিবার্য্য।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

যে জাতির মধ্যে এই কথা আছে সে জাতির ভয় নাই। তাহার অভ্যুত্থান অনিবার্য্য।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী

অধ্যাপক শ্রীদয়াময় মিত্র, এম্-এ

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী ও ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বলকারী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার স্মরণে শতবার্ষিকী সভার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। বাংলা দেশের অনেক গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় বঙ্কিম-ভক্ত ও সাহিত্যিকের দল বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান নৈহাটী কাঁঠালপাড়ায় সমবেত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তি অক্ষয় চিরস্থায়ী। কালধর্ম্মে আমাদের দেশে আজকালকার সাহিত্য উপন্যাসের আদি-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হইতে অন্যরূপ ধারণ করিতেছে ইহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তৎসহিত ইহাও স্বীকার্য্য যে তাঁহার রচিত উপন্যাস এখনও আমাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও ধরণ আজিকার তুলনায় পুরাতন ঢংয়ের হইলেও তাঁহার ভাব বাঙালী হৃদয়ের চিরন্তন সম্পত্তি—তাঁহার উপন্যাসের ভিত্তি আধ্যাত্মিক—আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণীতে ইহার বেশ নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া বাঙালী কোন দিনই বড় হইতে পারে না। দেশবাসীকে তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহার সহৃপ্রাণতা, জলন্ত স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বাজাত্যবোধের দ্বারা। আজ বাংলাদেশে ও সমগ্র ভারতে আমরা যে নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছি ইহার মূলে অনেকাংশে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত ভাবধারা বর্ত্তমান। আনন্দমঠ আমাদের দেশপ্রীতির পাঞ্চজন্য, একাধারে 'বাইবেল' ও 'গীতা'—তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বদেশীর প্রথম যুগে শ্রীঅরবিন্দ আনন্দমঠের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন—ভারতময় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারা প্রচারের জন্য। আনন্দমঠে দেশপূজার মহামন্ত্র বন্দেমাতরম্ গান ভারতবাসীকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহা ইংরাজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতির স্বদেশস্তুতি বা শুধু জলমাটির উপাসনার ন্যায় নহে। ইহার প্রতি স্তবকে আমরা পাই ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক চিন্তার ও সাধনার ভিত্তিতে মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ীর অধিষ্ঠান—জড়ের মধ্যে চিচ্ছক্তির উপাসনা—ইহারই আর এক দিক তাঁহারই বর্ণিত কমলাকান্তের দুর্গোৎসবের দিব্যদৃষ্টিতে ভাস্বর। দেশমাতৃকার এই মহান্ উদাত্ত বোধন মন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবাসী মাত্রেরই চিরদিনের জন্য পূজার্হ।

দেশের সাধনা বুঝিবার, জানিবার এবং অপরকে বুঝাইবার প্রবল আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বদাই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনে একদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাতে ধন্য হইয়াছিলেন। আমরা মনে করিতে পারি যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তাঁহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত সহকর্ম্মী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অধরচন্দ্র সেনের বাড়ীতে তিনি ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহার বিশেষ বিবরণ পাঠক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পঞ্চম ভাগে পাইবেন। শুনিতে পাওয়া যায় সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে দু-একটি বিস্ময়াবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার কয়েক খানি উপন্যাসে সাধু মহাপুরুষের অবতারণাও করিয়া-

ছেন। এই একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্ম শ্রীশ্রী-ঠাকুরের পূতসংস্পর্শে আসিয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার মনের মধ্যে ঝড় উঠিয়া তাঁহার চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিল তাহার ফলে তিনি দু একটি বড় বড় বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বহুকালের সযত্নপোষিত অনুশীলন ধর্ম্মের গোড়ার তথ্যটিই যে কত ভ্রমাত্মক ঠাকুরের ইঙ্গিতে তিনি তাহা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন*। বঙ্কিম সেদিন শিক্ষাপ্রার্থী। ঠাকুরের সম্মুখে আত্মগোপন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পরিশেষে আপনাকে ধরা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন যে এ মহাপুরুষ সামান্ত নহেন, ইনি তাঁহার কল্পনারাজ্যেরও অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। ঠাকুরের সমাধি দর্শনে তিনি চকিত হইয়াছিলেন। সেদিন চলিয়া যাইবার সময় তিনি এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে আপনার চাদর-খানি উঠাইয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের সহিত ঠাকুরের এই কথোপকথনের ভিতর আমরা দেখিতে পাই তাঁহার গূঢ় সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সত্যের সম্মুখে আত্মনিবেদনের স্পৃহা। ঠাকুরকে পুনরায় দেখিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তাঁহার আর ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ হয় নাই কিন্তু স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চিন্তা-জগতে সেদিন যে অকস্মাৎ এক নূতন আলোক দেখিতে পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে আমরা নিজেদের দেশ-সাধনা ও সংস্কৃতি ভুলিতে বসিয়াছিলাম। নানা দিক দিয়া নানাভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ তখনকার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে গর্ব্বের বিষয়ই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও যে পাশ্চাত্য ভাবের ভাবুক ছিলেন না তাহা নয়। তাঁহার অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে আমরা সেকালের শিক্ষিত সমাজের উপাস্য মিল, কোম্‌ত্, ডার-উইনের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পাই তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর হিন্দু সাধনায়, হিন্দু চিন্তার উপর গভীর শ্রদ্ধা। প্রচার এবং বঙ্গ-দর্শনের বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই, দেখি দেশকে তিনি সুলভ সাহেবিয়ানার মোহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মসংস্থ হইতে শিখাইতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা যাহাতে আত্মপ্রতারিত না হই দেশকে সেই শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহৎ ও সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহার জীবনের সাধনা সফল হইতে চলিয়াছে। আমরা এখন কতকটা আপনাকে জানিতে পারিতেছি। আজ দেশের বরেণ্য অগ্রণী চিন্তাশীল মনস্বী সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা নতমস্তকে প্রণাম করিতেছি।

* বঙ্কিমবাবুর অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান উপদেশ—'আগে পাঁচটা জিনিষ জানতে হয়, জগতের বিষয় তারপর ভগবানের কথা'—ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন আগে ঈশ্বর তারপর সৃষ্টি, তাঁকে লাভ করলে দরকার হয়তো সবই জানতে পারা যায়।

দেবতা

বিমল দাস

হে ধ্যানী দেবতা,
কত যুগ কাটি গেল তবু নাহি ভাঙে তব ধ্যান
স্তিমিত নয়নে বসি করিতেছ কাহার সন্ধান !
মহাধ্যানে যোগিরাজ স্পন্দহীন্ পাথর-প্রতিমা
চিত্তপাখি উড়িতেছে কোন্ ব্যোমে নাহি তার সীমা।
হে ধ্যানী দেবতা,
ভাঙ্গ ধ্যান, চোখ তুলি চাও, কও কথা কও কথা।

হে মোর দেবতা,
হৃদয়ের রাজা তুমি মোর প্রেমে গড়া তব দেহ,
জীবনে জীবনে তাই রচিয়াছি তোমা লাগি গেহ।
এত কাল গেছে ভুলে আজ যদি হয়েছে স্মরণ
জাগ, জাগ গো দেবতা, আর নাহি থেকো অচেতন।
হে মোর দেবতা,
জাগ একবার, ভাঙ্গ ধ্যান, কও কথা কও কথা।

দেবতা পাষাণ,
চরাচর বিশ্ব ভুলি হৃদি মাঝে অমৃতে বিলীন
অতল সাগর তলে মহানন্দে খেলিতেছে মীন।
ও মুখ-কমলে তাই ওঠে ভাসি আনন্দের রেখা
অশান্ত জগৎ মাঝে স্থির তুমি শান্ত তুমি একা।
দেবতা পাষাণ,
জাগ একবার, চোখ তুলি চাও, ভাঙ্গ মহাধ্যান।

দেবতা আমার,
তোমার আসন আমি রচিয়াছি প্রেমের কমলে
অভিষেক করিব গো দুঃখপূত নয়নের জলে।
নৈবেদ্য করিব দান মুকুলিত এ মোর জীবন
জাগ নাথ, লও পূজা, খোল খোল করুণা-নয়ন।
দেবতা আমার,
ওঠ ওঠ জাগ প্রিয়, লও মোর পুণ্য কণ্ঠহার।

হে ধ্যানী শংকর,
প্রকৃতির প্রভু তুমি তবু আছ বিশ্বে উদাসীন
আশুতোষ বিশ্বনাথ, সমাধিতে সদা সমাসীন।
বসন্ত বন্দনা গায়, গায় পিক তব স্তবমালা
প্রণতা কল্যাণী হের তব পদে গৌরী হিমবালা।
হে ধ্যানী শংকর,
জাগ নাথ, জাগ নাথ, জীবনের ভার লও মোর।

সেবা

স্বামী প্রশান্তানন্দ

ভারতেতর দেশের সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ সকল দেশের সভ্যতার মূলে রহিয়াছে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ জগৎ শক্তিমানেরই ভোগ্য, শক্তিহীনের জগতে কোনও স্থান নাই। অবশ্য সুখ যখন সকলেরই কাম্য, তখন কাহাকেও মারিয়া বা পীড়ন করিয়া আমি যদি সুখী হইতে পারি, তবে তাহা করিব না কেন? কিন্তু দেখা যায়, ভারত বহু প্রাচীন কাল হইতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। সে বহু পরীক্ষার পর, মানুষের সকল কর্ম্মের আদর্শ ত্যাগ ও সেবা বলিয়া স্থির করিয়াছে। ভারতেতর দেশের আদর্শ এ দেশে যে পরীক্ষিত হয় নাই তাহা নহে। চার্ব্বাকাদি বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদের মতবাদ ভারতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাশীল মনীষিগণ উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য স্থির করিয়া তাহা দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে উক্ত আদর্শ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও নয়ন-মনোরঞ্জক হইলেও তাহা যে অসার ও ভ্রান্তিপ্রসূত ইহা কালই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। কালের ন্যায় ভালমন্দের শ্রেষ্ঠ বিচারক আর নাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐ সকল আদর্শের উপাসক জাতিসমূহ জগতে কিছুকাল তাহাদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ও প্রভাব বিস্তার করিলেও অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শশীল ভারতীয় জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত জগৎকে যেন তাহার সভ্যতার এই আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্যই সগৌরবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এই চিরন্তন আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেরই বেশ পরিষ্কার ধারণা নাই, এবং সেই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ঐ বিজাতীয় অপরীক্ষিত ভাবগুলি নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করিয়া গিলিতচর্ব্বণ করিতে করিতে অপরিণামদর্শী যুবক-গণের নিকট উদ্গীরণ করি ও তাহারাও অবিচারে তাহা আত্মস্থ করে। এইরূপে কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্, নাজিজম্ প্রভৃতি কত নূতন নূতন মতবাদ আসিয়া আমাদের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং আমরাও আবার পণ্ডিতম্মন্য হইয়া তাহাই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতে করিতে অন্যের মাথায় ঢালিয়া দিই। "অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ" অন্ধ যেমন অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতে লইয়া গিয়া উভয়েই খানায় পড়ে, আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

এখন ত্যাগ ও সেবা এই কথা দুইটী একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এই ত্যাগ বলিতে অনেকেই ভয় খাইয়া যান। সাধারণের ধারণা এই যে, ত্যাগ মানে সব ছাড়িয়া দিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকা। পণ্ডিতগণ যাহাকে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের অপরোক্ষানুভূতি-প্রসূত বাণী বলিয়া বলেন, সেই শ্রুতি বা বেদ বলিয়াছেন, "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ত্যাগের সহিত ভোগকর। সব ভোগ বা সব ত্যাগ করা চলে না, তাহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। দুঃখের কারণগুলি ত্যাগ করিতেই হইবে এবং সুখের কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহারই সেবা

করিতে হয় অর্থাৎ ভোগ করিতে হয়। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূলমন্ত্র।

দুঃখ কেহ ভোগ করিতে চায় না, কাজেই দুঃখ এড়াইবার চেষ্টা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। এই স্বাভাবিক চেষ্টা হইতেই দর্শনের উৎপত্তি। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ" আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখদ্বারা মানুষ পীড়িত হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত তাহার পরিহারের উপায় খোঁজ করে। এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মানুষ কতকগুলি কর্ম্ম ছাড়িতে বাধ্য হয়, ইহারই নাম ত্যাগ। মানুষ যে কর্ম্মগুলি করিয়া থাকে তাহার নামই ভোগ। যে ভোগে দুঃখ পাইতে হয় তাহাকে ভোগ বলা চলে না, তাহা দুর্ভোগ মাত্র। শ্রুতি "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" বলিয়া ইহারই অনুশাসন করিয়াছেন। এই ভোগেরই অপর নাম সেবা। ইহাকে অন্যরূপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, নিজ সুখের জন্য মানুষ যে কর্ম্ম করে তাহারই নাম ভোগ বা সেবা। এখন এই বিষয়টাই একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

জগতের সর্ব্বত্রই প্রায় ভগবান্ ব্রহ্ম আল্লা খোদা গড্ প্রভৃতি নানা ঈশ্বর জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা কিন্তু সর্ব্বদাই অজ্ঞেয় থাকিয়া গিয়াছে। এই দুর্ব্বোধ্য বস্তুটাকে বুঝিবার ও বোঝাইবার জন্য সাধারণ লোক হইতে বড় বড় মনীষিগণ পর্য্যন্ত চিরকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও যে এই চেষ্টার বিরাম হইবে, তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ভারতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ঐ বিষয়ে বহু উপদেষ্টা ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে; শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি বহু গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান কালেও পৃথিবীব্যাপী সভ্যজগতের নানাস্থানে পণ্ডিতগণ ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। ইহাও অজ্ঞাতকে জানিবার ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতীয় মনীষিগণ যাহাকে অবিসংবাদী সত্য ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই শ্রুতি বা বেদ এই ঈশ্বরকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" ইহাতে আরও বোঝা যাইতেছে যে, এই তিনটী পৃথক নহে, একই বস্তুর তিনটী ভাবমাত্র। জড়জগতে যেমন একই শক্তির তাপ আলোক ও বিদ্যুৎ রূপ তিনটী শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সেইরূপ ব্যবহারিক জগতে চৈতন্যেরও সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ তিনটী শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রুতি বলেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ সবই হইয়াছেন, তাঁহাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি," এবং বলেন, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ নাই, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এখন এই জীবাত্মা বা জীবচৈতন্যে এই তিনটী ভাবের প্রকাশ কিরূপে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করা দরকার। আমরা মানুষ, অন্য জীবের মধ্যে ঐ সকল ভাবের প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। অতএব মানুষের ভিতর ঐ গুলির কি ভাবে বিকাশ হয় দেখা যাউক।

জন্মিয়া অবধি মানুষ কি চায়? বাঁচিতে চায়, জানিতে চায় ও সুখী হইতে চায়। এ ছাড়া আর কিছু চায় কেহ বলিতে পারেন কি? সৎস্বরূপ বলিয়া মানুষ বাঁচিতে চায়, তাহার "অস্তি"ত্ব লোপ করিতে চায় না। সে যখন শরীরে আত্মবুদ্ধি করে তখন শরীরটা রাখিতে চায়, যখন বোঝে তাহা চিরকাল থাকিবে না, তখন পুত্র পৌত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহা রাখিয়া যাইতে চায়, অন্ততঃ নিজ নামটার উপর আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহা নিজকৃত

বস্তু অথবা অন্য কোনও বস্তুর সহিত জড়াইয়াও বাখিয়া যাইতে চায়। অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চায়। অতএব ইহা যে তাহাব স্বরূপ বা স্বভাব, আগন্তুক বস্তু নহে, ইহা সহজেই বোঝা যাইতেছে। যাহা ছিল না, আজ আসিয়াছে কাল চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকে স্বভাব বলে না। এইরূপই মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা শৈশবাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান। জন্মিয়া অবধিই মানুষ —ইহা কি? উহা কি? ইহা কেন হয়? উহা কেন হয়? এইরূপে সব জানিতে চায়। এই জানিবাব ইচ্ছাই জীবের চিৎস্বরূপত্ব বা জ্ঞানস্বভাবত্ব প্রকাশ করিতেছে। তৃতীয়তঃ মানুষ যে আজীবন সুখের অন্বেষণেই ব্যস্ত, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না; কাবণ আনন্দ চায় না এমন জীব কল্পনা করাও অসম্ভব। অতএব জীবের আনন্দ স্বরূপত্ব সকলেরই প্রত্যক্ষানুভবগম্য। আর শ্রুতিও বলিতেছেন,"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি" আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি, আনন্দ দ্বারাই জীব বাঁচিয়া থাকে, অবশেষে আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই সুখের জন্যই জীব লালায়িত। সুখের আশায়ই চোর চুরি করে, সাধু সর্ব্বত্যাগী হয়, এই সুখের কামনাই সমস্ত কর্ম্ম প্রেরণার মূলে বিদ্যমান। নিজে সুখী হইবার জন্যই সকলে ব্যস্ত, অন্যকে সুখী করিবার জন্য নহে। "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি," পুত্রের নিমিত্ত পুত্র প্রিয় হয় না, নিজের জন্যই পুত্র প্রিয় হইয়া থাকে; "নবা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি," পত্নীর জন্যই পত্নীকে কেহ ভালবাসে না, নিজের জন্যই পত্নীকে ভালবাসে, ইত্যাদি বলিয়া শ্রুতি শেষে বলিতেছেন, "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি," অন্য সকলের জন্য নিজেকে বা অন্য সকলকে কেহ ভালবাসে না, নিজেব জন্যই সকলে অন্য সকল বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বার্থই জগতের সমস্ত কার্য্যের মূলে রহিয়াছে। ত্যাগের জীবন্তমূর্ত্তি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছেন, "ইতঃ কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতে," জগতে এমন কে মূঢ় ব্যক্তি আছে যে স্বার্থে ভুল করে? অতএব মহাপুরুষ বা হীনচেতা, যিনি যে কোনও আখ্যাধারীই হউন না কেন, তাঁহারা সকলেই স্বার্থপর। কেবল পার্থক্য এই যে, এই স্বার্থের ধারণার তারতম্যানুসারে কেহ বা মহাপুরুষ এবং কেহ বা কাপুরুষ আখ্যা লাভ করেন।

যিনি কেবল নিজ শরীরেই আত্মবুদ্ধি লইয়া তাহারই সেবায় ব্যস্ত থাকেন তাঁহাকেও সেবক বলিতে হইবে, আর যিনি আত্মবুদ্ধিব আরও একটু বিস্তার করিয়া স্বীয় পুত্র কন্যা বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির পরিচর্য্যায় রত হন তিনিও সেবক, আবার যিনি স্বীয় পল্লী গ্রাম দেশ প্রভৃতি ক্রমশঃ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আত্মবুদ্ধির প্রসার করিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাকেও সেবক বলা হয়। অবশেষে যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধি করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম করেন তিনিও সেবক। অতএব এখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, নানা ক্ষেত্রে আত্মবুদ্ধি করিয়া আত্মপরিতৃপ্তির জন্য মানুষ যে কর্ম্ম করে তাহারই নাম সেবা এবং ইহারই অন্য নাম ভোগ। আরও দেখা যাইতেছে যে আত্মবুদ্ধিই সুখাস্বাদের মূলমন্ত্র। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আত্মবুদ্ধি করিলে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক ভোগ করিতে হয়। কারণ, অনাত্মবুদ্ধির ক্ষেত্রই অর্থাৎ আত্মবুদ্ধির ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য সকল স্থলই দুঃখের কারণগুলির উৎপত্তি স্থল বলিয়া এবং এখানে অনাত্মবুদ্ধির ক্ষেত্র, আত্মবুদ্ধির ক্ষেত্র অপেক্ষা বড় হওয়ায় অধিক দুঃখ ভোগের কারণ হয়। কাজেই আত্মবুদ্ধির ক্ষেত্র যত বড় ও অনাত্মবুদ্ধির ক্ষেত্র যত ছোট হইতে থাকে,

সুখাস্বাদের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে যখন ঐ ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে হইতে সর্ব্বভূতাত্মভাবত্ব আসে তখনই কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি তাই বলেন "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" যাহা বিস্তীর্ণ তাহাই সুখের কারণ, যাহা ক্ষুদ্র তাহাতে সুখ নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে সেবা মানুষকে করিতেই হইতেছে। অতএব ঐ কর্ম্মের জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করাই ভাল।

এখন এই সেবার প্রকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সেবা প্রধানতঃ দুই প্রকার, শারীর ও মানস। এই উভয় প্রকার সেবাই প্রত্যেকে আবার ক্লেশাপনোদক, অভাব পরিপূরক ও উন্নতি বিধায়ক এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। এই সবগুলি আবার ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভেদে দুই প্রকার। অতএব শারীর সেবা ছয় প্রকার ও মানস সেবা ছয় প্রকার, এই সমস্ত মিলিয়া সেবার দ্বাদশ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

যে কর্ম্ম দ্বারা শরীরের ক্লেশনাশ অভাবপূরণ অথবা উন্নতি বিধান করা হয় তাহাকে শারীরসেবা বলে; আর যে কর্ম্ম দ্বারা মনের ক্লেশনাশ, জ্ঞানের অভাব দূরীকরণ অথবা পবিত্র উচ্চ আদর্শ প্রভৃতি দ্বারা মনের উন্নতি বিধান করা হয়, তাহাকে মানস-সেবা বলে। এই সমস্ত প্রকার সেবাই যেখানে কেবল একটী মাত্র ব্যক্তির করা হয়, তাহাকে ব্যষ্টিগত ও যখন বহু ব্যক্তির একসঙ্গে করা হয় তাহাকে সমষ্টিগত সেবা বলে। নিম্নে প্রত্যেকটীর উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। শারীর সেবা—

(ক) ক্লেশাপনোদন—রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা অথবা ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে গাত্র-সংবাহন ও বিজনাদি দ্বারা সেবা করা।

(খ) অভাব পূরণ—দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা পোষণ করা।

(গ) উন্নতি বিধান—ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর স্থান, খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা।

২। মানস সেবা—

(ক) ক্লেশাপনোদন—শোকসন্তপ্ত, ক্রুদ্ধ, ভীত ও লজ্জিত প্রভৃতি মানসিক ক্লেশ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা সান্ত্বনা দেওয়া অথবা অন্য উপায়ে উক্ত ক্লেশ দূর করা।

(খ) অভাব পূরণ—বিদ্যা শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া জ্ঞানের অভাব দূর করা।

(গ) উন্নতি বিধান—উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া ও সদুপ-দেশাদি দিয়া বর্ত্তমান চরিত্রগত দোষগুলি সংশোধন অথবা উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য করা।

এই শারীর ও মানস উভয়বিধ সেবা গুলিই আবার ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে হইয়া থাকে। যেমন একটী রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সেবা অথবা একটী ব্যক্তিকে বিদ্যাশিক্ষাদি দেওয়াকে ব্যষ্টিগত সেবা বলে, আর হাসপাতাল বা বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া বহুব্যক্তির একত্র সেবার ব্যবস্থা করাকে সমষ্টিগত সেবা বলা যায়।

সেবকের শরীর মন ও বুদ্ধিশক্তির এবং ভাবের তারতম্যানুসারে এই সেবার তারতম্য হয়। যিনি যত বিস্তৃত ক্ষেত্রে আত্মবুদ্ধির আরোপ করিতে পারেন তিনিই তত ভাল সেবক। বেদ বলেন, "অয়মাত্মাব্রহ্ম" এই আত্মা বা জীবচৈতন্যই ঈশ্বর, "অহংব্রহ্মাস্মি" আমিই সেই ঈশ্বর, "তৎত্বমসি" তুমিও সেই ঈশ্বর। গীতাও বলিতেছেন "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ঈশ্বর সকল প্রাণীর মধ্যেই রহিয়াছেন। আমি, তুমি ও সকল প্রাণীই যখন ঈশ্বর, তখন আমি সকল প্রাণীর মধ্যেই

বর্ত্তমান ইহা চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বজীবের সেবায় রত থাকিলে পরিশেষে আমি অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন আর কোনও বস্তু নাই, এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া যায়। যাঁহার এই জ্ঞান হয় তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক। বেদ এই ধর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্॥" যাহা কিছু জগতে রহিয়াছে সব ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা কর, ত্যাগের সহিত ভোগ কর, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিও না। যখন নিজের সহিত অন্য প্রাণীর একত্ব জ্ঞান হয়, তখন সকলের দুঃখ দূর করিবার জন্য সাধকের প্রাণে আকুল আগ্রহ জাগে, তখন তিনি পুরাণ-বর্ণিত এই বাণীর ন্যায় প্রার্থনা করেন—

"ন কাময়েহং গতিমীশ্বরাৎপরাম্
অষ্টর্দ্ধি যুক্তামপুনর্ভবংবা।
আর্ত্তিংপ্রপদ্যেখিল দেহ ভাজাম্
অন্তস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

হে ভগবান্, আমি তোমার নিকট হইতে অণিমাদি অষ্টবিভূতিযুক্ত ঈশ্বরত্ব অথবা মুক্তি কিছুই চাই না, সমস্ত প্রাণী যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা আমাকে দিয়া তাহাদিগকে দুঃখমুক্ত কর।

বর্ত্তমান যুগের আচার্য্যশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাবেই ভাবিত হইয়া বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥"

সর্ব্বভূতে এই প্রেমময়ের অধিষ্ঠান জানিয়া শরীর, মন ও বুদ্ধি তাঁহার সেবায় অর্পণ করাই ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, ইহাই ধর্ম্ম। আমরা যদি এই চিরন্তন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে থাকি, তাহা হইলে রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি কোনও নীতির জন্যই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দও তাই বলিয়া গিয়াছেন—"ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ। এই দুইটি পথে ইহাকে পরিচালিত কর, অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনিই আসিবে।"

অতএব আমাদের এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শই অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাদ্বারাই আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে যাহা আবশ্যক তাহা সম্পূর্ণ ভাবেই পাওয়া যাইবে।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শক্তিসম্পন্ন অনেক সন্ন্যাসী এক একটী সন্ন্যাসি-সংঘ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সংঘ মড়ী নামে আখ্যাত। এই প্রকার ৫২টী খ্যাতনামা মড়ী আছে। গিরি সন্ন্যাসীদের মধ্যে রামচুলা, গঙ্গাচক্কী, পবন চক্কী, নিরঞ্জন চৌকা প্রভৃতি বিভাগ আছে। মড়ীর ন্যায় এই সকল উপসম্প্রদায়ের সহিত দশনামীদের সম্বন্ধ নাই।

যে সকল প্রধান প্রধান সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও অনেক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় কুম্ভে যোগদান করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কুলাচারী, অবধূত, শৈব, আলেখিয়া, আকাশমুখী, ঊর্দ্ধবাহু, মৌনব্রতী, পঞ্চধুনী, ঠাড়েশ্বরী, নখী, দঙ্গলী, কড়ালিঙ্গী, গুদড়, সুখড়, রুখড়, দুধাধারী, ফলাহারী, স্বর্ভঙ্গী, অন্তঃসন্ন্যাসী, মানস সন্ন্যাসী, যোগী, কণফট্-যোগী, কাণিপা-যোগী, অঘোরপন্থী, লিঙ্গায়েৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

সন্ন্যাসীর দলকে জমাৎ বলে। হরিদ্বার ও কনখলে কয়েকটী স্থায়ী জমাৎ আছে। এই জমাৎগুলির মধ্যে হরিদ্বারে নিরঞ্জনী আখড়া, যূনা আখড়া, আনন্দ আখড়া ও ভোলানন্দগিরির আশ্রম, ভীমগড়ায় দশনামী আশ্রম, কমলদাসের কুঠিয়া ও কৈলাস আশ্রম এবং কনখলে নির্ব্বাণী আখড়া, নির্ব্বাণী ঘণ্টাকুঠিয়া, সুরথগিরির বাংলা, অটল আখড়া, হরিভারতীর মঠ, যূনাদের রামনিবাস, হরিহর আশ্রম, উদাসী চেতনদেবের কুঠিয়া, উদাসী নয়া আখড়া, উদাসী বড় আখড়া, মুনি মণ্ডল, নির্ম্মলা আখড়া, নির্ম্মলা বিরক্ত কুঠিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে বড় বড় জমাতের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনের জন্য পূজারী, কুঠারী, হিসাবী, কোতোয়াল, তুরহীওয়ালা, পাহারাদার প্রভৃতি আছেন। মোহন্তের আদেশে জমাতের সকল কার্য্য পরিচালিত হয়। কোতোয়াল মোহন্তের নির্দ্দেশে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের কাজের তদারক করেন। কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই সন্ন্যাসী। কুম্ভের সময় এই জমাৎগুলিতে সন্ন্যাসী ভিন্ন বহু গৃহস্থ ভক্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদান্য ব্যক্তিদের দানে জমাতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বড় বড় আখড়ার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে।

গৃহস্থ ভক্তদের আর্থিক সাহায্যে আখড়ার মণ্ডলেশ্বর মোহন্তগণ সাধুদিগকে ভাণ্ডারা দিয়া থাকেন। কুম্ভের সময় প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন আখড়ায় সাধুদের ভাণ্ডারা হইয়াছে। ভাণ্ডারা দুই প্রকার, সমষ্টি ও ব্যষ্টি। সমষ্টি ভাণ্ডারায় কয়েকটী জমাতের সকল সাধু এবং ব্যষ্টি ভাণ্ডারায় অল্পসংখ্যক সাধু নিমন্ত্রিত হন। ভাণ্ডারায় ভোজনের পূর্ব্বে মণ্ডলেশ্বর ও মোহন্তদের পূজা ও আরতি হয়। ভোজ্যদ্রব্যসকল পরিবেশনান্তে কোতোয়ালের নির্দ্দেশে তুরহীওয়ালা তুরীবাদন করিলে ভোজন আরম্ভ হয়। কোতোয়াল দণ্ডহস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পঙ্‌ক্তির তত্ত্বাবধান করেন। শেষে কোতোয়ালের ইঙ্গিতে পুনরায় তুরী নিনাদিত হইলে পঙ্গত উঠিয়া যায়। কোতোয়ালেরা অনেকে এক পদে রূপার শিকল পরিধান করেন। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুনা যায় যে, সংসাররূপ লোহার শিকল পরিত্যাগ করিয়া সাধুসেবার জন্য ইঁহারা স্বেচ্ছায় রূপার

শিকল বরণ করিয়াছেন। এক একটী জমাতের হাজার হাজার সাধু ও গৃহস্থদের দৈনিক আহারাদির ব্যবস্থা করা এক বিরাট ব্যাপার।

স্থায়ী জমাৎ ভিন্ন কুম্ভ উপলক্ষে স্থানে স্থানে ছোট বড় অনেক অস্থায়ী জমাৎ বসিয়াছিল। এই জমাৎগুলি ভীমগড়া, বোরী, সপ্তসরোবর প্রভৃতি স্থানকে এক একটী তাঁবুর সহরে পরিণত করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ব্রহ্মকুণ্ডের চতুর্দ্দিকের তিন চারি মাইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধুসংঘ, বিরক্ত সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণের তাঁবু ও খড়ের কুটিরে এমন ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল যে, 'ন স্থানং তিল ধারণং'। বহুলোক স্থানাভাবে এবং অনেকে তীর্থস্থানে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বৃক্ষতল ও খোলা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদ্বার, কনখল এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কুম্ভের সময় বাড়ী ভাড়া অগ্নিমূল্য হইয়াছিল। ভীমগড়া ও সপ্তসরোবরে সন্ন্যাসীদের জন্য কয়েকটী সদাব্রত খোলা হইয়াছিল।

কনখলে নীলধারা ও আদিগঙ্গার মধ্যস্থলে একটী বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রস্তরখণ্ডবহুল চড়ায় বৈষ্ণবদের একটী অস্থায়ী বৃহৎ জমাৎ বসিয়াছিল। ঠিক যেন তাঁবুর একটী সহর। বৈষ্ণবদের মধ্যে রামানুজী, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও গৌড়ীয় পাঁচটী প্রধান সম্প্রদায়ই এই জমাতে যোগদান করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন রামায়েৎ, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, রুইদাসী, সেনপন্থী, বল্লভাচারী, নিমাইৎ, বিঠলভক্ত, মীরাবাই, কর্ত্তাভজা, রামবল্লভী, আউল, বাউল, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, জাতগোসাই, স্পষ্টদায়ক, সাহেব ধনী, খাকী, নমুকরাসী, গৌরবদী, সহজী, সাধ্বিনী, খুসীবিশ্বাসী, হজরতী, তিলকদাসী, চরণদাসী, রাধাবল্লভী, মাধবী, কুড়াপন্থী, বলরামী, পাগলসাথী, তিলকী, অতিবড়ী, সখীভাবক, হরিশ্চন্দ্রী, চুহড়পন্থী, বৈরাগী, মানভাব, কিশোরী ভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া, নরেশপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় জমাতে তাঁবু খাটাইয়াছিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মোহন্তদের মধ্যে রামানন্দী সম্প্রদায়ের মোহন্ত ভরতদাসজী, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহন্ত ধনঞ্জয় দাসজী, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মোহন্ত রাসবিহারী দাসজী, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের মোহন্ত হরিদাসজী, দিগম্বরী আখড়ার মোহন্ত শ্রীরাম দুলারে দাসজী, নির্ব্বাণী আখড়ার মোহন্ত শ্রীসীতারাম দাসজী, নির্ম্মোহী আখড়ার মোহন্ত শ্রীকমল দাসজী, দারিয়া খালসা সম্প্রদায়ের ১২ জন মোহন্তের মধ্যে শ্রীরামরতন দাসজী ও ত্যাগী খালসা সম্প্রদায়ের ১৩ জন মোহন্তের মধ্যে স্বামী অর্জ্জুন দাসজী প্রধান। ছোট বড় তাঁবুর মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ের বিগ্রহসমূহের সম্মুখস্থ সামিয়ানার নিম্নে সারাদিন ভজন, পাঠ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিয়াছিল। জটাজূটধারী বিভূতিমণ্ডিত অসংখ্য বিরক্ত বৈষ্ণবসাধু উন্মুক্ত প্রান্তরে ধুনী জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন। এই সাধুদের বেশভূষা ও তিলকের বৈচিত্র্য, ধ্বজ-পতাকা ও বিগ্রহের প্রকার ভেদ এবং পূজা, ভোগ, ভাণ্ডারা ও আরাত্রিকের জাঁকজমকে জমাৎটীতে এক অবর্ণনীয় আধ্যাত্মিক ভাব প্রবাহিত হইয়াছিল।

শাক্তদের মধ্যে বৈষ্ণবাচারী, শৈবাচারী, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, পশ্বাচারী, বীরাচারী, সিদ্ধান্তাচারী, কৌলাচারী, চলিয়াপন্থী, করারী, ভৈরব, ভৈরবী, শীতলা পণ্ডিত প্রভৃতি ছোট ছোট সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ ভাবে একস্থানে জমাৎ না করিয়া নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া অজ্ঞাতনামা কত সম্প্রদায় যে কুম্ভে যোগদান করিয়াছিল, উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ।

২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে কুম্ভস্নান আরম্ভ হয়। ১৫ই মার্চ্চ দোলপূর্ণিমা, ৩১শে মার্চ্চ চৈত্র-অমাবস্যা ও ৮ই এপ্রিল রামনবমী উপলক্ষে বিশেষ স্নান হইয়াছিল। ১৩ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তিই কুম্ভযোগের মুখ্যস্নানের দিন ছিল। এই দিনের স্নানের মাহাত্ম্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া কথিত। প্রথম দিনে, চৈত্র-অমাবস্যায় ও শেষদিনে বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে স্নান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কুম্ভ উপলক্ষে অগ্রে স্নান লইয়া বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইত। ইহার ফলে সময় সময় যে নরহত্যা হইয়াছে, উহা চিরকাল মানুষের হিংস্র-প্রবৃত্তির পরিচয় ঘোষণা করিবে। দাবিস্তান নামক পারসীক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৭১৭ শকে হরিদ্বার কুম্ভে শিখ-সম্প্রদায় দুইদল সাধুকে রীতিমত যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন।[১] ১৭২৯ বা ৩০ শকে হরিদ্বারে শৈব সন্ন্যাসীরা ১৮,০০০ (?) বৈরাগীকে হত্যা করেন।[২] ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে গোস্বামী ও বৈরাগীদের দাঙ্গায় প্রায় দুই হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শিখযাত্রিগণ ৫০০ গোস্বামীকে হত্যা করেন। এখন ধর্ম্মের নামে এইরূপ পৈশাচিক অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন দেশীয় রাজ্যের হিন্দু-রাজা ও প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মিলিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে, আচার্য্য শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের এক একটী সম্প্রদায় এক এক স্থানের কুম্ভে অগ্রে স্নান করিবে এবং পরে পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্নান হইবে। এখনও দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে সন্ন্যাসীদের—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদের শোভাযাত্রা পরিচালন ও স্নানের সময় পুলিশের বিরাট বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এবারও আসন ও স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া উৎকলের বিখ্যাত জগন্নাথ বাবাজীর দলের সহিত কয়েকটী বৈষ্ণব দলের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অমাবস্যা-স্নানের দিন শান্তিরক্ষার নোটিশজারী হওয়ায় জগ-ন্নাথ বাবাজীর দল স্নান করিতে যায় নাই। এ জন্য শোভাযাত্রার সময় বিরুদ্ধ দলের বাবাজীদের আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য দর্শকদের নিকট বড়ই অশোভন বোধ হইয়াছিল।

(১) Asiatic Researches, Vol. VI P. 317.
(২) Asiatic Researches, Vol. II. P. 455.

হরিদ্বার কুম্ভে তিন দিনই নিরঞ্জনী আখড়া হইতে নিরঞ্জনী, যূনা, আবাহন ও অগ্নি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ শোভাযাত্রা করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্নান করিতে বাহির হইয়াছিলেন। শোভাযাত্রা গমনের বহু পূর্ব্ব হইতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ নরনারী ধূলিধূসরিত দেহে প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া কতক উপবিষ্ট ও কতক দণ্ডায়মান ছিলেন। তিন মাইল পথের আগাগোড়া দুই দিকে এত দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, কোথাও খালি স্থান ছিল না। প্রাতে ৮।৯টা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রান্তিহীন বিরামহীন ঔৎসুক্যে এই পুণ্যার্থী নরনারীগণ সাধুদের শোভাযাত্রা দর্শন করিবার জন্য সভক্তিচিত্তে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছেন তাঁহারাই মানুষের মনোরাজ্যে ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। প্রথমে হস্তিপৃষ্ঠে ও মটর গাড়ীতে বেতার যন্ত্র স্থাপন করিয়া কয়েকজন ইংরাজ, রিভলবারধারী অশ্বারোহী পুলিশগণ ও রাইফেল্‌ধারী পুলিশের দল অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পরে মায়াপুরের পুল পার হইয়া ক্রমে ৩০টী হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণখচিত রৌপ্যের হাওদায় উপবিষ্ট মণ্ডলেশ্বর, মোহন্ত ও বিশিষ্ট সাধুগণ দর্শকগণের অভিবাদনের উত্তরে হস্ত তুলিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। কয়েকজন সাধু উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করিয়া এবং কয়েকজন লাঠি খেলিতে খেলিতে অগ্রসর হইলেন। কয়েক দল মূল্যবান মখমল ও রেশমী কাপড়ের উপর জরির কাজ করা সুবৃহৎ পতাকা লইয়া চলিলেন। এই পতাকা-গুলির মধ্যে কয়েকটী মণিমুক্তাখচিত ও দেবমূর্ত্তি-যুক্ত। অতঃপর অশ্ব, উষ্ট্র, বহুমূল্য দোলা ও পাল্কীতে আরোহণ করিয়া বহু সন্ন্যাসী রওনা হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ব্যাণ্ডপার্টি বাদ্য বাজাইয়া চলিল। পরে প্রায় দুই হাজার সর্ব্বাঙ্গ

ভস্মাবৃত জটাজূটধারী শ্মশ্রুমণ্ডিত সম্পূর্ণ নগ্নদেহ নাগাসন্ন্যাসী প্রশান্তচিত্তে গমন করিলেন। শোভাযাত্রার মধ্যভাগে বিভূতিভূষিতা গৈরিকবসন-পরিহিতা প্রায় পাঁচ শত সন্ন্যাসিনী চলিলেন। তিতিক্ষা ও তপশ্চরণে নারীসুলভ কমনীয়তা অন্তর্হিত হইয়া ইঁহাদের মুখমণ্ডলে রুক্ষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বশেষে গৈরিক বসনধারী মুণ্ডিতমস্তক সৌম্য শান্ত হাজার হাজার সন্ন্যাসী ধীরপদবিক্ষেপে "নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর হর", "সনাতন ধরম কী জয়", "গঙ্গা মায়ীকী জয়" ধ্বনি করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় শোভাযাত্রায় নির্ব্বাণী ও অটল আখড়ার মণ্ডলেশ্বর, নাগা ও সন্ন্যাসিগণ বিংশতিটী সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, দোলা, পাল্কী, পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতিসহ প্রথম শোভাযাত্রার ন্যায় জাঁকজমক সহকারে বাহির হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের সাধুগণ এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। তৃতীয় শোভাযাত্রায় বহুসংখ্যক পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া মোহান্ত ও বিশিষ্ট সাধুগণ কয়েকটী হাতী ও পাল্কীতে গমন করিলেন এবং কয়েক দল উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তভাবে উন্মুক্ত অসি ও ঝাণ্ডা হস্তে অগ্রসর হইলেন। পরে বিচিত্র বেশভূষা ও তিলক-পরিহিত বিবিধ সম্প্রদায়ের অগণন বৈষ্ণবসাধু 'জয় রাধে শ্যাম", "জয় সীতারাম", "জয় সীয়ারাম" ধ্বনি করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবদের মিছিল বৃহৎ হইলেও বিশেষ কোন আড়ম্বর দৃষ্ট হইল না। চতুর্থ শোভাযাত্রায় তেইশটী হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, দোলা, পাল্কী, পতাকা ও কয়েকটী বাদ্যদলসহ উদাসী সন্ন্যাসিগণ সমারোহে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দলেও বহু নগ্ন নাগাসন্ন্যাসী ছিলেন। সর্ব্বশেষে তেইশটী সুসজ্জিত হস্তিসহ নির্ম্মলা আখড়ার শিখ-সাধুদের শোভাযাত্রা আসিল। সোণার কারুকার্য্যযুক্ত রূপার হওদামণ্ডিত একটী প্রকাণ্ড হস্তিপৃষ্ঠে "গ্রন্থসাহেব" স্থাপন করিয়া কয়েক জন চামর ব্যজন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। অনেকে উন্মুক্ত তরবারি ও কয়েকজন রাইফেল্ হস্তে ব্যাণ্ডের তালে তালে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বীরত্বের সংমিশ্রণে এই শোভাযাত্রা দর্শকগণের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল।

শোভাযাত্রাকয়টী অতিক্রম করিবার সময় রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত শত শত নরনারী ভক্তিপূত হৃদয়ে সাধুদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে এবং অনেকে সাধুদের পদরজ রাস্তা হইতে তুলিয়া অঙ্গে ধারণ করিতে লাগিলেন। পথের স্থানে স্থানে ভক্তগণ জল, সরবৎ, ফল প্রভৃতি শোভাযাত্রী সাধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন। কি বিরাট এই পুণ্যপিপাসু নরনারীর বিশ্বাস, কি অনন্যসাধারণ ইঁহাদের সাধুভক্তি! এক একটী শোভাযাত্রা ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছিলে সাধুগণ দলে দলে স্নান করিয়া পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া অন্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুম্ভ উপলক্ষে ব্রহ্ম-কুণ্ডে সাধুদের স্নানের সময় অন্য কাহাকেও স্নান করিতে দেওয়া হয় না। এক শোভাযাত্রার পর অপর শোভাযাত্রা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ-দিগকে স্নান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভিড়ের ভয়ে অনেক যাত্রী কুম্ভের পূর্ব্বদিন মধ্যরাত্রি হইতে স্নান আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অনেকে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান না করিয়া অন্যত্র গঙ্গায় স্নান করিয়াছিলেন। শেষ স্নানের দিন বৈষ্ণবদের মধ্যে একটী বড় দল স্নানান্তে শোভাযাত্রা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রোরীতে আসিয়া কোন অজ্ঞাত কারণে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া 'গেরুয়াধারী' দর্শন মাত্রই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। ইহাতে অনেক সন্ন্যাসী আহত হন। অজ্ঞতার সঙ্গে পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতাপ্রসূত গোঁড়ামির সংমিশ্রণে মানুষের মনে এইরূপ হিংস্র জিঘাংসা জন্মলাভ করে!

কুম্ভের কয়দিন ছোট বড় সকল জমাতেই পাঠ,

কথকতা ও বক্তৃতা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। বড় বড় রাস্তার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "সনাতন ধর্ম্মসভা", "ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারক মণ্ডল", "হিন্দু নবজীবন সংঘ", "আর্য্য-প্রতিনিধি সভা", "নিখিল ভারত সাধুসম্মেলন", "নিখিল ভারত মহিলাসম্মেলন", "আকালী শিখ-সম্প্রদায়", "বিশ্বজ্ঞান দোয়ার" প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছিল। ভীমগড়ায় উদাসী পূরণ দাসের বক্তৃতামঞ্চ ও বিরাট পাঠাগার দর্শক-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে একটী বৃহৎ সামিয়ানার নিম্নে পত্র-পুষ্পমণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলেখ্যের সম্মুখে পাঠ, ভজন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আশ্রমের বৃহৎ প্রাঙ্গণে অনেকগুলি তাঁবু ও পর্ণ কুটিরে প্রায় দেড় শত সাধু ও ৪।৫ শত গৃহস্থ ভক্তকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। সেবাশ্রম হইতে নিরাশ্রয় রোগীদের জন্য সুদক্ষ চিকিৎসকের অধীনে রোরী, ভীমগড়া ও ভূপৎ-ওয়ালা নামক স্থানে তিনটী অস্থায়ী য্যালোপেথিক্ দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছিল এবং সেবা-শ্রমের স্থায়ী হাসপাতালেও অনেক রোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এই সংখ্যার ৩৮৭ পৃষ্ঠায় "রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল" শীর্ষক সংবাদে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ভিন্ন আরও কয়েকটী প্রতিষ্ঠান স্থানে স্থানে অস্থায়ী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে নিত্য বহু রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। কুম্ভে সেবাকার্য্যের জন্য নানা স্থান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া তাঁবু খাটাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের "মহাবীর দল", দেরাদুনের "নবযুবক মণ্ডল", জোয়ালাপুরের "মহাবিদ্যালয় সংঘ", অমৃতসরের "সেবা সমিতি", "কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক", "কালী কমলী ছত্রের স্বেচ্ছাসেবক" প্রমুখ বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা সেবকদল মেলায় সন্তোষজনক সেবা-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন।

কুম্ভের সময় হরিদ্বার, কনখল ও ভীমগড়ার সকল ঘর বাড়ী ও রাস্তাঘাট যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রহ্মকুণ্ডের রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী সুদৃঢ় লৌহ ফটক নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ স্নানের দিন ব্রহ্মকুণ্ডের চতুর্দ্দিকের রাস্তায় সমুদ্রের তরঙ্গের মত জনপ্রবাহের ধাক্কাধাক্কি দেখা গিয়াছিল। রেল ষ্টেশনের রাস্তাগুলিতে অস্বাভাবিক ভিড় হইয়াছিল। ষ্টেশনের ফটক খুলিয়া দিলে ভিড়ের চাপে কয়েক জন প্রাণ হারাইয়াছেন। জনতার জন্য পুলগুলির প্রবেশ-পথ অতিক্রম করা দুর্ব্বল লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল। এই সংঘাতিক ভিড়ের মধ্যে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যে ভাবে শান্তি রক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। মেলা অফিসার মিঃ ম্যাল্কম্ কার্য্য-পরিচালনের জন্য পাঁচজন বে-সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছিলেন।

মেলা উপলক্ষে স্থানে স্থানে নলকূপ বসান হইয়াছিল এবং পায়খানা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও পাহারার ব্যাপক আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাতে জেলা বোর্ড ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। মেলা-কমিটি রোরী দ্বীপে একটী প্রকাণ্ড প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক ব্যবসায়ী ইহাতে দোকান খুলিয়াছিলেন। শেষ স্নানের পর এই প্রদর্শনীটীসহ বহু যাত্রি-নিবাস ভস্মীভূত হয়। এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অস্থায়ী দাতব্য ঔষধালয়ের তাঁবুটী পুড়িয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ইহা ছাড়া নিরঞ্জনী আখড়া, কনখল ও ভীমগড়ায়

আগুন লাগিয়া অনেক যাত্রী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এই কয়েকটী দুর্ঘটনা ভিন্ন মেলার কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, কুম্ভমেলা হিন্দু-ভারতের সকল সম্প্রদায়েব সম্মেলনক্ষেত্র। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন ভারতের সকল প্রদেশেব লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ ভক্ত কুম্ভে সমবেত হইয়া থাকেন। কুম্ভকে অবলম্বন করিয়া আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হিন্দুসম্প্রদায়সমূহ আশ্চর্য্যজনকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। বিনা আহ্বানে বিনা নিমন্ত্রণে সকল সম্প্রদায়ের এই প্রকার স্বয়ং আহূত সম্মেলন হিন্দু-ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের এক শ্রেষ্ঠ উপাদান। বর্ত্তমানে কুম্ভ প্রধানতঃ স্নান ও ধর্ম্ম-প্রচারেই সীমাবদ্ধ। ইহার সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহকে সংঘবদ্ধ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণ, সংস্করণ ও সম্প্রসারণ সাধন করিতে পারিলে হিন্দুজাতির পরম কল্যাণ সাধিত হইবে।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(৩) গুণভেদবশতঃই মনের বিবিধ বৃত্তিরূপে বিকারপ্রাপ্তি।

সত্ত্বাদি গুণবশতঃই মনের বিকারশীলতা, ইহাই দেখাইতেছেন—

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ
কামক্রোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা
রজসোত্থিতাঃ ॥১৪
আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারা-
স্তমসোত্থিতা। ১৪½

অন্বয়—বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্য্যম্ ইত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ (ভবন্তি)। কামক্রোধৌ লোভযত্নৌ ইত্যাদ্যাঃ রজসা উত্থিতাঃ (ভবন্তি)। আলস্য-ভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যাঃ বিকারাঃ তমসা উত্থিতাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্তবৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ দ্বারা উৎপাদিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রযত্ন ইত্যাদি ঘোর বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের রজোগুণ দ্বারা উৎপাদিত হয়। আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের তমোগুণ দ্বারা উৎপাদিত হয়।*

টীকা—অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না।

বৈরাগাদি বৃত্তিসমূহের কার্য্যসকল বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন—

(৪) গুণবিকারসমূহের ফলের বর্ণন, এবং অন্তঃকরণাদির প্রভু চিদাভাসের বর্ণন।

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ
রাজসৈঃ ॥১৫
তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং
ভবেৎ।১৫½

অন্বয়—সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ (ভবতি) চ

* গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭—১১ শ্লোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণসমূহ এবং ষোড়শাধ্যায়ে বর্ণিত দৈবীসম্পৎ—সত্ত্বগুণোৎপন্ন। ষোড়শাধ্যায়ের 'আসুরী সম্পদে'র অন্তর্গত কতকগুলি রজোগুণোৎপন্ন ও কতকগুলি তমোগুণোৎপন্ন। (রত্নপিটকগ্রন্থাবলীর) "জীবন্মুক্তিবিবেক"—২০পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাজসৈঃ পাপোৎপত্তিঃ (ভবতি), তামসৈঃ ন উভয়ম্ কিন্তু বৃথায়ুঃ ক্ষপণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পুণ্যার্জ্জন হয়, রজোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পাপোৎপত্তি হয়। তমোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা, তদুভয়ের কোনটিই হয় না, অর্থাৎ পুণ্য পাপ কিছুই হয় না, বৃথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র।

টীকা—নিষ্প্রয়োজন।১৫॥

এই বৈরাগ্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া অন্তঃকরণাদি সকলের অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ামক বা প্রভুর বর্ণনা করিতেছেন—

অত্রাহংপ্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ॥১৬

অন্বয়—অত্র "অহম্" ইতি প্রত্যয়ী কর্ত্তা, এবম্ লোকব্যবস্থিতিঃ।

অনুবাদ—ইহাদের মধ্যে যাহাতে "অহম্" (আমি) এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহাই কর্ত্তা। লোক ব্যবহারেও ঠিক এইরূপ নিয়ম।

টীকা—অহম্প্রত্যয়ী—এই অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে যাহা 'আমি' এইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট, তাহাই কর্ত্তা বা প্রভু, ইহাই অর্থ। ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে অহম্প্রত্যয়বিশিষ্ট আভাসযুক্ত অহঙ্কার। "লোকব্যবস্থিতিঃ"—যেহেতু লোক-ব্যবহারে কার্য্যের কর্ত্তাকে 'স্বামী' বলা হইয়া থাকে অথবা এইরূপে সংসারপ্রবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।১৬

জগৎ দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত ভূতসমূহেরই কার্য্য—এইরূপে নিশ্চয়

এই প্রকারে সংসারের স্থিতি বা ব্যবহারের কথা বলিয়া অথবা সংসারপ্রবাহের নির্ব্বাহের কথা বলিয়া, সেই সংসার যে ভৌতিক, তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন :—

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্॥১৭

অন্বয়—স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বম অতিস্ফুটম্ (ভবতি), অক্ষাদৌ অপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ তৎ অবধার্য্যতাম্।

অনুবাদ—স্পষ্ট শব্দস্পর্শাদিযুক্তবস্তুসমূহের ভৌতিকতা অর্থাৎ তাহারা যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়াদিবিষয়েও শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্য তাহাদের ভৌতিকতা নিশ্চয় করিয়া লইবে।

টীকা—"স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু"—স্পষ্ট যে শব্দ স্পর্শাদিগুণ, সেই সকল গুণের সহিত যুক্ত বা মিলিত যে ঘটাদি বস্তু তাহাতে "ভৌতিকত্বম্"—ভূতকার্য্যতা, "অতিস্ফুটম্"—স্পষ্টই বুঝা যায় অর্থাৎ (অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে) উৎপাদ্য-বস্তুর গুণ দেখিয়া তদ্গুণযুক্ত উৎপাদক বস্তুকে ধরা যায়। আকাশের শব্দ বায়ুতে দেখিয়া বায়ুকে আকাশের কার্য্য বলিয়া ধরা যায়। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ তেজে দেখিয়া তেজকে বায়ুর কার্য্য বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ উত্তরোত্তর বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে পঞ্চভূতের গুণযুক্ত ঘটাদি বস্তু যে পঞ্চভূতের কার্য্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। (শঙ্কা) ভাল, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে, তাহারা যে ভূতকার্য্য, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে? (সমাধান) আগম ও অনুমান দ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় এই কথাই বলিতেছেন :—"অক্ষাদৌ অপি"—'ইন্দ্রিয়াদি বিষয়েও' ইত্যাদি। (এস্থলে 'আদি" শব্দ দ্বারা মন, প্রাণ, দেহ ও মনোবৃত্তি বুঝিতে হইবে। * আগম বা শাস্ত্র

* জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি এক এক ভূতের গুণের গ্রাহক, যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের শব্দগুণের গ্রাহক। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়। তন্মধ্যে ত্বক্ ও চক্ষু যথাক্রমে স্পর্শ ও রূপের গ্রাহক হইয়া, সেই সেই গুণের আশ্রয় ঘটাদি ও

এই—"অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ ; তেজোময়ী বাক্" (ছান্দোগ্য উ, ৬।৫।৪) হে সৌম্য, মন নিঃসন্দেহ, অন্নময় অর্থাৎ অন্নের স্থূলাংশ বা পৃথিবী হইতে যেমন বিষ্ঠা, মধ্যমাংশ রস হইতে মাংস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্নের সূক্ষ্মাংশ পুণ্যাপাপ হইতে মন হয় ; দধি হইতে তাহার সূক্ষ্মাংশ যেমন নবনীতরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ। শিশু অন্ন-ভক্ষণ করিতে শিখিলে তাহার মন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কেহ অন্ন ভক্ষণ না করিলে, তাহার মন ক্ষীণ হইতে থাকে। সেইহেতু মন হইতেছে অন্নময়।* প্রাণ হইতেছে আপোময় (অম্ময়) অর্থাৎ পীতজলের স্থূলভাগ হইতে যেমন মূত্র, মধ্যমভাগ হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলের সূক্ষ্মভাগ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বাক্ হইতেছে তেজোময় অর্থাৎ ভুক্ত ঘৃতাদি তৈজস পদার্থের স্থূলভাগ হইতে যেমন অস্থি উৎপন্ন হয়, মধ্যমভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভুক্ত তৈজস পদার্থের সূক্ষ্মভাগ হইতে বাণী উৎপন্ন হয়। বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক বুঝিতে হইবে। তদ্বিষয়ক অনুমান এই—বিবাদাস্পদ যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তাহা অবশ্য ভূতগণেরই কার্য্য—প্রতিজ্ঞা, যেহেতু তাহারা ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী অর্থাৎ ভূতের সত্তায় ইন্দ্রিয়ের সত্তা ভূতের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব। যাহা যে বস্তুর সহিত অন্বয় ও ব্যতিরেকের নিয়মানুসারী, তাহা সেই বস্তুর কার্য্য, ইহা দেখা গিয়াছে ; যেমন মৃত্তিকার সহিত অন্বয়-ব্যতিরেকনিয়মানুসারী ঘট, মৃত্তিকারই কার্য্য দেখা গিয়াছে ; সেইরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও ভূতের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী, সেই হেতু সেই প্রকার ভূতের কার্য্য। "হে সৌম্য এই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যাগাত্মা, ষোড়শকলাবান্" ইত্যাদি (৬।৭।১) বচনদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে মন, ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী, অর্থাৎ প্রশ্নোপনিষদে (৬।৪) যে ষোড়শকলা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনকেও ধরা হইয়াছে, যথা প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, (দশ) ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম (দেব-দত্তাদি) এবং সেই মন সমষ্টিপ্রাণের (সম্মিলিত ভূতসূক্ষ্মের) কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই হেতু মন ভূতগণের সহিত অন্বয় ব্যতিরেক নিয়মানু-সারী। অন্যত্র অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৭

দীপাদিরও গ্রাহক, আর শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, কেবল মাত্র শব্দ, রস ও গন্ধের গ্রাহক। এইরূপ কিছু প্রভেদ আছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি, এক এক ভূতের গুণের নির্ব্বাহক, যেমন বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, আকাশের শব্দগুণের উৎপাদননির্ব্বাহক। পাণির গ্রহণ ক্রিয়া, বায়ুর স্পর্শগুণের গ্রহণনির্ব্বাহক। পাদের গমন ক্রিয়া, রূপগুণের গ্রহণের নির্ব্বাহক, (রূপ দর্শনবহির্ভূত হইলে, লোকে পায়ে হাঁটিয়া রূপ গ্রহণের জন্য নিকটবর্ত্তী হয়।) উপস্থের রসত্যাগক্রিয়া জলের রসগুণের ত্যাগের নির্ব্বাহক। এইরূপে ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়।

তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির সত্ত্ব গুণের কার্য্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির রজোগুণের কার্য্য। মন সর্ব্বেন্দ্রিয়সমানীত জ্ঞানের গ্রাহক বলিয়া পাঁচটি ভূতেরই সত্ত্বগুণের কার্য্য, এইরূপ প্রভেদের নিশ্চয় হয়।"

* সবিস্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে দ্রষ্টব্য।

"হে সৌম্য সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ (কারণ-স্বরূপ) ছিল" এই শ্রুতি দ্বারা 'সৎ অদ্বিতীয়ে'র প্রতিপাদন।

(১) উক্ত শ্রুতির অর্থ।

(ক) তদন্তর্গত "ইদম্" বা 'এই' শব্দের অর্থ।

এইরূপে ভূতসমূহ ও ভৌতিকপদার্থসমূহকে বিভাগপূর্ব্বক দেখাইয়া, এই প্রকরণের আদিতে উল্লিখিত "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ"—'হে

সৌম্য এই জগৎ আগে সৎকারণ রূপই ছিল'—এই অদ্বিতীয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে, সেই শ্রুতি বচনের অন্তর্গত 'ইদম্' পদের অর্থ বলিতেছেন :—

একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং
জগৎ ॥১৮॥

অন্বয়—একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ, যুক্ত্যা, শাস্ত্রেণ অপি যাবৎ কিঞ্চিৎ জগৎ অবগম্যতে, এতৎ "ইদম্"-শব্দোদিতম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা, অনুমান প্রভৃতি যুক্তি দ্বারা, এবং শব্দপ্রমাণ দ্বারা যত কিছু জগৎপ্রপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, সেই সমস্তই উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ 'ইদম্' পদের অর্থ।

টীকা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন লইয়া এগারটি ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপ করণদ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমার বিষয় শব্দাদি পাঁচটির গ্রহণ হয়। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ভাষণ, গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্রিয়া ও সেই সেই ক্রিয়ার বিষয়—বক্তব্য, গ্রহীতব্য ইত্যাদির গ্রহণ হয়। মন দ্বারা মানসপ্রত্যক্ষ, আভ্যন্তর বিষয় সুখ, দুঃখ প্রভৃতির এবং প্রত্যক্ষপ্রমা, অনুমিতিপ্রমা ইত্যাদি-রূপ সকল প্রকার বস্তুর জ্ঞানেরও গ্রহণ হয়। 'অপি'(ও) শব্দ দ্বারা 'অর্থাপত্তি' প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রমাণত্রয়কে ও প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ (১) উপমিতিপ্রমার বিষয় উপমেয় (গবয়রূপ) পদার্থ, অর্থাপত্তিপ্রমার বিষয় (২) (অদিবাভোজী) স্থূলকায় ব্রাহ্মণের রাত্রি ভোজন-রূপ উপপাদক, এবং (৩) অভাব প্রমার বিষয় পাঁচ প্রকার অভাব এবং সকল প্রমাণই যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই জ্ঞানকে এবং প্রমাণ-রূপ প্রপঞ্চকেও, বুঝিতে হইবে। এই সকল দ্বারা "যাবৎ কিঞ্চিৎ জগৎ অবগম্যতে"—যাহা কিছু জগৎ (প্রপঞ্চ) অবগত হওয়া যায়, তৎ-সমুদায়ই, "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত 'ইদম্' (এই) পদদ্বারা সূচিত হইতেছে। যদ্যপি (ইদম্) 'এই' শব্দদ্বারা বর্ত্তমানকালের ও সম্মুখবর্ত্তী দেশের সহিত সম্বদ্ধ বস্তুকে বুঝায় এবং তাহা হইলে 'ইদম্' শব্দের ঐরূপ অর্থ বাধিত হয় অর্থাৎ 'ইদম্' শব্দদ্বারা সকল প্রমাণজনিত জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষ, অপরোক্ষ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকাল সম্বদ্ধ সকল প্রপঞ্চকে বুঝান যায় না, তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অথবা সর্ব্বজ্ঞ উদ্দালক মুনির দৃষ্টিতে, (বর্ত্তমানাধ্বার, অতীতাধ্বার ও অনাগতাধ্বার *) সকল পদার্থই অপরোক্ষ এবং সেই হেতু পুরোবর্ত্তী দেশাবস্থিতের ন্যায় এবং সকল সময়েই এক রসরূপে প্রকাশমান বলিয়া বর্ত্তমানতুল্য। আর শ্রীভগবানও বলিতেছেন—"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি" ইত্যাদি; হে অর্জ্জুন, যে সকল পদার্থ একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে, তৎসমুদয়ই, আমি "বেদ"—জানিতেছি। এইরূপে ঈশ্বরদ্বারা অথবা উদ্দালক মুনি দ্বারা উচ্চারিত, উক্ত 'ইদম্' শব্দ সর্ব্বকালসম্বন্ধী ও সর্ব্বদেশসম্বন্ধী পদার্থকে বুঝাইতে পারে, তাহাতে বাধা হয় না। ১৮

* যোগমণিপ্রভার ১১৯ পৃষ্ঠায় কৈবল্যপাদ ১২শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

পরলোকে কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৮শে জুন তারিখে শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬১ বৎসর বয়সে মেনিঞ্জাইটিস্ রোগে তাঁহার ৭৩ বি কেশব সেন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ৺গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালীপদ বাবু দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে সরকারী শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। তিনি কিছুদিন হুগলী কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। বহুদিন সুখ্যাতির সহিত কর্ম্মের পর তিনি আলীপুর অব্জারভেটরীর সুপারিন্-টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বেলুড় মঠের পুরাতন ভক্তদিগের মধ্যে কালীপদ বাবু অন্যতম। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রমুখ বেলুড় মঠের প্রাচীন পূজনীয় সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বালকসদৃশ সরলতা ও ধর্ম্মভীরুতা ছিল তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদ

স্বামী নিখিলানন্দ—নিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জগৎ যে আর একটি মহাসমরের ধ্বংসলীলায় নিমজ্জিত হইবে এবং ইহার পর যে বর্ত্তমান ভোগ-সর্ব্বস্ব সভ্যতার অবসানে এক নূতন সভ্যতা উদ্ভূত হইয়া মানব সমাজকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, যে নবসভ্যতার জন্ম হইবে উহার পত্তন হইবে ভারতীয় ও আমেরিকার সংস্কৃতির সংযুক্ত ভিত্তিতে। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এবং আমেরিকার পার্থিব ও ব্যবহারিক সংস্কৃতির সম্মিলনই হইবে এই নব সভ্যতার প্রকৃত রূপ। বর্ত্তমান ভোগসর্ব্বস্ব সভ্যতায় জগৎ বড় ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা চারিদিকে শুধু ধ্বংসের বীজই বপন করিতেছে। এই সভ্যতার অবসানে যে নব সভ্যতার অভ্যুত্থান হইবে, উহা জগৎকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়া মানুষের মধ্যে একটা সুখ ও শান্তির আবহাওয়া আনয়ন করিবে। ইহা যে ঘটিবে, তাহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমি আমার মনশ্চক্ষে সেদিন যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি।

রামকৃষ্ণ মিশন আমেরিকায় কিরূপ কাজ

করিতেছে তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সম্বন্ধে আমেরিকার মত অত বড় একটি দেশের জনসাধারণ এখনও বিশেষ কিছু জানেন না। কিন্তু তথাপি আমেরিকার জ্ঞানী চিন্তাশীল ব্যক্তি যাঁহারা আছেন, তাঁহারা হিন্দুদর্শন, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি ক্রমেই অধিক আকৃষ্ট হইতেছেন।

স্বামীজী আরও বলেন, বর্ত্তমানে জড় সভ্যতার প্রতি আমেরিকাবাসীদের মন যে ক্রমেই বিরূপ হইয়া উঠিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া খুব শক্ত নহে। বর্ত্তমানে এই নিছক জড়বাদ লইয়া আমেরিকায় অধিবাসীরা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা আজ এমন একটা জিনিষ খুঁজিতেছেন, যাহা দুর্গত মানব জাতির মনে একটা শান্তির প্রলেপ আনিয়া দিতে পারে। সেই জন্যই আজ আমেরিকায় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সভ্যতার মুখাপেক্ষী নরনারীর অভাব দৃষ্ট হয় না। এমন অনেক আমেরিকাবাসী আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতাই তাহাদের অস্থির ও ক্লিষ্ট মনে শান্তি আনিতে পারে। আমেরিকাবাসী একটি নূতন জাতি। তাহারা কর্ম্মপ্রবণ ও উদ্যমশীল। তাঁহাদের মধ্যে জীবনের সত্যকার স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ আমেরিকাবাসীর অন্তর ন্যায় ও যৌক্তিকতার ভাবে উদ্বুদ্ধ। এইজন্য ইহা বুঝা অতি স্বাভাবিক যে, আমেরিকার জনসাধারণ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের ধারণা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমেরিকার ঘরে ঘরেই মহাত্মা গান্ধীর নাম উচ্চারিত হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, জগতের কল্যাণের জন্যই মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, ভারতের মুক্তি আনয়নে মহাত্মাজীর অসহযোগ-নীতির সাফল্য সম্বন্ধে আমেরিকার সকলেই নিঃসন্দেহ। তথাপি এই কথা বলা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর নাম তাঁহাদের মনে ইন্দ্রজালের ন্যায় কাজ করে। ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আমি যখন ভারতে আসিবার আয়োজন করিতেছিলাম তখন আমাদের কেন্দ্রের একজন দ্বাররক্ষক আমার কাছে আসিয়া আমাকে এই অনুরোধ করে যে, যদি আমার সহিত মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ হয় তবে আমি যেন মহাত্মা গান্ধীকে তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি।

স্বামীজী আরও বলেন যে, আমেরিকায় ও ইউরোপে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ যদিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, তথাপি রামকৃষ্ণ মিশন যদি আরও অধিক সংখ্যক প্রচারকের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে ঐ সব দেশে তাঁহাদের কার্যের পরিধি আরও বাড়ান যাইতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, এই ভ্রমণ কালে তিনি আগ্রহের সহিত ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঐ দুই মহাদেশের সর্ব্বত্রই জনগণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যাহা কিছুই বলা হউক না কেন তাহা বেশ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম ও কার্য্যাবলী জগতের—বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র বহুল প্রচারের কার্য্যে রোঁমা রোঁলার "রামকৃষ্ণ" পুস্তকখানি যে অনেক সহায়তা করিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং এই জন্যই এই দুই মহাদেশের যেখানেই স্বামীজীরা যান, সেখানেই তাঁহারা সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন যে, উত্তর আমেরিকায় মোট ১১টি, ইউরোপে ৩টি ও দক্ষিণ আমেরিকায় ১টি রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র

আছে। এই সকল কেন্দ্রে সাধারণতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতাদি দেওয়া হয় ও অধ্যাপনা করা হয়। এই বক্তৃতাদিতে হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া বলা হয়। তবে কাহাকেও কোন বিশেষ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলা হয় না। যাহার যে ধর্ম্ম তাহাকে সেই ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থাকিয়া সাধন করিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অন্যান্য মিশনারীদের মত রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ধর্ম্মান্তর (হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা) গ্রহণ করিবার জন্য প্রচার কার্য্য করা হয় না।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল —বিগত কুম্ভমেলায় কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সহৃদয় দেশবাসীর সহায়তায় যেরূপ সেবাকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

সেবাকার্য্য প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—(১) মেডিক্যাল রিলিফ্, (২) অপরাপর রিলিফ্।

(১) মেডিক্যাল্ রিলিফ্ চারিস্থানে পরিচালিত হইয়াছিল :—(ক) কনখল, (খ) রোরীদ্বীপ, (গ) ভীমগড়া, (ঘ) ভূপৎওয়ালা।

(ক)—প্রধান কেন্দ্র কনখলের 'আউটডোর' বিভাগে ৯১৩০ জন রোগী ঔষধ লইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪৫৯০ জন নূতন রোগী এবং বাকী সব পুরাতন রোগী ছিল। এই প্রধান কেন্দ্রের 'ইনডোর' হাসপাতাল বিভাগে ২২২ জন রোগীকে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করা হইয়াছিল। সেবাশ্রমের একজন ডাক্তার স্থানীয় মিউনিসিপালিটির অধীনে থাকিয়া যাত্রিগণকে টীকা দিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া 'টুরিং রিলিফ্' নামে আর একটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগের ডাক্তার ও সেবকগণ মেলার বিভিন্ন মহল্লায় গিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেন, এবং উত্থান-শক্তিরহিত রোগিগণকে আনিয়া কেন্দ্রীয় হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন।

(খ) রোরীদ্বীপ—এই দ্বীপটি অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। একদিকে গঙ্গার নীলধারা ও হিমালয়, অপর দিকে ব্রহ্মকুণ্ড। এই স্বভাবসুন্দর ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া সাধুগণের শোভাযাত্রা যাতায়াত করিত। মেলা উপলক্ষে এ স্থানটি জনবহুল নূতন সহরে পরিণত হইয়াছিল। এই কেন্দ্র হইতে ৩৬৪২ জন যাত্রীকে ঔষধ দেওয়া হয়।

(গ) ভীমগড়া শাখা—এই স্থানটি হরিদ্বারের উত্তরদিকে অবস্থিত। উদাসী উপদেশক সভা এখানে একটি বিরাট পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিল। ইহারই অঙ্গনে আমাদের শাখা কেন্দ্র ছিল। মেলার দুইমাস পূর্ব্ব হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া এই কেন্দ্র হইতে ৬২৩৩ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়।

(ঘ) ভূপৎওয়ালা শাখা—কনখল যেমন হরিদ্বারের দক্ষিণ প্রান্তে, তেমনি ইহা উত্তর প্রান্তে। এই কেন্দ্র হইতে ৩৩৬১ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়।

(২) অপরাপর রিলিফ্—এই বিভাগের কার্য্য চারিবিভাগে বিভক্ত ছিল।

(ক) যাত্রিগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, (খ) ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও প্রচার, (গ) পাঠাগার, (ঘ) অসহায় যাত্রিগণের সেবা।

(খ) ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও প্রচার—এই বিভাগের অধীনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিত্য বিবিধ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ভজন ও বক্তৃতা করেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১০৩তম জন্মোৎসব এই সময়ে সম্পাদিত হয়। এই উপলক্ষে হিন্দীভাষায় লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী বিতরণ করা হয়।

(গ) পাঠাগার—ইহাতে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল প্রভৃতি নানা ভাষার ৪১ খানা দৈনিক ও সাময়িক পত্র ছিল। ইহা ছাড়া নানা রকমের পুস্তকও ছিল। নিত্য বহুলোক এখানে আসিয়া পাঠ করিতেন।

(ঘ) অসহায়গণের সেবা—মিশন সেবাশ্রমে

বহু অসহায় ও নিরাশ্রয় স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকে দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেবাশ্রমের সেবকগণ তৎপরতার সহিত ইহাদের আত্মীয় ও সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থিভবন, নারায়ণগঞ্জ—মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার আদর্শ। ধর্ম্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপিত না হইলে এই পূর্ণতার বিকাশ সম্ভব হয় না।

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে তরুণগণের অন্তরে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব জাগাইবার কোন প্রচেষ্টা হয় না বলিলেই চলে। এজন্য যুবকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নানাভাবে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এই অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের নানাস্থানে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়াছে ও করিতেছে।

এই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে একটি বিদ্যার্থিভবন স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে স্থানীয় হাইস্কুলের ৩টি ছাত্র এই বিদ্যার্থিভবনে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে। ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান এবং আদর্শ চরিত্র গঠনই ইহার উদ্দেশ্য।

নারায়ণগঞ্জ স্বাস্থ্যকর স্থান। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে এখানে পাঁচটি হাইস্কুল চলিতেছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ আশ্রমের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া স্থানীয় হাইস্কুলগুলিতে অধ্যয়ন করে। ছাত্রদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধানের যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে (নূতন বৎসরে) ছাত্রাবাসে আরও দশটি ছাত্র লওয়া হইবে।

দশ হইতে পনর বৎসর বয়স্ক ছাত্রগণকে এই ছাত্রাবাসে গ্রহণ করা হয়। ভর্ত্তি ফিস্ দুই টাকা বাদে পড়ান (Coaching), থাওয়া, জলখাবার ও অন্যান্য চার্জ্জ বাবদ মোট মাসিক ১২৲ টাকা করিয়া প্রত্যেক ছাত্রের দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত স্কুলের বেতন, কাপড়, বিছানা ও পুস্তকাদির ব্যয়ভার পৃথকভাবে অভিভাবককে বহন করিতে হয়।

বিদ্যার্থিভবনের নিয়মাবলী ও ভর্ত্তির আবেদনের জন্য নিম্ন ঠিকানায় দুই পয়সার টিকিটসহ পত্র লিখিতে হয়:—স্বামী সম্পূর্ণানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ নারায়ণগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন—বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৩৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৯৩৭ সন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেবাশ্রম ইহার কর্ম্মজীবনের একত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। এই বৎসর সেবাশ্রমের অন্তর্ব্বিভাগে ২৪টি বেড্ ছিল এবং তাহাতে মোট ৩৩১ জন রোগী স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বহির্ব্বিভাগে মোট ৩৫৭৮২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১২৫৫০। এতদ্ভিন্ন ১৭টি বিপন্ন পরিবারকে নগদ ৯৪৷৴০ দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। এই সকল পরিবারের অধিকাংশই ভদ্রবংশসম্ভূত; প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।. আবশ্যক স্থলে কাপড় কম্বল প্রভৃতি দ্বারাও সাহায্য করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৬৯২৵৬ পাই সহ এই বৎসরের মোট আয় ৬০৯৫।৴০ এবং মোট ব্যয় ৪৩৩৪৷৵৩ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর—আমরা দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৩৭ সনের (ষোড়শ বার্ষিক) সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। এই বৎসর বিদ্যাপীঠে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৯। শিক্ষকদের মধ্যে ১৩ জন গ্র্যাজুয়েট, ১৪ জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং অধিকাংশই রামকৃষ্ণ-মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী।

৭ জন ছাত্র এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৪ জন ১ম বিভাগে এবং ৩ জন ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ছাত্রদের জন্য হকি ক্রিকেট ফুটবল বাস্কেট বল ভলিবল এবং নানাপ্রকার দেশীয় খেলার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ সকালে ছাত্রগণ তাহাদের বয়স ও শারীরিক শক্তি অনুসারে ব্যায়াম অভ্যাস করে।

প্রায় ১২ জন ছাত্র এই বৎসর টাইপ রাইটিং শিক্ষা করিয়াছে। ছাত্রেরা আশ্রমের উদ্যানে উদ্যান সম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ৺সরস্বতীপূজা ৺কালীপূজা ৺দুর্গাপূজা এবং প্রার্থনা ভজন প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক শিক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বিদ্যাপীঠের পুস্তকালয়ে ২৫০ খানা নূতন গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। বিবেকানন্দের কথা ও গল্প নামক একখানা শিশুদের উপযোগী গল্পপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপীঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তাহা প্রধানতঃ বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও শিক্ষকগণের জন্য স্থাপিত হইলেও এ বৎসর প্রায় ১৫০০ দরিদ্র লোককে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ১১২৩৭।৶৪ পাই সহ এ বৎসরের মোট আয় ৪২৫১১।১৮ পাই এবং মোট ব্যয় ২৬২৯৫৲৩ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ঝরিয়া ও ধানবাদ—গত ২২শে মে রবিবার ধানবাদের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ-সোসাইটীর কর্ম্মিগণের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। উৎসব দিবস সমিতির নবনির্ম্মিত পাকা বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগাদির পর দরিদ্র এবং ভক্ত নরনারীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়।

বৈকালে ৬ ঘটিকার সময় সমিতির নিজস্ব বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় হিন্দুসমাজের নেতা স্বনামধন্য পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী লালা শ্রীযুক্ত অলিরাম তানাজা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হিন্দী ভাষায় একটি উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার নন্দী মহাশয় বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করেন।

অতঃপর স্বামী মাধবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে অতি সরল এবং সুললিত ইংরেজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। পরে স্বামী সুন্দরানন্দ বাংলা ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দান করেন। স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমাপদ রায় বাঙ্গালা ইংরেজী মিশ্রিত ভাষায় এবং স্থানীয় মাইনিং স্কুলের শিক্ষক মিঃ হুদা ইংরেজী ভাষায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে মাননীয় সভাপতি মহাশয় হিন্দী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর বিষয়ে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা দান করিয়া উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। তিনি সমিতির কার্য্যাবলী দৃষ্টে বিশেষ প্রীত হইয়া ইহার দাতব্যঔষধালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য এক হাজার টাকার একখানা চেক দেন এবং তাঁহার বন্ধু ঝরিয়ায় কয়লা-ব্যবসায়ী শেঠ শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনলাল আগরওয়ালা সমিতির নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ডে ২৫০৲ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অযাচিত দানে সমিতির কর্ম্মিগণের উৎসাহ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভায় পাঞ্জাবী গুজরাটী মাড়োয়ারী বাঙ্গালী বিহারী এবং ইংরেজ মিলিয়া প্রায় দেড় হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সভার কার্য্য শেষ হইলে দুইটি ভজনের পর

উপস্থিত প্রায় ১৩০০ শত লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও সেবাশ্রম, টাঙ্গাইল—গত ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার টাঙ্গাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও সেবাশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ময়মনসিংহ মঠের স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ, ঢাকা মঠের স্বামী জপানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমিয় চৈতন্য এবং শিলচর মঠের ব্রহ্মচারী লোকেশ চৈতন্য এখানে আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডী পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে সহস্রাধিক দরিদ্র নারায়ণ ও শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ স্বামী জপানন্দ "যত মত তত পথ" এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ ও জাতীয় সমস্যা" সম্বন্ধে জনসভায় অতি সুললিত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। ৪ঠা তারিখে কালিকানন্দ গ্রামের মদনমোহনের বাড়ীতে স্বামীজী "সামাজিক সমস্যা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম, ভট্টকাক (পাবনা)—গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে পরিকল্পিত ভট্টকাক শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম কমিটির উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্মরণোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উল্লাপাড়া রেলওয়ে ষ্টেসন বাজারে উৎসব স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

প্রথম দিনে ঊষা কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগ, গীতাপাঠ, কীর্ত্তন, শোভাযাত্রা, নব-নারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণের আয়োজন হয়। দ্বিতীয় দিনের কার্য্যসূচী অনুযায়ী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তৃতীয় দিন ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় উৎসব স্থানে সলপের জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় সিরাজ গঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পাবনার ডেপুটী সুপারিনটেনডেণ্ট অব্ পুলিশ ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামী অখিলাত্মানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও সাধনা" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

উপসংহারে তিনি এই স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সন্তোষ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মিবৃন্দকে কল্পনাটি অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসাহিত করেন।

রামকৃষ্ণ-সেবাসমিতি, কলমা (ঢাকা)—গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে কলমা রামকৃষ্ণ আশ্রমে বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ, স্বামী সম্পূর্ণানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বামী বেদা-নন্দের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠশালায় পুরস্কার বিতরণ সভা হয়। ইহাতে স্বামী সম্পূর্ণানন্দ একটি শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণে "বসন্তবালা-স্মৃতিমন্দির" নামক দাতব্য ঔষধালয়ের নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে একটি জনসভা হয়। বাশিরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার পর-লোকগত সহধর্ম্মিণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই সুন্দর গৃহটি দান করিয়াছেন। এই সভায় ঢাকা জুবিলি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যক্ষতা করেন। স্বামী জ্যোতিঃস্বরূপানন্দ উক্ত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। স্বামী সম্পূর্ণানন্দ, স্বামী সাধনানন্দ বক্তৃতা দান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে সেবাসমিতির বাৎসরিক

সভায় স্বামী সাধনানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক মহাশয় সমিতির বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবসহ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বগাপ্রসাদ সেন, স্বামী সম্পূর্ণানন্দ ও সভাপতি মহাশয় সমিতির কার্য্যাবলী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সমস্তদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয় এবং তাহাতে প্রায় দেড়হাজার পুরুষ ও মহিলা প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্তা সুজাতা গুপ্তার সভানেত্রীত্বে শ্রীকালী-পাঠশালার পুরস্কার বিতরণ ও মহিলা সম্মেলনের কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়, বেলুড়

ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের প্রচারকল্পে জগদ্বরেণ্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি উক্ত প্রতিষ্ঠান জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নানাভাবে নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। দুঃস্থ ও অসহায় নরনারীর সেবা করা ইহার একটী প্রধান ব্রত।

সহায়সম্বলহীন রোগীদিগের দুর্দশা কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে অন্যান্য বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যের সহিত একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও ১৯১৩ সাল হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে অতি সামান্যভাবে ইহার কাজ আরম্ভ হইলেও আজ ইহা হাওড়া জেলার একটী বিশিষ্ট চিকিৎসালয়ে পরিণত হইয়াছে। দিনদিন ইহার রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহা হইতেই ইহার লোক-প্রিয়তা ও কার্য্যের প্রসার অতি সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম বৎসরে ইহার রোগীর সংখ্যা মাত্র ১০০০ ছিল, কিন্তু তার পর কোন কোন বৎসরে উহা বিশগুণেরও অধিক হইয়াছে। বিগত পঁচিশ বৎসরে উক্ত চিকিৎসালয় হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪,০৭,৩২৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ২,৬৩,৫৬৮ জন। ডাক্তার ও সেবকগণের ঐকান্তিক যত্নের ফলে বেলুড় ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলি ছাড়া সালিখা, হাওড়া, এমন কি গঙ্গার অপর পার হইতেও দলে দলে রোগীরা চিকিৎসার্থ আসিয়া থাকে।

উক্ত চিকিৎসালয় হইতে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের রোগীদের ঔষধ তো দেওয়া হয়ই, অধিকন্তু আবশ্যকমত পথ্য এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে বস্ত্র এবং কম্বলও দেওয়া হইয়া থাকে; কঠিন পীড়া হইলে রোগীদের ভাল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়; স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়, এবং জরুরী হইলে রাত্রেও রোগীদের দেখা হয়।

১৯৩৭ সালে ২৩,৮১৯ জন রোগী উহা দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৮,৯৮১; অর্থাৎ গত বৎসর প্রায় একচতুর্থাংশ রোগী অধিক হইয়াছে। ঐ বৎসর নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১২,১৬০। ইহাদের মধ্যে ১২০৭ জনের অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে এবং ৩৬৮৬ জন বেলুড়ের বাহির হইতে আসিয়াছে।

কিন্তু চিকিৎসালয়ের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নহে। ১৯৩৭ সালের মোট আয়

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত সমেত ১২৫২৴৮ পাই ছিল এবং মোট ব্যয় ছিল ১১৪৯৸৶০ আনা, অর্থাৎ বৎসরের শেষে ১০২৶৮ পাই মাত্র হাতে ছিল। প্রায় ১৪০০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ ও অন্যান্য উপকরণ দানশীল ব্যবসায়ী মহোদয়গণের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে উক্ত চিকিৎসালয়ের বিশেষ প্রয়োজন একটী প্রশস্ত বাটীর, যাহাতে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রপাতি ও অত্যাবশ্যক সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকিবে। এই প্রকারের একটী বাটীর আনুমানিক ব্যয় ১১,০০০৲ টাকা। ঐ টাকার অধিকাংশ কতিপয় হিতৈষী বন্ধুর আনুকূল্যে সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও আমাদের ৩০০০৲ টাকার প্রয়োজন। আর বিলম্ব করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা সহৃদয় জনসাধারণের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিবেন, যাহাতে আগামী দুইমাসের মধ্যেই ঐ গৃহ সম্পূর্ণ হয়। দরিদ্র ও আর্ত্তের সেবা আমাদের দেশে চিরদিন মহাপুণ্য কর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। পরদুঃখকাতর বঙ্গ-নরনারীগণ এই সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হউন, ইহাই প্রার্থনা।

নিবেদক—স্বামী মাধবানন্দ,
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোষ্ট বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

জড়বাদ ও ধর্ম্মান্ধতা

সম্পাদক

বর্ত্তমান ভারতে আপাতদৃষ্টিতে দুইটি বিরুদ্ধ-শক্তির দ্বন্দ্ব চলিতেছে। নবীন ও প্রাচীন ভাব-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে আসমুদ্রহিমাচল ভারতের জাতীয় জীবন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সংঘাতের বর্ণনা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ মনোমুগ্ধকর ভাষায় লিখিয়াছেন, "একদিকে প্রত্যক্ষশক্তিসংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শত সূর্য্যজ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষিউদ্‌ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব-বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়-বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়-সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে পূর্ব্বপুরুষদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। * * বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে—'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।' * * একদিকে নব্যভারত বলিতেছে, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছে, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!"[১]

১ বর্ত্তমান ভারত

এই ভাব-সংঘাতে দেশের সর্ব্বত্র প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, ভারতের জাতীয় জীবন সংগঠনে এই দুইটির মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়? এই সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইয়া একদিকে পাশ্চাত্যের অমিশ্র জড়বাদ এবং অপরদিকে উগ্র ধর্ম্মান্ধতাকে আশ্রয় করিয়া দুইটি বিরাট দল সৃষ্ট হইয়া দেশময় প্রচার-কার্য্য চালাইতেছে।

নিছক জড়বাদিগণ জড়জগতের উন্নতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য সকল বিষয়ে তাহাদের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতেছেন। এই শ্রেণীর মতে পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় পরমার্থের মোহ ত্যাগ করিয়া সংঘবদ্ধভাবে সর্ব্ববিধ ঐহিক উন্নতির অনুশীলনই ভারতের জাতীয় উন্নতির উপায়। জাগতিক উন্নতির পরিপন্থিজ্ঞানে ধর্ম্মকে ইঁহারা ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন করিতে বদ্ধপরিকর। ভোগের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই উগ্র জড়বাদিগণ ভারতবর্ষকে সকল বিষয়ে ইউরোপে পরিণত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জড়বাদের কুজ্মটিকায় ইঁহাদের দৃষ্টি এরূপভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতের যে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যরূপঅর্ণবপোত শত শত প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভারতবাসীকে পারাপার করিয়াছে, তাহার মধ্যেও ইঁহারা কোন মহত্ত্বের নিদর্শন দেখিতে পাইতেছেন না!

অপরদিকে প্রাচীনের অনুরক্ত একশ্রেণীর রক্ষণশীল ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার প্রতীচ্য-প্রভাব-বিবর্জ্জিত প্রাচীন যুগের আচার নিয়মাদির সম্যক্ সংরক্ষণের মধ্যেই ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় দেখিতে পাইতেছেন। ইঁহাদের মতে শতভেদ সহস্র বৈষম্যের সমর্থক প্রাচীন সমাজনীতির যথাযথ অনুসরণই ভারতের সকল সমস্যা সমাধানের উপায়। রাজশক্তির সাহায্য পাইলে এই শ্রেণী এ যুগেও 'শূদ্রের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধের জন্য জিহ্বাচ্ছেদ ও শরীরভেদাদি দয়াল দণ্ডসকল' প্রচলিত করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন বলিয়া মনে হয় না! ইঁহাদের মতে হিন্দুই জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি, ভারতের সীমান্ত বহির্ভূত জাতিসকল ম্লেচ্ছ—যবন, ইত্যাদি। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জ্ঞানবিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি ও প্রবল রজোগুণের অভিব্যক্তি এই শ্রেণীর নিকট আসুরিক শক্তির বিকাশ বলিয়া উপেক্ষিত! বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিসমূহের সঙ্গে ঐহিক জীবনসংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ পরাজিত এবং দৈন্য-দুঃখের একশেষ ভোগ করিয়াও বাহ্যিক উন্নতিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া প্রাচীন পদ্ধতির আশ্রয়ে আত্মিক বা সাত্ত্বিক উন্নতি সাধনে ইঁহারা ব্যস্ত! এই ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণ সর্ব্ববিধ বর্ত্তমানের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া নির্ব্বিচারে প্রাচীন প্রথাসমূহকে আঁকড়াইয়া থাকাই ভারতের উন্নতির উপায় বলিয়া প্রচার করেন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ এখন উৎকট জড়বাদের গভীর আবর্ত্তে মজ্জমান। রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে ধর্ম্ম এখন ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের বাহনে পরিণত। সকলকে বঞ্চিত করিয়া জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভোগে নিবেদন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকলপ্রকার সুখের পন্থা আবিষ্কার প্রতীচ্য জাতির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পৃথিবীর সকল সম্পদে পাশ্চাত্যের প্রত্যেক জাতির একচেটিয়া ভোগাধিকারের দাবী তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য তাহারা অধুনা মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ ও বৃদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বারুদের স্তূপের উপর উপবিষ্ট! যে কোন সময় একটু অগ্নিসংযোগ হইলেই তাহাদের জড়বাদের জাতীয়-জতুগৃহ যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভোগের উচ্চ-

শীর্ষে আরোহণ করিয়াও পাশ্চাত্য জাতির শান্তি নাই। তাহাদের গোড়ায়ই যে গলদ রহিয়াছে। ইহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত। তিনি বলিয়াছিলেন, "ইউরোপের রাজনৈতিক শাসনসংস্থষ্ট সর্ব্বপ্রকার প্রণালী এক এক করিয়া অনুপযোগী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে; আর এক্ষণে ইউরোপ অশান্তি সাগরে ভাসিতেছে—কি করিবে, কোথায় যাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সব ধন—সব ক্ষমতা অল্পসংখ্যক কয়েকটি ব্যক্তির হস্তে—তাঁহারা নিজেরা কোন কার্য্য করেন না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার ক্ষমতা রাখেন। এই ক্ষমতাবলে তাঁহারা সমগ্র জগৎ রক্তস্রোতে প্লাবিত করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও আর যাহা কিছু, সবই তাঁহাদের পদতলে। তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। পাশ্চাত্য-জগৎ মুষ্টিমেয় শাইলকের শাসনে পরিচালিত হইতেছে। তোমরা যে প্রণালীবদ্ধ শাসন, স্বাধীনতা, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা প্রভৃতির কথা শুন—সেগুলি বাজে কথামাত্র। পাশ্চাত্য-প্রদেশ শাইলকের অত্যাচারে জর্জ্জরিত, প্রাচ্যদেশ আবার পুরোহিতগণের অত্যাচারে কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। উভয়কেই পরস্পরকে শাসনে রাখিতে হইবে। * * যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।"[১] স্বামীজির এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনিরূপে ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন, "ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্মের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতির মুক্তি নির্ভর করিতেছে।" স্যর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ঙ্ হাজ্ব্যাণ্ড বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য এখন প্রাচ্য—বিশেষ করিয়া রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।" প্রতীচ্য জাতিসমূহের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির ভিতর দিয়া এ কথার সত্যতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াও যাঁহারা সকল বিষয়ে পাশ্চাত্যের নিচ্ছিদ্র জড়বাদকে ভারতের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া প্রচার করেন, জানেন না যে, তাঁহারা অমৃত বলিয়া দেশবাসীকে কি সাংঘাতিক হলাহল পান করিতে বলিতেছেন।

এই আলোচনায় স্পষ্ট যে, হিন্দুজাতি আধ্যাত্মিকতাকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া ভুল করে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্ম হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড—ধর্ম্মদ্বারা হিন্দুর জীবন নিয়ন্ত্রিত। সহস্র সহস্র বর্ষ যাবৎ ধর্ম্ম অধিকারসূত্রে হিন্দুর শোণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এজন্য ধর্ম্ম ও হিন্দু একার্থ-বোধক। পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুজাতি দার্শনিক চিন্তায় যত উৎকর্ষ দেখাইয়াছে, অন্য কোন জাতি তাহা দেখাইতে পারে নাই। গত ৪ঠা জুন তারিখে মাদ্রাজ রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় মাউণ্ট এভারেষ্ট-অভিযানের অন্যতম নায়ক ডাঃ সোমারভিলি বলিয়াছেন, "যখন ইউরোপের অধিবাসিবৃন্দ প্রকৃতই অসভ্য অবস্থায় ছিল, তখনও ভারতবর্ষ উন্নত সভ্যতার উচ্চশীর্ষে আরূঢ়। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পারমার্থিক উন্নতিকে অবহেলা করিয়া ঐহিক জীবনের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত, ইহাই তাহার সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ। মানুষের একটি আধ্যাত্মিক দিকও আছে, একমাত্র এই জ্ঞানই প্রতীচ্য-সভ্যতাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে। ভারতবর্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক দিকের মূল্য স্বীকার করিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় সভ্যতা অনেক যুগ অতিক্রম করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে।"[২]

[১] ভারতে বিবেকানন্দ

[২] Hindu, 5th June, 1937.

ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু যে কেবল বাঁচিয়া আছে তাহা নহে, পরন্তু তাহার আধ্যাত্মিক ভাবধারা যুগে যুগে জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। জগৎকে সর্ব্বপ্রথম উন্নত দার্শনিক আলোক প্রদান ভারতের মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। আর্‌উইক্ সাহেব তাঁহার "Message of Plato" গ্রন্থে গ্রীক-দর্শনের সঙ্গে হিন্দু-দর্শনের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতবাদ ভারতীয় দর্শন দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবান্বিত তৎসম্বন্ধে সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নাই। পাশ্চাত্য লজিক্ বা ন্যায়দর্শনের স্রষ্টা প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল্ তদীয় ছাত্র আলেকজেণ্ডার দি গ্রেটের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদ গৌতমের ন্যায়-দর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দু-দর্শন ও হিন্দুর অধ্যাত্মবিদ্যা শান্তভাবে এবং অনাড়ম্বরে গ্রীক রোম আরব চীন প্রভৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রেরই একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গমাত্র তাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায় না। অন্যান্য সেমিটিক্ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই অভিমত অত্যুক্তি নহে। হিন্দুধর্ম্মের শাখাস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম আজও তিব্বত চীন জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিবৃন্দের ধর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বর্ত্তমানেও দেখা যায় যে, শিক্ষায় উন্নত হইয়া ভারতবর্ষ যতই ঘনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসিতেছে, ততই তাহার আধ্যাত্মিকতা জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে আপন মহিমায় আপনি বিস্তারলাভ করিতেছে। চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ সাফল্যের পর হইতে পাশ্চাত্য-জগৎ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে। ইহার সত্যতা যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক উৎসবের বিশ্বব্যাপকতা এবং কলিকাতা টাউনহলে আহূত শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গের বক্তৃতার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, যে সকল জাতি অমিশ্র জড়বাদরূপ বালির ভিত্তির উপর তাহাদের জাতীয় জীবন-প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহারা-কালের আক্রমণে উৎসন্ন গিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-জাতি ধর্ম্মকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। হিন্দু যে ক্ষমতা এবং সুযোগসত্ত্বেও তাহার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পরদেশবিজয় বা কোন জাতির অনিষ্ট করে নাই, ইহার মূলেও তাহার ধর্ম্ম বিদ্যমান। ধর্ম্ম হিন্দুর ভোগকে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হইতে দেয় নাই। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্", 'ত্যাগবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে আশা করিও না', হিন্দুশাস্ত্রকারদের এই অমূল্য উপদেশ হিন্দুজাতির ভোগকে বরাবর মহদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে বলিয়া ইহা সাম্রাজ্যবাদ ও পরস্বাপহরণ-পাপে কলঙ্কিত হয় নাই। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতির ভোগ মহদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতে অসমর্থ হইয়াই জগতে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ যতই সভ্যতার গর্ব্ব করুক না কেন, প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও মনুষ্যসমাজে আসুরিক শক্তিই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুকে শান্ত ও নিরীহ জাতিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য হিন্দুস্থানের উপর ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত আসুরিক জাতিসমূহের বারংবার অমানুষিক অত্যাচার সম্ভব হইয়াছে! বর্ব্বর জাতিসমূহের আক্রমণে ভারতের বক্ষ দিয়া অনেকবার রক্তের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর জাতীয় জীবনের বিশেষত্ব ধর্ম্ম তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহাতে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যতদিন হিন্দু তাহার ধর্ম্মরূপ

বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়াইয়া থাকিবে, ততদিন শত অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যেও প্রহ্লাদের মত সে অক্ষত থাকিবে—ততদিন তাহার ধ্বংস নাই। অতীতের গর্ভেই জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত। হিন্দুকে অতীতের বলপ্রদ ও বীর্য্যপ্রদ ধর্ম্মরূপ নির্ঝরিণীর জল আকণ্ঠ পান করিয়া সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের জাতীয় জীবন-সমস্যার সমাধানের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সত্যের অনুরোধে স্বীকার্য্য যে, বিজ্ঞানের অপব্যবহার যেমন নিরেট জড়বাদ সৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য জাতির অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, ধর্ম্মের অপব্যবহারপ্রসূত গোঁড়ামির ফলে তেমন ভারতের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ঋষিকুলের বিদ্যা, তপস্যা, সংযম ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ কালক্রমে যখন গুরু-পুরোহিতগণের ভোগ্য-সংগ্রহ এবং আধিপত্যসংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উপাদানরূপে নিয়োজিত হইল, তখন উহারা বহিঃ-শুদ্ধির আচারজালে আবদ্ধ বহুবিবদমানভাগে বিভক্ত হইয়া উদ্দাম ধর্ম্মান্ধতার লীলাস্থলে পরিণত হইল। এইরূপে বিশ্বজনীনত্বের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত, অধিকারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমোন্নতির প্রণালীক্রমে নির্দ্দিষ্ট হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ গুরু-পুরো-হিতের ব্যক্তিগত স্বার্থে ইন্ধন যোগাইতে নিযুক্ত হইয়া আজ শতভেদ সহস্র বৈষম্যের কুরুক্ষেত্রে পরিণত! মানুষকে সর্ব্ববন্ধনবিবর্জ্জিত নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করাই হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজের আদর্শ, কিন্তু এক শ্রেণীর স্বার্থপর সমাজনিয়ন্তাদের কৌশলে এই ধর্ম্ম ও সমাজই আবার মানুষের শত বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল! গুরু-পুরোহিতগণ পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত যে বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল সমাজের পায়ে পরাইয়াছিলেন, উহা কাল-চক্রের আবর্ত্তে তাঁহাদেরও গতিশক্তিকে প্রতিহত করিল, কিন্তু উপায় নাই, এ বন্ধন নষ্ট হইলে যে সমাজে তাঁহাদের প্রভাব থাকে না!

দেখা যায়, মানুষের প্রতিভা, প্রভাব ও শক্তি যখন স্বার্থসাধনের নিয়োজিত হয়, তখন বাধা পাইলে উহা আসুরিক শক্তির আকার ধারণ করে। নিরক্ষর সরল বিশ্বাসীর ধর্ম্মের বিকৃত জ্ঞানপ্রসূত গোঁড়ামি নিন্দনীয় হইলেও উহা কতকটা সমর্থন যোগ্য, কিন্তু সমাজের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থসাধণের জন্য ধর্ম্মের গোঁড়ামির আশ্রয়গ্রহণ অমার্জ্জনীয় অপরাধ। আজও যে হিন্দুসমাজ-সংরক্ষণের নামে ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে মানুষের ভোগাধিকার বৈষম্য সমর্থিত হইতেছে, আজও যে সনাতন ধর্ম্মের বিধানের নামে সমাজের শ্রেণী বিশেষকে বিদ্যা ধর্ম্ম সংস্কৃতি প্রভৃতি মানবতার শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে, আজও যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নামে সমাজের কোটি কোটি নরনারীকে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যজ্ঞানে শতভাবে অপমানিত ও অসম্মানিত করা হইতেছে, ইহার মূলে রহিয়াছে ঐ শেষোক্ত শ্রেণীর ধর্ম্মান্ধতা। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এখন জীবিকার্জ্জনের তাড়নায় বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও সামাজিক আভিজাত্যের অধিকার দাবী করিতেছেন। বর্ত্তমান কালেও ইঁহাদের পরিচালিত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের বিদ্যার্থী গৃহীত হয় না। ইদানীং সহরে বন্দরে রেলে ষ্টীমারে যন্ত্রোদ্ধৃত জল ব্যবহারে ইঁহাদের আপত্তি দেখা যায় না, মৃত জীব-জন্তুর অস্থিবিশোধিত শর্করাও অবাধে ইঁহাদের গলাধঃকৃত হইতেছে এবং বর্ত্তমান প্রয়োজনের অঙ্কুশ-তাড়নায় এই রকম অনেক কিছু সম্বন্ধে এই ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণ এখন উদারমতাবলম্বী, কিন্তু ইঁহাদের অনুদারতা এবং গোঁড়ামি কেবল অগণন স্বদেশবাসী ও স্বধর্ম্মাবলম্বীকে অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য করিয়া রাখিবার বেলায়! ইঁহারা বুঝিতেছেন না যে, এ যুগে আর বর্ত্তমানের আবশ্যকতাকে উপেক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতিকে ধরিয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। জাতীয় ঐক্যবিরোধী গ্রাম্য আচার

উঠাইয়া দিবার কথা হইলেই যাঁহারা 'ধর্ম্ম গেল' মনে করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মকে এ যুগে রক্ষা করা অসম্ভব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রগতিশীল মানবসমাজে আচার-নিয়মাদি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে, ইহাতে কাহারও ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই বা হইবার কোন কারণও নাই। জাতীয় উন্নতির বিরোধী, আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অনাবশ্যক এবং শক্তিমান ব্যক্তিদের স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত আচার-নিয়মগুলি এ যুগে নির্ম্মম ভাবে পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

অনেকে বলেন, পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের মধ্যেও ধর্ম্মবিরোধ এবং গোঁড়ামি আছে। সত্য বটে, জার্ম্মান ফরাসী রুশিয়া ব্রিটন মার্কিন তুরস্ক চীন জাপান প্রভৃতি দেশে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান, এবং ইহা মিথ্যা প্রচার মাত্র যে, এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন বিরোধ ও গোঁড়ামি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাঙ্গারি দেশের কথা ধরা যাক, এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের লোক সংখ্যার শত করা ৬৩ জন বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ক্যাথলিক্, ২১·৩ জন প্রোটেস্ট্যান্ট, ৬·২ জন এভাঞ্জেলিস্, ২·১ জন গোঁড়া গ্রীকশাখার অন্তর্গত খৃষ্টান, ৬·২ জন অখৃষ্টান ইহুদী, বাকী অন্যান্য ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমান ইউরোপে প্রত্যেক দেশেই এই প্রকার বহু আপাতবিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান। খৃষ্টান ধর্ম্মের আইনমতে ক্যাথলিক্ পুরুষ প্রোটেস্ট্যান্ট নারীকে বিবাহ করিতে পারে না। ক্যাথলিক্ বিধানে ক্যাথলিকের সঙ্গে ইহুদীর বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক্ দ্বন্দ্ব এবং এতদুভয়ের সঙ্গে ইহুদীদের অহি-নকুলসম্বন্ধ। খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সাধারণতঃ যে কোন সম্প্রদায়ের হিন্দু হইতে অনেক বেশী ধর্ম্মান্ধ—পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু। যে কোন গোঁড়াখৃষ্টানের সঙ্গে আলাপ করিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মবিরোধ ও গোঁড়ামি তাহাদের জাতীয় ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় না। প্রতীচ্য জনমত ও রাষ্ট্রীয় বিধান ধর্ম্মবিরোধ বা গোঁড়ামিকে জাতীয় উন্নতি পথে বাধা জন্মাইতে দেয় না। জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পাশ্চাত্যের সকল সম্প্রদায় বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এবং প্রয়োজনের তাড়নায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষেও জনমত এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ক্রমেই ধর্ম্মবিরোধ বা ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে। এই বিরোধকে জীবিত রাখাই যাঁহাদের স্বার্থ, তাঁহাদের ধর্ম্মের মুখোশ ক্রমেই খসিয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের নামে সকলকে ঠকাইয়া স্বার্থ-সাধন ক্রমেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "একচেটিয়া ভোগাধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য নিজের সমাধি নিজে খনন করা, আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য্য করেন, ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবে, উহা ততই পচিবে, আর উহার মৃত্যুও ততই ভয়ানক হইবে।"[১]

নিছক জড়বাদ ও ধর্ম্মান্ধতার জন্য যে বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম দায়ী নয়, এখন তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মানবসমাজে উন্নত জ্ঞান বিস্তার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দিক দিয়া বিজ্ঞানের দানের তুলনা নাই, কিন্তু ইহাই আবার ভীষণ মরণাস্ত্র নির্ম্মাণের সহায়রূপে জগতের আতঙ্কের কারণ। এইভাবে ধর্ম্ম মানুষের সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় এবং মানবসমাজে সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইতেছে, কিন্তু ইহার অপ-ব্যবহারপ্রসূত গোঁড়ামি মানুষের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিয়া স্থূল জড়বাদকে ধর্ম্ম আক্রমণের সুযোগ দিতেছে। হস্তপদাদিসহায়ে মানুষ ভাল ও মন্দ উভয় কাজই করিতে পারে, মন্দকাজ করা সম্ভব

১ ভারতে বিবেকানন্দ

বলিয়া যেমন হস্তপদাদি কাটিয়া ফেলা সুস্থ মনের পরিচায়ক নহে, ঠিক তেমন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের অপপ্রয়োগের জন্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে দায়ী করা অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে এ জন্য দায়ী মানুষের স্বার্থপরতা—দুর্ব্বুদ্ধি! বিজ্ঞানসহায়ে ভীষণ মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য ইদানীং এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞানের নিন্দা করিয়া থাকেন, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা শুনিলে অনেকে ধর্ম্মেরও নিন্দা করেন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে, এইরূপ নিন্দা করা সমীচীন নহে। সে দিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম, ক্যাথলিক্ জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ অসভ্য হাবসিগণকে সভ্য করিয়া তুলিবার অজুহাতে ইতালী কর্ত্তৃক আবেসিনিয়া-বিজয় সমর্থন করিতেছেন! কিছুদিন হয় লণ্ডনের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ব্রিটেনের সমরোপকরণ বৃদ্ধির আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। ভারতবর্ষেও দেখিতে পাই, অধুনা ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ-সংরক্ষণের দোহাই দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও ব্যবস্থাপক সভাদিতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচন চলিতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রকৃত ধর্ম্মের সঙ্গে এই সকল বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই। যতদিন মানুষের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন কেবল বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম নয়—সকল বিষয়কেই সে তাহার স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিবে। মানুষের ভিতরের পশুত্ব দেবত্বে উন্নীত না হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে না। একমাত্র প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানই মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে সক্ষম।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ছাঁকা জড়বাদ এবং ধর্ম্মান্ধতা নিন্দনীয় হইলেও জড়জগতের উন্নতি ও ধর্ম্ম উভয়ই মানব-সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ত্তির জন্য বিশেষ আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র এক শ্রেণীর স্বতাল্প-সংখ্যক মুমুক্ষুর জন্য যেমন নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের বিধান দিয়াছেন, সমাজের আপামর জনসাধারণের জন্য তেমন প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেও কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাঁহারাই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সমাজের সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মোন্নতির জন্যও যে তাহাদের ঐহিক উন্নতি অপরিহার্য্য, একথা শাস্ত্রকারগণ বিশেষভাবেই জানিতেন। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে প্রমাণের অভাব নাই। যে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, যে এ জীবনে মোটা ভাত মোটা কাপড় সংস্থান করিতে অসমর্থ, তাহাকে ধর্ম্ম বা পরলোকের সন্ধান দিতে যাওয়া বাতুলতামাত্র। এ কথা মিথ্যা যে, আত্মিক বা সাত্ত্বিক উন্নতির জন্য ঐহিক উন্নতির আবশ্যকতা নাই। কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা সত্য হইলেও কোন জাতির পক্ষে ইহা সত্য নহে। ঐহিক উন্নতি ভিন্ন আত্মিক বা সাত্ত্বিক উন্নতি কোন জাতির পক্ষে যেমন সম্ভবপর নহে, সাত্ত্বিকতা ভিন্ন অন্য উপায়ে কোন জাতি বা ব্যক্তির ঐহিক উন্নতিকে সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত রাখিবার চেষ্টাও তেমন পণ্ডশ্রমমাত্র।

পাশ্চাত্য জাতি উৎসন্নের পথে চলিয়াছে ভোগের আতিশয্যে বা জড়বাদকে ধর্ম্মদ্বারা মহদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার অভাবে, এবং ভারতবর্ষও মরিতে বসিয়াছে ভোগের ঐকান্তিক অভাবে বা তমোগুণকে বর্জ্জন করিয়া রজোগুণদ্বারা জীবন পরিচালিত করিবার অসমর্থতার জন্য। এই সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার সমাধান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ভারতে রজোগুণের একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্ব-ধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরের তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না এবং বহুধা পারলৌকিক কল্যাণেরও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"[১] হিন্দুশাস্ত্র বলে, 'যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী", ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের কল্যাণ যাহাতে হয়, সেই চাতুরীই চাতুরী। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধানের জন্য তাহার উভয় লোকের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১ ভাববার কথা

রুদ্র-বাণী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ঈশান যে ঐ বাজায় বিষাণ
ঘুর্ণী হাওয়ায় রুদ্রতালে
ভীষণ ভয়াল ক্রুদ্ধ নয়ন
তপ্ত তরল বহ্নি ঢালে।

তাণ্ডবে ভীম প্রকম্পনে
ঝঞ্ঝাবোলে হুঙ্কারিয়া
সৃষ্টি-মথন ছন্দেরে ঐ
পিণাক উঠে টঙ্কারিয়া।

পদক্ষেপের তুচ্ছ হেলায়
চূর্ণ কোটি সৌর জগত
অসীম ব্যোমের নিরাশ্রয়ে
বন্দনা গায় স্বর্গ মরত।

উর্দ্ধায়িত দহন শিখা
ভস্ম করে বিশ্বভূমি
উদ্বেলিত সিন্ধু সাগর
ক্ষিপ্ত শিবের চরণ চুমি।

দীপক রাগের উদ্দীপনায়
শব্দ বাজে ববম্ ববম্
ধ্বংস-দোলায় দুলছে রে ঐ
সংখ্যা বিহীন জন্মমরণ;

কক্ষচ্যুত লক্ষ তপন
ক্ষিপ্ত কালের নখর ঘাতে,
মুক্ত জটায় গঙ্গাধারা
বন্যা আনে প্রলয় বাতে।

গর্জ্জি উঠে মত্ত বৃষ,
ভুজঙ্গদল বিষোদ্গারে
ঝঙ্কারিছে রুদ্রবীণা
মৃত্যু-গহন অন্ধকারে।

অম্বরে ভীম মৃদঙ্গ রোল
অন্তরালে যায়রে শোনা
বজ্রগানের দহন রাগে
দিগম্বরে সুর-সাধনা।

ধরার ঘাটে ভাঙ্গন লাগে
চমকে উঠে স্বপ্ন-মাতাল
অট্ট হেসে মৃত্যু আসে
যায় ভেসে সুখ শান্তি জাঙ্গাল।

কে আজ আছিস তন্দ্রামগন
সুপ্তি ঘোরে বদ্ধ হয়ে
আয়রে ভেঙ্গে জীর্ণ কারা
কালের স্রোতে মৃত্যু জয়ে।

মরণ চিতায় ভস্ম করে
সশঙ্কিত চিত্ত খানি
শোন্‌রে ভীরু রুদ্রদেবের
মাভৈঃ মাভৈঃ অভয় বাণী।

কান্না হাসির সময় কোথা?
চিরন্তনের যাত্রা পথে
যায় ভেসে রে সব কামনা
অব্যাহত মরণ স্রোতে।

শেষ কোরেনে সকল কাঁদন
সকল বাঁধন ধরার পরে
আলিঙ্গনে ধররে বুকে
মৃত্যুজয়ী ভয়ঙ্করে।

আয়রে ছুটে মুক্তি-পাগল
মরণ বাজের যজ্ঞভূমে
রুদ্রলীলায় হোমশিখা তাঁর
উগ্রতেজে গগন চুমে।

রক্তরাঙ্গা স্তব্ধ আকাশ
সর্ব্বনাশের দেয় সূচনা
করিস্‌নেকো আপনাকে আর
স্বপ্ন-মায়ায় প্রবঞ্চনা।

প্রলয় রাতের তিমির তলে
দেখরে চেয়ে সর্ব্বহারা
অন্ধকারে রন্ধ্র ফুঁড়ে
ঝরছে জ্যোতির ঝর্ণাধারা।

মাণ্ডূক্যকারিকায় বৌদ্ধমত

(আলোচনা)

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

মাননীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় গত ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে "গৌড়পাদ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের আলোচনা আমরা গত বৈশাখের (১৩৪৫) "মাসিক বসুমতী"তে করিয়াছি (১)। সম্প্রতি আষাঢ়ের (১৩৪৫) প্রবাসীতে শাস্ত্রী মহাশয় "গৌড়পাদ" সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই প্রবন্ধে প্রকাশিত করিতেছি।

বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রথম প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন (২)। এই জন্য দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথম প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকা চারিটি প্রকরণে বিভক্ত, এই চারি প্রকরণের নাম যথাক্রমে এইরূপ ; ১। আগম প্রকরণ ২। বৈতথ্য প্রকরণ ৩। অদ্বৈত প্রকরণ ৪। অলাতশান্তি প্রকরণ। চতুর্থ প্রকরণকে শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধমত-প্রতিপাদক স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অদ্বৈতবেদান্তসম্প্রদায়ের প্রবীণ আচার্য্যগণ এই চতুর্থ প্রকরণকে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন প্রকরণের সার-সংগ্রহ-স্বরূপ মনে করিতেন ; তাঁহারা কোন স্থানেই পূর্ব্ববর্ত্তী তিন প্রকরণের সহিত অসম্বদ্ধ স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এই প্রকরণের উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়, পূর্ব্ব তিন প্রকরণে খাঁটি অদ্বৈত বেদান্ত আছে ইহা স্বীকার করিয়াও, চতুর্থ প্রকরণে বৌদ্ধমতের আলোচনা লক্ষ্য করিতেছেন।

এক গ্রন্থকারের অনেক গ্রন্থ থাকিতে পারে ; কিন্তু একজন অদ্বৈত বেদান্তের প্রামাণিক প্রসিদ্ধ আচার্য্য বৌদ্ধমতের প্রতিপাদক গ্রন্থ রচনায় কেন প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু প্রথমে সর্ব্বাস্তিবাদী বৈভাষিকমতাবলম্বী ছিলেন এবং বৈভাষিক মতের প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে "অভিধর্ম্মকোষ" প্রণয়ন করেন ; তিনি পরে নিরাকার বিজ্ঞানবাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া সেই মতের প্রতিপাদক "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধ দার্শনিক অপ্যয়দীক্ষিতের বিষয়েও এইরূপ কথা জানিতে পারা যায় ; তিনি প্রথমে শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্র-শৈবভাষ্যের

(১) বেদান্তাচার্য্য গৌড়পাদ—মাসিক বসুমতী—বৈশাখ ১৩৪৫।

(২) "চতুর্থ প্রকরণের আরম্ভে বুদ্ধকে এই বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছিল যে, তিনি জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মসমূহকে ভাল করিয়া জানিয়াছিলেন।"—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৫। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য ইহাই ছিল (দ্রষ্টব্য "গৌড়পাদ" প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)। চতুর্থ প্রকরণের যে প্রথম শ্লোকটিকে শাস্ত্রী মহাশয় বুদ্ধের নমস্কার রূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই প্রথম শ্লোকটি এই,—

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্ ॥

শিবার্কমণিদীপিকা নামে টীকা রচনা করেন ; পরে অদ্বৈত মতের অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আচার্য্য গৌড়পাদের যে এরূপ মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, ইহার কোন প্রমাণ নাই ; বিশেষতঃ প্রথম তিন প্রকরণে যে সকল কথা তিনি বলিয়াছেন, এই চতুর্থ প্রকরণে তাহার বেশী তেমন কিছুই বলেন নাই, এই প্রকরণে বুঝিবার সুবিধার জন্য পূর্ব্ব প্রকরণগুলির সার-সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে "ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা"। এই বুদ্ধিবলকে অবলম্বন করিয়া কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় "চৌরপঞ্চাশৎ" নামক আদিরসাশ্রিত কাব্যের কালী-পক্ষে ভক্তি-রসাশ্রিত ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন ; কোন বুদ্ধিমান্ বেদান্তী পণ্ডিত "অমরু শতক" নামক শৃঙ্গার-রসপূর্ণ কাব্যের অদ্বৈত বেদান্তপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাজসাহীর সেকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় পাণিনির সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীর অদ্বৈত বেদান্তপক্ষে ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন (৩)। ভোজ-প্রবন্ধে পাণিনির সূত্র অবলম্বন করিয়া সমস্যাপূরণও করা হইয়াছে (৪)। শাস্ত্রী মহাশয়, বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া গৌড়পাদের কোন কোন শ্লোকের বৌদ্ধ মতে ব্যাখ্যা করিতেছেন ; অন্য লোকে ইচ্ছা করিলে সেই-রূপ উপনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সমগ্র "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির" অদ্বৈত বেদান্তমতেও ব্যাখ্যা করিতে পারে ; আবার কেহ পরিশ্রম করিলে বৃহদারণ্যকেরও বৌদ্ধমতে একটা ব্যাখ্যা যে না হইতে পারে, তাহা নহে।

এখানে বিবেচনা করিবার একটি কথা আছে, ব্যাখ্যা হইলেও সেই ব্যাখ্যাটি মূল গ্রন্থকারের অভিপ্রেত কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। গ্রন্থকার কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহার গ্রন্থ গুরু পরম্পরাক্রমে কোন্ মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রন্থ পরম্পরাক্রমে কোন্ সম্প্রদায়ে আদৃত হইয়া আসিতেছে, ইহার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি আদ্যন্ত লক্ষ্য না রাখিয়া এবং সাম্প্রদায়িক প্রসিদ্ধির প্রতি অবহেলা করিয়া, কেবল কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া যদি কোন গ্রন্থের কোন অংশবিশেষের ব্যাখ্যা করা যায়, তবে সে ব্যাখ্যা যে অপব্যাখ্যা হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। যাঁহারা সংস্কৃতের ন্যায় কোন বিস্তৃত ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এই সকল দীর্ঘজীবী ভাষার এক একটা যুগ আছে ; সেই সকল যুগে কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, সেই সময়ের সমস্ত গ্রন্থ—সে গ্রন্থ যে মতের বা যে বিষয়েরই হউক না কেন,—তাহাতে সেই যুগে বহুল প্রচলিত শব্দগুলির একভাবেই প্রয়োগ করা হয়। আবার অন্য যুগে সেরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায় না (৫)। গৌড়পাদ-কারিকা যে

(৩) এই ব্যাখ্যা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

(৪) "সর্ব্বস্য দ্বে" (অষ্টাধ্যায়ী ৮।১।১) সুমতিকুমতী সম্পদাপত্তিহেতূ
"একো গোত্রে („ ৪।১।৯৩) প্রভবতি যুবা যঃ কুটুম্বান্ বিভর্ত্তি।
"বৃদ্ধো যূনা" („ ১।২।৬৫) সহ পরিচর্য্যা-জীরতে কামিনীভিঃ।
"স্ত্রী পুংবচ্চ („ ১।২।৬৬) প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্।

(৫) পাণিনির সূত্রে (৮।৩।৫৮, ৮।৪।২) এবং মহাভাষ্যে ব্যবায় শব্দ ব্যবধান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। জৈমিনির মীমাংসাসূত্রেও (২।১।৪৯) ব্যবধান অর্থে ব্যবায়শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্ত্তী কালে এই শব্দের বিপরীত অর্থ প্রচলিত হইয়াছে,—ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মো না মৈথুনং নিধুবনং রতম্ :—অমরকোষ ব্রহ্মবর্গ ৫৭। "একোঽয়মাত্মা উদকং নাম"

যুগে রচিত হইয়াছিল, সে যুগে বা তাহার সন্নিহিত যুগে যে সকল বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত যদি কোন কোন স্থলে গৌড়পাদ-কারিকার শব্দের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই গৌড়পাদ-কারিকার অংশবিশেষকে বৌদ্ধমত-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। শব্দগুলি সমগ্র ভাষার সম্পত্তি, কোন এক সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। যদি বৌদ্ধ গ্রন্থে এমন কোন সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়, যাহার ব্যুৎপত্তি পাণিনির সূত্র, বার্ত্তিক এবং মহাভাষ্যের সাহায্যে করিতে পারা যায় না, সেইরূপ শব্দকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেইরূপ শব্দ যে গ্রন্থে আছে, সে গ্রন্থকে বৌদ্ধ গ্রন্থ বলিতে কাহারও আপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখানে এ কথা বলা বাহুল্য যে, এইরূপ কোন শব্দের সন্ধান, কেবল চতুর্থ প্রকরণে কেন, সমগ্র গৌড়পাদ-কারি-কায় পাওয়া যায় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় চতুর্থ প্রকরণের প্রথম কারিকায় "দ্বিপদাং বরম্" এই কথাটির উপর বিশেষ নির্ভর করিয়া চতুর্থ প্রকরণকে বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে "দ্বিপদাংবরম্" কথাটি গৌতমবুদ্ধের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বৈদিক পণ্ডিতগণের প্রণীত শাস্ত্রেও এই *কথাটি বুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত* যুক্তিযুক্ত নহে। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে বৈদিকগণের গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম সঙ্গত কি না, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এরূপ নিয়ম গ্রহণ করিলে সমস্ত শাস্ত্রে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক-কারিকার আরম্ভে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে "বদতাং বরম্" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (৬)। বৌদ্ধশাস্ত্রে "দ্বিপদাং বরম্" এই কথাটি বুদ্ধদেবের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই জন্য যদি গৌড়পাদ-কারিকার "দ্বিপদাং বরম্" কথাটিও বুদ্ধ অর্থে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে নাগার্জ্জুনের এই "বদতাং বরম্" প্রয়োগ অনুসারে সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে যে যে স্থানে "বদতাং বরম্" এই কথা আছে, সেই সকল স্থানেও এই শব্দের বুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা অনিবার্য্য হইবে না কেন, তাহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "দ্বিপদাং বরম্" এই কথাটিকে বুদ্ধ অর্থে গ্রহণ করিবার প্রেরণায় এই কারিকার ধর্ম্মশব্দটি বিষয় অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে ইহার অর্থ আত্মা (জীবাত্মা) করা হইলেও, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ধর্ম্মশব্দের স্থানে ধর্ম্মন্ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্ক এই ধর্ম্মন্ শব্দের একস্থানে ধারণ অর্থ করিয়াছেন এবং অন্য স্থানে ধারণ-কর্ত্তা (ধারয়িতা) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন (৭)। পুরুষসূক্তে যাগাদিক্রিয়া অর্থে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মন্ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (৮)। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে এবং পাতঞ্জল মহাভাষ্যে বিধি-নিষেধের বিষয় যে আচারাদি, সেই অর্থে ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ আছে (৯)। কঠোপনিষদে (১।২১) আত্মা *অর্থে ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ আছে* (১০)। যাজ্ঞবল্ক্য-

এই স্থলে মহাভাষ্যে (১।১।১) আত্মা শব্দের ধর্ম্মী (দ্রব্য) অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। মহাভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থে আত্মা শব্দের এই অর্থে প্রয়োগ নাই। এখানে অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

(৬) যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্। দেশয়া-মাস সংবুদ্ধস্তং বন্দে বদতাং বরম্ ॥—মাধ্যমিককারিকা ১।১

(৭) নিরুক্ত—৭।২৫।১, ৯।২৫।১

(৮) যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। —পুরুষসূক্ত। শবরস্বামী প্রভৃতি মীমাংসকগণ এখানে ধর্ম্ম-শব্দের যাগাদিক্রিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৯) ৬।১।৮৪ সূত্রে ৫ সংখ্যক বার্ত্তিক ও তাহার মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(১০) শাস্ত্রী মহাশয়, ধর্ম্ম-শব্দের আত্মা অর্থ হইতে পারে,

সংহিতায় যোগের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকারকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে (১১)। বাক্য পদীয়ে একস্থানে স্বভাব অর্থে এবং অন্যস্থানে দ্রব্য অর্থে ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (১২)। ধর্ম্মশব্দের এইরূপ নানা অর্থে প্রয়োগ থাকিলেও ইহার মধ্যে যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ সকল স্থানে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিলে অসঙ্গতি দোষ ঘটিবেই। গৌড়পাদের চতুর্থ প্রকরণের দশম কারিকায় ধর্ম্মকে, "জরা-মরণ-নির্ম্মুক্ত" এই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে (১৩)। যাহার জরা এবং মরণ সম্ভাবিত, তাহাকেই শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে "জরামরণনির্ম্মুক্ত" (১৪) বলা যায়। যাহার জরামরণ কোনও কালে সম্ভাবিত নহে, তাহাকে "জরামরণনির্ম্মুক্ত" এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিলে সেটি ব্যর্থ বিশেষণ হইয়া পড়ে। জীবেরই জরা মরণ হয়, সাধারণ বুদ্ধির লোকেরা এরূপ মনে করে; তাহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার উদ্দেশ্যে এখানে "জরামরণনির্ম্মুক্ত" এই বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই দশম কারিকায় গৌড়পাদ জীবাত্মা অর্থে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (১৫)। ইহার

ইহা স্বীকার করিয়াও ("গৌড়পাদ"—৩৫নং পাদটীকা—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) কঠোপনিষদের ধর্ম্মশব্দটির শঙ্করাচার্য্য-সম্মত আত্মা অর্থ স্বীকার করেন নাই। এখানে ধর্ম্মশব্দের আত্মা অর্থ গ্রহণ না করিলে, পরবর্ত্তী গ্রন্থ অসঙ্গত হইয়া যাইবে। নচিকেতার তৃতীয় বর সম্বন্ধে যম যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে "অণুরেষ ধর্ম্মঃ" এই কথা আছে। এই তৃতীয় বর এইরূপ,

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

এখানে প্রেত অর্থাৎ মৃত জীব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হইতেছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না, ইহাই নচিকেতার প্রষ্টব্য বিষয়। ইহার উত্তরে পরবর্ত্তী সমগ্র গ্রন্থে আত্মার বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। যদি এখানে ধর্ম্মশব্দের আত্মা অর্থ গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে প্রশ্নের বিষয় আত্মা না হওয়ায় পরবর্ত্তী গ্রন্থে আত্মার নিরূপণের কোনই সঙ্গতি থাকে না। প্রশ্নের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে উত্তরকে উত্তর বলা যাইতে পারে না, তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়।

(১১) অয়ং তু পরমোধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা আচারাধ্যায়।

(১২) (ক) প্রতিবিম্বং যথাহন্যত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ। তৎপ্রবৃত্তিমিবান্বেতি স ধর্ম্মঃ স্ফোটনাদয়োঃ॥—প্রথম (ব্রহ্ম) কাণ্ড।

(খ) সংযোগিধর্ম্মভেদেন দেশে চ পরিকল্পিতে।

তেষু দেশেষু সাধানামাকাশস্যাপি বিদ্যতে॥—তৃতীয়কাণ্ড (প্রকীর্ণক)।

(১৩) জরামরণনির্ম্মুক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ।—চতুর্থ প্রকরণ ১০

(১৪) বাক্যপদীয় দ্বিতীয় কাণ্ডের "সংসর্গো বিপ্রয়োগশ্চ" ইত্যাদি কারিকা এবং তাহার পুণ্যরাজকৃতটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫) বৌদ্ধ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র যে কেবল জ্ঞানের বিষয় অর্থেই ধর্ম্মশব্দের ব্যবহার আছে, এমন কথা বলা যায় না। আমরা এখানে বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর ত্রিংশিকা এবং তাহার স্থিরমতিকৃত ভাষ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সুধীগণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে, আমাদের কথা মিথ্যা নহে।

আত্মধর্ম্মোপচারো হি বিবিধো যঃ প্রবর্ত্ততে,
বিজ্ঞান পরিণামোহসৌ ... .. ॥ ত্রিংশিকা—১

আত্মা জীবো জন্তুর্মনুজো মানব ইত্যেবমাদিক আত্মোপচারঃ। স্কন্ধা ধাতব আয়তনানি রূপং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারা বিজ্ঞানমিত্যেবমাদিকো ধর্ম্মোপচারঃ। অয়ং দ্বিপ্রকারোহপ্যুপচারো বিজ্ঞানপরিণাম এব ন মুখ্যে আত্মনি ধর্ম্মেষু চেতি।—স্থিরমতিভাষ্য। এখানে বিজ্ঞানকেও ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, ইহা সুধীগণ লক্ষ্য করিবেন।

পুনরায়—

ধর্ম্মাণাং পরমার্থশ্চ স যতস্তথতাহপি যঃ।—ত্রিংশিকা ২৪॥
স যস্মাৎ পরিনিষ্পন্নঃ স্বভাবঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং পরতন্ত্রাত্মকানাং

পরমার্থঃ ... স্থিরমতিভাষ্য।

এখানে পরতন্ত্রকেও ধর্ম্মশব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। পরতন্ত্র শব্দ বসুবন্ধু বিকল্পাত্মক জ্ঞান অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন,—"পরতন্ত্রস্তু বিজ্ঞেয়ো বিকল্পঃ প্রত্যয়োদ্ভবঃ" (ত্রিংশিকা ২০½)। এই বিকল্পজ্ঞান আলয়-বিজ্ঞান হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু নয়। এই আলয়বিজ্ঞানই বৌদ্ধ মতে আত্মা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কেবল গৌড়পাদই আত্মা অর্থে ধর্ম্ম শব্দের

কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম কারিকায় তিনি যে এই অর্থে ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার করেন নাই, ইহার কোন প্রমাণ নাই; প্রকরণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রথম কারিকাতেও জীবাত্মা অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। বৈদিক পণ্ডিতদের গ্রন্থে বৌদ্ধমতের আলোচনা কেবল মাত্র খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই হইতে পারে। গৌড়পাদ এই প্রথম কারিকায় খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধমত ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা বলা যায় না; প্রথম কারিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ের খণ্ডন পরবর্ত্তী গ্রন্থে নাই। অতএব এই কারিকায় বৌদ্ধ মতের কোন কথা বলা হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে প্রথম শ্লোকে গৌড়পাদ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়াছেন; অথচ দেখা যাইতেছে তিনিই সেই গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে পরব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার করিতেছেন (১৬)। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই অন্তিম শ্লোকে বর্ণিত পরব্রহ্মের কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, ইহা অদ্বৈত বেদান্তেরই স্বীকৃত বস্তু। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা মানিলে বলিতে হইবে, এই চতুর্থ প্রকরণের উপক্রম এবং উপসংহারের সামঞ্জস্য নাই; আজ পর্য্যন্ত অদ্বৈত বেদান্তের মহাপণ্ডিত আচার্য্যগণ যাঁহাকে সম্মাননীয় গুরুরূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতি এইরূপ অজ্ঞতার আরোপ করা যায় না।

যাঁহারা বৈদিক শাস্ত্রের সমস্ত ভাল কথাই বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে গৃহীত, এইরূপ প্রচার করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, এই অন্তিম শ্লোকটি গৌড়পাদের নয়, এটি প্রক্ষিপ্ত। এইরূপ বিচার-পদ্ধতি নূতন নহে; অনেক বুদ্ধিমান্ লোক নিজের আগ্রহপূর্ণ মত রক্ষার জন্য এই প্রকার যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যে সকল কথা এই সকল ব্যক্তি নিজের অনুকূল মনে করেন, অন্য লোকে সেই সকল কথাকেই যদি তর্কস্থলে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে, সেস্থলে এই সকল ব্যক্তির কলহ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। আমরা কোন অবস্থাতেই শাস্ত্রী মহাশয়ের এরূপ মনোবৃত্তির সম্ভাবনা করিতে পারি না।

শাস্ত্রী মহাশয় "দ্বিপদাং বরম্" শব্দের নরোত্তম অর্থ স্বীকার করিয়া, সেই নরোত্তম বুদ্ধ, ইহা বলিতেছেন। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোককে নারায়ণের নমস্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 'দ্বিপদাং বরম্" এই শব্দের পুরুষোত্তম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। নারায়ণ গৌড়পাদের উপদেষ্টা ছিলেন এবং তিনি পরমেশ্বর, ভাষ্যকার শঙ্কর এ কথাও বলিয়াছেন। গৌড়পাদের উপদেষ্টা যে নারায়ণ, এ বিষয়ে আনন্দগিরি ভাষ্যের টীকায় একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সে প্রবাদটি এই, গৌড়পাদ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়া নারায়ণের নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে যে সকল অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই কিছু কিছু অলৌকিক প্রবাদ পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ প্রবাদ কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত আছে অথবা কেবল বৈদিক সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে, তাহা নহে; সকল দেশে এবং সকল সম্প্রদায়ে এই প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে এইরূপ অলৌকিক প্রবাদ অনেক প্রচলিত আছে এবং শ্রদ্ধালু বৌদ্ধ, তিনি দার্শনিক হ'ন বা না হ'ন —এইরূপ প্রবাদে অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। যদি বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবসম্বন্ধীয় অলৌকিক প্রবাদে বিশ্বাস করিলে তাহা দোষের না হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর গৌড়পাদসম্বন্ধীয় প্রবাদে

প্রয়োগ করেন নাই কিংবা কেবলমাত্র শঙ্করাচার্য্যই ধর্ম্মশব্দের আত্মা অর্থগ্রহণ করেন নাই।

(১৬) দুর্দর্শমতিগম্ভীরমজং সাম্যং বিশারদম্।
বুদ্ধ্বা পদমনানাত্বং নমস্কুর্ম্মো যথাবলম্॥
গৌড়পাদকারিকা ৪।১০০

বিশ্বাস করিলে তাহা অনুচিত হইবে কেন? সুতরাং শঙ্কর এইরূপ প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ব্যাখ্যা লিখিয়া কোন অন্যায় করেন নাই।

দ্বিপাদ্ শব্দ বহুব্রীহি সমাসে (১৭) নিষ্পন্ন একটি যৌগিক শব্দ; ইহার অর্থ যাহার দুই পদ আছে। এই দ্বিপাদ্ শব্দের নর অর্থ গ্রহণ করিয়া "দ্বিপদাং-বরম্" এই শব্দের নরোত্তম অর্থ করা হইতেছে; তাহা হইলে, এখানে সামান্য শব্দকে বিশেষ অর্থে নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য দ্বিপাদ্ শব্দের পুরুষ অর্থ স্বীকার করিয়া "দ্বিপদাং বরম্"এই শব্দের পুরুষোত্তম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ সুধীগণ এখানে প্রণিধান করিবেন, এই স্থলে শাস্ত্রী মহাশয় এবং শঙ্কর উভয়েই লক্ষণাবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, কেহই শব্দের মুখ্যবৃত্তি যে শক্তি, তাহার অবলম্বনে এইস্থলে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা স্বীকার করিতেছেন না।

আচার্য্য শঙ্করের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অনুসারে যদি "দ্বিপদাং বরম্" শব্দের অর্থ নরোত্তম এবং ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বিষয় ধরিয়া লই, তাহা হইলেও অদ্বৈত বেদান্তপক্ষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তবে নরোত্তম যে একমাত্র বুদ্ধ, অন্য কেহ নরোত্তম হইতেই পারেন না, এ কথা কেহই বলিবেন না।

একমাত্র ব্রহ্মই প্রত্যক্ষাদি সকল জ্ঞানের বিষয়, ঘটাদির যে জ্ঞান তাহাও ব্রহ্মেরই জ্ঞান; জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। বেদান্ত সিদ্ধান্তে সেই অজ্ঞানের বিষয় একমাত্র ব্রহ্ম, অচেতন ঘটাদি অজ্ঞানের বিষয় নয়। আমরা দেখিতে পাই, যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান দ্বারা সেই বিষয়েরই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়; অন্যবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অন্য বিষয়ের অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না; ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানের বিষয়, ঘটাদি জড়বস্তু অজ্ঞানের বিষয় নয়, তখন ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে। ঘটাকাশস্থলে ঘট আকাশের উপাধি, যে স্থলে ঘটজ্ঞান হয়, সেখানেও ঘট ব্রহ্মের উপাধি, জ্ঞানের আসল বিষয় ব্রহ্ম। যদি ঘটাদিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম না হন, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকের অন্তর্গত সম্বন্ধবার্ত্তিকে নিরূপিত হইয়াছে (১৮)।

এখন দেখা যাইতেছে, জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় আকাশকল্প এবং বিষয়ও ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় গগনোপম। সাধারণ বুদ্ধির লোক আমরা, জ্ঞানের দ্বারা বিষয়কে জানিলেও জ্ঞান যে আকাশকল্প, তাহা আমাদের অনুভবে আসে না এবং ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বিষয় না থাকায় বিষয়গুলি গগনোপম হইলেও, আমরা সে গুলিকে সেরূপ বুঝিনা। আমরা, এইরূপে জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা বিষয় গুলিকে জানি না; কিন্তু জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহার দ্বারাই বিষয়গুলিকে জানি। এই জন্য আমরা "সংবুদ্ধ" (যথার্থদর্শী) নহি। যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত-দৃষ্টি-সম্পন্ন, যাঁহারা সাধারণ লোকের অগম্য জন্মরহিত পরমব্রহ্মে সুনিশ্চিত

(১৭) অষ্টাধ্যায়ী ২।২।২৪ এবং ৫।৪।১৩৮

(১৮) অতোঽনুভব এবৈকো বিষয়োঽজ্ঞাত লক্ষণঃ।
অক্ষাদীনাং স্বতঃ সিদ্ধো·যত্র তেষাং প্রমাণতা॥
সম্বন্ধবার্ত্তিক ১০০২।

এই সিদ্ধান্ত আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধিতে (প্রথম পরিচ্ছেদ—পরিচ্ছিন্নত্বহেতূপপত্তি) এবং গৌড়ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকায় সমর্থিত হইয়াছে।

হইয়াছেন, সেই মহাজ্ঞানী পুরুষরা (১৯) আকাশকল্প এবং জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন জ্ঞান দ্বারা গগনোপম বিষয়গুলিকে জানিতে পারেন ; এই জন্য আমাদের জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান না হইলেও, তাঁহাদের জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান ; এই সম্যক্ জ্ঞান আছে বলিয়াই তাঁহারা সংবুদ্ধ ; অতএব তাঁহারা নরোত্তম। গৌড়পাদ এই শ্রেণীর মহাজ্ঞানী নরোত্তম গুরুর উদ্দেশে নমস্কার করিয়াছেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৌড়পাদ এই চতুর্থ প্রকরণের আরম্ভে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক বুদ্ধদেবকেই নমস্কার করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অনুকূলে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নাই। এই শ্লোকের বেদান্তমতে একাধিক ব্যাখ্যা হইতে পারে। গৌড়পাদ একজন প্রাচীন ও প্রামাণিক বেদান্তাচার্য্য হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধকে নমস্কার করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় আষাঢ়ের (১৩৪৫) প্রবাসীতে গৌড়পাদের অন্য একটি কারিকার বৌদ্ধ মতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (২০)। সেই কারিকায় বুদ্ধ শব্দ আছে এবং তায়িন্ শব্দ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, "বুদ্ধকে বুঝাইতে তায়িন্ শব্দের প্রয়োগ হয়, ইহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে।" এই জন্য এই শ্লোকটির বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের সুবিধা হইয়াছে। শব্দসাদৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের চলার অভ্যাস আছে, ইহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে ; সুতরাং এখানেও শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি সমীচীন কি না, তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বুদ্ধকে বুঝাইতে তায়িন্ শব্দের প্রয়োগ হইতে

(১৯) অজে সাম্যে তু যে কেচিদ্ ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ।
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে॥
গৌড়পাদ, ৪র্থ প্রঃ, ৯৫।

(২০) ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্॥
গৌড়পাদ চতুর্থপ্রকরণ, ৯৯।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ইহার আক্ষরিক স্থূল অর্থ এই—

সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বুদ্ধের মতে জ্ঞান ধর্ম্ম (অর্থাৎ বস্তু) সমূহে যায় না। ধর্ম্মসমূহ ও জ্ঞান—ইহা বুদ্ধ বলেন নাই।" প্রবাসী, আষাঢ় (১৩৪৫) ৩২৩ পৃষ্ঠা।

ইহার পরে (৩২৪ পৃষ্ঠায়) শাস্ত্রী মহাশয় এই শ্লোকের অভিপ্রায় বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"এই জন্য গ্রন্থকার চরম তত্ত্বটিকে বলিতেছেন যে, ধর্ম্ম-সমূহ ও (তাহাদের) জ্ঞানের কথা অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞেয়ের কথা বুদ্ধ বলেন নাই। তিনি এত সব বলিয়াছেন অথচ ইহার কথা বলেন নাই, ইহার তাৎপর্য্য কী? তাৎপর্য্য কিছুই নহে, তিনি কিছুই বলেন নাই।"

ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করার পর হইতে পরিনির্ব্বাণ লাভ করার সময় পর্যান্ত এক অক্ষরও কাহাকেও বলেন নাই, লোকরা অবিদ্যাবশতঃ অর্থাৎ ভ্রমবশে মনে করিয়াছে যে, বুদ্ধ উপদেশ করিতেছেন। এখানে একটি কথা স্বতঃই মনে হয়, আসল কথা হয়ত এই যে, বুদ্ধদেব কোন উপদেশ না করিলেও পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধরা লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের নিমিত্ত বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া নিজের মত গুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এই বিষয়ে বৌদ্ধদের মতের সমালোচনা শ্লোকবার্ত্তিকে (১।২) পাইতেছি,—

রাগাদিরহিতে তস্মিন্ নির্ব্যাপারে ব্যবস্থিতে।
দেশনাঽন্যপ্রণীতৈব স্যাদৃতে প্রত্যবেক্ষণাৎ॥
সান্নিধ্যমাত্রতস্তস্য পুংসশ্চিন্তামণেরিব।
নিঃসরন্তি যথাকামং কুড্যাদিভ্যোঽপি দেশনাঃ॥
এবমাদ্যুচ্যমানস্তু শ্রদ্দধানস্য শোভতে।
কুড্যাদিনিঃসৃতত্বাচ্চ নাশ্বাসো দেশনাসু নঃ॥
কিন্তু (নু) বুদ্ধপ্রণীতাঃ স্যুঃ কিমু কৈশ্চিদ্ দুরাত্মভিঃ।
অদৃশ্যৈর্বিপ্রলম্ভার্থং পিশাচাদিভিরীরিতাঃ॥১২৭-১৪০
ইত্যাদি।

অনুসন্ধিৎসু সুধীগণ শ্লোকবার্ত্তিক দেখিবেন। এখানে বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন।

পারে কিন্তু এই শব্দ বুদ্ধের পর্য্যায় নয়; কোন সংস্কৃত অভিধানে বুদ্ধের বাচকরূপে এই শব্দ পঠিত হয় নাই। ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়সূত্রকার অক্ষপাদের বিশেষণ রূপে তায়িন্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (অক্ষপাদায় তায়িনে"); ইহা শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে, এই তায়িন্ শব্দটি একটি বিশেষণ শব্দ। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী দার্শনিক যুগে এই শব্দ মহামাননীয় জ্ঞানীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত, ইহা না বলিলে, বাচস্পতি মিশ্রের "অক্ষপাদায় তায়িনে" এইস্থলে অক্ষপাদের বিশেষণরূপে এই শব্দের ব্যবহারের সঙ্গতি থাকে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সংস্কৃত ভাষার এক এক যুগে এক একটি শব্দ বিশেষ অর্থে প্রচলিত ছিল। যে সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে গৌড়পাদকারিকা অথবা ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা বিরচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে "তায়িন্" শব্দটি জ্ঞানী লোকের সম্মানার্থ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত; এটি সে যুগের সভ্যতার মধ্যে ছিল। যেমন এখন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির উল্লেখ করিতে হইলে, তাঁহার নামের আগে অধ্যাপক (Professor) শব্দ যোগ করিয়া উল্লেখ করা হয়, তিনি কোন স্থানে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন কি না, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না; প্রাচীন দার্শনিক যুগে তায়িন্ শব্দের ব্যবহার ঠিক এই ভাবে হইত। এই তায়িন্ শব্দটি উপরঞ্জক মাত্র, নীলোৎপল শব্দের অন্তর্গত নীলশব্দ যেমন পীতাদি হইতে উৎপলকে পৃথক্ করিবার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এ শব্দটি সে রূপ কোন উদ্দেশে প্রযুক্ত হয় না, কেবল বিশেষ্যের উৎকর্ষ বোধের নিমিত্তই প্রযুক্ত হয় (২১)। এই কারণে ইহার একটা নিয়মিত অর্থ নাই। উদয়নাচার্য্য যে অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রজ্ঞাকরমতি ঠিক সেই অর্থ দেখান নাই। আবার, প্রজ্ঞাকরমতি একটি অর্থ দেখাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই তিনি অন্য আর একটি অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডূক্যকারিকার এই শ্লোকের ভাষ্যে এই শব্দটির তিনটি অর্থ দেখাইয়াছেন (২২)।

(২১)। যাঁহারা শব্দশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁহারা জানেন যে, শাব্দিকেরা উপসর্জ্জনকে (অর্থাৎ বিশেষণকে) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন,—বিশেষণ, উপলক্ষণ এবং উপরঞ্জক। যে বস্তু স্বয়ং বিদ্যমান থাকিয়া অন্য বস্তু হইতে বিশেষ্যকে পৃথক্ করে, সেটি বিশেষণ, যেমন নীলোৎপল শব্দের অন্তর্গত নীলটি বিশেষণ। যে বস্তু নিজে বিদ্যমান না থাকিয়াও বিশেষ্যকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করে, সেটি উপলক্ষণ, যেমন "কাকবন্তো দেবদত্তস্য গৃহাঃ", একবার কাক দেখিয়া গৃহটি স্থির করিয়া লইলে, পরে কাক উড়িয়া গেলেও অন্য গৃহ হইতে দেবদত্তের গৃহ পৃথক্ করিতে পারা যায়, এইজন্য এখানে কাক উপলক্ষণ। "অক্ষপাদায় তায়িনে" এস্থলে অক্ষপাদ যদি একাধিক থাকিতেন, তাহা হইলে অন্য অক্ষপাদ হইতে তায়ী এই বিশেষণটি তাঁহাকে পৃথক্ করিতে পারিত এবং তাহা হইলে তায়িন্ শব্দটি অক্ষপাদের বিশেষণ হইত। কিন্তু অন্য অক্ষপাদ না থাকায় তায়িন্ শব্দটি নীল এই শব্দের ন্যায় ব্যাবর্ত্তক নয়, কিন্তু অক্ষপাদের উৎকর্ষের বোধক মাত্র। কাহারও ব্যাবর্ত্তক না হওয়ায়, তায়িন্ শব্দটি বিশেষণ বা উপলক্ষণ হইতে পারে না, এইজন্য এটি ভিন্ন শ্রেণীতে গণ্য হইবার যোগ্য, এটি উপরঞ্জক মাত্র।

(২২) প্রজ্ঞাকর মতির দুইটি অর্থ ও উদয়নাচার্য্যের প্রদর্শিত অর্থ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে,—(ক) তায়িনাং স্বাধিগতমার্গদেশকানাম্ (খ) অথবা তায়ঃ সন্তানার্থঃ। আসংসারমপ্রতিষ্ঠিতনির্ব্বাণতয়া অবস্থায়িনাম্।—প্রজ্ঞাকরমতি। তায়ী তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণক্ষমসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ।—উদয়নাচার্য্য। (ক) তায়িনঃ তায়োঽস্যাস্তীতি তায়ী সন্তানবতো নিরন্তরস্য আকাশকল্পস্যেত্যর্থঃ। (খ) পূজাবতো বা (গ) প্রজ্ঞাবতো বা। তায়্ ধাতুর পালন অর্থগ্রহণ করিলে 'তায়ী' শব্দের অর্থ রক্ষক হইতে পারে। সুধীগণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, মূল ধাতুর অর্থ অবিকল ভাবে অনুসরণ করিয়া কেহই ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। পাণিনির ধাতুপাঠে তায়্ সন্তানপালনয়োঃ", এইরূপ আছে এবং সিদ্ধান্তকৌমুদীতে "সন্তানঃ প্রবন্ধঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা

তায়্ ধাতুর সন্তান অর্থ গ্রহণ করিয়া টানাটানি করিয়া তায়িন্ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে; আচার্য্য উদয়ন কিংবা প্রজ্ঞাকরমতি উভয়েই এইভাবে তায়িন্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন। "স্থিতস্য গতিশ্চিন্তনীয়া" যাহা আছে, তাহার একটা গতি কোনরূপে করিতে হইবে—এই ন্যায় অনুসারে এ স্থলে এই পথ ভিন্ন অন্য পথ দেখা যায় না। জ্ঞানী লোকের বিশেষণরূপে এ শব্দটির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল, তাহার একটা সঙ্গতি করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াই এরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, তায়িন্ শব্দ বুদ্ধ ছাড়া অন্যের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং কেবল বুদ্ধকে বুঝাইতেই তায়িন্ শব্দের প্রযোগ হয়, এইরূপ বলা চলে না এবং এই তায়িন্ শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এই চতুর্থ প্রকরণে ৯৯ শ্লোককে বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বুদ্ধ শব্দটি এই শ্লোকে আছে। বুদ্ধ শব্দ জ্ঞানার্থক বুধ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার আসল অর্থ জ্ঞাতা—জ্ঞানী। প্রথমে গৌতমবুদ্ধকেও জ্ঞানী অর্থেই বুদ্ধ শব্দে অভিহিত করা হইত। তাহার পরে অমরকোষ প্রভৃতিতে ইহা তথাগতের পর্য্যায়রূপে পঠিত হইলেও যৌগিক অর্থে ইহার প্রয়োগে কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধ শব্দের জ্ঞানী অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর ধর্ম্ম শব্দের আত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা দেখিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয়ও ধর্ম্ম শব্দের এই আত্মা অর্থ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আচার্য্য

করা হইয়াছে, এখানে প্রবন্ধ শব্দের অর্থ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্তি। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন, ধাতুর বহু অর্থ হয়। ("নচেদং নাস্তি বহ্বর্থা অপি ধাতবো ভবন্তীতি ১।৩।১)। পতঞ্জলি ইহার কয়েকটি উদাহরণও দিয়াছেন। মহাভাষ্যকারের এই কথা অনুসারে তায়িন্ শব্দের যতগুলি ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে, সকলগুলিই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

শঙ্করের মতে গৌড়পাদের চতুর্থ প্রকরণের এই ৯৯ কারিকার অর্থ এইরূপ,—পূজ্য অথবা প্রশস্ত-প্রজ্ঞাশালী ব্রহ্মদর্শীর দৃষ্টিতে (সূর্য্যে যেরূপ প্রভা বিদ্যমান আছে সেইরূপ) আত্মাতে বিদ্যমান যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান কোন কিছুতে সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ জ্ঞান অসঙ্গ; জ্ঞানের ন্যায় আত্মাও অসঙ্গ (যেহেতু, জ্ঞান ও আত্মাতে কোন ভেদ নাই)। যাহা কিছু বলা হইল, ইহা বুদ্ধ বলেন নাই।

শঙ্করাচার্য্যের মতে প্রথম বুদ্ধ শব্দটি যৌগিক এবং শেষের বুদ্ধ শব্দটি তথাগত অর্থে ব্যবহৃত। যৌগিক অর্থে বুদ্ধ শব্দের ব্যবহার এই চতুর্থ প্রকরণের ৯২ কারিকাতেও দেখা যায়।

শঙ্করাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা প্রকরণের অনুকূল। ৯৬ কারিকায় বলা হইয়াছে, জ্ঞানের সহিত কোন কিছুর সম্বন্ধ হয় না, জ্ঞান অসঙ্গ (২৩)। এই ৯৯ কারিকায় জ্ঞানের ন্যায় আত্মাও অসঙ্গ, এই কথা বলা হইতেছে। সাধারণ বুদ্ধির লোকেরা জ্ঞান ও আত্মাকে ভিন্ন বলিয়া জানে এবং জ্ঞানের সহিত বিষয়ের একটা সম্বন্ধ আছে, ইহা মনে করে। এই জন্য প্রথমে জ্ঞানকে অসঙ্গ বলিয়া পরে আত্মাকেও অসঙ্গ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আত্মা ও জ্ঞানের অভেদ সূচিত হইতেছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অনুসারে এই ৯৯ শ্লোকে "তথা" শব্দের কোন স্বারস্য নাই, এখানে 'তথা' শব্দটি চ বা তু হির মত নিরর্থক। শাস্ত্রী মহাশয় এই কারিকার উত্তরার্দ্ধের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থ যদি গৌড়পাদের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে গৌড়পাদ এস্থলে "এতৎ" শব্দের ব্যর্থ প্রয়োগ করিতেন না; "সর্ব্বধর্ম্মাংস্তথা জ্ঞানং নৈব বুদ্ধেন ভাষিতম্" এইরূপ বলিতেন অথবা অন্য কোন

(২৩) অজেষ্বজমসংক্রান্তং ধর্ম্মেষু জ্ঞানমিষ্যতে।
যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্ত্তিতম্।
চতুর্থ প্রকরণ ৯৬।

ভাবে বলিতেন। শঙ্করের মতে তথা শব্দটি সাদৃশ্যবোধক, যেটি পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ, তাহারই সাদৃশ্য অপর বস্তুতে দেখান হয়: এইজন্য ৯৬ কারিকায় বর্ণিত জ্ঞানের অসঙ্গত্বকে ৯৯ কারিকার পূর্ব্বার্দ্ধে উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম চরণে, তথাশব্দের দ্বারা জ্ঞানের সহিত আত্মার অসঙ্গত্ব-মূলক সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে, আচার্য্য গৌড়পাদ সমগ্র গ্রন্থের সমাপ্তিকালে "নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" ইহা বলিয়া নিজের প্রতিপাদ্য বস্তু যে বুদ্ধের প্রতিপাদ্য বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা সূচিত করিয়াছেন। এখনও অনেকের ভ্রম আছে যে, বেদান্তমত বৌদ্ধমত হইতে অভিন্ন; এই ভ্রম যে সে কালেও ছিল না, তাহা নয়। এই ভ্রম দূর করিবার উদ্দেশে গ্রন্থশেষে 'নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্' এই বলিয়া, পরে উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইয়াছে (২৪)। সমাপ্তিশ্লোকে ব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার করায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই যে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

ধর্ম্ম শব্দের বিষয় অর্থ গ্রহণ করিলেও অদ্বৈত বেদান্তমতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয় না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্তমতে প্রত্যক্ষাদি সকল জ্ঞানের বিষয়ই ব্রহ্ম। তাহা হইলে এই কারিকার অর্থ এই হয় যে, ব্রহ্মদর্শীর দৃষ্টিতে বিষয়ে জ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই, জ্ঞান অসঙ্গ; জ্ঞান যেরূপ অসঙ্গ, বিষয়ও (ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায়) সেইরূপ অসঙ্গ। বুদ্ধ ইহা বলেন নাই অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যে বস্তু, তাহা বুদ্ধ বলেন নাই।

এই শ্লোকের 'তথা' শব্দ এবং 'এতৎ' শব্দের ব্যর্থতার পরিহার করিতে হইলে ধর্ম্মশব্দের বিষয় অর্থ গ্রহণ করিলেও শঙ্করের পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা না করিয়া উপায় নাই। গৌড়পাদ কেবল শ্লোকের অক্ষরসংখ্যা পরিপূরণের উদ্দেশে দুইটি বৃথা শব্দ এই কারিকাতে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি এমন অক্ষমতার আরোপ করিবার অধিকার আমাদের নাই।

যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া নিজের বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে মহামাননীয় বেদান্তাচার্য্যরূপে সমাদর করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার এক একটি উক্তিকে বেদান্তের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ শ্রুতির ন্যায় প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, সেই পরমপূজ্য বেদান্তপরমাচার্য্য গৌড়পাদ বৌদ্ধমতের প্রতি-পাদনের উদ্দেশে প্রকরণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—ইহা সঙ্গত কিনা, সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২৪) মাণ্ডুক্যকারিকার আরম্ভে প্রথম প্রকরণের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মের স্মরণ করা হইয়াছে, গ্রন্থের মধ্যে চতুর্থ প্রকরণের আরম্ভে গুরু নমস্কার করা হইয়াছে, গ্রন্থের অন্তে ব্রহ্মের উদ্দেশে নমস্কার অর্পিত হইয়াছে, এইরূপে আদি, মধ্য এবং অন্তে তিনটি মঙ্গল করা হইয়াছে। ইহা বেদবিশ্বাসী আস্তিকগণের পদ্ধতি। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এইরূপ আদি, মধ্য ও অন্তে মঙ্গল করিবার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন,—মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানি হি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষাণি চাধ্যেতারশ্চ মঙ্গলযুক্তা যথা স্যুরিতি। মহাভাষ্য ১।৩।১।

নেত্রজন (Nitrogen)

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্ সি

জলজান, অম্লজান প্রভৃতি অধিক পরিচিত যতগুলি মৌলিক গ্যাস আছে তাহাদের মধ্যে নেত্রজনের প্রতিপত্তি কম নয়। দৃশ্যতঃ উহার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তায়। ইহার মত স্বাধীন মুক্তস্বভাব গ্যাস মৌলিকদের মধ্যে বেশী নাই। বায়ুর ইহা ⅘ অংশ অধিকার করিয়া আছে। সহসা কাহারও সঙ্গে বন্ধনযুক্ত হয় না বলিয়া বায়ুর মৌলিক গঠনে ইহার শ্রেষ্ঠ স্থান। আকাশজোড়া যাহার রাজত্ব তাহাকে পৃথিবীচক্ষে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না, প্রকৃতপক্ষে জীবনের মূলসত্তাস্বরূপ ইহা গাছপালা শাক সব্জী, জীবজন্তু এবং বহু ভেষজ পদার্থে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় প্রমাণিত হইয়াছে, মানুষ পশুপক্ষী যাবতীয় চেতন পদার্থের মূলক্ষেত্র ইহা দ্বারাই গঠিত। মাটির গঠনোপাদানে নেত্রজনের আনাগোনা তত বেশী নয়, এজন্য মাটিতে অনেক রকম মৌলিকের সন্ধান মিলিলেও ইহাকে পাইতে হইলে ঊর্দ্ধেই বেশী নজর দিতে হয়। ভগবানের ইচ্ছার কৌশল বুঝিয়া উঠা ভার, যদি পৃথিবীর বক্ষেই নেত্রজন বেশী আনাগোনা করিত তবে বায়ুতে থাকার নির্দ্দেশ করা কঠিন হইত। পৃথিবীর লীলায় তখন নিশ্চয়ই জীবনখেলার ব্যাঘাত হইত।

গ্যাসটীকে একান্তে পাওয়া তত কঠিন নয়। বায়ুই ইহার অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেখান হইতে ইচ্ছামত অবিমিশ্র নেত্রজন পাওয়া অবশ্য খুব সহজ নয়। এজন্য রাসায়নিক প্রতিভার সাহায্য দরকার। ইহাকে অম্লজানের হাওয়া হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট। কারণ বায়ুতে অন্যান্য উপকরণ এত কম যে তাহাদের কথা না ভাবিলেও চলে। তবে সম্পূর্ণ পরিশ্রুত নেত্রজনও পাওয়া যায়। তরল বায়ু হইতে আজকাল এই গ্যাসটী তৈয়ার হয়।

সাধারণ গুণাগুণ দ্বারা বায়ু হইতে ইহাকে তারতম্য করা যায় না। বর্ণহীন, ঘ্রাণহীন নেত্রজনের রূপ প্রায় বায়ুরই মত।

কিন্তু বায়ু ও নেত্রজন যে এক পদার্থ নয় তাহা বুঝাইতে হইলে রাসায়নিক পরীক্ষার আশ্রয় লইতে হয়। বায়ুতে যে আলো জ্বলে, বিশুদ্ধ নেত্রজনের হাওয়ায় তাহা জ্বলা সম্ভব নয়। নেত্রজনের মধ্যে কোন আলো প্রবিষ্ট হইলে মনে হয় যেন ঠিক জলের মধ্যে ইহাকে প্রবেশ করান হইল, ইহা তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাধারণ বাজারে ইহা অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য। চলতি তাপে কখনও কোন মূলপদার্থের সাথে ভাব করিবার পরিচয় আমরা পাই না। এই নিষ্ক্রিয় নেত্রজন কেবল যে বায়ুতেই বর্ত্তমান তাহা নহে, সুদূর তারকারাজি, নীহারিকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ইহার হাওয়ায় ভরপুর। বিজ্ঞানজ্ঞানভাণ্ডারে আজ এ সমস্ত মোটেই নূতন সংবাদ নয়। আমাদের এই অতি পুরাতন সভ্যদেশ এ সমস্ত সংবাদে মনোনিবেশ না করিয়া কতকগুলি অন্ধসংস্কারে লিপ্ত থাকায় আমাদের নিকট এগুলি অবশ্য নূতন তত্ত্বকথা বলিয়া প্রতিভাত হয়। তারকাগণ নীহারিকাগণ নেত্রজনকে সহস্র সহস্র মাইলব্যাপী আধিপত্য করার স্থান দিয়াছে।

শুনা যায় মঙ্গল, বৃহস্পতি গ্রহগণ একমাত্র নেত্রজনের হাওয়ায় পরিপূর্ণ। অন্যান্য মৌলিক গ্যাস বহুদিন পূর্ব্বে উহাদের শক্তশরীরে জমিয়া গিয়াছে এবং সেখানে যুক্তপদার্থের অংশ হইয়া বসবাস করিতেছে। ঐ সমস্ত গ্রহের বায়ুতে কাহারা বাস করে? উহারা কি মনুষ্যপদবাচ্য? এ সমস্ত প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। অল্পজ্ঞানের অভাববশতঃ আমাদের মত মনুষ্য, জীবজন্তু, সেখানে বাস করিতে পারে কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন, একমাত্র নেত্রজনের বায়ুতেও কোন কোন জীব, কীট পতঙ্গ প্রাণধারণ করিতে পারে অবশ্য তাহারা এক নূতন শ্রেণীর জীব। হয়ত এরূপ এক জাতীয় প্রাণী ঐ সমস্ত গ্রহে বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়া সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ঐরূপ একটা গ্রহের কথা ভাবিলেও আতঙ্ক হয়। সেখানে আমাদের প্রাণপ্রদীপ এক মুহূর্ত্তও জ্বলিবে না। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র একমূল্যে বিক্রিত হইবে, সকলেই কঠিন শবে পরিণত হইয়া অচেতন পদার্থের বাজারে মনদরে চালান যাইবে। তৈল, কয়লা ইত্যাদি পদার্থ তখন হইবে অদাহ্য অশোষ্য ইত্যাদি।

নেত্রজনের পরিচয় পাইয়া অনেকে মনে করিতে পারেন এ জিনিষটীর থাকার দরকার কি ছিল; অপদার্থের বোঝা বাড়াইয়া লাভ কি? কিন্তু এ অপবাদ উহার স্কন্ধে স্থাপন করা ঠিক নয়। নেত্রজন মোটেই অকর্ম্মণ্য নয়। সকলের কর্ম্মক্ষেত্র সমান হয় না। যশোলিপ্সা উহার নাই। গোপনে কাজ করিয়া যাওয়াই উহার অভিলাষ। আকাশের নেত্রজন কোন্ গোপনপথে উদ্ভিদাদি ও প্রাণী জগতের মধ্য দিয়া গতাগতি করে সাধারণ লোক তাহার কি খবর রাখে? আমরা মনে করি, বায়ুর অলস নেত্রজন চিরকালই ঐ অলস বায়ুর স্তরে বসবাস করিতেছে।

ইহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র দেখিলে আমাদের নির্ব্বাক্ হইতে হয়। মনুষ্য, জীবজন্তুতে যে অবিরাম পরিবর্ত্তন চলিয়াছে তাহার একমাত্র অনুপ্রেরণা এই নেত্রজন। বায়ুতে ইহা সদা নৃত্যপরায়ণ। এমতাবস্থায় কৌশলে উহাকে ধরিবার জন্য একশ্রেণীর কীটাণু ওত পাতিয়া বসিয়া থাকে। সহজ রাসায়নিক সখ্যতায় যখন ধরা দিতে নারাজ, তখন প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে চাপিয়া ফেলিবার জন্য এ হেন প্রাণিজগতের চেষ্টা ও তৎপরতা প্রশংসার্হ। এ সমস্ত জীবাণুগুলির (Bacteria) কর্ম্মদক্ষতা অসীম। বুদ্ধিমান মানুষ উহাদের অদ্ভুত রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া বিস্ময় পুলকে হতবুদ্ধি হয়। ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও উহাদের দেহের আভাস পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। এরূপ অণুপরিমাণ ক্ষুদ্র জীবাণুদের ধরাবক্ষে এক প্রকাণ্ড কারখানা আছে। উহাদের রসশালায় অবিরাম কাজ চলিয়া থাকে। মানুষ মনে করিতে পারে উহারাই দুনিয়ার মালিক কিন্তু এ সমস্ত ক্ষুদ্রতম প্রাণশক্তির অপরিসীম সহানুভূতি না থাকিলে এ মালিকত্বের নমুনা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইত কে বলিতে পারে। প্রতি অণুপরমাণুতেও যখন সজীব শক্তি বর্ত্তমান এবং মনুষ্যের জীবনধারণের পক্ষে যখন উহারাও কম সহায়ক নয়, তখন উহাদেরও আদরযত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণগুলি উহাদের পছন্দমত গাছপালায় নেত্রজনকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তখনই হয় উক্ত গাছপালাগুলি মানুষের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে —নেত্রজনঘটিত পদার্থই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। ক্ষুদ্র প্রাণগুলির কাজের পালা এ ভাবেই শেষ হয় নাই, সুযোগ পাইলে উহারা নেত্রজনকে ধরিয়া নাইট্রেট্ (Nitrate) নামে এক প্রকার লবণ তৈয়ার করিতেও বিশেষ পারদর্শী। চিলির বিশ্ববিখ্যাত লবণ (Chele salt petre)

উহাদেরই কারখানার মাল। ভূমির সারপদার্থ ও গোলাবারুদের মসলা হিসাবে সভ্যজগতে ইহার প্রচুর সমাদর। আমাদের দেশে সোরা নামে একটী নেত্রজনযুক্ত সারপদার্থ বাজারে খুব পাওয়া যায়। ঐ জিনিষটীও প্রকৃতির কারখানায় ঐ ক্ষুদ্র কারিকরদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রাণীজগতে যে বিরাট কর্ম্মতৎপরতা চলিয়াছে, মানুষ তাহার কতটুকু অংশ গ্রহণ করে তাহা জানিবার যদি মাপকাঠি থাকিত, তাহা হইলে মানুষের গর্ব্বের মাথা নিশ্চয়ই এতদিনে ধূলায় লুটাইত। নেত্রজন লইয়া যত রাসায়নিক নাড়াচাড়া চলে তাহার প্রধান উদ্যোক্তা এই ক্ষুদ্রাশয়গণ।

আহার্য্য হিসাবে বৃক্ষ লতা পাতা আমরা যথেষ্ট গ্রহণ করি, ঐগুলি অবলম্বন করিয়া নেত্রজন আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রকৃত জীবনীশক্তির রসদ দান করিয়া থাকে। বড় বড় পণ্ডিতদের মতে প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থানেই এই অকর্ম্মণ্য গ্যাসটীর রাজত্ব (In the Protoplasm), ইহাকে বাদ দিয়া প্রাণ হয় না। শরীরের অনেক অংশের উপাদানেও এই গ্যাস বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা দেহ প্রাণ উভয়ই পরিপুষ্ট হয়। এই উন্মুক্ত গ্যাসটীর সাহায্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ধরাধামে এক বিশাল কর্ম্মস্রোতের প্রেরণা জাগাইয়াছেন। সাধারণ কীটাণুদের উপর নির্ভর করিয়া ইঁহারা সন্তুষ্ট নয়। প্রকৃতিকে নাড়াচাড়া দিতে পারিলেই ইঁহাদের আনন্দ। বৈদ্যুতিক স্পন্দন হেতু বায়ুতে নেত্রজন অম্লজানের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তখন নানা প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নেত্রজন-অম্লজানঘটিত অম্লরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। ইহাও নেত্রজনকে বাঁধিবার এক প্রকার রাসায়নিক সঙ্কেত। রক্ষক যে ভক্ষক হইতে পারে, শান্ত যে দুর্দ্দান্ত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ পৃথিবীতে অনেক পাওয়া যায়। রক্ষক যখন ভক্ষক হয় তখন তাহার অবাধ তাণ্ডবে দুনিয়া তোলপাড় হইয়া উঠে। নেত্রজন যেমন খাদ্যাখাদ্যের মধ্য দিয়া অতি গৌরবময় শান্তিবারি সিঞ্চন করে, তদ্রূপ সভ্যজগতের হিংসানলে আহুতি দিবার জন্য ইহা গোলাবারুদের প্রাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় তীব্র বিস্ফোরকেই নেত্রজনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা বিজ্ঞানের হাটে একটু চলাফেরা করেন তাঁহারা সকলেই নেত্রজনঘটিত প্রসিদ্ধ অম্লটীর (Acid) নাম অবগত আছেন। এই অম্লটীর (Nitric Acid) সাহায্যেই রাসায়নিক অনেক প্রকার মৃত্যুর মসলা তৈয়ার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। আজকাল প্রত্যেক সভ্যজাতি তাঁহাদের সভ্যতার মাপকাঠি অর্থাৎ যুদ্ধসজ্জার উপকরণ নিজেরাই যাহাতে প্রস্তুত করিতে পারেন এজন্য তৎপর, পরমুখাপেক্ষী হইয়া সুযোগ সুবিধা না হারাইতে হয় এজন্য বিশেষ সতর্ক। একদিন চিলির নাইট্রেট দুনিয়ায় নেত্রজন তথা নাইট্রিক এসিড ক্ষুধা মিটাইবার মূল সামগ্রী ছিল। আজকাল জার্ম্মানী, নরওয়ে ইত্যাদি প্রত্যেকটী স্বাধীন দেশ নেত্রজনকে আকাশ হইতে ধরিবার সঙ্কেত জানিয়াছে এবং ভারে ভারে এই এসিড্ তৈয়ার করিতেছে। নেত্রজনঘটিত শ্রেষ্ঠ পদার্থকে এভাবে আয়ত্ত করিয়া পৃথিবী সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠিয়াও মূলতঃ বর্ব্বরতার নিম্নসীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কোথায় নেত্রজনকে বলা হইত "কল্যাণময়ী তুমি ধন্য", এখন উহাকে বলিতে হয়, "তুমি ধ্বংস, তুমি হিংসা, তুমি মরক !"

ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে নেত্রজনের দ্বারস্থ হইতেই হয়। নেত্রজনযুক্ত পদার্থ সাররূপে ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হয়। ইহার একটী প্রধান যৌগিকপদার্থ এমোনিয়া (Ammonia)। এই এমোনিয়া অনেকগুলি লবণসার পদার্থরূপে কৃষকদের কাজে লাগে।

নেত্রজনকে ঘরে বাঁধিবার অনেক প্রকার কৌশল আমরা হাতে পাইলাম এবং উহাদের

সহায়তায় সত্যসত্যই বহু নেত্রজন ধরাধামে শৃঙ্খলিত হইয়াছে। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও বায়ু-সমুদ্রে নেত্রজনের মাত্রা উন হয় নাই। কে যেন উহার পেছনে তুলাদণ্ড লইয়া বসিয়া আছেন, এদিক ওদিক হইবার সাধ্য নাই। ইহা অবশ্য নানা ভাবে আবদ্ধ হইতেছে কিন্তু বৃক্ষাদি পশুপক্ষীর ধ্বংসের দ্বার বন্ধ না হওয়াতে উহাদের ধ্বংসের সাথে সাথে শরীরস্থ নেত্রজন উন্মুক্ত হইয়া পুনরায় বায়ুতে আসিয়া মিলিত হয়। এক্ষেত্রেও ঐ ক্ষুদ্র কীটাণু-শক্তির সহায়তায় মোচনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রসরাজের অদ্ভুত রসচক্র। নেত্রজনের বায়ুতে নিষ্ক্রিয় নিরালম্ব ভাব, ধরাধামে অবতরণ, বিপুল ঘাত প্রতিঘাত ও কর্ম্মযুদ্ধ, আবার সেই শূন্যের নির্লিপ্ততা চক্রীরই চক্রের পরিচয় দিয়া থাকে।

সাধক অবদোল্লা

শ্রীমতী আভা সান্যাল

আধ্যাত্মিক জীবন ও ধর্ম কোন দেশ জাতি সমাজ বা মত-পথে গণ্ডিবদ্ধ হতে পারে না। সময় সময় দেখা যায়, পৃথিবীর সব দেশেই সব সমাজেই এমন সব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের অমূল্য জীবন দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে মহাকালের বুকে সোনার অক্ষরে অমর হয়ে থাকে। সকল দেশের সকল সমাজের লোক তাঁদের উদ্দেশ্যে অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য যুগে যুগে নিবেদন করে এসেছে। সত্যই এঁরা মহামানব, এদের অপূর্ব জীবনালোকে মানবসমাজ ধন্য, পৃথিবী গৌরবান্বিত।

অবদোল্লা ছিলেন একজন মুসলমান সাধু। তাঁর সাধুজীবনের কাহিনী বিশ্বাসী মুসলমানদের কাছে যেমন আদরের, অন্যান্য ধর্মের ধর্মপিপাসু নরনারীর কাছেও তেমনি শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু বলে পরিগণিত হবে।

অবদোল্লা মরও নামক স্থানে বাস করতেন। লোকে তাকে শাহল্‌শাহে ওল্‌মা বলত। শাহল্‌-শাহে ওল্‌মা মানে পণ্ডিতের সম্রাট। অবদোল্লা একদিকে যেমন ধার্মিক ছিলেন ধর্মশাস্ত্রেও তেমনি ছিলেন সুপণ্ডিত।

দেখা যায়, কোন কোন সময় এমন এক একটা ঘটনা এসে উপস্থিত হয়, যার ফলে জীবনের গতি হঠাৎ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঐ ঘটনাগুলো হয়তো সাধারণের চোখে অতি সাধারণ বলেই মনে হবে, কিন্তু এগুলোর সংঘাতে পড়ে বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী হতে দেখা যায়, মহাপুরুষ মহাপিশাচে পরিণত হয়। হয়তো একটি অতি সামান্য ঘটনাই অবিশ্বাসীর অন্তরে তীব্র বিশ্বাসের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, নরপিশাচের হৃদয়ে নন্দনের বার্তা বহন করে আনে, অশান্তের প্রাণে প্রেমের শান্তিবারি সিঞ্চন করে।

ঘটনাটি অতি সামান্য। কিন্তু তাতেই অবদোল্লার জীবনে একটা মহা পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেল। অবদোল্লা একটি সুন্দরী রমণীকে বড়ই ভালবাসতেন। ধীরে ধীরে এমন হল যে ঐ মেয়েটি তাঁর অন্তরের সবটুকুই জুড়ে বসল। তাকে না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না।

এক শীতের রাত্রে বাইরে ভয়ানক বরফ পড়ছিল। গভীর রাত, রূপসী কামিনীকে মাত্র একটিবার দেখবার এক তীব্র আকাংক্ষা জেগে উঠল অবদোল্লার মনে। সে দুর্বার কামনাকে তিনি প্রতিহত করতে পারলেন না, ছুটে গেলেন

রূপসীর বাড়ির সামনে। দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। অবদোল্লা ভিতরে যেতে পারলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে সুন্দরীর দর্শন প্রতীক্ষায়।

সারারাত কেটে গেল, অবদোল্লা কিছুই জানতে পারলেন না। ভোর বেলা নমাজের মধুর আজান ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। অবদোল্লা ভাবলেন, বুঝি দুপুর রাত্রের আজান। ধীরে ধীরে ঊষার রঙিন আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। অরুণালোক-স্পর্শে রাতের আঁধার নিমিষে কোথায় মিলিয়ে গেল। সেই আলোকসম্পাতে অবদোল্লার অন্তরের অন্ধকারও যেন হঠাৎ পালিয়ে গেল। তাঁর মনে চেতনা ফিরে এল, তিনি বুঝতে পারলেন, একটি তরুণীর প্রতীক্ষায় তিনি সমস্ত রাত সেখানে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছেন। সারারাত বরফ পড়েছে, কন্‌কনে শীত, দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট, লোকলজ্জা, কিছুই তাঁর অনুভব হয় নি। কি মোহই তাঁকে পেয়েছিল।

অনুতপ্ত হয়ে তিনি ভাবলেন, যদি আমি সমস্ত রাতটা নমাজ করে কাটিয়ে দিতুম, যদি আমি সারাটি রাত পবিত্র কোরান পড়ে কাটিয়ে দিতুম। আহা, একটি নারীর দর্শন লালসায় যে কষ্টটুকু আমি সহ্য করেছি, যদি তা ঈশ্বরের জন্য করতে পারতুম।

যে হতভাগিনী তার রূপের বেসাতি নিয়ে হয়তো শত শত মানবের মনকে মোহের আবিলতার মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছিল, সেই আজ অবদোল্লাকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে দিলে, তার হাত দিয়েই বিধাতা পাঠিয়ে দিলেন ভক্তের জন্য নন্দনের পারিজাত উপহার।

সেদিন থেকেই অবদোল্লার ধর্মজীবনের আরম্ভ। তিনি ভগবদারাধনায় সাধুসঙ্গে ও তীর্থদর্শনে জীবনের বহুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ব্যবসা করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন এবং অর্থের অধিকাংশই তিনি সহচরদের মধ্যে দরিদ্রদের মধ্যে ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। মরও-তে তিনি দুটি পান্থশালা তৈরী করে দিয়েছিলেন।

পেছনে হাজার লোকের বাহবা থাকলে মহা কাপুরুষও ভীমবিক্রম দেখায়, সব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মহাত্যাগীর পথ বরণ করে নেয়। কিন্তু লোক-চক্ষুর অন্তরালে দৈনন্দিন ছোট ছোট কাজে যাঁদের মহত্ত্ব ফুটে ওঠে, তাঁরাই প্রকৃত মহৎ। আর মানুষের মহত্ত্বের বিচার করতে গেলে জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলোই কষ্টিপাথরের কাজ করে।

এক সময় একটি অসৎলোক অবদোল্লার সঙ্গী হয়েছিল। অবদোল্লা তার বিষয় সবই জানতেন। কিছুদিন পর লোকটি অবদোল্লাকে ছেড়ে চলে গেল। লোকটি চলে যাওয়াতে অবদোল্লা কেঁদে-ছিলেন। তিনি বললেন, হতভাগা চলে গেল, তার চরিত্রও তেমনি তার সঙ্গেই রইল।

অবদোল্লা মনে করেছিলেন, কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকলে সঙ্গগুণে লোকটির চরিত্র শুধরে যাবে। অবদোল্লার অন্তর ছিল মহৎ, তাই তিনি পাপীকেও ভালবাসতে পেরেছিলেন।

যাঁরা যথার্থই মহৎ তাঁদের একটি বিশেষ গুণ থাকে, ছোট হোক তুচ্ছ হোক যেখানেই শেখবার মত কোন বস্তু তাঁরা দেখতে পান, অতি শ্রদ্ধাভরে তা গ্রহণ করে থাকেন। একদিন অবদোল্লা কোন ধনী বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছিলেন। পথে এক ফকির তাঁর সঙ্গী হল। তিনি ফকিরকে বললেন, ফকির, আমি ধনী বলে নিমন্ত্রণ পেয়েছি, বিনা নিমন্ত্রণে তুমি কোথা যাচ্ছ?

ফকির উত্তর করলে, যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন যদি দয়ালু হন তা হলে আমাকেও তিনি দেখবেন। আপনাকে যদি তিনি বাড়িতে নিয়ে যান তা হলে আমাকেও নিয়ে যাবেন।

—আমার মত ধনীদের কাছে তিনি সাহায্য চান বলেই তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেন।

—সাহায্য যদি চান তো আমাদের জন্যই চাইছেন।

ফকিরের কথায় অবদোল্লা লজ্জিত হয়ে বললেন, ঠিক বলেছ।

অবদোল্লা গরিব ফকিরদের সেবা করতে ভালবাসতেন। তিনি তাদের কোর্মা খাওয়াতেন আর যে যত কোর্মা খেতে পারত তাকে তত পয়সা দান করতেন।

অবদোল্লার একটি দামী ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় চড়েই তিনি সাধারণত চলাফেরা করতেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। পথে নমাজের সময় ঘোড়াটি কাছে বেঁধে নমাজ করতে আরম্ভ করেন। নমাজের শেষে তিনি দেখলেন ঘোড়াটি বাঁধন ছিড়ে পালিয়েছে আর ক্ষেতে প্রবেশ করে শস্যের অনেক ক্ষতি করেছে। কৃষকের ক্ষতি করেছে দেখে অবদোল্লার মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, ঘোড়াটি থাকলেই এভাবে মাঝে মাঝে পরের ক্ষেত নষ্ট করবে। তিনি তখনই ঘোড়াটিকে পরিত্যাগ করলেন।

এক সময়ে তিনি শাম দেশের কোন লোকের কাছ থেকে একটি কলম এনেছিলেন। কিন্তু ভুলক্রমে তাকে তা ফেরৎ দিতে পারেন নি। মরও থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে অবদোল্লা শাম দেশে গেলেন ও লোকটিকে তার কলম ফেরৎ দিয়ে আসলেন। অবদোল্লার সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যবুদ্ধি সত্যই প্রশংসার উপযুক্ত।

অবদোল্লা একবার তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন। একদিন মক্কার মসজিদের পাশে তিনি শুয়ে আছেন, স্বপ্নে দেখলেন দুজন দেবদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে বলাবলি করছেন।

—এবছর কত লোক তীর্থ করতে এসেছিল?

—ছয় লক্ষ।

—এর মধ্যে কত লোকের তীর্থের কাজ সফল হয়েছে?

—এদের মধ্যে একজনেরও হয় নি।

দেবদূতদের কথায় অবদোল্লার মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, হায়, কত দূর দেশ থেকে কত দুঃখ কষ্ট বরণ করে কত পর্ব্বত প্রান্তর পার হয়ে মানুষ তীর্থ করতে এসেছে, তাদের সব কষ্ট ও পরিশ্রম বিফল হল!

একজন দেবদূত তখন বললেন, দমস্ক নগরে একজন মুচি বাস করে। তার নাম আলিঅল্ মওফক্। সে মক্কায় আসে নি অথচ তার মক্কা দর্শনের ফললাভ হয়েছে।

অবদোল্লা জেগে উঠলেন। স্বপ্নের ঘটনা সত্যি কিনা দেখবার জন্য তাঁর মনে কৌতূহল হল। তিনি দমস্ক যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে খোঁজ করাতে আলিঅল্ বলে একজন মুচির সন্ধান পেলেন। তিনি অবিলম্বে আলিঅলের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। আলিঅলের সঙ্গে দেখা হল এবং তিনি তাঁর স্বপ্নের ঘটনা আগাগোড়া তাকে বললেন।

আলিঅলের কাহিনী অবদোল্লা শুনতে চাইলেন। আলিঅল বললে, ত্রিশ বৎসর ধরে আমার মনে মক্কাতীর্থ দর্শন করবার বিশেষ আকাংক্ষা। জুতো সেলাই করে কিছু টাকা আমি তার জন্য সঞ্চয় করেছিলুম। আমার স্ত্রী গর্ভবতী। একদিন প্রতিবেশীদের কারো বাড়ি থেকে সুন্দর রান্নার গন্ধ আসছিল। আমার পরিবার আমাকে বললে, ওগো, কার বাড়ি রান্না হচ্ছে, কি চমৎকার গন্ধ আসছে। যাও না, আমার জন্য কিছু খাবার চেয়ে নিয়ে এস।

আমি গেলুম। প্রতিবেশীর বাড়ি গিয়ে আমার পরিবারের অন্তরের ইচ্ছার কথাটা বললুম। শুনে বিশেষ সংকুচিত হয়ে প্রতিবেশী বললে, দাদা, কি বলব আমার দুর্ভাগ্যের কথা! আজ সাতদিন আমার ছেলে মেয়েরা খেতে না পেয়ে উপোস আছে। একটি মরা গাধা পড়েছিল। তাই থেকে খানিকটা মাংস কেটে এনেছি। তাই রান্না হচ্ছে। আজ সাত দিন পর ছেলেমেয়েগুলো কিছু খেতে পাবে। এ খাবার তোমার হাতে কি বলে তুলে দিই। এ যে তোমাদের উপযুক্ত নয়।

আলিঅল্ বলতে লাগল, প্রতিবেশীর কথা শুনে অন্তরে বড়ই ব্যথা পেলুম। মক্কা যাবার জন্য যে টাকাগুলো তুলে রেখেছিলুম, তাই এনে প্রতিবেশীর হাতে দিয়ে বললুম, ভাই, মক্কা যাব বলে টাকাগুলো জমিয়েছিলুম। তোমার ছেলে-মেয়েদের দুঃখ দেখে আমি সত্যিই বড় ব্যথিত হয়েছি। তাদের জন্য এ কটি টাকা আমি দিচ্ছি। এই আমার তীর্থগমন মক্কাদর্শন।

অবদোল্লা আলিঅলের কাহিনী শুনে বললেন, দেবদূতরা সত্য কথাই বলেছেন। তুমিই যথার্থ ধর্মপ্রাণ।

আলিঅলের কাহিনী আমাদের ধর্মব্যাধের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আলিঅল্ সামান্য মুচির কাজ করত কিন্তু অন্তর ছিল তার কত মহৎ কত উদার। তিনিই যথার্থ ধার্মিক তিনিই যথার্থ ভক্ত অন্তর যাঁর আর্ত বিপন্ন ক্ষুধিত নরনারীর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ওঠে, নিজের সমুদয় শক্তি যিনি আর্ত সেবায় হাসি মুখে দান করতে পারেন।

অবদোল্লার একটি চাকর ছিল। একদিন এক বন্ধু অবদোল্লাকে বললেন, ভাই তোমার চাকরটি কিন্তু বড় সুবিধের লোক নয়। রোজ রাত্রে সে গোরস্থানে যায় দেখি। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ, ও নিশ্চয়ই কবর খুঁড়ে শবের কাপড় চোপড় চুরি করে।

শুনে অবদোল্লা ভারি দুঃখিত হলেন। এক রাত্রে তিনি চুপি চুপি সেই চাকরের পেছনে পেছনে গোরস্থানে গেলেন। একটু তফাতে থেকে তিনি দেখতে লাগলেন, চাকরটি কি করে। চাকরটি অবদোল্লার কথা কিছুই জানতে পারলে না। সে একটা কবরের পাশে গিয়ে বসল ও একমনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। ধীরে ধীরে অবদোল্লাও তার পেছনে গিয়ে বসলেন। কেঁদে কেঁদে সে অতি করুণ ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলে। সে করুণ প্রার্থনায় অবদোল্লাও স্থির থাকতে পারলেন না, তিনিও কেঁদে ফেললেন।

প্রার্থনায় সারারাত কেটে গেল ভোর হবার পর চাকরটি মসজিদে চলে গেল এবং সকাল বেলার নামাজে সকলের সাথে যোগ দিলে। চাকরের ব্যাপার দেখে অবদোল্লা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যদি প্রভু হতে আর আমি যদি তোমার চাকর হতুম!

উন্নতমনা মানবের মনেও সময় সময় দুর্বলতা দেখা যায়। কিন্তু সে দুর্বলতা তাঁরা তখনই বুঝতে পারেন এবং বিচার ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা তাঁরা তা অনায়াসেই জয় করতে পারেন।

পরমতসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে ভারত যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে, পৃথিবীর আর কোন দেশ সেরূপ পারে নি। অন্য ধর্মাবলম্বীকে ভারত যে শুধু আশ্রয়ই দিয়েছে তা নয়, তার জন্য মন্দির করে দিয়েছে, তার ধর্মমতকে শ্রদ্ধানত শিরে সম্মানের আসন দিয়েছে। যে সব ধর্ম ভারতের বাইরে জন্মলাভ করেছে তাদের অধিকাংশের মাঝেই দেখতে পাই বিধর্মীকে নিজের ধর্মে আনয়ন অথবা বিধর্মীর সহিত যুদ্ধ করা পুণ্য বা ধর্মকর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে।

অবদোল্লাও অনেকবার বিধর্মীদের সাথে ধর্মযুদ্ধ করেছেন। একবার তিনি একটি বিধর্মীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। যখন নামাজের সময় হল অবদোল্লা তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বললেন, আমার নমাজের সময় এসেছে। আমাকে একটু সময় দাও, নমাজ শেষ করে আসি, আবার তোমার সাথে লড়াই করব।

বিধর্মী তাতে রাজী হল। কিছু সময় পর তারও পূজোর সময় উপস্থিত হল। সে তখন অবদোল্লাকে বললে, তোমাকে তোমার নমাজের সময় দিয়েছি। আমারও পূজোর সময় এসেছে, আমাকে পূজো শেষ করতে দাও।

অবদোল্লা রাজী হলেন। বিধর্মী প্রতিমার সম্মুখে পূজো করতে চলে গেল। যখন সে পূজোতে ব্যস্ত আছে তখন অবদোল্লার মনে একটি দুর্বলতা দেখা দিলে। তিনি ভাবলেন, বিধর্মী এবার প্রতিমার সামনে পূজোয় আছে, এসময় যদি আমি গিয়ে তার মাথাটি কেটে নিই, তাহলে কাজটি অতি সহজেই হয়ে যায়।

অবদোল্লা তরবারি নিয়ে ছুটে গেলেন বিধর্মীর জীবনের অবসান করবার জন্য। কিন্তু একটি দৈবকারণে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, তিনি তাঁর দুর্বলতা বুঝতে পেরে নিরস্ত হলেন। যে বিধর্মী তাঁকে প্রার্থনার সময় দিলে, তিনি তাকে পূজো করতে দিয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করতে গিয়েছিলেন। শেষকালে অবদোল্লার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লোকটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং সাধন-জীবনে খুবই উন্নতি করেছিল।

হয়তো এ ঘটনার পর থেকেই ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে অবদোল্লার দৃষ্টি বিশেষ উদারতা লাভ করেছিল। একবার তিনি একটি বিপদে পড়েছিলেন। তাঁর দুঃখে অনুবেদনা প্রকাশ করবার জন্য অনেক বন্ধু বান্ধব তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। একজন অগ্নি-উপাসকও তাঁর কাছে গিয়েছিল। অগ্নি-উপাসক তাঁকে বললে, বিপদে পড়ে মূর্খলোক যে উপায় তিন দিন পরে অবলম্বন করে, জ্ঞানীরা তাই প্রথম দিনেই গ্রহণ করে থাকেন।

শুনে অবদোল্লা বললেন, এ কথা কটি লিখে রাখ, এগুলো জ্ঞানের কথা।

অবদোল্লার এ উদারতা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

একবার ভীষণ শীতের সময় অবদোল্লা বাজারের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন একজন দাস একখানা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে যাচ্ছে আর শীতে কাঁপছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি শীতে কষ্ট পাচ্ছ, তোমার মনিবের কাছে একটা গরম জামা চাও না কেন?

সে উত্তর করলে, আমি আর তাঁকে কি বলব? তিনি নিজেই তো আমার সব জানতে পারছেন ও দেখছেন।

এ উত্তরে অবদোল্লা বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, এ দাসের কাছ থেকে ধর্ম শিক্ষা কর।

দাসের প্রভুনির্ভরতা দেখে অবদোল্লার মনে হয়তো ঈশ্বর-নির্ভরতার ভাব জেগে থাকবে। ঈশ্বর আমাদের সবই দেখছেন সবই জানেন। তিনিই আমাদের প্রভু। আমাদের যা প্রয়োজন তিনিই আমাদের দিচ্ছেন। যে অবস্থায়ই তিনি আমাদের রাখুন না কেন, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এক ব্যক্তি অবদোল্লার কাছে উপদেশ চেয়েছিল। তিনি বললেন, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রেখো। সর্বদা এভাবে চলবে যেন ঈশ্বরকে সামনে দেখতে পাচ্ছ।

মৃত্যুকাল উপস্থিত জেনে অবদোল্লা তাঁর সমুদয় ধনসম্পত্তি গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। তখন একজন শিষ্য তাঁকে বললেন, প্রভু, আপনার তিনটি মেয়ে আছে। সবই যদি আপনি বিলিয়ে দিলেন, তাহলে এঁদের কি উপায় হবে?

উত্তরে অবদোল্লা কোরানের একটি কথা বললেন, সাধুর গতি ঈশ্বর।

তিনি আরও বললেন, দেখ, অবদোল্লা কারো বিধাতা হতে চায় না, সে চায় ঈশ্বরই সকলের বিধাতা হোন।

ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ভক্তি নির্ভরতা সত্যিই অতুলনীয় ছিল। তিনি ঈশ্বরের নাম করতে করতে হাসিমুখে দেহত্যাগ করেছিলেন।

সাধু ও চলতি বাংলা

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কি মতামত ছিল এবং তিনি নিজে কিভাবে লিখে গেছেন, তা আলোচনা করেছি।[১] এ সম্বন্ধে স্বামীজী আর কোথাও কিছু বলেছেন কিনা খোঁজ করতে গিয়ে কতকগুলো চমৎকার কথা পেয়েছি। মূল ইংলিশ থেকে তার অনুবাদ করে দিলুম।

সহজ সরল ভাবে ভাব প্রকাশ করাই হচ্ছে ভাষার মূল কথা। আমার গুরুদেবের ভাষাকেই আমি আদর্শ মনে করি। তিনি অতি সাধারণ চলতি ভাষায় কথাবার্তা বলতেন, অথচ তাঁর ভাষা কেমন জোরাল ও স্পষ্ট। ভাষা এমন হওয়া চাই, যাতে ভাবটি অবিকল প্রকাশ করতে পারা যায়।

খুব তাড়াতাড়ি করে বাংলা ভাষাকে পূর্ণাঙ্গ করবার চেষ্টা করলে তা নীরস হয়ে পড়বে। সত্য কথা বলতে কি, বাংলাতে ক্রিয়া পদের বড় অভাব। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতায় তা শোধরাবার চেষ্টা করেছিলেন। কবিকংকণ ছিলেন বাংলার সবচেয়ে বড় কবি। সংস্কৃতয় সবচেয়ে ভাল গদ্য রচনা হচ্ছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য। মহাভাষ্যের ভাষা খুব প্রাণবন্ত। হিতোপদেশের ভাষাও মন্দ নয়। কাদম্বরীর ভাষাকে সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির একটা দৃষ্টান্ত বলে ধরা যেতে পারে।

বাংলা ভাষাকে পালির ছাঁচে গড়তে হবে, সংস্কৃতর ছাঁচে নয়। পালির সঙ্গেই বাংলার সাদৃশ্য বেশী। পারিভাষিক শব্দ তৈরী বা অনুবাদ করবার সময় সংস্কৃত থেকে শব্দ নিতে হবে। নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ তৈরীর চেষ্টা দরকার। সংস্কৃত অভিধান থেকে যদি একটি পারিভাষিক শব্দসংগ্রহ সংকলন করা যায়, তাতে বাংলা ভাষার গঠন-ধারায় বিশেষ সাহায্যই হবে।[২]

১ উদ্বোধন, পৌষ ও ফাল্গুন ১৩৪৪।

২ দি কম্প্লিট ওয়ার্কস্ অব দি স্বামী বিবেকানন্দ, খণ্ড ৫, পৃ ১৮৬-৮৭।

মানুষের ভাষাকে নদীর সাথে তুলনা করা যায়। অন্ধকার অতীতের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভাষাও ঠিক নদীরই মত প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যেন অনন্তের পানেই ছুটে চলেছে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজ থেকে বিভিন্ন ধারা এসে তাকে পুষ্ট করেছে, তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার নদীরই মত ভাষানদীও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সমাজ তাকে নানা নাম দিয়েছে।

বাংলা ভাষাটা কোন যাদুকরের মোহন মন্ত্রে হঠাৎ একদিন বাঙালী সমাজকে দখল করে বসে নি। অজানা অতীতের ভিতর থেকে হাজার হাজার বৎসর অতিক্রম করে কত শত শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ তা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার যাত্রাপথের পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন, এমন ঐতিহাসিক পৃথিবীতে এখনও আসেন নি। বাংলা ভাষার অতীতের বিশিষ্ট স্থানগুলোর মাত্র কয়টি আমরা জানতে পারি। বাকী সবই অজ্ঞাত। এ যেন হরিদ্বার কানপুর প্রয়াগ কাশী পাটনা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করে গঙ্গার গতিপথের বর্ণনা করা।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাস এভাবে নির্দেশ করেছেন, বৈদিক কথিত ভাষার রূপভেদ—প্রাচ্য অঞ্চলের কথিত ভাষা—কথিত মাগধী প্রাকৃত—মাগধী অপভ্রংশ—প্রাচীন বাংলা—মধ্য যুগের বাংলা—আধুনিক বাংলা।[৩]

৩ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, সং, পৃ ২৪।

জগতে সব চেয়ে স্বাধীন বস্তু হয়েছে সত্য। সত্য কখনও কারো মুখ চেয়ে চলে না। যেদিন প্রথম আবিষ্কার হল, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, অনেকের সংস্কারেই তখন বিষম আঘাত লেগেছিল। কিন্তু কারো মানসিক বেদনার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে সেই অজানা কাল থেকে পৃথিবী আজ পর্যন্তও সূর্যের চারদিকে অবিরাম ঘুরে চলেছে।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের সন্তান। বাঙ্গালার শিরায় শিরায় সংস্কৃতের বিশুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত। বাঙ্গালার আপাদমস্তক সংস্কৃত। যদি এরূপ কথা প্রমাণ হয় তাহলে হয়তো অনেকেরই আনন্দের সীমা থাকবে না। আবার বাংলা দরিয়ায় একেবারে তাজা আরবী পানি বয়ে যাচ্ছে, একথা প্রমাণিত হলে হয়তো কোন কোন বাঙালীর দিল খুশী হয়ে গুলবাগিচার বুলবুলের মত আনন্দে নাচতে থাকবে।

কর্ম অর্থে কেউ কেউ বাংলায় কায লেখেন। তাঁরা মনে করেন সংস্কৃত কার্যম্ শব্দ থেকে এসেছে তাই কায লিখলে বানানের শুদ্ধতা রক্ষা হয়। সংস্কৃত কার্যম্ শব্দ থেকে প্রাকৃত কজ্জ শব্দ এসেছে এবং তাই থেকে বাংলা কাজ। এরকম অসংখ্য শব্দ আছে। বাংলার ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলেন—

গৌড়বঙ্গের ভাষাকে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বলা সমীচীন হইবে না। এখনও প্রচলিত খনার বচন, ডাকের বচন, মানিকচন্দ্রের গীত, ধর্ম্মমঙ্গল, এমন কি চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে যেরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে বাঙ্গালাকে কোনক্রমে সংস্কৃতমূলক বলিয়া মনে হয় না। সেভাষা অনেকাংশে প্রাকৃতেরই অনুরূপ।[৪]

বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে। * * * এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ব-বর্ণিতরূপ প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালার জননী। সংস্কৃত উহার জননী নহেন, কিন্তু মাতামহী।[৫]

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই, উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের অতি সন্নিহিত হইলেও উক্তমত এখন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।[৬]

পালিশব্দের অর্থে অভিধানে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস লিখেছেন—বৌদ্ধ-মাগধী-ভাষা, প্রাকৃত ভাষার শাখা বিশেষ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন—বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র যে মাগধী পালী ভাষায় লিখিত, উহাও একপ্রকার প্রাকৃত।[৭] এক সময় সংস্কৃত ছাড়া ভারতের অন্যান্য সকল ভাষাকেই প্রাকৃত বলা হত। সংস্কৃতর নাম প্রকৃত, প্রকৃত থেকে যা হয়েছে, তার নাম প্রাকৃত। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রাকৃতজন অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা যা, তার নামই প্রাকৃত।

পারিভাষিক শব্দ তৈরীর কথা স্বামীজী বলেছেন। কিছুকাল যাবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষিক শব্দ সংকলনের চেষ্টা করছেন এবং কয়েক খণ্ড পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক সাহিত্যিকই ঐ কাজে চেষ্টা করেছেন ও করছেন। সকলেই স্বামীজীর প্রস্তাবিত পথেরই অনুসরণ করছেন।

কবিকংকণ সম্বন্ধে স্বামীজী সংক্ষেপে যা বলেছেন, ঠিক অনুরূপ কথাই দেখতে পাচ্ছি বিশ্বকোষে এবং রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্যিকদের লেখায়।[৮]

৪ বিশ্বকোষ, খণ্ড ১৮, পৃ ২১।

৫ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ৮,১১।

৬ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ম৫, পৃ ১৯।

৭ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ১০।

৮ বিশ্বকোষ, খ১৮, পৃ ৫৫-৫৬। এ খণ্ড ছাপা হয়েছে

স্বামীজী চলিত ভাষার পক্ষপাতী। সাধু ও চলতি বাংলা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবার চেষ্টা করছি।

১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা বাংলা দেশে প্রথম আসে ও ১৬৯৯ সাল থেকে এদেশে বাস করতে থাকে। তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই তাদের বাঙালীর সঙ্গে মেশবার ও বাংলা শেখবার দরকার হতে লাগল। ১৭৯৯ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরাই বর্তমান সাধু বাংলার সৃষ্টিকর্তা। সাধুভাষায় কেউ কখনও কথা বলত না।

বাংলা ভাষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, পনর ষোল শতকে মুখ্যত পশ্চিম বঙ্গের ভাষার আধারের উপর পুরাতন বাংলার সর্বজনগ্রাহ্য একটি সাহিত্যের ভাষা দাঁড়িয়ে যায়। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটিকে অনেকটা অবিকৃত রেখেই আধুনিক সাধুভাষার উদ্ভব। প্রাচীন রূপটি বিশেষ করে ক্রিয়াপদে ও সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধু-ভাষায় অপরিবর্তিত আছে, কেবলমাত্র এক শ পঁচিশ বছরের কিছু বেশী হয়েছে সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতিবাহুল্য ঘটেছে।[৯]

গত শতাব্দী পর্যন্ত চলতি ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয় নি। যে দু একজন সাহসী সাহিত্যিক এ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের যথেষ্ট গঞ্জনা লাভ হয়েছিল। তারপর দেখা গেল চলতি ভাষার একটা ছন্দ আছে, তরঙ্গ আছে দ্রুত চলার শক্তি আছে। সাহিত্যে চলতি ভাষাকে গ্রহণ করলে তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না। কথা-সাহিত্যে পাত্রপাত্রী নায়কনায়িকার জবানিগুলো চলতি ভাষায় না লিখলে অস্বাভাবিক শোনায়, তাতে প্রকৃত সাহিত্য গড়ে ওঠে না। কথাসাহিত্যের পক্ষে মৌখিক ভাষা অপরিহার্য। দেশে কথাসাহিত্যের প্রসার যত বাড়তে লাগল, মৌখিক ভাষার আদরও ততই বাড়তে লাগল। তা ছাড়া বাংলাতে আজ-কাল অনেক বিদেশী শব্দ চলছে। এগুলো আমাদের শুধু বাচিক জীবন নয়, মানসিক জীবনের সঙ্গেও বিশেষ ভাবে জড়িয়ে গেছে। এগুলোকে বাদ দেবার উপায় নেই, আর সে চেষ্টায় ক্ষতি আছে যথেষ্ট। চলতি ভাষায় এ শব্দগুলো যেমন খাপ খায়, সাধু-ভাষায় তেমন হয় না। আবার সংস্কৃত শব্দকেও ছাড়া যায় না, তাতে ক্ষতি আরও বেশী।

তখন একটা সন্ধি-সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হল। দেখা গেল, ভাগীরথী তীরের ও কলকাতার ভদ্র সমাজের ভাষা অনেকটা সাধুভাষার কাছাকাছি আর ঐ ভাষাতে সাহিত্য রচনার চেষ্টাও হচ্ছে বহুকাল থেকে। কথাসাহিত্যে প্রচলিত হওয়ায় বাঙালীদের কাছে এ ভাষা অপরিচিতও নয়। আবার এ ভাষায় সংস্কৃত শব্দগুলো যেমন অবাধে স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে, বিদেশী গ্রাম্য ও দেশজ শব্দও তেমনি চলতে পারে। এখন এ ভাষায় বাংলার সকল জেলার সাহিত্যিকরাই কথাসাহিত্য রচনা করছেন। কেবল কথাসাহিত্য কেন, সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গও এই চলতি ভাষাতেই অতি সুন্দর ভাবে আজকাল রচনা হচ্ছে।[১০]

সাধুভাষাকে মার্জিত ভাষা বা লিখিত ভাষাও বলা হয়। বাংলা অভিধানে সাধু শব্দের অর্থ—ধার্মিক, সদ্বংশজাত, ভদ্র, সুন্দর, উত্তম ইত্যাদি। সংস্কৃত অভিধানে—উত্তম কুলোদ্ভব, কুলীন, আর্য, সভ্য, সজ্জন, চারু ইত্যাদি।

স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় পাঁচ বৎসর পর। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, পৃ ১১৪। রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, পৃ ১৩-১৫। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ ৩৬৮-৭৩।

৯ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, সং ২ পৃ ১১২।

১০ কবিশেখর কালিদাস রায়—রচনাদর্শ, পৃ ৩-৫।

বাংলা সাহিত্যিকগণ এতকাল চলতি ভাষাকে কোনরূপ আমল দেওয়া দূরে থাক, তার ছোঁয়াচ থেকে সাধুভাষার বিশুদ্ধি ও আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্যই এরূপ নাম তৈরী করেছিলেন। সাধুভাষা বলতে সাধু ভাষাই যে ভদ্র সভ্য সুন্দর ও কুলীন বুঝায়, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝায়, চলতি ভাষাটি অভদ্র অসভ্য অসুন্দর অকুলীন। চলতি ভাষার অপর নাম চলিত ভাষা, কথিত ভাষা, কথ্য ভাষা।

কামার চামার হাড়ি ডোম প্রভৃতি কথারও কোন খারাপ অর্থ নেই। কিন্তু চামারকে চামার বললে সে বিরক্ত হয়। কারণ, চামার শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে বক্তার মানসিক ভাবের যে পরিচয় আসে, বক্তার পক্ষে যতই আভিজাত্য-প্রকাশকই হোক না কেন, চামারের কাছে তা খুব সুখকর হয় না। এজন্যই এদেশের সামাজিক অভিধানে চাষা শব্দের অর্থ—বর্বর অসভ্য ইতর মূর্খ।

স্বামীজীর আগেও আরো দু একজন মনীষী চলতি ভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মত এত দৃঢ় কণ্ঠে আর কেউ বলতে সাহস করেন নি বা বলেন নি। স্বামীজীর গুরুদেব দক্ষিণেশ্বরের মহামানব রামকৃষ্ণ চলতি ভাষায়ই তাঁর অমূল্য উপদেশবাণি বলে গেছেন। তিনি জীবিত থাকতে থাকতেই সে সব কিছু কিছু পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের ধারণা ছিল, চলতি ভাষায় কখনও কোন উচ্চ বিষয় আলোচিত হতে পারে না, চলতি ভাষায় বললে বা লিখলে কখনও গাম্ভীর্য থাকে না, তাঁরা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, রামকৃষ্ণ অতি সাধারণ চলতি ভাষায় গ্রাম্য উপাখ্যানে দর্শন বেদান্তের অতি উচ্চ উচ্চ কথা অনায়াসে অবিরাম বলে যাচ্ছেন আর শ্রোতাদের মনে তা গভীর ভাবে অংকিত হয়ে যাচ্ছে।

কবিশেখর কালিদাস রায় লিখেছেন, পরমহংস-দেব চলতি ভাষাতে তাঁর কথামৃত পরিবেশন করলেন। তাতে গদ্যে চলতি ভাষা বেশ জোর পেয়ে গেল। বিবেকানন্দ প্রধানত চলতি ভাষাকেই আশ্রয় করলেন।

ভারতবর্ষ ছেড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে, ইউরোপ মণিমুক্তার বাক্সয় মাটির ঢেলা রাখে—এরকম বাক্যই তিনি বেশী লিখতেন। * * * এ ভাষা যেমন সরস তেমনি সরল ও সবল। ইহাই বাংলার নিজস্ব ঢঙ, সংস্কৃত রীতিও নয় ইংরাজী ঢঙেরও নয়।[১১]

চলতি ভাষায় গাম্ভীর্য থাকে না, চলতি ভাষায় কোন উচ্চ ভাব প্রকাশ করা যায় না। এ সব মতবাদ যে কত অসার, একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারা যায়। কঠিন উচ্চারণের কতকগুলো বড় বড় সমাসবদ্ধ কথা বললেই গাম্ভীর্য আসে আর সহজ শ্রুতিমধুর কথা বললেই গাম্ভীর্য থাকে না, এ কথার কোন যুক্তি নেই। শব্দগুলোর কষ্টকর উচ্চারণের ফলে গাম্ভীর্য আসে, না ভাবের ফলে গাম্ভীর্য আসে? ভাবের জোর নেই, চিন্তার জোর নেই, প্রকাশ করে বলবার ক্ষমতা নেই, শুধু সন্ধি সমাসের অনুপ্রাস অলংকারের কসরৎ দেখালেই গাম্ভীর্য আসে না। চলতি ভাষা বাংলার একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের কথ্য ভাষা। চলতি ভাষায় কোন উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না বলা আর চলতি বাংলা ভাষী লোকসমাজকে গালাগাল দেওয়া একই কথা। কথ্য ভাষায়ই মানুষ চিন্তা করে। যে ভাষায় উচ্চ চিন্তা করা যায়, সে ভাষায় তা লেখাও যায়। রামকৃষ্ণ কথামৃতের যে কোন একটি পৃষ্ঠা পড়ে দেখলেই একথা বুঝতে পারা যায়। আধুনিক লেখকদের অনেকেই চলতি ভাষায় অতি চমৎকার লিখছেন।

চলতি ভাষার বিরোধিতার প্রকৃত কারণ স্বল্প

১১ রচনাদর্শ, পৃ ৩১২।

রকম। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার তাঁর প্রবোধ-চন্দ্রিকাতে—কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে—এরূপ উৎকট ভাষা লিখেছেন। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন মশায় মন্তব্য করেছেন—

আজিও সংস্কৃত শাস্ত্রে পরম প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে একপাত বাঙ্গালা লিখিতে দিলে তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন, জটিল ও দুর্ব্বোধ রচনাতেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—এ কি হয়েছে। এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে! এযে অনায়াসেই বোঝা যায়![১২]

আর একটা কারণ, একবার যেটা অভ্যাস হয়ে যায় সেটাতে আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশী। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়ে গাড়ীর গরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমিয়ে পড়লেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু এর চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহংকারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করে এসেছি সেটার যে অন্যথা হতে পারে এমন কথা শুনলে রাগ হয়।[১৩]

মানব সমাজ বালকত্ব ছেড়ে যতই প্রবীণত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই সরলতার প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ছে। বাঙালী সমাজ পোষাক-পরিচ্ছদ অলংকার বাড়িঘর সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিদ্যা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই অগ্রসর হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যে কিছুদিন আগেও যে অলংকার অনুপ্রাস বিশেষণ ও সমাসের ছড়াছড়ি বিশেষ সম্মানের ছিল, বর্তমানে সে সব খুবই নিন্দনীয়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বাংলার ছোটবড় সকল সাহিত্যিকদের রচনা লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের গতি আজ কৃত্রিম আড়ম্বরতা ছেড়ে স্বাভাবিক সরলতার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। খুব অল্প কথায় সরল ভাষায় যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তিকেই আজকাল সাহিত্য মনে করা হয়।

বাংলার আলালের ঘরের দুলাল বা হুতুম পেঁচাকে যথেষ্ট তিরস্কার গঞ্জনা ও ঘৃণা সহ্য করতে হয়েছিল। স্বামীজীর লেখাও বাদ যায় নি। স্বামীজীর পর বাংলার সাহিত্যরথিগণ স্বামীজীর কথাগুলো কিভাবে সমর্থন করেছেন ও করছেন তার খানিকটা গত পৌষের উদ্বোধনে দেখিয়েছি। স্বামীজীর মতামতের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মুকুটমণি রবীন্দ্রনাথের মতামতের সাদৃশ্য দেখে বাস্তবিকই অবাক হতে হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ যদি কেউ বিস্তারিত ভাবে জানতে চান তাহলে বাংলা শব্দতত্ত্ব পুস্তকের ভূমিকায় ভাষার কথা নামক তাঁর লেখাটি পড়লেই হবে। এতবড় একটা প্রবন্ধ এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। সাধু ও চলতি বিতর্কে সবুজপত্রের সম্পাদক কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি লেখাটি লিখেছিলেন। এটি ১৩২৩ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—

চলতি ভাষা,—যেটা হচ্ছে শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথীতীরের ভদ্র সমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যেভাষা এখন বাংলাদেশে সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হয়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাংলা সাহিত্যে সাধু ভাষার এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর যে ধারা এখন সাহিত্যে চলছে সেধারা বাধা না পেয়ে চলতে থাকলে যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্য হয়ে

১২ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, ২০৭।

১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভাষার কথা, সবুজপত্র ১৩২৩।

দাঁড়াবে এখনকার 'সাধু ভাষাকে একেবারে হটিয়ে দিয়ে।'[১৪]

বর্তমান চলতি ও সাধু সাহিত্যের ধারা যাঁরা একটু লক্ষ্য করছেন তাঁরাই সুনীতি বাবুর এ উক্তি সমর্থন না করে পারবেন না। সাধু বাংলা বলে এখন যা বাংলা সাহিত্যে চলেছে, তার মালা তিলক ছাড়া বাকী সবই যে চলতি। ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম গুলো সাধুর আকারে রেখে মাঝে মাঝে দুএকটা বড় সংস্কৃত বিশেষণ বা সমাস বসিয়ে দিলেই সাধুভাষা হয় না। সংস্কৃত ও তদ্ভব ছাড়াও বহু দেশী শব্দ আছে সেগুলোকে ভাষা বা সাহিত্য থেকে বাদ দেবার কারও এখন সাধ্য নেই। এগুলো এতকাল অপাংক্তেয় ছিল। তারপর বাধ্য হয়ে কতক কতক শুদ্ধি করে এগুলোর কিছু কিছু সাহিত্যে গ্রহণ করা হয়। এই সব দেশী শব্দ ছাড়া বহু বিদেশী শব্দ আছে যেগুলোকে সাহিত্যে গ্রহণ না করে উপায় নেই। অথচ বিশুদ্ধ সাধুতে এগুলো অচল।

বিদ্যাসাগরের ভাষা বিশুদ্ধ সাধু ভাষা। বংকিম বাবুর লেখার মাঝে মাঝে চলতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কথাসাহিত্যের কথোপকথনে চলতি ভাষার প্রয়োগই আজকালকার রীতি। বংকিম বাবু কথোপকথনের ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম শব্দেও সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। বন্দেমাতরম্ ও আনন্দমঠ নিয়ে দেশে এখন নানারকম আলোচনা হচ্ছে। আনন্দমঠ খানা পড়ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল কথোপকথনের মধ্যে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামেতে জায়গায় জায়গায় তিনি খিচুড়ি করে ফেলেছেন। তারপর আরও দুএকখানা বই পড়ে দেখলুম, সেগুলোতেও মাঝে মাঝে সাধু চলতির মাখামাখি হয়ে গেছে।[১৫] একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এ দোষ বংকিমের ইচ্ছাকৃত নয়। মাতৃভাষা অজ্ঞাতসারেই তাঁর লেখায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ইহাই কি চলতি ভাষার প্রথম প্রকাশ্য বিজয়যাত্রা? বিদ্যাসাগরী ভাষায় আজকাল কেউ লেখেন না। গোঁড়া সাধুপন্থীরাও বর্তমানে সাধুর সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে অসাধুর খাদ মিশাচ্ছেন। নইলে লেখা বাজারে চলে না। অসাধু চলতি শব্দে তাঁদের আর ততটা আপত্তি নেই, যত আপত্তি শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেই।

হইবে-র জায়গায় হবে, হইতেছে-র জায়গায় হচ্ছে ব্যবহার করলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনারা যখন টিকি কাটে নি তখন টিকির খর্বতাকে তারা মানের খর্বতা বলেই মনে করত। আজ যেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়ল অমনি তারা হাঁফ ছেড়ে বলছে, আপদ গেছে। এক সময়ে ছাপার বইতে হয়েন লেখা চলত, এখন হন লিখলে কেউ বিচলিত হন না। হইবা করিবা-র আকার গেল, হইবেক করিবেক-এর ক গেল, করহ চলহ র হ কোথায়? এখন নহের জায়গায় নয় লিখলে বড় কেউ লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা কেহ লিখি, তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও তিনির বদলে তেঁহ লেখা হত। এক সময়ে আমারদিগের শব্দটা শুদ্ধ বলে গণ্য ছিল, এখন আমাদের লিখতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখতুম সেহ, এখন সেখানে লিখি সেও, অথচ পণ্ডিতের ভয়ে কেহ কে কেও বা কেউ লিখতে পারি নে। ভবিষ্যৎ বাচক করিহ শব্দটাকে করিয়ো লিখতে সংকোচ করি না, কিন্তু তার বেশী আর একটু অগ্রসর হতে সাহস হয় না।[১৬]

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে সাধনা করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর কেউ করতে পারে নি। তিনি জীবনে কত কঠোর দুরূহ সাধনা সব

১৪ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, স ২, পৃ ১০।

১৫ আনন্দমঠ ১।১০ ১।১২ ১।১৫, ইন্দিরা ৬, রজনী ১।২, মৃণালিনী ১।৬ পরিচ্ছেদ।

১৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষার কথা (বাংলা শব্দতত্ত্ব)।

করলেন আর উপদেশ দেবার জন্য কিছু সংস্কৃত অন্তত আমাদের বিশুদ্ধ সাধু ভাষাটা একটু শিখে নিতে পারতেন না? পতিত কাঙালের দেবতা রামকৃষ্ণ, দরিদ্রনারায়ণ-মন্ত্রের ঋষি রামকৃষ্ণ কেন যে অতি সাধারণ গ্রাম্য কথায় তাঁর অমৃত পরিবেশন করলেন, তাঁর শক্তি পেয়ে বাংলার অনাদৃত চলতি বাংলা কেন শক্তিমান হয়ে উঠল, তার ব্যাখ্যা আজ কাল আর না করলেও চলে।

চলতি ভাষার ধোপা নাপিত বন্ধ করে একঘরে করবার উপায় আর নেই, কারণ ধোপা নাপিত একে একে সকলেই যে চলতি ভাষার দলে নাম লিখিয়েছে। চলতি ভাষাকে অপাংক্তেয় বলবার মত গলার জোর আজকাল কোন গোঁড়া সাধুর মাঝেই দেখা যায় না। নিজের শক্তিতেই চলতি ভাষা সাহিত্যে স্থান দখল করে নিয়েছে। কেউ দয়া করে তাকে স্থান ছেড়ে দেয় নি।

বাংলা সাহিত্যের এ দুটি ভাষার মধ্যে যদি একটি অবলম্বন করতে হয়, তাহলে চলতি ভাষাকেই নিতে হবে। সাধুভাষায় কথাসাহিত্য নাটক বা বক্তৃতা হয় না। সাধু ভাষায় বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করা যায় না। শিশুসাহিত্যের শতকরা ৯৮ খানা বই আজকাল চলতি ভাষায় ছাপা হচ্ছে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বিভাগে চলতি ভাষার ক্ষমতা সাধুভাষারই তুল্য।

শিশুসাহিত্যের কথায় একটি ঘটনা মনে পড়ছে। বাংলা খবরের কাগজগুলো সাধুভাষার পক্ষপাতী। এ বিষয় তাঁদের গোঁড়া না বললেও রক্ষণশীল বলতে বাধা নেই। তাঁরা চলতি ভাষার বক্তৃতাগুলোও অশেষ পরিশ্রমের সহিত সাধুভাষায় অনুবাদ করে ছাপেন। কিন্তু সেদিন আনন্দবাজারে দেখলুম ছেলেদের জন্য স্নোহোয়াইটের গল্প (বিজ্ঞাপন নয়) বেরিয়েছে চলতি ভাষায়। বাধ্যতার চেয়ে স্বাধীনতার শক্তি বেশী, স্কুলের পাঠ্যের চেয়ে উপরি পড়ার ছাপ ছেলেদের মনে বেশী পড়ে।

চলতি ভাষা সমগ্র বাংলা সাহিত্য দখল করলে সাধুভাষার বাংলা সাহিত্যের কি গতি হবে? এ ভাবনারও কারণ নেই। দু এক বছরের মধ্যেই চলতি ভাষা সাধুকে গ্রাস করে ফেলবে না। যে ভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে এভাবেই তার গতি চলবে। আজ যেমন আমারদিগের কথাটা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য নয়, সেরকম বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের কাছে করিয়াছি যাইয়াছি কথাও দুর্বোধ্য হবে না। চলতি বাংলা বললে একথা বোঝায় না যে তাতে কোন সংস্কৃত শব্দ থাকবে না। সংস্কৃত থাকবে, আরবী পারসী ইংলিশ থাকবে আবার বহু অন্যদেশী শব্দও এসে বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধন করবে।

চলতি ভাষার ব্যাকরণ নেই। ব্যাকরণের জন্য খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। স্বাভাবিক নিয়মে উপযুক্ত সময়েই ব্যাকরণ আসবে। আজকাল বাংলা সাহিত্যে কোন কোন লেখকদের লেখায় চলতি ভাষা ব্যবহারে কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। তাতেও ভয় পাবার কারণ নেই। মাঝে মাঝে সামান্য সামান্য উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চলতি ভাষা ব্যবহার করতে না দেওয়া আর আছাড় খাবার ভয়ে হাঁটতে নিষেধ করা একই কথা।

চলতি ভাষারও ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব শব্দ আছে, ধ্বনিগত ও বর্ণবিন্যাসগত স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব বাক্যরীতি ও নানা রূঢ়ী প্রয়োগ আছে। জন্মগত ও শিক্ষাগত অধিকারে যাঁরা এগুলো পান নি, এগুলো আয়ত্ত করে নিয়ে তাঁদের চলতি ভাষায় লিখবার চেষ্টা করা উচিত। এখানেও নানা স্থূল সূক্ষ্ম নিয়মের যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে।[১৭]

স্বামী বিবেকানন্দকে জগৎ ধর্মাচার্য বলেই

১৭ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

জানে। ধর্মাচার্যগণ লৌকিক সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ হবেন, এমন কোন কথা নেই। বাংলা সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বামীজী যা যা বলেছেন, তার কিছু কিছু বা সবই যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাতে ধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের গৌরব ম্লান হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন, যে সব ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, আজ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা ও গতি দেখে একথা জোর করে বলা যায় যে স্বামীজীর কথার প্রত্যেকটি বর্ণই সত্য।

ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা—এ যুগে এবং সে যুগে

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্‌-এস্‌সি, বি-টি

অতি প্রাচীন যুগের অন্ধতমিস্রা ভেদ করিয়া জ্ঞানের ঈষৎ জ্যোতিরেখা যেদিন বর্ব্বর মানবের চক্ষুতে প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল, যেদিন প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক যুগের অজ্ঞানান্ধকার ছিন্ন করিয়া শিক্ষার ক্ষীণ আলো ইতস্ততঃবিচরণশীল, গৃহ ও সভ্যতাহীন মানবের সম্মুখে প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সেইদিন হইতে বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার অপূর্ব্ব উৎকর্ষের দিন পর্য্যন্ত জগতের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে মানবের প্রগতিপথে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। পরিলক্ষিত হইবে যে, চিরকাল ধরিয়া ধর্ম্মের বন্ধন পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য অথচ অপ্রতিহত শক্তিতে মানবের পরিবার, সমাজ, জাতি, সঙ্ঘ প্রভৃতি সমষ্টিগত অনুষ্ঠানগুলির একদিকে যেমন সৃষ্টি, পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধন সাধিত করিয়াছে—অন্যদিকে আবার তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে সংযম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন সংসাধিত করিয়া তাহাকে দিন দিন উদার হইতে উদারতর করিয়া চরমে পরমশান্তি ও অসীমশক্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছে। ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মের প্রেরণা একদিকে যেমন জগতের প্রায় সমস্ত জাতিকেই সঙ্ঘবদ্ধ হইবার পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়াছে, অন্যদিকে আবার তেমনি ব্যষ্টিগতভাবে মানবকে তাহার পশুত্বের নিম্নতম স্তর হইতে ধীরে ধীরে উন্নীত করিয়া দেবত্বের আলোকোজ্জ্বল ভূমিতে লইয়া যাইতে সহায়তা করিয়াছে।

কিন্তু কবে কিংবা কি প্রকারে যে এই ধর্ম্মপ্রেরণা মানবের অন্তরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কবে সে ধর্ম্মতরঙ্গিনীর উচ্ছল গতিবেগ প্রথম আপনার মধ্যে অনুভব করিয়াছিল সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন মতবাদ এ সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু স্থিরনিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দেহ-ভোগৈকলক্ষ্য বর্ব্বর মানব স্মরণাতীতকালে একদিন সহসা মৃত্যুর সহিত পরিচিত হইয়াছিল। নিজের সমধর্ম্মী, সমভাবাপন্ন একটি জীব যেদিন প্রথম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সজীব চঞ্চলতার রাজ্য ছাড়িয়া মৃত্যুর হিমশীতল রাজ্যে মহাপ্রস্থান করিল—ভীত চকিত হইয়া সেদিন সে প্রথম নিজেই নিজকে প্রশ্ন

করিয়াছিল,—যে গেল সে কোথায় গেল? এই-মাত্র রূপে, রসে যে ব্যক্তি জগতের দশজনেরই একজন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ কিসের অভাবে সে চিরদিনের মত নীরব হইয়া গেল—আর উঠিল না, কে তাহাকে লইয়া গেল?—কোথায় লইয়া গেল?

আবার নিজের নিতান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ-কাতরচিত্তে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যে চিন্তাসমূহ খেলা করিল তাহাই রজনীর সুপ্তাবস্থায় স্বপ্নাকারে চিত্তাকাশে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জড়জগৎ ভিন্ন আর এক জগৎ সম্বন্ধে তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিল। মৃত্যুর পরে অথবা স্থূল দেহটি ত্যাগ করিবার পরে এক উর্দ্ধতর জগতে স্থূলদেহটিরই অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ লইয়া মানব বিরাজ করে, এইরূপ একটা ধারণাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। জগতের সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিবৃত্তেই প্রেতপূজা, ভূতপূজা প্রভৃতির বিবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যদিকে আবার বহুবিধ নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হইয়া এবং উহার বিভিন্ন অঙ্গের অপূর্ব্ব বিশালতা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া তাহাদিগের উদ্দেশে ভীতিবিস্ময়যুক্ত পূজা নৈবেদ্যাদি প্রদান করিতেও সে অগ্রসর হইয়াছিল। এইরূপে অতি-প্রাচীনকালেই মৃত্যু, ভূতপ্রেত পূজা এবং নৈসর্গিক নানাদৃশ্যের উদ্দীপনা হইতে মানবের অন্তরে ধর্ম্মের অঙ্কুর প্রথম উদ্গত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, ধর্ম্মের প্রেরণা লাভ করিয়া এবং দিনে দিনে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অধিকতর পরিচিত হইয়া ক্রমশঃ মানব ইহাও বুঝিতে শিখিল যে সমষ্টির স্বার্থেই ব্যষ্টির স্বার্থ উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারে। তাই নিজের স্বার্থভাব কিছু কিছু বিসর্জ্জন দিয়া সে অপরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল। আর তাহারই ফলে উদ্ভূত হইল সমাজ, গোত্র, জাতি ইত্যাদি। ভারতের দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় বৈদিকযুগের সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবস্থাবিধান—সবকিছুই ধর্ম্মানুভূতি এবং ধর্ম্মপ্রেরণার উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "বৈদিক ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে বলীয়ান্"—তাই রাজশক্তি সহজেই ব্রাহ্মণ্যশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। মোক্ষলাভেচ্ছু, আপ্তকাম বৈদিকঋষির অনুশাসন সেদিন সমগ্র দেশ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিত। দুঃখ, অভিযোগ যে মোটেই ছিল না এমন কথা অবশ্য সত্য নহে কিন্তু অর্থনৈতিক ও চরিত্রনৈতিক অবস্থা যে বর্ত্তমান সময় হইতে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠতর ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। আবার পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগেও দেখিতে পাই ভগবান্ বুদ্ধের অনুশাসন অবলম্বন করিয়া সম্রাট্ চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোক নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই মহারাজ বিম্বিসার, কনিষ্ক প্রভৃতি তদানীন্তন ভারতের সম্রাট্গণ বিরাট রাজ্যের গঠন ও শাসনাদি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্তর্জ্জাতিক মিলনের সূচনা হইয়াছিল—ভগবান্ বুদ্ধের জীবনী ও বাণীরূপ জীবন্ত ধর্ম্মাদর্শে অনুপ্রাণিত শ্রমণগণ কর্ত্তৃকই তাহা সাধিত হইয়াছিল। সুদূর গ্রীস, ইতালী, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলাভূমি—ঋষি ভারতের সঙ্গলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিল। ভারতের মনীষী কুমারজীব, মাহিন্দ, সঙ্ঘমিত্রা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর অতীশ প্রভৃতি ধর্ম্মচক্রাভিযান চালিত করিয়াছিলেন। এই "মহামানবের সাগরতীরে" মহামানবতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর পবিত্র পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবেই ভারতের গৌরব—মৌর্য্যশিল্প ও গুপ্ত-সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। একধারে নালন্দা, তক্ষশীলা, অন্যধারে অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি আজও বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তি প্রচার করিতেছে। জাতির সেই

নবজাগরণে কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি বৈদেশিক বাণিজ্য, কি চারুশিল্প, কি সাহিত্য, কি ধর্ম্ম সর্ব্বভাবেই ভারতে এক নবযুগ সূচিত হইয়াছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও ধরিত্রীর গহ্বরে আজ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

আবার ঐকালে ভগবান্ কংফুচ্ ও লাওৎজের ধর্ম্মপ্রভাবে কিরূপে বিশাল কিন্তু বিক্ষিপ্ত চীন জাতির মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হইল তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অন্যদিকে দুর্দ্ধর্ষ, যাযাবর বেদুইন জাতির ক্রমোন্নতির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। দয়া, মায়া, সংযম প্রভৃতি উচ্চবৃত্তির সংস্পর্শমাত্র বিবর্জ্জিত নগ্ন বেদুইনগণ সেদিন দেহের ভোগকেই একমাত্র কাম্য জানিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যদৃচ্ছা বিচরণ করিত। "বেদুইনের দেহ, মন, প্রাণ কাহারও নিকট আবদ্ধ নহে"—এই সূত্রকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকার্য্য নিয়মিত করিতে অগ্রসর সেদিনকার বেদুইনগণের কার্য্যকলাপের বিবরণ ঐতিহাসিক-মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু কালে ধর্ম্মের অপ্রতিহতশক্তি হজরৎ মহম্মদকে অবলম্বন করিয়া এই দুর্দ্ধর্ষ জাতিকেই সঙ্ঘবদ্ধ করিল এবং কিঞ্চিন্ন্যূন একশত বৎসরের মধ্যে এই অসভ্যজাতি ধর্ম্মের তীব্র প্রেরণায় পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিল। ইস্লামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকাবাহী অমিততেজা এই সেনাদল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া জগতে মহাক্ষমতাশালী 'মুসলমান' জাতি নামে অভিহিত হইল। এই ইস্লামেরই চরম পরিণতি "সারাসেন্" সভ্যতায়।

ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় সংঘটিত ইউরোপখণ্ডের ক্রুশেড্ অভিযান সমূহের কথা ইতিহাসের ছাত্র-মাত্রেই অবগত আছেন। টিউটন্, কেল্টিক্, স্লাভন্, হিউজিনট্ প্রভৃতি বহুপ্রকারের রক্তের সংমিশ্রণে উদ্ভূত ইউরোপ ও আমেরিকার বহুজাতি বহুকাল পর্য্যন্ত স্বার্থপরতার নানাবিধ বিচ্ছেদকারী শক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া যে একতা বন্ধনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল তাহা শুধু ধর্ম্মের শক্তিতেই সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। জাতিগত স্বার্থ ও ভৌগোলিক বিভাগজনিত দূরত্বকে তুচ্ছ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের অপূর্ব্বশক্তি এই সমস্ত জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত যদি ল্যাপ্ল্যাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে প্যাটাগনিয়া মরুভূমির অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত—সমস্ত জাতি কাঁহারো নামে কখনো একযোগে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তবে সে নাম প্রেমাবতার ঈশার ভিন্ন অন্য কাঁহারও নহে। আবার নব্যমন্ত্রে জাগরিত জাপান আজ যে শক্তি ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারও মূলীভূত কারণ ছিল ধর্ম্মপ্রেরণা। 'শিন্তো ধর্ম্ম' তাহার মধ্যে অনন্য-সুলভ দেশপ্রীতি জাগাইয়াছিল। রাজশক্তির একান্ত আনুগত্য বোধ সৃষ্টি করিয়াছিল। আর বৌদ্ধধর্ম্মের 'ক্ষণবাদ' জাগতিক সব কিছুর অস্থায়িত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাহার নয়ন হইতে মায়া অঞ্জন মুছাইয়া দিতে প্রযত্ন করিয়াছিল।

শুধু সুসভ্য জাতিসমূহের মধ্যেই যে ধর্ম্মের অপ্রতিহত শক্তি একতা আনয়ন করিয়াছে তাহা নহে, অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য জাতি-সমূহের মধ্যেও ঐ প্রেরণা নানাপ্রকার অবান্তর ভূত, প্রেতপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অতীতে যাহা ছিল আজ আর ঠিক সেই জিনিষটি সেই রূপটি লইয়া বাঁচিয়া নাই।

দিনে দিনে মানবের সভ্যতা ও নীতির গতিপথ একদিক হইতে অন্যদিকে প্রবাহিত হইয়া তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা ও বিশ্বাসে প্রভূত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে।

যে ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রেরণা স্মরণাতীতকাল হইতেই মানবের জীবনে ও সভ্যতায় গভীর প্রভাব

বিস্তার করিয়া আসিতেছিল—ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল যুবকমন বিবিধ কারণ হেতু ধর্ম্মের সে প্রভাব স্বীকার করিয়া লইবার কিছুমাত্র প্রেরণা বোধ করিতেছে না। জাতির জীবন-পথে ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন সত্যই আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কতটুকু বর্ত্তমান যুগের তাহাই এক প্রবল সমস্যা।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, যেদিন বিজ্ঞানের প্রভূত উৎকর্ষ বলে প্রকৃতির উপর মানব তাহার অধিকার স্থাপনে সক্ষম হইয়া স্থান ও কালের দূরত্ব অনেকাংশে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল সেই দিন হইতে এ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—সেইদিন হইতেই ধর্ম্মের অনুশাসনসমূহ বিদ্যালয়ের উপযোগী হিতোপদেশরূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হইতে সুরু করিয়াছে। বস্তুতঃ একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে মধ্যযুগের ইউরোপ আর বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এক জিনিষ নহে। তদানীন্তন ইউরোপের একচ্ছত্র সম্রাট 'রোমের পোপ'—যাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে, অনাবৃত আকাশতলে প্রবল প্রতাপ রাজ্যেশ্বরকেও বদ্ধপাণি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল—তিনি আজ নামে মাত্র পর্য্যবসিত। অতীতের কঙ্কাল আজ কেবল শক্তিমান্ মন্ত্রিত্বের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্রে রূপান্তরিত। আজ মস্কো হইতে ডাব্‌লিন্, ডাব্‌লিন্ হইতে ম্যাড্রিড্ এবং ম্যাড্রিড্ হইতে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত যদি ঘুরিয়া আসি তবে নিঃসংশয়ে প্রতীত হইবে যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের নীতিকথাসমূহ গীর্জ্জার পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে, বাইবেলের মরক্কো আবরণের অন্তরালে নিশ্চিন্ত আলস্যে নিদ্রামগ্ন আর তাহার পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া দুর্দ্দমশক্তিতে মস্তকোত্তলন করিয়াছে দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রবল মতবাদ। একটি সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) ও তাহারই প্রতিরূপ ফ্যাসিজম্ এবং আর একটি সোসিয়ালিজম্ এবং তাহারই অত্যুগ্ররূপ কমিউনিজম্। কার্লমার্ক ও ক্রুপট্‌কিন্ আজ ইউরোপের—তথা সমগ্র জগতের চিন্তাক্ষেত্রে বিপুল আন্দোলন আনয়ন করিয়াছে। সাধারণতন্ত্রপরিচালিত রুষ ধর্ম্মকে "জাতির আফিম" (Opium of the race) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ট্রট্‌স্কি, লেনিন্, রাসেল্ প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষিগণ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা এককালে অস্বীকার করিয়াছেন। মুসোলিনী, হিট্‌লার, ষ্টেলিন প্রভৃতি অনন্যাধীন নিয়ন্তৃগণ যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য বর্ত্তমান জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর তাহা আর যাহাই হউক—ধর্ম্মের প্রেরণা নহে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স সম্বন্ধেও মোটামুটিভাবে ঐ কথাই প্রযোজ্য। স্পেনে আজ মহা বিপ্লব চলিতেছে—যদি ফ্রাঙ্কো (Franco)-বাহিনী স্পেনের অধিকার প্রাপ্ত হয় তবে সেখানেও সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ফ্যাসিজম্ প্রবর্ত্তিত হইবে এবং ধর্ম্ম নিতান্ত গৌণ একটি স্থান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। তুরস্কের জাতীয়তার পুরোহিত কামাল আতাতুর্ক আজ চিরাচরিত ইস্‌লামের অনুশাসন ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য প্রথায় জাতির সংগঠনে যত্নবান। এই সেদিন পর্য্যন্তও অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক জীবন বহু জটিলতায় সমাচ্ছন্ন ছিল। জার্ম্মানী তাহাকে গ্রাস করিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিবে অথবা ফরাসী ও ইটালির অভিপ্রায়ানুযায়ী সে স্বাধীনই থাকিবে এবং আর্ক ডিউক্ বেলজিয়াম্ হইতে আসিয়া অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবেন—এই সব দারুণ সমস্যা ইউরোপের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। আজ সে সমস্যার সমাধান হইয়াছে। জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়াকে স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছে। দেবতা বা ধর্ম্ম লইয়া মাথা ঘামাইবার সেখানে কাহারও অবসর আছে বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।

আবার এশিয়া ভূখণ্ডেও ইতিমধ্যে কম পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। দূরপ্রাচীর একপ্রান্ত হইতে নিকটপ্রাচীর আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের খরস্রোত বহিয়া যাইতেছে। ল্যাফ্‌ক্যাডু হার্ন (Lafcadio Hearn) যেদিন জাপানের বর্ণবহুল সুদৃশ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন সেদিনের জাপান আজও কি আর তেমনটিই আছে? তাহার সে সহজ, অনাড়ম্বর ও সাবলীল জীবনে যে সব চিন্তাধারা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল আজও কি তাহারা তেমন ভাবেই ক্রিয়াশীল আছে? ইউরোপীয় সভ্যতার ও প্রগতির উজানস্রোত কোন বাহিনী হইয়া চলিয়াছে এ তত্ত্বটি যেদিন জাপান আবিষ্কার করিল সেইদিন হইতেই তাহার জাতীয় জীবনে ধর্ম্ম ও নীতিশাসন গৌণস্থান লাভ করিল। আধুনিক জাপানের উগ্র সামরিক মনোভাব ইউরোপীয় আবহাওয়ারই সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। মিকাডো এখনো দেবপ্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হ'ন, প্যাগোডা এখনো সে দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে সত্য কিন্তু জাতীয় চিন্তাকেন্দ্র আজ স্থানত্যাগ করিয়াছে। কারখানার চক্রঘূর্ণন ও কামানের আলোড়নকারী ক্ষমতার সহিত আজ তাহার সমষ্টিমনের উঠানামা চলিতেছে। উত্তর চীনে তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখিতে পাইতেছি। চীনে ও প্রাচীনযুগের লাওৎজে এবং কংফুচের প্রভাব কতটা আছে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন, নবজাগ্রত যুবক-চীন যে প্রেরণা ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমানে মাথা তুলিতে চাহিতেছে তাহার মূলে ধর্ম্ম-প্রেরণা যে খুব বেশী খোরাক জোগাইতেছে এমন ধারণা করিবার হেতু নাই। ইরান, আফগানিস্থান ও আরব প্রভৃতি দেশেও আজ ধর্ম্মের স্থান জাতীয় শোভাযাত্রার পুরোভাগে নহে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক সমস্যা বর্ত্তমান যুগের প্রত্যেক মনীষী মাত্রেরই চিন্তাক্ষেত্র সম্পূর্ণ দখল করিয়া বসিয়া আছে সুতরাং সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব এখনো নিঃশব্দে ক্রিয়াশীল থাকিলেও—যাঁহাদের চিন্তাধারা কালক্রমে অনুসৃত হইয়া গণমনকে আবিষ্ট ও প্রভাবান্বিত করিবে সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ হয় ধর্ম্মবিরোধী, নয় সে বিষয়ে এককালে উদাসীন।

এমন কি ভারতবর্ষ—যে দেশ স্মরণাতীত কাল হইতেই ধর্ম্মকে তাহার জাতীয় জীবনের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া কালের নিঃসীম যাত্রাপথে চলিয়াছে সেখানেও এ চিন্তার ঢেউ আসিয়াছে। গভীর ক্ষোভের সহিত আধুনিক শিক্ষিত তরুণমন উপলব্ধি করিতেছে যে ধর্ম্মের নামে হীন, নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক কলহ আজ ভারতের আকাশ বাতাসকে কলুষিত করিয়াছে—গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও শুধু অতীতনিবদ্ধদৃষ্টি ধর্ম্মের পতাকাবাহী বহু সম্প্রদায়কে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থিরূপে পরিণত করিয়াছে। তাই পাশ্চাত্য-ভাবভাবিত, প্রগতিপন্থী যুবকদল আজ ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের ক্ষীণদৃষ্টি যতদূর অবধি দেখিতে পায় তাহাতে এইটিই মনে হয় যে সম্প্রদায়গত, সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলী শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশঃই তাহাদের প্রভাব হারাইতে বসিয়াছে। অগ্রগতিশীল, যুক্তিপূর্ণ বর্ত্তমান যুগমন—অতীতনিবদ্ধদৃষ্টি, আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রানুগামী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে সুরু করিয়াছে সুতরাং দূরভবিষ্যতে ইহাদের কিরূপ পরিণতি ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়।

তবে একথা খুবই সত্য এবং ইহা আমাদের খুব গভীর ভাবেই মনে হয় যে সম্প্রদায়গত ধর্ম্ম-মণ্ডলীর যেরূপ পরিবর্ত্তনই ভবিষ্যতে ঘটুক, তাহাদের উপযোগিতা থাকুক আর নাই থাকুক—

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা মানব চিরকালই স্বীকার করিবে—ধর্ম্মের সংজ্ঞা হয়ত পরিবর্ত্তিত হইবে, আচার অনুষ্ঠান ও অর্থহীন গোঁড়ামির গ্লানি দূর হইয়া একটা যুক্তিসহ, বিজ্ঞানানুমোদিত ধর্ম্ম হয়ত সৃষ্ট হইবে কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মভাব মানবজীবন হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না। কেন যে তাহা পারিবে না তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বিচিত্র সংস্কার, বিচিত্র চিন্তাধারা এবং বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পুঁজি লইয়া মানব একদিন ধরিত্রীর ক্রোড়ে প্রথম পদার্পণ করে। দিনে দিনে তাহার বুদ্ধির বিকাশ হয়, দিনে দিনে প্রবৃত্তির সহস্র জিহ্বা লেলিহান বহ্নিশিখার মত সহস্রদিকে প্রসারিত হইয়া তাহাকে নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতে প্রলুব্ধ করে। একটির উপভোগ শেষ না হইতেই আর একটির বাসনা জাগে, আবার সেটি শেষ না হইতেই তৃতীয়টি আসিয়া দেখা দেয়। ধীরে ধীরে মানব উপলব্ধি করে যে, "মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি।" ধীরে ধীরে সে ধারণা করে যে, ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় দুরন্ত বাসনাজাল "ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে" এবং অনেক দুর্ভোগ ভুগিবার পর তবেই সে বুঝিতে শিখে যে আশা যায় কিন্তু তৃষ্ণা মিটে না, শক্তি শ্লথ হইয়া আসে কিন্তু বাসনার তীব্র বহ্নি অন্তরকে দগ্ধ করিতে এতটুকু নিবৃত্ত হয় না। আর সেই অবস্থায়ই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে—"এ পরমদুঃখের শেষ সত্যই কোথাও আছে কিনা।" ঊর্দ্ধরেতা, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি এই চিরন্তর প্রশ্নের উত্তরে বহু প্রাচীনকালে একদিন উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই।

'Religion is a process of being and becoming'—স্বামী বিবেকানন্দ এই কথা বলিতেন। মানবের মধ্যে লুক্কায়িত যে শক্তি সুপ্তভাবে অবজ্ঞাত হইতেছে তাহাকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত ও বিকশিত করিয়া যথার্থ শুভ ও কল্যাণময় কার্য্যের পথে পরিচালিত করিবার যে দুরারোহ বন্ধুর পথ তাহাই বস্তুতঃ ধর্ম্মের পথ, নিজ অন্তরটিকে বিশাল হইতে বিশালতর করিয়া স্নেহ, প্রেম ও পবিত্রতায় তাহাকে মহিমান্বিত করিয়া দেশের ও দশের সেবায় নিয়োজিত করিবার যে প্রয়োজনীয়তা তাহাই ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আর দিনের শেষে কর্ম্মক্লান্ত দেহটিকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি মহামায়ার কোলে সঁপিয়া দিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিবার যে পরম সুখ—তাহাই ধর্ম্মের সুখ।

'Purity, unselfishness and self-control these are the whole of religion.'—আর জীবনের যে কোন ক্ষেত্রের দিকেই দৃষ্টিপাত করি, যে কোন মহাপুরুষের জীবনী লইয়াই পর্য্যালোচনা করি, পবিত্রতা, সংযম নিঃস্বার্থপরতা ও একাগ্রতার অমোঘ শক্তি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

* * * *

ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, কলা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি অনেক কিছুর সমষ্টি লইয়াই একটা জাতির জীবন গঠিত। আবার বিভিন্ন ব্যক্তিতে যেমন বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন সংস্কারের তারতম্যে একজন মানুষ স্বতঃই আর একজন হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়,—অথচ একে অপরের গুণাবলী হইতে হয়ত এককালে বঞ্চিত নহে—জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা সর্ব্বাংশে প্রযোজ্য। জার্ম্মান্ জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য, ক্ষুদ্র জার্ম্মানশিশু যেদিন বিদ্যারম্ভ করে সেইদিন হইতেই তাহার সহিত সে পরিচিত হয় এবং যেদিন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয় সেদিন সে একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের ছাপ লইয়া

বাহির হয়। ফরাসী, জার্ম্মানী, ইংরাজ, ইতালীয়, জাপানী প্রভৃতি সমস্ত জাতিই ঠিক ঐ একভাবে গড়িয়া উঠে। তাই প্রত্যেক জাতিই শিক্ষা ও সভ্যতার প্রত্যেকটি অঙ্গ আয়ত্ত করিবে সত্য কিন্তু তাহাদের বিকাশের ধারা হইবে তাহাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আর ধর্ম্মই ভারতের সেই বৈশিষ্ট্যের ধারা। এই ধর্ম্মের জন্য তাহাকে নানাপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে,—হয়ত বা তাহার বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য অতিরিক্ত ধর্ম্মানুগত্যবোধও অনেকাংশে দায়ী কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ভারত কখনো লাভ লোকসানের বাটখারায় ওজন করিয়া অনুভব করে নাই। ভারতের মৃত্তিকা, ভারতের জলবায়ু স্বতঃই তাহাকে ঈশ্বর, অবতার ও পরকালে বিশ্বাসী করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের শিশু জন্ম হইতেই সর্ব্বত্যাগী—শঙ্করকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া পথ চলিতে অভ্যস্ত। সংস্কারগত ভাবেই হউক আর ভূয়োদর্শনের ফলেই হউক—ভারত চিরকাল স্বীকার করিয়াছে যে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুর অনুশীলন হইতে ধর্ম্মের অনুশীলন শ্রেষ্ঠতর। কারণ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ যদি মানবের এক একটা দিকের উৎকর্ষ মাত্র হয় তবে ধর্ম্মের উৎকর্ষ মানব মনের সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ বলিয়া ধরিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন,—"বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করা আনন্দকর সন্দেহ নাই কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি বিজয় তদপেক্ষাও আনন্দকর। যে নিয়মাধীনে গ্রহতারাসমূহ প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে—সে নিয়ম জ্ঞাত হওয়া উত্তম সন্দেহ নাই কিন্তু যে নিয়মাবলী মানবের বিচিত্র মনোভাব বিচিত্র সঙ্কল্প এবং রিপুর অদ্ভুত ক্রিয়াসমূহকে নিয়মিত করিতেছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া আরও উত্তম। এইরূপে মানবের অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা, মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুহ্য সঙ্কল্প বিকল্পাদি সম্বন্ধে সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সেই প্রচণ্ড প্রেরণা যাহা চিরকাল মানবকে তাহার জন্মগত ও স্বভাবগত অন্তর্নিহিত বিপুলশক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত করে এবং সে শক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে।"

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দূরভবিষ্যৎদৃষ্টিসম্পন্ন, শক্তিমান্ সে মনীষী ধর্ম্মের গতিশীল (Dynamic) রূপটি বেদান্তের 'অভীঃ' মন্ত্র সহায়ে ভারতের প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, খুঁটিনাটি অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান, এবং শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কালের যাত্রার বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকা সাধারণ ধর্ম্মজীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই একটা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, যুক্তিসহ ও জীবন্ত ধর্ম্মাদর্শ—যাহা যুগের দ্রুত অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া পথ চলিতে সক্ষম—তিনি প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেবালয়ের ও শাস্ত্রের কঠিন আবরণ ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের অনাবিল মর্ম্ম-কথাটিকে বাহির করিয়া আনিয়া মানবের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি কাজে তাহাকে নিয়োগ করিবার ব্রতই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপ্তকাম মনীষীর সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও সুমহান্ ব্রত ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আজ তাই জাতির সর্ব্ব অঙ্গে জাগরণের নবচেতনা ও উদ্বুদ্ধ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। গতিশীল ধর্ম্ম (Dynamic Religion) কী তীব্র ও ব্যাপক শক্তি ধারণ করে এবং তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা কতদূর প্রসারী মহাত্মা গান্ধীর জীবন সহায়ে আজ সমগ্র সভ্যজগৎ তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাই, ভরসা হয়, সুদূর অতীতে একদা ভারতের জয়যাত্রা যেমন ধর্ম্ম পথেই সুরু হইয়াছিল অনাগত ভাবীকালেও তাহার বিজয়শকট হয়ত সেই পথেই চলিতে থাকিবে। ধর্ম্মের গ্লানি দূরীভূত হইয়া তাহার অম্লান ও ক্রিয়াশীল রূপ আবার পরিস্ফুট হইবে, ধর্ম্মের নামে

সংঘটিত সাম্প্রদায়িক কলহাদি ঝটিকা নিবৃত্তির পূর্ব্বক্ষণের শেষ আলোড়নের ন্যায় অচিরে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আর অধিক কিছু আমাদের বলিবার নাই। এক কথায় আমাদের বক্তব্যের সারাংশ যদি বলিতে হয় তবে বলিব—জাতীয় জীবনে বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের যে আত্যন্তিক প্রয়োজন, সমষ্টির দিক দিয়া তাহাই ধর্ম্মের প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইঁহাদের মত সর্ব্বতোমুখী বিশাল চরিত্রের যে শক্তি ও উপকারিতা তাহাই ধর্ম্মের পরমশক্তি ও চরম উপকারিতা।

ধরিত্রীর বুকে মানব যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্য তাহাকে বিচলিত করিবেই, জগতের বিচিত্র প্রাঙ্গণ জুড়িয়া যতদিন মানুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিবেই এবং অন্তঃ-প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৃত্তিনিচয়ের সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা সে নতমস্তকে স্বীকার করিবেই। যে কোন শব্দ বা সংজ্ঞাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, যে কোন ভাবেই উহাকে আমরা গ্রহণ করিনা কেন—ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য কিন্তু চিরকাল অব্যাহত থাকিবে। সংযম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ-পরতা, ত্যাগ, ভালবাসা প্রভৃতি ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি চিরকালই মানবের জীবন ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠ শোভা ও সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। চিরকালই ভারতের কবি নির্জ্জন বনতলে বসিয়া, আপনাতে আপনি ডুবিয়া গাহিবেন—

—"শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র যতো দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে;
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্যপথ নাহি।"*

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

নচিকেতা

(কঠোপনিষৎ)

উদয়ন

কালের সীমান্ত হতে জীবন প্রবাহে অবিশ্রান্ত গতি
আত্মহারা ভুলি আপনারে রুদ্ধশ্বাসে আসিলাম ছুটি।
লক্ষ্য কোন্ খানে নাহি জানি, নাহি জানি কতদূরে কূল
মৃত্যুপতি, দুঃখযাত্রা এই সাঙ্গ কর, ভেঙ্গে দাও ভুল।

যেথা নাই ব্যর্থ আড়ম্বর ক্লান্তি ঘেরা ভ্রান্ত কোলাহল
যেথা শূন্য মিথ্যার আঘাতে, সত্য কভু হয় না চঞ্চল—
প্রাণ আজি স্থিতি চাহে সেথা আদিহীন অন্তশূন্য জ্ঞানে
এই ভিক্ষা দেহ শুধু মোরে মৃত্যুপারে শাশ্বত জীবনে।

বহুবার জীবনে জীবনে চুমিয়াছে পৃথিবীর আলো
বহুস্নেহে বহু আকর্ষণে প্রেমে মোরে বাঁধিয়া রাখিল।
বহু যত্নভরে বহুমত সাজালেম কত খেলাঘর
অবশেষে মিলায়ে দিলেম ভাঙ্গি সব মহাশূন্যপর।

দূর দূর হতে কোন্ যেন কলরব আসিছে ভাসিয়া
অতীতের সাথী সবে মিলি ডাকে বুঝি মোরে প্রতীক্ষিয়া।
ফিরিবার নাহি আর পথ চলিয়া এসেছি বহু দূরে
পুঞ্জীভূত তৃপ্তিহীন জ্বালা বক্ষে শুধু গুমরিয়া মরে।

আজি লয়ে নব সম্ভাবনা নবীন প্রভাত পুনরায়!
অবহেলে ব্যর্থ খেলা খেলে আর তারে দিব না বিদায়।
রবিকরে ধরণী উপরে কার যেন ছায়া দেখিয়াছি
মন্দ সমীরণে আজি যেন বাণী কার স্পষ্ট শুনিয়াছি।

আর নহে আর নহে খেলা ওরে মোর মূঢ় ভ্রান্ত ছেলে
যুগ যুগান্তের ক্রীড়নক আজি সব দেরে ছুঁড়ে ফেলে।
বিত্ত বাঞ্ছা কান্তা অশ্ব বাহ স্বর্গ মর্ত্ত্য নরক পাতাল
তুচ্ছ হোক্ রহুক ভাস্বর আজি শুধু সত্য অচঞ্চল।

যেই আশা নাহি নিভে কভু মুহূর্ত্তের চঞ্চল ফুৎকারে
যেই প্রেম নাহি পায় লয় প্রলয়ের রুদ্র হাহাকারে—
যায় যদি নিঃশেষে সকলি নিভে যাক্ পৃথিবীর আলো
নাহি ক্ষোভ আজ মৃত্যুরাজ, চিরন্তন সেই আশা জ্বালো।

গহন গহ্বরে গূঢ় অমৃতের লাগি আমি মর্ত্ত্যবাসী
হইনু উন্মাদ আজি জীবন-উষায় সাজিয়া সন্ন্যাসী।
যত মায়া সব থাক পিছে, হে আচার্য্য আজি এ মিনতি
মৃত্যুজয় মম দৃঢ় পণ, এই বর মাগি মৃত্যুপতি।

শ্রাদ্ধ

স্বামী গিরিজানন্দ

হিন্দুদর্শনপ্রণেতা অধিকাংশ ঋষিই ব্রহ্ম, জীব ও পরকাল সম্বন্ধে একমত। মানুষ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন আবার স্বকৃত কর্ম্মফলে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। জীবের স্বকৃত কর্ম্মই তাহার জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ প্রভৃতির কারণ।

মানুষ যদি স্বকর্ম্মার্জ্জিত কর্ম্মফলানুসারে সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক ভোগ করে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের সার্থকতা কি? শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম মৃত ব্যক্তির স্বকৃত কর্ম্ম নয়, ইহা পুত্রাদিকৃত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম দ্বারা মৃত ব্যক্তির কল্যাণ হয় কিনা তাহাই বিচার্য্য। শ্রাদ্ধে নিবেদিত পিণ্ডাদি (অন্ন) পিতৃ-পিতামহের কোন কল্যাণ সাধন বা সন্তোষ উৎপাদন করে কিনা সে সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিগ্ধ হইয়াও সামাজিক কারণে বাধ্য হইয়া শ্রাদ্ধ করেন।

চার্ব্বাক মুনি শ্রাদ্ধের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'যদি মর্ত্ত্যে দত্ত পিণ্ডাদি স্বর্গ-নরকগত পিতৃ-পিতামহের তৃপ্তি সাধন করে, তাহা হইলে অতি নিকটবর্ত্তী মর্ত্ত্যের যে কোন স্থানে কেহ প্রবাসী হইলে গৃহে তৎপত্নী বা পুত্রেরা তাহার উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদন করিলেই তাহার বুভুক্ষা দূর হইবে, তাহার জন্য পাথেয় দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বাস্তব জগতে ইহা যেমন প্রবাসীর কোন কল্যাণে আইসে না, পরলোকের সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে।'

উত্তরে বলিতে হয়, আমি যাহা দেখি না বা বুঝি না তাহাই যে জগতে নাই বা হইতে পারে না, ইহা বালকের অভিমত। বালককে যেমন বুঝান যায় না যে, ক্ষুদ্র সোণার থালার মত প্রত্যক্ষদৃষ্ট সূর্য্য পৃথিবী হইতে বহু লক্ষ গুণ বড়, সেইরূপ কুতার্কিককে অদৃষ্ট পদার্থের সত্তা বুঝান বিশেষ কষ্টসাধ্য। কলেরা যক্ষা প্রভৃতি রোগজীবাণু যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলেও জীবাণুবিদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়, সেইরূপ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন আমরা অনেক জিনিষ দেখি না বা বুঝি না বলিয়াই যে সেই সকল জিনিষ নাই, একথা বলা চলে না। এতদিন আমরা জানিতাম, বৃক্ষ জড়বস্তু কিন্তু বর্ত্তমানে আর ইহাকে জড়বস্তু বলা চলে না, এখন উহা চেতন পদার্থ। বৃদ্ধ মনু বলিয়া গিয়াছেন,—

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ॥" ১।৪৯।

'বৃক্ষাদি কর্ম্মের হেতুভূত তমোগুণ দ্বারা বহুরূপে আবৃত রহিয়াছে বটে কিন্তু ইহাদের বোধশক্তি ভিতরে রহিয়াছে, ইহারা সুখ দুঃখ অনুভব করে।'

আজ যদি বৈজ্ঞানিক বসু মহাশয় বৃক্ষের প্রাণশক্তি প্রমাণ না করিতেন, তাহা হইলে কেহ কি কখনো বৃদ্ধ মনুর কথা মানিতেন? অথবা বেদে যে জীবাত্মার কর্ম্মফলে বৃক্ষাদি রূপপ্রাপ্তির কথা আছে—"স্থাণুমন্যে অনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্" (কঠ ২।২।৭), ইহা কেহ কি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন? তাই স্বীকার করিতে হয়, আমি যাহা বুঝি না বা দেখি না তাহাই মিথ্যা বলা যায় না।

বর্ত্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিতেছি। সাধারণের জ্ঞান হইতে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান যেমন শ্রেষ্ঠ, স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের জ্ঞান হইতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদের জ্ঞান তেমনি শ্রেষ্ঠ। হিন্দুশাস্ত্র এই

অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদের অনুভূত মতবাদের উপর স্থাপিত। ব্রহ্মের বিরাটত্ব, আত্মার অমরত্ব, জীবের কর্ম্মফলভোগ কোন্ শাস্ত্র উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে? ইহুদী, খৃষ্টান্, মুসলমান সকলেই মৃতের পুনরুত্থান (resurrection) স্বীকার মূলে কর্ম্মফল মানেন। পরলোক তাঁহাদের মতেও আছে। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, "বেহস্ত ও দোজকে" জীবের গতি হয়। ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেও উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুদের মত মৃতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা, শাস্ত্রপাঠ ও ভোজনাদি সকল ধর্ম্মেই আছে। মুসলমানেরা মৃত্যুর ৪০ দিনের মধ্যে প্রেতের উদ্দেশ্যে কোরান শরিফ পাঠ, নমাজ ও মৌলবীদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহাতে পরলোকগত আত্মা তৃপ্তিলাভ করেন। হিন্দুদের মধ্যে পিতৃদেবগণের উদ্দেশ্য প্রার্থনা ও অন্নাদি নিবেদন হয় এবং পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান হয়। উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই এক।

পিতৃলোক দেবলোকবিশেষ এবং পিতৃগণ এক প্রকার দেববিশেষ :—

"বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচ্যা লোকবিশ্রুতাঃ॥
৩।১৯৫ মনু।

সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণান্তু সুকালিনঃ॥৩।১৯৭।
অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ॥"
৩।১৯৯।

'বিরাটের পুত্র সোমসদগণ সাধ্যগণের পিতৃগণ এবং অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি মরীচিপুত্রেরা দেবগণের পিতৃগণ। ব্রাহ্মণের পিতৃগণ সোমপা, ক্ষত্রিয়ের পিতৃগণ হবির্ভুজ, বৈশ্যের পিতৃগণ আজ্যপা ও শূদ্রদিগের পিতৃগণ সুকালিন হয়েন। অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হির্ষদ, অগ্নিষ্বাত্ত ও সৌম্য প্রভৃতি পিতৃগণও দ্বিজাতিদিগের পিতৃগণ হয়েন।'

অনেকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সময় অগ্নিদগ্ধ অনগ্নিদগ্ধ প্রভৃতি মন্ত্র শুনিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পিতৃপুরুষ যাঁহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইয়াছে অথবা যাঁহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় নাই (অর্থাৎ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিংবা মাটীতে প্রোথিত করা হইয়াছে) তাঁহাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়া হইতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে। অগ্নিদগ্ধ মানে পিতৃদেবতাবিশেষ, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে পিতৃদেবগণের নিকট প্রার্থনার কোন সার্থকতা আছে কিনা এবং পিণ্ডদানাদি পিতৃ-পিতামহের নিকট পৌছায় কিনা? উত্তরে বলিতে হয়, যদি মানুষের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌছায়, তাহা হইলে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মানুষের প্রার্থনা নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিকট পৌছায়। শব্দ যেমন বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া অতিদূরে ক্ষণমধ্যে নীত হয়, সেইরূপ চিন্তাতরঙ্গগুলিও মুহূর্ত্তে জগতে ছড়াইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকরা যেমন শব্দতরঙ্গগুলি ধারণ করিতে পারেন, সেইরূপ অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন দেবতারা মানবের চিন্তারাশি অনুভব করেন। সেই জন্যই যজ্ঞাদিতে প্রার্থনা ফলোপধায়ক হয়। জৈমিনি মুনি বলেন, যজ্ঞকালে উচ্চারিত মন্ত্র ও ধ্যান (শব্দ ও ভাবনা) উভয় মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব জিনিষ সৃষ্টি করিয়া যজমানের পরম কল্যাণ সাধন করে। শব্দ ও চিন্তার প্রভাব অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায়, চিন্তা প্রবাহ এক স্থানে যখন হইতেছে, ঠিক সেই সময়েই অপর স্থানে উহার তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং ইহা সত্য যে, শব্দ এবং চিন্তা অতি সত্বর দূরে নীত হয় এবং বৈজ্ঞানিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বা দেবতারা উহা অনুভব

করিতে পারেন। বারদীর ব্রহ্মচারী প্রমুখ যোগীরা বহুদূরের সংবাদ বলিতে পারিতেন। কাশীর শ্যামাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় কাশীতে বসিয়া তাঁহার উপরওয়ালা সাহেবের বিলাতস্থ মেম সাহেবের অসুখের সঠিক সংবাদ দিতেন। সূক্ষ্মদর্শী মানবের যাহা সাধ্য, দেবগণের পক্ষে তাহা অসাধ্য হইবে কেন? তাই ভক্তিভাবে শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত প্রার্থনা ও দান দেবগণ ও পিতৃগণের গ্রহণীয় হয়। তাঁহাদের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ যজমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কল্যাণ সাধন করে। মনোবিদ্ যেমন মনোভাব বুঝেন, দেবতারা তেমনি প্রার্থনা অনুভব ও ভক্তের মঙ্গল সাধন করেন।

শ্রাদ্ধ জিনিষটাও ঠিক তাই। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য দান ও প্রার্থনা পরলোকগত পিতা পিতামহের কল্যাণের জন্য। দূরে খবর পাঠাইতে হইলে যেমন টেলিগ্রাফ্ অফিসের মারফৎ আমরা পাঠাই, সেইরূপ প্রেতের (মৃতের) উদ্দেশ্যে কিছু করিতে হইলে পিতৃগণের মারফৎ করিতে হয়। সূক্ষ্মশরীরী পিতৃগণ উক্ত দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ বহন করিয়া প্রেতের নিকট লইয়া যান ও প্রেতের সন্তোষসাধন করেন। যেমন কলিকাতা ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের কোন একখানা চেক্ বিলাতের ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে দাখিল করিলে টাকা পাওয়া যায়, এই ব্যাপারটাও ঠিক তাহাই। টাকা বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতে হয় না, ক্ষুদ্র চেক্ খানিই টাকার প্রতীক।

আজকাল প্রেতাত্মবাদী (Spiritualist) মৃতব্যক্তিদের প্রেতাহ্বান করিতেছেন ও তাঁহাদের দ্বারা সময় সময় নানা গুহ্য কথা জানিয়া লইতেছেন। ইহাতে আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রমাণিত হইতেছে। মৃতের আত্মা শেষবিচারের দিন বা কিয়ামৎ না আসা পর্য্যন্ত কবরের নীচে পড়িয়া থাকিবেন এ মত অনেকেই সমীচীন বোধ করিতেছেন না। স্পিরিট আনয়নে যেমন মধ্যস্থের (medium) আবশ্যক হয় পুত্রকৃত সৎকর্ম্মের ফল মৃত-আত্মার নিকট পৌঁছাইবার জন্য সেইরূপ পিতৃগণকে মধ্যস্থ মানা হয়। সূক্ষ্ম আত্মার নিকট সূক্ষ্ম-শরীরী পিতৃগণের যাতায়াতই সম্ভব। তাই বেদে দেবগণের নিকট প্রার্থনায় দেখা যায়—

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।"
(১৮ ঈশোপনিষৎ)।

এই মন্ত্রে অগ্নিকে মধ্যস্থ করিয়া প্রেতকে (মৃতের আত্মাকে) শোভন পথদিয়া লইয়া যাইবার এবং তাহার পাপক্ষালনের জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

"ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদান অনুদ্যাবা পৃথিবী
আততংথ।" (১৯।৫৪ যজু)।

'হে সোম (চন্দ্র), আপনি পিতৃগণের সংবাদ জানেন—পৃথিবী এবং দ্যুলোকের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখেন।' এই মন্ত্রে সোমকে মধ্যস্থ করা হইতেছে।

"যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদিতাঃ
সর্ব্বাং স্তামগ্ন আবহ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।"
(১৭।২।৩৪ অথর্ব্ব)।

'যে সমস্ত পিতৃপুরুষদের প্রোথিত করিয়া হইয়াছে, যাঁহাদিগকে জলে ভাসান হইয়াছে, যাঁহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়াছে, হে পিতৃগণ, আপনারা তাঁহাদের এই যজ্ঞে হবিঃ গ্রহণের জন্য লইয়া আসুন।'

এখানে পিতৃ পিতামহদের আত্মাকে পিণ্ড-গ্রহণের জন্য আহ্বানার্থ পিতৃগণকে প্রার্থনা করা হইতেছে।

শাস্ত্রে দুইটী পথের কথা আছে, দেবযান ও পিতৃযান। গীতায় আছে—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥"৮।২৬।

বেদেও আছে—

"দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত
মর্ত্ত্যানাম্।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং
মাতরং চ॥" (যজু)।

'আমি মর্ত্ত্যলোকবাসীদের জন্য দুইটী রাস্তার কথা শুনিয়াছি, একটী পিতৃযান, অপরটী দেবযান। স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা এই দুইটী পথেই যাতায়াত করেন।' সুতরাং পিতৃলোক দেবলোকবিশেষ এবং পিতৃগণ দেবগণবিশেষ। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই দেববিশেষের নিকট আমরা পিতা ও পিতামহ প্রভৃতির পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধে প্রার্থনা করিয়া থাকি। গীতায় আছে—"পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ" অর্থাৎ যাঁহারা পিতৃগণের পূজা করেন তাঁহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। সুতরাং শ্রাদ্ধ করিলে যে শুধু পিতৃপুরুষের কল্যাণ হয়, তাহা নয়, নিজেরও কল্যাণ হয়। পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া যজমানকে পিতৃলোক প্রাপ্ত করান।

যদি কেহ বলেন, কাহারো পিতার মৃত্যুর পর তিনি যদি পশুযোনি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে কি করিয়া পুত্রকৃত পিণ্ডাদি তাঁহার সন্তোষ উৎপন্ন করিবে? বেদে চন্দ্রমাকে মধ্যস্থ মানিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধনের কথা উল্লেখ আছে—

"ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদান অনুদ্যাবা পৃথিবী
আততংথ।" (১৯।৫৪ যজু)।

এই মন্ত্রার্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সোম দেবতাকে মধ্যস্থ করিয়া পিতৃদেবগণের আবাহনও হবি প্রাপ্তির জন্য। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা বনস্পতির বৃদ্ধি হয়, গাছপালার পুষ্টিকারক চন্দ্রমা পশু-আত্মার খাদ্য পুষ্টি করিয়া তাহাকে উহা প্রাপ্ত করাইবেন। পুত্রদত্ত ঘৃত অন্ন প্রভৃতির সূক্ষ্মাংশ চন্দ্রমার কিরণসম্পাতে পশুযোনিপ্রাপ্ত পিতার খাদ্যে প্রবিষ্ট হইবে ও তদ্দ্বারা তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিবে। অন্নের পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্মাংশ পশুখাদ্যের পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্মাংশে একীভূত হইবে।

যদি কেহ বলেন, ইহা বিশ্বাস হয় না, তাহা হইলে বলিব, হিন্দুশাস্ত্রে চারিপ্রকার প্রমাণ মধ্যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমানকে নিকৃষ্ট বলিয়া মানিয়াছেন, কেবল আগমপ্রমাণকে শঙ্করাচার্য্য শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন। দশজন বালক দূরে একটা জিনিষ দেখিয়া বলিল উহা কি? একজন বলিল, উহা বৃক্ষ; একজন বলিল, না উহা একখণ্ড কাষ্ঠ, যখন জিনিষটী নিকটতর হইল তখন কেহ বলিল, উহা কোন মানুষ, পরে একজন বলিল, ওরে ও আমাদের শ্যাম, অপরজন বলিল, না ঘোষেদের বাড়ীর কানু, অপরে বলিল, দেখিস না উহার দাড়ি রহিয়াছে, উনি আমাদের ঠাকুর বাড়ীর বড় জেঠা মহাশয়। এখন কথা এই যে, এতগুলি লোকের প্রত্যক্ষ কি করিয়া ঠিক হইবে? কাহার প্রত্যক্ষ সত্য মানিব? যখন প্রত্যক্ষে এত ভুল হয়, তখন প্রত্যক্ষ বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা যখন জীবাণু পরীক্ষা হয়, তখন নানা জনে নানা রূপ বলেন। কেহ কত কি জীবাণু দেখিলেন কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় অনেকে ভুল করিয়াছেন। চর্ম্মচক্ষুও যেমন ভুল করে, অনুবীক্ষণ সাহায্যেও তেমনি ভুল হইয়া থাকে। কাজেই প্রত্যক্ষের মূল্য খুব বেশী নয়। শঙ্করাচার্য্য প্রত্যক্ষে এত ভুল বুঝিয়া অনুমান ও উপমানকে একেবারেই আমল দেন নাই। আমরা যেমন বৈজ্ঞানিকের মত অভ্রান্ত বলিয়া মানি, ব্যবহারিক জগতের পক্ষে শঙ্কর তেমনি পারলৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিদের দর্শনকে (বেদকে) শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মানিয়াছেন। এইমত উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, বিচারপ্রিয় শঙ্কর কূট-তার্কিক বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে এই মতকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বমত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। এখনো ভারতীয় পণ্ডিতগণ

নির্ব্বিচারে তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। বালক সূর্য্যকে সুবর্ণ থালার মত ক্ষুদ্র বলিলে বা প্রত্যক্ষ দেখিলেও সূর্য্য প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতে কোটী কোটী গুণ যে বড় একথা সে সহজে মানে না। ইহকালসর্ব্বস্বের পরলোকসম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধে জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন —"দার্শনিকদের জ্ঞানের বাহিরে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা তাঁহারা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই।" বাস্তবিক স্থূলবিষয় গ্রহণকারী আমাদের মন বুদ্ধি সূক্ষ্মবস্তু গ্রহণ ও ধারণে প্রকৃত পক্ষে অক্ষম বলিয়াই আমরা ঋষিদের জ্ঞানলভ্য সত্য অনুধাবন করিতে পারি না।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উদ্দেশ্যে পুত্রকৃত কর্ম্মফল যে তিনি প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। যযাতি নবমের যজ্ঞদ্বারা পিতা নহুষের প্রেতশরীর নষ্ট করিয়াছিলেন। পরলোকগত পিতার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক হবিষ্যান্নভোজী হইয়া এবং ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া বহু সদ্ব্রাহ্মণ ভোজন, দান যজ্ঞ, প্রার্থনা প্রভৃতি করার ফলে পিতার ঊর্দ্ধগতি হয়।

আমি একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি। ময়মনসিংহ সদর থানার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত তাঁহার মৃত পিতা এবং মাতাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সভয়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে সূক্ষ্মদেহধারী পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি গয়াধামে গিয়ে পিণ্ডদান করে উদ্ধার কর।" তাঁহার পিসা মহাশয়ও অখিল বাবুর পরলোকগত পিতাকে দেখিয়াছিলেন। প্রেতাত্মা তাঁহার নিকটও ঐরূপ পিণ্ড প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অখিলবাবুর পিতা তাঁহার ভগ্নিপতির নিকটও পিণ্ডদানের আবেদন করিয়াছিলেন। ভগ্নিপতি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'পূর্ণ, তুমি মৃত্যুকালে বলেছিলে যে তোমার খাটের নীচে ভূগর্ভে কিছু টাকা আছে, কিন্তু ঐ টাকা আমরা পেলাম না। ঐ টাকা কে নিয়েছে?" প্রেত বলিয়াছিলেন, 'এখন তা বলে আর লাভ নেই। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে কোন লাভ দেখতে পাচ্ছি না। যা পরহস্তগত হয়েছে তার জন্য দুঃখ করে কোন ফল নেই। তার একটা উপায় কর।" অর্থাৎ পিণ্ডদানের ব্যবস্থা কর। অখিলবাবু গয়ায় যাইয়া পিতার পিণ্ডদান করার পর হইতে আর ঐ প্রেতাত্মা কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মৃত্যুর পর পিতার আত্মা সন্তোষ লাভের জন্য পুত্রাদির নিকট তীর্থদর্শন, দান, পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম কামনা করেন। মাতাপিতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার নিবেদনকেই শ্রাদ্ধ বলে। তাই বেদ বলেন—

"শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।"

(৮৷৯৷১ অথর্ব্ব)

"সত্যঞ্চ মে শ্রদ্ধা চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্।"

(১৮৷৫ যজু)।

'শ্রদ্ধাদ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত হয় শ্রদ্ধাদ্বারা হবি হুত হয়।'

'সত্য এবং শ্রদ্ধা যজ্ঞে কল্পিত হয়।'

প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে কোন পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠিত হউক না কেন উহা মৃতের উদ্দেশ্যে হইলেই শ্রাদ্ধ শব্দে অভিহিত হইবে। মৃতের উদ্দেশ্যে বাইবেল, কোরান, জেন্দাবেস্তা পাঠ, মৃতের আত্মার তৃপ্তির জন্য দরিদ্র মৌলবী কিংবা ব্রাহ্মণ ভোজন, যাহাই করা হউক না কেন সকল কার্য্যকেই শ্রাদ্ধ শব্দে অভিহিত করা যায়। সৎলোক ভোজন করাইলে পুণ্য হয়, কেননা তাঁহারা ভোজন ও দানাদি গ্রহণ করিয়া পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাই ধার্ম্মিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা। অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে সে বেশী অধর্ম্মাচরণ করিবে সুতরাং তৎকৃত পাপ দাতাকে

স্পর্শ করিবে ও পরলোকগত প্রেতাত্মাকে উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত না করাইয়া অধঃপাতিত করিবে। এজন্ত শাস্ত্র খুব সাবধান হইতে বলিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,

"ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
পিত্রে কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ ॥"
(৩।১৪৯ মনু)।

'দৈবকর্ম্মে ব্রাহ্মণের গুণপরীক্ষার আবশ্যক হয় না কিন্তু পিতৃকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে।'

"যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলর্ষ্টয়োগুড়ান্ ॥"
(৩।১৩৩ মনু)।

'অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে যত গ্রাস অন্ন ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা ততগুলি শূলর্ষ্টি নামক তপ্তলৌহ পিণ্ড পরলোকে ভোজন করেন।'

আবার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রশংসা করিতেছেন—

"সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচা যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ ॥"
(৩।৩১৩১ মনু)।

'শ্রাদ্ধে দশলক্ষ বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ভোজনে যে ফল হয়, একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনে সেই ফল হয়।'

সেইজন্ম মনু শ্রাদ্ধে বহুব্রাহ্মণ ভোজন করান নিষেধ করিয়াছেন—

"দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্রবা।
ভোজয়েৎ সু-সমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥"
(৩।১২৫)।

"সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্ ॥"
(৩।১২৬)।

'দৈব কার্য্যে দুই এবং পিতৃকার্য্যে তিন অথবা উভয় কার্য্যে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অবস্থা সচ্ছল হইলেও বেশী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে না। ব্রাহ্মণ বেশী হইলে সকলের উপযুক্ত সৎকার হয় না, অভ্যর্থনা ও বসাইবার যথোপযুক্ত স্থানাভাব হয়, যথা কালে ভোজন করান যায় না, দ্রব্যাদি শুদ্ধভাবে প্রস্তুত হয় না, আর জ্ঞানী গুণী ব্রাহ্মণও পাওয়া যায় না, এই জন্য ব্রাহ্মণ বাহুল্যে অগ্রসর হইবে না।'

"একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পৈত্রে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি ॥"(৩।১২৯)।

'দৈবে কিংবা পিতৃ কার্য্যে একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অবেদজ্ঞও বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ ভোজনের তুল্য ফল লাভ হয় না।' ব্রাহ্মণকে সুখাদ্য খাওয়াইতে বলা হইয়াছে, মাংস পর্য্যন্ত—

"ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।
হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীনি চ ॥"
(৩।২১৭)।

মহাভারতে ও মনুতে নিন্দিত, পতিত, অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভোজনের নিষেধমূলক বহু শ্লোক আছে। বাহুল্য ভয়ে শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া তাৎপর্য্য লিখিতেছি—

'শ্রাদ্ধে মিত্র ভোজন করাইবে না কিংবা শ্রাদ্ধের অন্নাদি লৌকিকতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না' (৩।১৩৯ মনু)। 'শ্রাদ্ধে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাইলে মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, বিদ্যাগুরু বা দীক্ষাগুরু, দৌহিত্র, জামাতা, পিসার পুত্র বা মেসোর পুত্র, পুরোহিত, ভাগিনেয় ও যজ্ঞকর্ত্তা এই দশ জনকে ভোজন করাইবে' (৩।১৪৮ মনু)। 'চোর, পাতকী, নপুংসক, নাস্তিক, জটাধারী বা মুণ্ডিত মুণ্ড ব্রহ্মচারী, অবেদজ্ঞ, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহু যাজনশীল, চিকিৎসক, দেবল (যাঁহারা দেবপূজা দ্বারা প্রতিপালিত), মাংসবিক্রেতা, বাণিজ্যকারী, রাজকর্ম্মচারী নট বা গায়ক, ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যিনি বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন কিংবা যিনি বেতন দিয়া বেদ পড়িয়াছেন, গৃহদাহকারী, বিষ প্রদানকারী, জারজ, মিথ্যাসাক্ষ্যদানকারী, কুষ্ঠী, মদ্যপায়ী, উন্মত্ত, অন্ধ, মৃগীরোগী, ধবলরোগী, নক্ষত্রবিদ্যাদ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা-দাতা, দৌত্যকর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।' মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের শ্রাদ্ধ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

আমরা শ্রাদ্ধে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পরলোকগত পিতার এবং নিজের অকল্যাণ করি। মনু বলিতেছেন,—

"যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা বপ্তা ন লভতে ফলম্।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্ ॥"(৩।১৪২)।

'উষর ভূমিতে বীজ বপন যেমন নিরর্থক, অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে হবিদান তেমনি নিরর্থক।'

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

"ইদম্" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিবচনটি অক্ষর ধরিয়া পাঠ না করিয়া অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—

(খ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্বচঃ ॥ ১৯

অন্বয়—ইদম্ সর্ব্বম্ সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়কম্ সৎ এব আসীৎ, নামরূপে ন আস্তাম্ ইতি আরুণেঃ বচঃ।

অর্থ—প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয়রূপ সৎকারণই ছিল, নামরূপ ছিল না। ইহাই আরুণির বচন।

টীকা—"আরুণিঃ" - অরুণ নামক ঋষির পুত্র আরুণি বা উদ্দালক। শ্বেতকেতু নামক পুত্রের প্রতি পিতা উদ্দালকের বচন। (ছান্দোগ্য উপ, ৬।২।১)।

উক্ত শ্রুতিবচনে যে 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা এই তিনটি শব্দ দ্বারা, সদ্‌বস্তুতে সম্ভাবিত স্বগতাদিভেদত্রয় নিবারণ করিবার জন্য। (এই প্রকরণে প্রথম শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। লোকব্যবহারে যে উক্ত তিনটি ভেদ আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন -

(গ) ব্যবহারে স্বগতাদি তিনপ্রকার ভেদের নির্ণয়।

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ
শিলাদিতঃ ॥ ২০

অন্বয়—বৃক্ষস্য পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ স্বগতঃ ভেদঃ (ভবতি), বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি), শিলাদিতঃ (বিজাতীয়ঃ ভেদঃ) ভবতি।

অর্থ—বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বীর যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। সেই বৃক্ষে অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ তাহার নাম সজাতীয় ভেদ; আর শিলা প্রভৃতি হইতে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ।

টীকা—পরস্পর অভাবের নাম ভেদ; ভেদ দ্বারা পৃথক্‌করণ সাধিত হয়। যেমন ঘট ও পটে একে অপরের অভাব। তন্মধ্যে তাহারা পরস্পর ভেদের আশ্রয় বা অনুযোগী হইতে পারে এবং পরস্পর ভেদের নিরূপক বা প্রতিযোগী হইতে পারে। একটি অনুযোগী হইলে অপরটি প্রতিযোগী।

'স্বগত' শব্দের অর্থ অবয়ব বা অঙ্গ। তদ্দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন কোনও শূদ্রের আপনার হস্তপাদাদি অঙ্গ হইতে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ; শূদ্রান্তর হইতে অর্থাৎ সমানজাতিবিশিষ্টের দ্বারা কৃত যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ; ব্রাহ্মণাদি হইতে অর্থাৎ বিরুদ্ধ-জাতিবিশিষ্টের দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ।

এইরূপে অনাত্ম বস্তুতে তিনটি ভেদ থাকে, ইহা বুঝাইলেন; সদ্বস্তুতেও অর্থাৎ আত্মাতেও সেই তিনটি ভেদের থাকিবার সম্ভাবনা। শ্রুতি 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটি পদ দ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন :—

(ঘ) সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত ভেদত্রয়ের নিবারণ।

তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ॥২১

অন্বয়—তথা সদ্বস্তুনঃ প্রাপ্তম্ ভেদত্রয়ম্ ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈঃ ত্রিভিঃ ক্রমাৎ নিবার্য্যতে।

অর্থ—সেইরূপ সদ্বস্তুতেও উক্ত তিন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, এই হেতু শ্রুতি, 'একত্ব', 'অবধারণ' (নিশ্চয়) এবং দ্বৈতের 'নিষেধ'বোধক, যথাক্রমে 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিন পদ দ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন।

সদ্বস্তুসম্বন্ধে স্বগত ভেদের আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেননা সেই সদ্বস্তু নিরবয়ব, এই কথাই বলিতেছেন—

(ঙ) সদ্বস্তুতে স্বগতভেদের খণ্ডন।

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥২২

অন্বয়—সতঃ অবয়বাঃ ন শঙ্ক্যাঃ, তদংশস্য অনিরূপণাৎ ; নামরূপে তস্য অংশৌ ন (ভবতঃ), তয়োঃ অদ্য অপি অনুদ্ভবাৎ।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর স্বগত ভেদ বা অবয়ব আছে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেননা তাহার অংশ হইতে পারে, এইরূপ নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। আর নাম ও রূপ এই দুইটি তাহার অংশ নহে, কেননা সেই দুইটি আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎপন্নই হয় নাই।

টীকা—সদ্বস্তুর যে অবয়ব থাকিতে পারে না, তাহা দেখাইতেছি। সদ্বস্তু যদি জড় হইত, তবে সাবয়ব হইতে পারিত। আর সদ্বস্তুকে যদি জড় বলা যায়, তবে তাহা জড় বলিয়া বিনাশী হইবেই, কেননা দেখা যায় যাহাই জড় তাহাই বিনাশী, যেমন ঘট, পট। এইরূপ অনুমাণপ্রমাণ দ্বারা সদ্বস্তু বিনাশী হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার আর সদ্রূপতা থাকে না, অসদ্রূপতা আসিয়া পড়ে। এইহেতু সদ্বস্তু জড় নহে তাহা চেতন।

আবার যদি সেই চেতনরূপ সদ্বস্তুকেই সাবয়ব বল, তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই সদ্বস্তুর অবয়ব চেতন বা অচেতন (বা জড)? যদি বল চেতন, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহা সেই সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি তাহাকে ভিন্ন বল, তবে অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে, আর যদি বল, সেই অবয়ব সদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে সেই সদ্বস্তুর সহিত তাহার অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি সেই অবয়বকে অচেতন বা জড বল, তাহা হইলে সেই জড় অবয়ব দ্বারা বিরচিত সেই সদ্বস্তুও জড হইবে, কেননা নিয়ম রহিয়াছে—"কারণগুণাঃ হি কার্য্যগুণান্ আরভন্তে"—কারণের গুণ দ্বারাই কার্য্যের গুণ নিরূপিত হয়, জড় সূত্রের দ্বারা জড় বস্ত্র বিরচিত হয়; তাহা কখন চেতন হইতে পারে না।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা সেই জড় "সদ্বস্তুর" বিনাশিত্বই আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে তাহা আর সদ্রূপ থাকে না। এই হেতু সদ্বস্তুর অবয়ব আছে, এরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে তাহাকে 'সৎ' এই নাম দিয়া অভিহিত করা হইতেছে, তাহা হইলে 'তাহার নাম নাই'—ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) তদুত্তরে বলি এই নাম ব্যবহার-সাধনের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে মাত্র। আর তাহার যে রূপ নাই, একথা শ্রুতি "অস্থূল","অনণু", "অহ্রস্ব", "অদীর্ঘ" ইত্যাদি পদ দ্বারা জানাইতেছেন।

নাম ও রূপ সদ্বস্তুর অবয়ব কেন হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই দুইটি, সদ্বস্তুর অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না, কেননা সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই দুইটি আদৌ ছিল না। এই কথাই বলিতেছেন—'আর নাম ও রূপ এই দুইটি ছিল না।' ভাল, নাম ও রূপ ছিল না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃপুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিবংশং যথা বিয়ৎ ॥২৩

অন্বয়—নামরূপোদ্ভবস্য এব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ

পুরা তয়োঃ উদ্ভবঃ ন, তস্মাৎ যথা বিয়ৎ তথা সৎ (ব্রহ্ম) নিরংশম্ ভবতি।

অনুবাদ—আর নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি; সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপের উৎপত্তি অসম্ভব; সেইহেতু আকাশের স্থায় সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) নিরবয়ব (অংশ রহিত)।

টীকা—(সৃষ্টির পূর্ব্বে) নাম রূপের উৎপত্তি হয় নাই। ফলিতার্থ বলিতেছেন—"সেই হেতু" ইত্যাদি। এস্থলে এইরূপ অনুমান হইবে—সদ্বস্তু (পক্ষ) অবশ্যই স্বগতভেদশূন্ত (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা; যে হেতু তাহা নিরবয়ব (হেতু)। আকাশের স্থায় (দৃষ্টান্ত)।

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম নাম ও রূপ সদ্বস্তুর অবয়ব নহে। 'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ'—কেন সেই সদ্বস্তুর অবয়ব হইবে না?

(সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' এই তিনটি পরস্পর ভিন্ন নহে; কেননা 'সৎ' যদি চিৎ ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তবে জড় ও দুঃখরূপ হইয়া পড়ে, (জড় ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য), সুতরাং 'সৎ' অসৎ হইয়া পড়ে। আবার 'চিৎ' যদি সৎ ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অসৎ ও দুঃখরূপ হওয়াতে জড় হইয়া পড়ে। আবার 'আনন্দ' যদি সৎ ও চিৎ হইতে ভিন্ন হয়, তবে অসৎ ও জড় হওয়াতে তাহা দুঃখরূপ হইয়া পড়ে। এই হেতু সৎ, চিৎ, আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে: সেই সদ্বস্তু বা ব্রহ্ম, 'সৎ' অর্থাৎ দেশকালাদির দ্বারা অবাধিত,—পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহে; তাহাই চিৎ বা অলুপ্তপ্রকাশ এবং তাহাই আনন্দ বা পরিচ্ছেদরূপ দুঃখসম্বন্ধরহিত। এইরূপে সেই 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' সেই সদ্বস্তু ব্রহ্মের স্বরূপই, গুণ বা অবয়ব নহে। এই হেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব।২৩

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম সদ্বস্তুতে স্বগতভেদ নাই; সজাতীয় ভেদ কেন থাকিবে না? (উত্তর) এইরূপ আশঙ্কা করিলে সেই সদ্বস্তুর সজাতীয় অন্য সদ্বস্তুর নাম করিতে হইবে। সেইরূপ অন্য সদ্বস্তু কিন্তু আর পাওয়া যায় না। কেননা সদ্বস্তুর বৈলক্ষণ্য হয় না। (তাহাতে ভেদজ্ঞাপক কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না।) এই কথাই বলিতেছেন:—

৬। সদ্বস্তুতে সজাতীয় ভেদ নাই।

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা॥২

অন্বয়—সজাতীয়ম্ সদন্তরম্ ন (ভবতি); বৈলক্ষণ্য-বর্জ্জনাৎ। নামরূপোপাধিভেদম্ বিনা সতঃ ভিদা ন এব।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর সমানজাতীয় অন্য সদ্বস্তু নাই, কেননা সদ্বস্তুতে বিলক্ষণতা (ব্যক্তিগত ভেদ) নাই। 'নাম' ও 'রূপ' নামক যে উপাধি, তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ (ভেদব্যবহার) হয় না।

টীকা—(গুরু) যদি সদ্বস্তু নানা হইত, তাহা হইলে সদ্বস্তুর সজাতীয় অন্য সদ্বস্তু হইত।

(শিষ্য) আচ্ছা, যে সদ্বস্তুর নানাত্বের কথা বলিতেছেন, সেই সদ্বস্তু যে বাস্তব, তাহার প্রমাণ কি? আগে সেই সদ্বস্তু যে কল্পিত নহে, তাহা যে বাস্তব, তাহাই সিদ্ধ হউক, পরে তাহার নানাত্ব-একত্বের বিচার হইবে।

(গুরু) তুমি নিজের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় কর না; এক্ষণে সেই সদ্বস্তুকে বাস্তব বলিয়া না মানিলে, তোমার কথা (নিজের বাস্তবতা বিষয়ে সংশয়), "আমার মাতা বন্ধ্যা" এই বাক্যের স্থায় প্রলাপসদৃশ হইবে। এক্ষণে সেই সদ্বস্তুকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সেই 'নানা' সদ্বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বলিবে বা

ব্যাপক বলিবে ? যদি তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বল, তবে সেই পরিচ্ছেদ বা অন্ত, দেশ অথবা কাল অথবা বস্বন্তর দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে, তাহার উৎপত্তি ও নাশ মানিতে হয় ; তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে এবং তাহা আর সৎ থাকে না, অসৎ হইয়া পড়ে। আর যদি তাহাকে ব্যাপক অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পবিচ্ছেদ-বহিত বলিয়া মান, তাহা হইলে তাহাব নানাত্ব সম্ভবপব হয় না ; (কেননা পবিচ্ছিন্নতা শব্দেব অর্থ ই, দেশ, কাল, বস্তু দ্বাবা বিবিধরূপতা ।)

(শিষ্য) ভাল, এই বেদান্তশাস্ত্রেই ত পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক ভেদে তিন প্রকার 'সদ্বস্তু' স্বীকৃত হইয়াছে ; তবে কি প্রকারে বলিলেন, সদ্বস্তুতে নানাত্ব নাই।

(গুরু) সে স্থলেও একই পারমার্থিক সদ্বস্তু, ভ্রান্তিবশতঃ ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক রূপে প্রতীত হয়। যেমন একই রাজশক্তি ভ্রান্তিবশতঃ তদাশ্রিত মন্ত্রিশক্তিরূপে এবং মন্ত্রীব আশ্রিত রাজ-পুরুষের শক্তিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ একই পারমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক ঘটাদির সত্তারূপে এবং প্রতিভাসিক স্বাপ্নবস্তু প্রভৃতির সত্তারূপে, স্ফটিকে জবাপুষ্পের লাল রঙেব মতো অন্যথাখ্যাতি* বশতঃ অথবা সর্পের সহিত রজ্জুর তাদাত্ম্য সম্বন্ধের ন্যায় সংসর্গাধ্যাস † দ্বারা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি ‡ বশতঃ প্রতীত হয়। এইহেতু সদ্বস্তুর নানাত্ব নাই, সেইহেতু স্বজাতীয় অন্য সদ্বস্তুও নাই। এই কারণে সদ্বস্তু স্বজাতীয়ভেদরহিত।

এইরূপ নির্ণয় মনে রাখিয়া টীকাকার শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

টীকা—ভাল, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটসত্তা প্রতীত হয় ; পট রহিয়াছে, এইরূপে পটসত্তা প্রতীত হয়। এইরূপে সকল বস্তুতেই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, এইরূপে সদ্বস্তুর ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান জন্য বলিতেছেন—যেমন ঘটাকাশ, মঠা-কাশ ইত্যাদিরূপে আকাশের ভেদ নামরূপময় উপাধিকৃত, সেইরূপ সদ্বস্তুর ভেদও নামরূপময় উপাধিকৃত ; স্বরূপতঃসিদ্ধ ভেদ প্রতীত হয় না। এই কথাই বলিতেছেন—নাম ও রূপ নামক যে উপাধি তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ প্রতীত হয় না। এস্থলে এইরূপ অনুমান রহিয়াছে—সদ্বস্তু অবশ্যই স্বজাতীয়ভেদরহিত (প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু উপাধিব ভেদ গ্রহণ না করিলে ভেদের প্রতীতি হয় না (হেতু), যেমন আকাশ (উদাহরণ)। ২৪

* তদভাববতি তৎপ্রকারকজ্ঞানম্। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তদ্রূপের ভান অন্যথাখ্যাতি।

† যেমন মুখের সহিত দর্পণে কোন সম্বন্ধই নাই, আর দুইটি পদার্থই ব্যবহারিক। সে স্থলে দর্পণে মুখের যে সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধটী অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের জ্ঞানকে সংসর্গাধ্যাস বলে।

‡ যে অধ্যস্ত পদার্থকে সৎ বলিয়া, অসৎ বলিয়া, কিম্বা সদসৎ বলিয়া নির্ব্বাচিত করা যায় না, তাহারই প্রতীতির নাম অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি।

সংবাদ

বেদান্ত সমিতি, লণ্ডন—অধ্যক্ষ স্বামী অব্যক্তানন্দ গত ৩০শে জুলাই বেদান্ত ও যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। গত ৩১শে জুলাই পূর্ব্বাহ্নে ধ্যান এবং অপরাহ্নে বেদান্তসার ও পতঞ্জলির যোগসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঐ দিন সমিতির সভ্যদিগকে তিনি ধ্যান শিক্ষা দিয়াছেন। গত ১৪ই আগষ্ট স্বামীজী গীতা ও বিবেকচূড়ামণি সম্বন্ধে দুইটী ক্লাস করিয়াছেন।

বেদান্ত সমিতি, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কো—অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ গত জুলাই মাসে প্রতি সপ্তাহে রবিবার ও বুধবার সেঞ্চুরী ক্লাবে ও বেদান্ত সমিতিতে দুইটী করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শুক্রবার বেদান্ত সম্বন্ধে ক্লাস করিয়াছেন ও সমিতির সভ্যদিগকে ধ্যান শিক্ষা দিয়াছেন। গ্রীষ্ম উপলক্ষে আগষ্ট মাসে সমিতির ক্লাস বন্ধ থাকিবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি রবিবার ও বুধবার স্বামীজী নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিবেন :—"আত্মার প্রকৃতি উৎপত্তি ও ভবিষ্যৎ", "কর্ম্মের আইন", "যোগ ও পাশ্চাত্য মন", "ভারতের গূঢ়শিক্ষা", "আত্মার নিভৃত কক্ষ," "অস্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক মন," "আধ্যাত্মিক জীবনের কৌশল"।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয়, বেলুড় মঠ—এই বিদ্যালয়ের ১৯৩৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—শিল্প বিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগ, যথা—কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ ও দর্জ্জির কাজ। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা মোট ৬২। ইহার মধ্যে ২৫ জন ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে স্থান লাভ করিয়াছিল।

ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষার সাহায্যকল্পে বিদ্যালয়ে একটী পুস্তকালয় আছে। অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ছাত্রকেই কিছু কিছু কৃষিবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ছাত্রাবাসের ছাত্রগণকে সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা, সঙ্গীত, খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে।

এই বৎসরের মোট আয় ১১০০৬৲ এবং মোট ব্যয় ৬২৭৩৬৯ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি—১৯৩৭ সালে সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের চত্বারিংশত্তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯১৪ খৃঃ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পর্য্যন্ত আশ্রমে গৃহীত ৪০টী বালকের মধ্যে ৩৩টী যথোচিত শিক্ষা লাভ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রমে ৭টী বালক আছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা হইতেছে।

আশ্রম কর্ত্তৃক দুইটী অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ৬২ ও ৩১। আশ্রমের ডাক্তারখানা হইতে এই বৎসর ১৮২৮২ জন রোগী চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্রমে একটী পুস্তকালয় আছে। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ২০০০। এই বৎসর বহু দরিদ্র পরিবারকে সাময়িকভাবে কাপড়, চাউল ও টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৯২৭৸/১৫ সহ এ বৎসরের মোট আয় ৮৪৫৫/৭॥ এবং মোট ব্যয় ৬৯৯৫৷১২॥।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থিভবন. গৌরীপুর, দমদম, (কলিকাতা)— রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থিভবনের ১৯৩৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৩৭ সালের শেষে বিদ্যার্থিভবনে মোট ৪০ জন ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ২৫ জন ফ্রি ও ১০ আংশিক ফ্রি। এই বৎসর বিদ্যার্থিভবনের ৯ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছাত্র রসায়ন বিদ্যায় এম্-এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে, একজন এম্-বি পরীক্ষা এবং অবশিষ্ট ৭ জন আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আশ্রমে ছাত্রদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য নিয়মিত ভাবে পাঠ আলোচনা এবং কালীপূজা সরস্বতীপূজা প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যেক শনিবারে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনাদি করে। ছাত্রদের দ্বারা একখানা হাতেলেখা মাসিকপত্রিকা পরিচালিত হয়। রান্নার কাজ ভিন্ন অন্যান্য সমুদয় শারীরিক কাজই ছাত্রেরা নিজেদের ব্যবস্থানুযায়ী নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৭১১৻৩ পাই সহ এ বৎসরের মোট আয় ১০০৭৬৮৹ আনা এবং মোট ব্যয় ৯৯৪৩৮৵৩ পাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মজঃফরপুর—আমরা মজঃফরপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের ১৯৩৭ সালের কার্য্যবিবরণ পাইয়াছি। এই বৎসর মোট ৫৭৮১২ জন রোগী সেবাশ্রম হইতে চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেবাশ্রম কর্ত্তৃক একটী উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৬১, এবং অধিকাংশ ছাত্র নিম্নজাতীয় ও দরিদ্র। সেবাশ্রমে একটী ফ্রি পুস্তকালয় আছে।

এই বৎসরের মোট আয় ৭১৩৬৮৵৫॥ পাই এবং ব্যয় ৩৩৯৫৴৬ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতি, হবিগঞ্জ—হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতির ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—সমিতি চর্ম্মকার, শব্দকর, নমঃশূদ্র, মল্লবর্ম্মণ, কৈবর্ত্তদাস, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় বালকদের জন্য ৪টী বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। ১৯৩৭ সালে উক্ত বিদ্যালয়সমূহে গড়ে ৯২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জন্য একটী সাধারণ পুস্তকালয় আছে। ১৯৩৭ সালে ইহার পুস্তক সংখ্যা ৮৭৯। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে পুস্তকালয় হইতে যথাক্রমে মোট ৪৪৬২ ও ২৩১৫ খানা পুস্তক পাঠকগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে। সমিতি চর্ম্মকার জাতির মধ্যে চর্ম্মশিল্প শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহু বিপন্ন পরিবারকে ঔষধ, পথ্য, সেবা, বস্ত্র ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ২০১৮৵৩ পাই সহ ১৯৩৬ সালের মোট আয় ৯৫৯॥৵৯ পাই এবং মোট ব্যয় ৬৩৫৮৴৩ পাই। ১৯৩৭ সালের মোট আয় ১১৯৫॥২ পাই এবং মোট ব্যয় ৮৩১॥৵৯ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন, বাঁকুড়া—১৯৩৭ সালে বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ৮৫০০৮ জন রোগী চিকিৎসা ও ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছে। সহরে সেবাশ্রমের পুরাতন বাটীতে দরিদ্র বালকদের জন্য একটী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা হইতেছে। তাহাতে ১৯৩৭ সালে ছাত্রদের দৈনিক উপস্থিতি সংখ্যা ৩৩। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১০টী ছাত্রকে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সহরের বিভিন্ন অংশে ও পল্লী অঞ্চলে এ বৎসর বসন্তের বিশেষ প্রকোপ হইয়াছিল। সেবাশ্রম হইতে ইহার প্রতিকারকল্পে যথারীতি সেবা- কার্য্য পরিচালনা করা হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের মোট আয় ২৭৭২।/৩ পাই এবং মোট ব্যয় ২২৭৯।/৩ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদন, শালিখা, হাওড়া—শালিখা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদনের ১৯৩৫, ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

সেবাসদনের দাতব্য চিকিৎসালয়ে এই তিন বৎসরে যথাক্রমে মোট ৩৯৩৭৮, ৪২৩০১ ও ৪১৪৯২ জন রোগী ঔষধ ও চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য সেবাসদনে একটী অনাথাবাস ও বিদ্যার্থিভবন পরিচালিত হইতেছে। তাহাতে উক্ত তিন বৎসরে যথাক্রমে মোট ১৭, ১৭ ও ১৬ জন ছাত্র স্থান পাইয়াছে। ছাত্রদের সকলেই স্কুলে ও কলেজে অধ্যয়ন করে। এতদ্ভিন্ন সেবাসদন হইতে বহু বিপন্ন পরিবারকে সাময়িক ভাবে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের শেষ হইতে সেবাসদনে প্রতি সপ্তাহে উপস্থিত জিজ্ঞাসু শ্রোতৃবর্গের মধ্যে নিয়মিত ভাবে গীতা পাঠ করা হইতেছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৭৬৩৸০ সহ উক্ত তিন বৎসরের মোট আয় যথাক্রমে ৩৩১০৷৷/৩, ৩৪৭২।৵৬, ৩৯৪০৸০ এবং মোট ব্যয় ৩৩১০৷৷/৩, ৩৪৭২।৵৬, ৩৯৪০৸০ আনা।

বিবেকানন্দ-আশ্রম কোতুলপুর (বাঁকুড়া)—গত ২২শে আষাঢ় পুনর্যাত্রাদিবসে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামে বিবেকানন্দ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে যথাবিহিত পূজা, চণ্ডী ও গীতা-পাঠ অন্তে সমবেত ভক্তগণকে প্রসাদ দান করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ এবং সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামাতুল কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভার অধিবেশন হয়। আশ্রমের সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ মহাশয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার বিবরণ ও গত দুই বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় একটী সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিলে জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পরমেশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাকীর্ত্তনের পর উৎসব কার্য্য শেষ হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা-সেবাকার্য্য

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ কেন্দ্র হইতে মিশনের সেবকগণ তথাকার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহার কতক অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা লিখিতেছেন, "আমবা যতই গ্রামেব পব গ্রাম পবিদর্শন করিতেছি ততই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি। গ্রামেব সমস্ত লোক যে একসঙ্গে একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতে পাবে তাহা পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এক একটী গ্রামে দুইশত হইতে বার তের শত লোকেব বাস। প্রায় সকলেরই চাষেব জমি আছে; অল্প যে কয়জনের জমি নাই তাহারা মজুরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু অভাবেব তাড়নায় চাষী ও মজুর সকলেই এক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারও ঘবে এক মুঠা ধান বা চাউল নাই। দুইবেলা দুই মুঠা খাবার যোগাড় করা সকলেরই সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। জমিজমা বাঁধা দিয়াও টাকা ধার পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এমত অবস্থায় গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। তাহাদেব পেটে অন্ন নাই, পবিধানে বস্ত্র নাই। বস্ত্রাভাবে মেয়েদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য বাহিবে আসাও তাহাদেব পক্ষে অসম্ভব হইয়া পডিয়াছে। নিত্যই বহু দূব দূব গ্রাম হইতে নূতন নূতন লোক সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেছে। সকলেব মুখেই এক কথা— 'আমাদের খেতে দাও, পরতে দাও। আমাদেব খাবার নেই, পরবার নেই।'

"এই সকল দুরবস্থার কাবণ যে শুধু বন্যা তাহা নহে, উহা উপলক্ষ মাত্র। বহুদিন হইতেই চাষীরা মহাকষ্টের ভিতব দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। দেনার দায়ে অধিকাংশ চাষীর জমিই অন্যের হাতে বাঁধা। কোন মতে দিনমজুরী করিয়া মহাদুঃখের ভিতর দিয়া দিনগুলি কাটাইতেছিল। ইতিমধ্যে এই বন্যা দেখা দেওয়াতে তাহাদের সকল আশা ভরসা একেবাবে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রাণধারণই তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। দেনার দায়ে জড়িত, অন্নহীন, বস্ত্রহীন কৃষককুল আজ 'হা অন্ন', 'হা অন্ন' রব তুলিয়াছে।"

আমাদের সেবকেরা নিজরা ও শিলনা কেন্দ্র হইতে গত সপ্তাহে ৬৫৲ মণেরও উপর চাউল ২০টী গ্রামের ১৩৮৬ জন গ্রামবাসীব ভিতব বিতবণ কবিয়াছেন। কিন্তু এখনও জল বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই লোকের দুর্দ্দশা চবম সীমায় উঠিবে। তখন দুর্ভিক্ষেব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাউলেব পবিমাণও বৃদ্ধি কবিতে হইবে। এই অবস্থায় সর্ব্বসাধাবণেব নিকট আমাদেব বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা তাঁহাদের দুঃস্থ ভ্রাতা ভগিনীদিগকে দুর্ভিক্ষেব করালগ্রাস হইতে বক্ষা কবিবার জন্য অচিবেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্য কবিতে অগ্রসব হউন।

এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :—

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ,
জেলা হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈতাশ্রম,
৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন আফিস,
১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাক্ষব—স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রী নন্দলাল বসু গৃহীত

শক্তি-সাধনা

সম্পাদক

এক অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তি এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে অনন্তসাজে সজ্জিতা হইয়া অভিনয় করিতেছেন। পৃথিবীর দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল ভূতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপে তাঁহার বিচিত্র লীলাভিনয় চলিতেছে। কোথাও তিনি গুপ্ত এবং কোথাও ব্যক্ত। সাধারণ দৃষ্টিতে জড়পদার্থে তিনি গুপ্তভাবে অবস্থিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট জড়পদার্থও শক্তির রূপান্তর। আকাশ বায়ু অগ্নি সাগর মৃত্তিকা পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি হইতে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুপুঞ্জে পর্য্যন্ত তাঁহারই বৈচিত্র্য প্রকটিত। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ কাল দিক আলোক ও অন্ধকারে তিনিই প্রকাশিত। জীব-জগতে—বিশেষ করিয়া প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের মধ্যে এই শক্তির খেলা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ায়, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও সমাধিতে এবং এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার ভাষা বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরায় তিনি দেদীপ্যমান। জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান পাপ-পুণ্য ভক্তি-অভক্তি বন্ধুতা-শত্রুতা প্রভৃতিতে এই একই শক্তি বিভিন্ন ভাবে পরিব্যক্ত। এক কথায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ও এতদন্তর্গত সকল বিষয়ই এই সর্ব্বরূপিণী অনাদ্যা আদ্যাশক্তির লীলা-বিলাস। তন্ত্রশাস্ত্রও এই সত্য সমর্থন করে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ তন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া শক্তির এই রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অধিকাংশ তন্ত্রশাস্ত্র মতে শিব ও শক্তি ভিন্নও বটেন অভিন্নও বটেন। ইহাকে শক্তিবিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বলা যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে শক্তিমান্ ও তাঁহার শক্তি ভিন্নভাবাপন্ন বোধ হয়, কিন্তু বিচার-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ভিন্নাভিন্ন বলিতে হয়। বেদান্তমতে শক্তি বা মায়া সদসদ্ভিন্ন বা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া বর্ণিত। ইহার অর্থ, শক্তি

নাই অথচ তাহা স্বীকার করিতে হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প থাকে না, তথাপি তাহাতে সর্প দর্শন হয়। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্র মতে অগ্নি ও তাঁহার দাহিকা শক্তির মত শিব ও শক্তিকে এক বাক্য-মনাতীত সত্তার একই কালে বিদ্যমান দুইটী বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশবিশেষ বলা যায়। তন্ত্র একই সৎবস্তুর গুণাতীত চিৎভাবকে শিব এবং ত্রিগুণাত্মক সৃজনভাবকে শক্তি বলিয়া প্রচার করে। তান্ত্রিক দর্শনের মতে শিব চিৎস্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নির্গুণ পুরুষরূপী সত্তা এবং শক্তি ক্রিয়াস্বরূপা পরিবর্ত্তনীয়া সগুণা স্ত্রীরূপা সত্তা। এইজন্য শিবকে অকুল ও শক্তিকে কুল বলা হয়। শক্তিভিন্ন শিব নিষ্ক্রিয় এবং শিবভিন্ন শক্তি জড়াপ্রকৃতি। এ স্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে, শিব ও শক্তি একই সৎবস্তুর পুরুষ ও স্ত্রীসত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তিনি পুরুষ বা স্ত্রী কোনটীই নহেন। তিনি অলিঙ্গ। এই দিক দিয়া বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম ও তন্ত্রোক্ত নিষ্কল শিব অভিন্ন বলা হয়। এই ভাবে বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম ও তন্ত্রের 'সকল' শিব অভিন্ন বলা যাইতে পারে। নির্গুণ বা নিষ্কল অবস্থায় কলা অব্যক্ত এবং সগুণ বা 'সকল' অবস্থায় কলা ব্যক্ত। এই কলা বা শক্তির সঙ্গে স্বরূপতঃ সাংখ্যের মূলাপ্রকৃতি (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) এবং বেদান্তের মায়ার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যখন ব্রহ্মকে নির্গুণ ও শিবকে নিষ্কল বলা হয়, তখন ব্রহ্ম ও শিব মায়া ও শক্তি নিরপেক্ষ, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহাও জানিতে হইবে যে, তন্ত্রমতে শক্তি তখনও শিবের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থিতা। পক্ষান্তরে তন্ত্রোক্ত শিব সক্রিয়া শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হইলে 'সকল' শিব নামে আখ্যাত হন। এইরূপে তন্ত্রের নিষ্কল ও 'সকল' শিবে সর্ব্বাবস্থায় শক্তি বিদ্যমানা বলিয়া শক্তিও নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদান্ত পারমার্থিক দৃষ্টিতে মায়াকে সদসদ্‌ভিন্ন পদার্থরূপে দেখিতে শিক্ষা দেয়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে মায়া অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র শক্তিকে সৎবস্তু বলিয়া প্রচার করে। তান্ত্রিকগণ বলেন যে, জগতে শিবরূপী ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই, শক্তিরূপে যিনি পূজিতা তিনিও সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই শক্তি, তিনি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন। শক্তিসাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি। একই ব্যক্তি, নামরূপ ভেদ।" এই বাক্যে সিদ্ধাবস্থায় বেদান্ত সিদ্ধান্ত এবং সাধক অবস্থায় তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে। তন্ত্রমতে ব্রহ্ম যখন চিদ্রূপে অর্থাৎ জ্ঞাতৃরূপে অবস্থান করেন, তখন চিৎশক্তি এবং যখন মায়ারূপে জগৎসৃষ্টিরূপ ক্রিয়া করেন, তখন মায়াশক্তি বলিয়া উল্লিখিত। এই দিক দিয়া চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি একই সৎবস্তুর দুইটী বিভিন্ন অবস্থার প্রকারভেদ মাত্র। একই সর্পের অবস্থান-ভেদের ন্যায় এক অবস্থায় তিনি স্থির—নিষ্ক্রিয় এবং অন্য অবস্থার চঞ্চল—ক্রিয়াশীল। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই উভয় শক্তিরই খেলা। প্রাণি-শরীরে চিৎশক্তি আত্মা বা চৈতন্যরূপে এবং মায়া-শক্তি জড়মন ও স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপে ক্রিয়া করিতেছেন। স্বরূপতঃ এই শক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কার্য্য-কারণভাবের ন্যায় চিৎশক্তির মধ্যেও মায়া বা অবিদ্যাশক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সুপ্ত আছেন এবং মায়াশক্তির মধ্যেও চিৎশক্তি বিদ্যমান। ইহার প্রমাণস্বরূপ কুল-চূড়ামণি গ্রন্থে দেবী বলিতেছেন, "অহং প্রকৃতিরূপা চেৎ চিদানন্দপরায়ণা", 'আমি প্রকৃতিরূপা হইয়াও চিদানন্দপরায়ণা।' ইহাতে স্পষ্ট যে, জগৎস্রষ্টা

ঈশ্বর বা বিশ্বপ্রসবিনী ঈশ্বরী অচিৎ নহেন। শক্তি-সাধক এই চিদ্রূপিণী বিশ্বেশ্বরীর সাধন করেন।

কেহ কেহ শিবকে প্রভু এবং শক্তিকে তাঁহার পরিচারিকা মনে করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। আগমশাস্ত্র মতে ব্রহ্ম শিব-শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্মকে যখন গুণাতীত মনে করা হয়, তখন জগতের নিমিত্তকারণরূপে তিনি শিব এবং যখন ব্রহ্মকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ধরা হয়, তখন জগতের উপাদানকারণরূপে তিনি শক্তি এবং এই বিশ্ব তাঁহার শরীর। বেদান্তমতে ইহাকে সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কুলচূড়ামণি নিগম-শাস্ত্রে ভৈরবী ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি সকলের গুরু। আমি শক্তিরূপে তোমার অভ্যন্তরে আছি বলিয়াই তুমি জগতের প্রভু। আমি ভিন্ন জগতের কার্য্যবিভাবিণী বা সৃজন-পালন-কারিণী মাতা কেহ নাই। আমি সৃষ্টি না করিলে তুমি জগৎপিতা হইতে পারিতে না। তুমি জগৎ-পিতারূপে কার্য্যবিভাবক, তুমি যে সংকল্প কর, আমি তাহা কার্য্যে পরিণত করি। "শিবশক্তি সমাযোগাৎ জায়তে সৃষ্টিকল্পনা", 'শিব ও শক্তির সংযোগের ফলেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।' জগতের সকল বস্তুই শিব-শক্তির বিকাশ। সেই হেতু, হে মহেশ্বর, তুমিও বিশ্বের সর্ব্বত্র এবং আমিও সর্ব্বত্র অবস্থিত, তুমিও সকলের মধ্যে এবং আমিও সকলের মধ্যে বিরাজমান।" এই আদর্শেই নামরূপ বিশিষ্টা শক্তি শক্তি-সাধকের প্রিয়। শক্তির উপাসক বৈদান্তিকের মত এই জগৎকে মায়া বলিয়া অস্বীকার করেন না। তিনি মহাশক্তির প্রকাশ-মূর্ত্তি নাম-রূপকে তাঁহার স্বরূপসন্দর্শন করিবার উপায় মনে করেন। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে", 'যিনি নামরূপাশ্রয়ে সকল ভূতে চেতনরূপে বিরাজ করিতেছেন', তাঁহাকে সাধক মহাদেবীরূপে ভাবভক্তি ও ব্যাকুলতা সহায়ে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে চান। তিনি মাতার ন্যায় এই বিশ্ব প্রসব করিয়া ধারণ ও পালন করিতেছেন। এই জন্য শক্তির উপাসক তাঁহাকে জগন্মাতারূপে পূজা করেন।

শাস্ত্র বলে, "অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্", 'যাহা সসীমস্বভাব বলিয়া পূর্ণব্রহ্ম নহে, নাম-রূপাত্মক ঐ প্রকার কোন পদার্থ বা প্রাণীকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাতে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপানুভূতির চেষ্টা করার নাম প্রতীক বা প্রতিমা পূজা।' উপাসক অবাঙ্‌নীয় বিষয় লইতে তাঁহার মনকে উঠাইয়া আনিয়া ব্রহ্মময়ী জগন্মাতার জীবন্তমূর্ত্তিজ্ঞানে পুরাণ বা তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাপ্রমুখ দেবীপ্রতীকবিশেষে অর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করেন। সর্ব্ববাসনা-বিমুক্ত হইয়া ব্যাকুলতাসহকারে নিরন্তর দেবীর পূজা স্মরণ মনন ও ধ্যানাদি করার ফলে তাঁহার মন তদাকারকারিত একটী বৃত্তিতে পরিণত হয়। ইষ্টদেবীকে ব্রহ্মস্বরূপিণীজ্ঞানে তৈলধারাবৎ অহর্নিশি চিন্তা করিতে করিতে সাধকের মনও তদ্রূপ বৃত্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ইষ্টদেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন হয় এবং আপনার দেহ মন বুদ্ধি ও ইহাদের ক্রিয়াতেও সাধক জগন্মাতারই ইচ্ছার অভিব্যক্তি দেখিতে পান। তখন তিনি অনুভব করেন যে, বিশ্বেশ্বরীই তাঁহার শরীর আশ্রয়ে সকল কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার প্রতিকার্য্য তখন সর্ব্বস্বরূপিণী জগদম্বারই কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় উপনীত হইয়া সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, "আহার করি, মনে করি, আহুতি দেই শ্যামা মাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব আপনাকে জগন্মাতার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ মনে করিয়া নিজ শরীর দেখাইয়া বলিয়াছেন, "দ্যাখ্, এটা কেবল খোলমাত্র, এই খোলটা আশ্রয় করে শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা লোকশিক্ষা দিচ্ছেন।" তিনি তাঁহার নিন্দাশ্রবণে জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,

"ওরে, ও আমাকে যা বলে বলুক গে, (নিজ শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর যে আছে, তাকে ত কিছু বলে নি ? আমার সচ্চিদানন্দময়ী মাকে ত কিছু বলে নি ?" বেদান্ত-সাধক যেমন আপনাকে অদ্বৈত ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদরূপে প্রত্যক্ষানুভব করেন, শক্তি-সাধকও তেমন আপনার সত্তাকে ব্রহ্মরূপিণী মহামায়ার সত্তারূপে সন্দর্শন করেন। এই খানেই শক্তি-সাধন সমাপ্ত নহে, সাধনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় চণ্ডীতে যে আছে, "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্", 'শক্তি নিত্যস্বরূপা, এই জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন', জগন্মাতার সেই সর্ব্বগতস্বরূপ সাধকের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া নিজমুখে বলিয়াছেন, "তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল। এই বেলগাছ। বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন বেলপাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল। দেখলুম, গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হলো।" * * "কালীঘরে পূজা করতুম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়। কোষা-কোশী, বেদী, ঘরের চৌকাট—সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলুম। যা দেখি তাই পূজা করি।" এই দর্শনের সমর্থনে বিশ্বসারতন্ত্র বলে, "যাঁহার চন্দনে ও কর্দ্দমে, পুত্রে ও শত্রুতে, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে, গৃহে ও শ্মশানে, স্বর্ণে ও তৃণে কোন ভেদদৃষ্টি নাই, যিনি সকল জীবের মধ্যে নিজ আত্মাকে এবং নিজ আত্মার ভিতর সকল জীবকে দেখেন, এরূপ সমদর্শীই শ্রেষ্ঠ কৌলিক।" এইরূপে "ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ" প্রভৃতি তন্ত্র-শাস্ত্রবাক্যের সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে জীবন্তভাবে রূপায়িত হইয়াছিল।

* * *

বাংলাদেশ শক্তি-সাধনার পীঠস্থান। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বাংলাদেশে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মও বাংলার মাটির গুণে তান্ত্রিকধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারের ফলে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তন্ত্রের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় শ্রেণীই শক্তি পূজা করেন। শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালীর সার্ব্বজনীন জাতীয় উৎসব। প্রতিবৎসর বাংলাদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ সমারোহে এই পূজা হইয়া থাকে এবং ইহাতে সকলেই যোগদান করেন। এই জন্য মনে প্রশ্ন আসে যে, শত শত শতাব্দী যাবৎ বাঙালী এত আড়ম্বরে মহাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া আজও শক্তিহীন স্বাস্থ্যহীন বিদ্যাহীন ধনহীন ও অন্নহীন কেন ? দোষ কাহার ? শক্তি-সাধক স্বামী সারদানন্দ তাঁহার "ভারতে শক্তিপূজা" গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, "দোষ—পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন এবং নির্জ্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায় ? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসনা অঙ্গহীন। মহামারীর প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধান সকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য পানীয়ের বিচার না করিয়া কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চরোলে হরিসংকীর্ত্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? তাহার ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। দুর্ভিক্ষের করালকবল হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাকালীর পূজা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি ও অন্যান্য উপযোগী উপায় সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না রাখে, তাহার আরাধনাও অঙ্গহীন বৈ আর কি বলা যাইবে ?"

পৃথিবীতে শক্তি যেমন অনন্ত দিক দিয়া অভিব্যক্ত, তাঁহার পূজাবিধিও তেমন অনন্ত। আমরা বিদ্যারূপিণী মহামায়ার মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা করি কিন্তু তিনি যে অবিদ্যার আবরণে আমাদের প্রতিবেশী শত শত নরনারীরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করি না। আমরা "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" বলিয়া দেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে স্তব পাঠ করি কিন্তু তিনি যে অজ্ঞান দরিদ্র রুগ্ন প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া আমাদের প্রতিবেশীরূপে সেবা চাহিতেছেন, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহি না। সর্ব্বরূপিণী জগজ্জননী প্রসন্না হইবেন কেন? আমরা নিত্য চণ্ডীতে পাঠ করি, "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু", 'হে দেবী, তুমিই জগতের সকল নারীরূপে অবস্থান করিতেছ', কিন্তু আমাদের চতুর্দ্দিকেই শক্তি-প্রতীক মাতৃজাতি শতভাবে নিত্য লাঞ্ছিতা অপমানিতা ও ধর্ষিতা হইতেছেন। নিরাশ্রয়া অসহায়া বিধবার দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাঙলার আকাশ-বাতাস বিষাক্ত। ইহা কি শক্তিপূজার বিধিলংঘন নহে?

বাংলার জাতীয় জাগরণের ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র মৃন্ময়ী বঙ্গভূমিকে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার চিন্ময়ী প্রতিমারূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অমর তুলিকায় অঙ্কিত "আনন্দমঠে" জননী জন্মভূমির সেবায় উৎসর্গীকৃত ভবানন্দ-চরিত্র সৃষ্টি করিলেন এবং দেশমাতৃকার স্থূলরূপে মহাশক্তিরই প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া অনুপম ছন্দে তাঁহার কণ্ঠে গাহিলেন—

"বন্দে মাতরম্। •
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

বঙ্গভূমির সপ্তকোটি সন্তানের কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরাট শক্তিরই কল-নিনাদ শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বিসপ্তকোটি ভুজে মহাশক্তিরই প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি বাঙালীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "এস, ভাই সকল। আমরা এই অন্ধকারে কালস্রোতে ঝাঁপ দেই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে, চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?" কিন্তু আমরা কি এই ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা জননী জন্মভূমিকে তুলিয়া আনিতে প্রস্তুত? হুজুগের মাথায় কেবল সভাসমিতিতে বক্তৃতা এবং সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ও 'জিন্দাবাদ' উচ্চারণের মধ্যেই কি আমাদের জননী জন্মভূমির সেবা পর্য্যবসিত নয়? দেশ-মাতৃকার সেবার জন্য চাই—একদল আশিষ্ঠ দ্রঢিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও মেধাবী যুবক যাঁহারা যথাসর্ব্বস্বপণ করিয়া অক্লান্ত কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত। দেখিতেছ না, জগতের উন্নত জাতিসমূহ তাঁহাদের স্বদেশের সেবায় কি অনন্যসাধারণ বুদ্ধি, অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রদ্ধা, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অচিন্তনীয় কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেছেন? শক্তি-সাধকের জানা দরকার যে, বৃথাশক্তিক্ষয় নিবারণ করা শক্তি-সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ। শক্তির অপচয় বন্ধ করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে ভূতশুদ্ধি, বিদ্যোৎসারণ, ন্যাস প্রভৃতির ব্যবস্থা। প্রত্যেক কার্য্যে বিরুদ্ধশক্তিকে পরাভূত করিয়া রাখাই শক্তির অপক্ষয় নিবারণের উপায়।

সমগ্র বিশ্বের ভিতরে বাহিরে অনন্ত ভাবে দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের, ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের, দেবভাবের সঙ্গে পশুভাবের যে অনুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে, শক্তি-প্রতীকমাত্রেই

তাহারই বিকাশ। শক্তি একাধারে এই উভয়গুণ-সম্পন্না। তাই তিনি একই মূর্ত্তিতে বরাভয়করা ও নৃমুণ্ডমালিনীরূপে পূজিতা। সৃষ্টি ও প্রলয়—জীবন ও মৃত্যু যে একই মহাশক্তির দুইটী দিক, উভয়ই যে জগন্মাতার লীলা-বিলাস, ইহা শক্তি-সাধকের বিশেষরূপে বোঝা দরকার। কিন্তু—

"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়
মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার রুধির-উদ্গার, ভীম তরবার
খসাইয়ে দেয় বাঁশী।"

শ্যামাকে যাহারা "অসুরনাশিনী" বলে কিন্তু তাঁহার মুণ্ডমালা দেখিয়া "ভয়ে ফিরে চায়" আর "নাম দেয় দয়াময়ী" তাহাদের মায়ের উপর শ্রদ্ধা নাই—প্রীতি নাই, আছে ভয়। স্বামী বিবেকানন্দ তৎপ্রণীত "নাচুক তাহাতে শ্যামা" শীর্ষক কবিতায় মনোমুগ্ধকর ভাষায় বর্ণন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোমলপ্রাণ সাধক যদি মায়ের রুদ্ররূপ অর্থাৎ দারিদ্র্য দুঃখ রোগ মহামারী মৃত্যু ইত্যাদি দেখিয়া ভয় পান, তাহা হইলে উহা যথার্থই দুর্ব্বলতা। উহাকে দূর করিয়া যে সাধক মৃত্যুকে বরণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাঁহার হৃদয়েই শ্যামা নৃত্য করেন। এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বীরসাধক বিবেকানন্দ "মৃত্যুরূপা মাতা" শীর্ষক কবিতায় গাহিয়াছেন—

"কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো
আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, —মৃত্যুরে যে
বাঁধে বাহুপাশে—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা
তা'রি কাছে আসে।"

মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে—সৃষ্টি করিতে হইলে ভিতরে বাহিরে সংখ্যাতীত বিরুদ্ধ-শক্তিরূপ অসুরের সঙ্গে তাহাকে অবিরত যুদ্ধ চালাইতেই হইবে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই সংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া তাহার উপায়ান্তর নাই। আত্মহিত এবং পরহিত সাধন করিতেও এই সংগ্রাম অপরিহার্য্য। মানুষকে এই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার উপায় শিক্ষা দেওয়াই তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির বিশেষত্ব। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিপূজার যে সকল উপকরণের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বলিই প্রধান। বলি ভিন্ন শক্তিপূজায় ফলসিদ্ধি অসম্ভব। ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুবলি অনুকল্প। শক্তির সাধনায় ফল পাইতে হইলে সাধককে তাঁহার ঈর্ষা দ্বেষ অভিমান অহঙ্কার নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি-রূপ ভিতরের পশুকে দেবীর নিকট বলি দিতে হইবে এবং আপন হৃদয়ের শোণিত মোক্ষণ করিয়া স্বার্থসুখত্যাগে আত্মবলি দানে তাঁহার তর্পণ করিতে হইবে। বলিপ্রিয়া মহাদেবীকে প্রসন্না করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এবং শক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভেরও ইহাই একমাত্র রহস্য!

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি

রায়সাহেব শ্রীবিপিনবিহারী সেন

যখন আমার বয়স এগার বার বৎসর তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসার ও আশীর্ব্বাদ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি কীর্ত্তনের সময় এরূপ বিভোর ভাবে নৃত্য করিতেন ও সমাধিস্থ হইতেন যে, তাহাতে মনে হইত যেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তখন তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম। নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার কটিদেশ হইতে পরিধেয় বস্ত্র খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না, এবং তাহার সেই মধুর নৃত্য বন্ধ হইত না। আমরা তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেও নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় উহা খুলিয়া যাইত। তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইলে তিনি উপবিষ্ট হইতেন এবং সমাগত ভক্তগণের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন।

অধরলাল সেন তাঁহার একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি আমার পঞ্চম (নতুন) খুল্লতাত ছিলেন। তখন আমরা একান্নবর্ত্তী ছিলাম। তাঁহার বাড়ীতে প্রায় প্রত্যেক শনিবারই পরমহংসদেবের শুভাগমন হইত। ইহা ইং ১৮৮৩।-৪ সনের কথা। পরমহংসদেবের শুভাগমনে যে কত ভক্তের সমাগম হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। বাড়ীর বৈঠকখানায় কীর্ত্তন ও সদালাপ হইত। কীর্ত্তনের সময় বাড়ীটী যেন পুণ্যক্ষেত্র হইত এবং স্থানাভাবে লোক বাড়ীর উঠানে ও রাস্তায় দাঁড়াইয়া যাইত। ঠাকুর সকল সময়ই সহাস্যবদনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন। বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তন করিতেন, ঠাকুর তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেন ও সমাধিস্থ হইতেন। দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যায় প্রশ্ন কখনও করিলে তিনি সহাস্যবদনে তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় অষ্টমী পূজার দিন তিনি আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর-দালানের উপর উঠিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি বলিয়াছিলেন, "এইরূপ হাস্যময়ী প্রতিমা আমি পূর্ব্বে দেখি নাই।" তাঁহার আগমনে বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং যেন একটী আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পরে তিনি উপরের বৈঠকখানায় যাইয়া বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়, রাখাল মহারাজ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঘণ্টাখানিক পরে কিছু জলযোগান্তে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যদিও জগদম্বার পূজা হইতেছিল তথাপি তিনি বাড়ী পরিত্যাগ করিবামাত্রই বাড়ীখানা যেন বিমর্ষ হইয়া গিয়াছিল। আমার খুল্লতাত অধর বাবু ঠাকুরের পরিচর্য্যায় এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

আমার খুল্লতাত মহাশয় আফিস হইতে আসিয়া স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া প্রায় প্রত্যহই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। তখন মটরগাড়ী ছিল না, তিনি নিজের ভাড়া গাড়ীতে যাইতেন। আমাদের বাড়ী হইতে সেখানে যাইতে প্রায় দেড়ঘণ্টা লাগিত। তিনি প্রায় মধ্য রাত্রে বাড়ী ফিরিতেন। তিনি তাঁহার ছোট ছোট কন্যা ও আমাকে কখনও কখনও দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন এবং সেদিন একটু সকাল সকাল ফিরিতেন। একদিন আরতির সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। আরতি আরম্ভ হইতেই ঠাকুর আসিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় জোড়হস্তে জগৎতারিণীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সেই সময় তাঁহার ঠোঁট কম্পিত হইতেছিল। আরতি শেষ হইলে শঙ্খধ্বনির পর প্রণাম করিয়া গলা হইতে

পবিধেয় বস্ত্রাংশ হাতে লইয়া আস্তে আস্তে মা জগদম্বার রাতুল চবণস্পর্শ ও মস্তকে কবিয়া নিজ ঘরে গিয়া বসিলেন। এরূপ সাবধানে ও সন্তর্পণে তিনি বস্ত্রখণ্ড মায়েব চরণে স্পর্শ কবিলেন যে, যেন তাঁহাব হস্তস্পর্শে মায়েব শ্রীচরণে আঘাত না লাগে। যতক্ষণ ঠাকুব মন্দিবে থাকিতেন ততক্ষণ তিনি মনে মনে জগদম্বার স্তুতিপাঠ কবিতেন, ইহা তাঁহার ওষ্ঠকম্পন দ্বাবা প্রতীয়মান হইত।

ইং ১৮৮৫—আন্দাজ ৮ই জানুয়ারী আমার খুল্লতাত অধর বাবু ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাওয়ায় বামহস্তেব কব্জি ভাঙ্গিয়া যায়; আট দিন পবে ইহাবই ফলে তাঁহাব দেহত্যাগ হয়। পীড়ার সময় ঠাকুব একদিন আমাব খুল্লতাতকে দেখিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুবেব মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি কাছে গিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া ঠিক্ যেন ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন। আমাব খুল্লতাত তখন স্পষ্ট বাক্যালাপ কবিতে অপারক, কিন্তু ঠাকুবকে দেখিয়া তাঁহাব চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধাবা বর্ষিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাব সহিত কিছু বাক্যালাপ কবিলেন, কিন্তু আমি তখন অল্পবয়স্ক বলিয়া তাহা কিছুই বুঝিতে পাবিলাম না, তবে ইহা দেখিলাম যে, ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহাব মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পবে ঠাকুর সমান্য জলযোগান্তে ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান কবিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় এক বৎসব পবে আমি আমাব অন্য এক খুল্লতাতের সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব কুটিবে গিয়া তাঁহাব চবণধূলি লইয়া উপবেশন করি। তখন ঘরটী ভক্তগণদ্বাবা পবিপূর্ণ ছিল। আমি বসিলে পর ঠাকুর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই ছেলেটীকে আমি যেন কোথাও পূর্ব্বে দেখেছি।" রাখাল মহারাজ বলিলেন, "এটী অধরের ভাইপো, বিপিন।" ঠাকুর হস্ত উত্তোলন কবিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ।" ইহার পর আমার খুল্লতাতেব সহিত কথাবার্ত্তা এবং বাড়ীব সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আমবা অল্পবয়স্ক বলিয়া বাড়ীতে সর্ব্বদাই গুরুজনদেব ফাই ফবমাস শুনিতে হইত। শ্রীশ্রীঠাকুব আমাদের বাড়ীতে গেলে অনেক বারই তাঁহাকে গেলাসে কবিয়া পানীয় জল আনিয়া দিয়াছি। ঠাকুব বড় কাঁচেব গেলাসে ববফ দেওয়া জল পান কবিতে এবং সুমিষ্ট আম খাইতে ভালবাসিতেন। ঠাকুরেব আগমনে আমাদেব বাড়ীতে গিবিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ও অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ সবকাবী কর্ম্মচাবী পদার্পণ কবিতেন।

ঠাকুব একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে বলিলেন, "নবেন, তুমি একবাব বেহালা বাজাও।" নবেন কিছুক্ষণ মধুব স্বরে বেহালা বাজাইবার পব ষ্টাব থিয়েটারেব কালীবাবু "কেশব কুরু করুণা দীনে" এই গানটী গাহিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুব আমাদেব বাড়ীতে যে ঘবটীতে আসিয়া বসিতেন, এখনও তাঁহাব ভক্তগণেব মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া সেই ঘব দর্শন ও প্রণাম কবিয়া যান।*

* এই প্রবন্ধের লেখক কলিকাতা কাষ্টম্ হাউসেব কোষাধ্যক্ষ। পিতার নাম ৺দয়ালচাঁদ সেন। পূর্ব্ব ঠিকানা—৯৭, বেনেটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা—(স্বর্গীয় অধর বাবুর বাড়ী)। বর্ত্তমান ঠিকানা—৩০, লম্বব হালদার লেন, কলিকাতা। বয়স ৭৫ বৎসর।

শরতের আবাহন

শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর

এস এস শুভ শরৎ ফিরিয়া বঙ্গভূমে
গগনে গগনে ঘুচায়ে মুছায়ে মেঘলা ধূমে ।
ফিরে এস তুমি কাননে কাননে সুরভি বায়ে,
ফিরে এস পুন দাঁড়াও ছাতিম ছাতার ছায়ে ।
ফিরে এস পুন তড়াগে তড়াগে মরাল দলে,
স্ফটিক সলিলে কুমুদে কমলে নীলোৎপলে ।
এস ঝিকি মিকি রোদের খেলায় পাতার ফাঁকে
এস চিকি চিকি বালুকা-বেলায় বকের ঝাঁকে ।
এস কাশবনে গাঙশালিকের মহোৎসবে,
এস বাঁশবনে কুহরে কুহরে বেণুর রবে ।
ধবল মেঘের কেতন উড়ায়ে তরল পথে,
এস এ মরতে আবার শরৎ মরাল-রথে ।
বাজিছে শঙ্খ বাজিছে শানাই গৃহাঙ্গনে,
সাজিছে বালক-বালিকা পুলকে নব বসনে,
শোভিতেছে ঘট মণ্ডিত চূতশাখার হারে,
কদলীর তরু দুধারে রাজিছে ভবন দ্বারে ।
এত আয়োজন কিসের লাগিয়া জান কি তুমি ?
তোমারি বরণে দধি ঘট বহে বঙ্গ-ভূমি ।
এস বনে বনে ছায়া আলোকের আলিম্পনে,
এস মনে মনে নব আশা-রস-সঞ্চারণে ।

বাঙ্গালীর অদ্বৈতবাদ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

শ্রুতিতে যে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব অনাদিকাল হইতে প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা লইয়া ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণের মধ্যে নানা মতভেদ হইয়াছে এবং সেই মতভেদকে অবলম্বন করিয়া যে বহু সম্প্রদায় ও নানাপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবিদিত নহে।

ভগবান্ বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রুতি প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর না হইলেও তিনি যে অনার্য্য যুগের অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে প্রাচীনতম ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিধানপ্রসিদ্ধ তাহার নামসমূহের মধ্যে 'অদ্বয়বাদী' এই নামটী সুপরিচিত।

নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমুখ বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যের গ্রন্থে ভগবান্ তথাগতের মত বলিয়া যাহা কীর্ত্তিত সমালোচিত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয়, সর্ব্বশূন্যবাদই তাহার অভিমত ছিল। এই শূন্যকেই যাঁহারা অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারে বুঝা যায় যে, সংসারে এক শূন্যব্যতিরেকে কোন বস্তুরই বাস্তব সত্তা নাই। আমাদের নিকট যাহা জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা বলিয়া প্রকাশমান তাহাদের মধ্যে কোনটীই সৎ নহে। ইহাদের সাংবৃত্তিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা ইহাদের কাহারও নাই। স্বপ্নাবস্থায় প্রতীত বস্তুনিবহের ন্যায় ইহারা কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নহে। এই জ্ঞান, এই জ্ঞেয় ও এই জ্ঞাতার সকলেরই নিষেধ করিলেই যে অবশিষ্ট বস্তু থাকিয়া যায় তাহারই নাম শূন্য। সেই সকল বচনের অতীত সকল প্রত্যয়ের বহির্ভূত শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব, তাহা জ্ঞানও নহে, তাহা জ্ঞেয়ও নহে এবং তাহা জ্ঞাতাও নহে। তাহা হইতেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ইহারা অবস্থিত এবং তাহাতেই ইহারা প্রত্যস্তমিত হইয়া থাকে।

এই শূন্যবাদ ভগবান্ বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতের অধ্যাত্মরাজ্যে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার পরিণাম হইয়াছিল—শ্রুতিমূলক কর্ম্মবাদের প্রতি লোকের অবিশ্বাস, বর্ণাশ্রমাচার প্রতিপালনে শৈথিল্য এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব। এই নৈরাত্মবাদের অবশ্যম্ভাবিফল সংসারের সকল বস্তুতেই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য মনুষ্যের আজন্মসিদ্ধ প্রকৃতির বিরোধী। সুতরাং ইহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা হইবার নহে, হয়ও নাই। এই কারণে সহস্র বর্ষব্যাপী আনন্দ, শারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভা ও শক্তিশালী বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী মহাস্থবিরগণের সহস্র প্রকার প্রযত্ন ও সাধনায় এই নৈরাত্মবাদ ভারতে অবিসম্বাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। ক্রমে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সর্ব্বশূন্যবাদের মূল শিথিল হইতে আরম্ভ করিল, ঔপনিষদ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মবাদের অনুকূল অবস্থা উত্তরোত্তর প্রসার পাইতে লাগিল। এই শুভ অবসরে ভারতের আধ্যাত্মিক গগনে যে সকল মহাদ্যুতিশালী জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছিল,

তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার উদয়ে বৌদ্ধনৈরাত্মবাদের অবসাদময় নিবিড় অন্ধকার সূর্য্যের উদয়ে নৈশ তমোরাশির ন্যায় ভারতীয় অধ্যাত্মগগন হইতে একেবারে বিদূরিত হইয়া পড়িল। ভারতে আবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মবাদরূপ শ্রৌত অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল।

আচার্য্য শঙ্কর জ্ঞানের ও জ্ঞেয়ের সত্তাকে শূন্যবাদীর ন্যায় একেবারে উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার মতে সত্তা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যথা, বাস্তব বা পারমার্থিক সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা এবং প্রাতিভাসিক সত্তা। অতীতে বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে যাহা বাধিত হয় না অর্থাৎ কোন কালেই যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহার সত্তাই বাস্তব বা পারমার্থিক সত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। আত্মা বা জ্ঞান কোন কালেই বিনাশ পায় না, সুতরাং আত্মা বা জ্ঞানের যে সত্তা তাহাই পারমার্থিক সত্তা। যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, অথচ যাহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতীতি মাত্রেই নির্ভর করিয়া থাকে না —অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রতীতি বিলুপ্ত হইলে বিলুপ্ত হয় না, সেই বস্তুর সত্তাকে ব্যবহারিক সত্তা বলা যায়। ব্যবহারার্হ বস্তুমাত্রেরই এই ব্যবহারিক সত্তা আছে। ঘট পট প্রভৃতি বস্তু কোন ব্যক্তি-বিশেষের কদাচিৎ প্রতীতির বিষয় হইয়া বা না হইয়াও থাকে। তুমি বা আমি যখন ঘট পট প্রভৃতিকে জানি তখনও যেমন তাহারা থাকে, আবার তোমার বা আমার প্রতীতির বিষয় না হইলেও তাহা থাকে। এই কারণে ঘট পট প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক বিষয়কে ব্যবহারিক সৎ বলা যায়। এ সংসারে আর এক প্রকার বস্তু আছে, তাহা পারমার্থিক সৎ নহে এবং ব্যবহারিক সৎও নহে, কিন্তু তাহা প্রাতিভাসিক সৎ, যেমন শুক্তিতে রজতদোষবশতঃ যখন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া আমরা বুঝি না, অথচ তাহাকে রজত বলিয়া আমরা বুঝি, তখন যে রজত আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয়, সে রজত আমাদের ব্যবহারের উপযোগী নহে, সুতরাং তাহার ব্যবহারিক সত্তা নাই। কিন্তু তাহা যে একেবারে অসৎ বা গগন-কুসুমের ন্যায় তুচ্ছ, তাহা বলা যায় না। যদি তাহা একেবারে অসৎ বা তুচ্ছ হইত তবে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের গোচর হইত না। অসৎ বা তুচ্ছের প্রত্যক্ষ হয় না। আমার প্রত্যক্ষ প্রতীতির উপরই তাহার সত্তা নির্ভর করিয়া থাকে। যতক্ষণ আমার সেই প্রতীতি থাকে, ততক্ষণই রজত বিদ্যমান থাকে। সেই প্রতীতির অভাব হইলে সেই রজতেরও অভাব হইয়া থাকে। এই কারণে সেই রজতকে প্রাতিভাসিক রজত কহা যায়।

প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সদ্‌বস্তুতে আমি বা আমার এই প্রকার জ্ঞানই আমাদের এই সংসারে সকল প্রকার অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। ইহারা কেহই পারমার্থিক সৎ নহে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পারমার্থিক সৎ, জীব মাত্রই বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ। অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজের ব্রহ্মস্বরূপতা না বুঝিয়া যখন আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝে, তখনই সে সংসারী বলিয়া আপনাকে বুঝে। ভ্রান্তিই তাহার সকল প্রকার দুঃখের কারণ। এই ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেই তাহার সংসারের সকল দুঃখের অবসান হয়। আত্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ের দ্বারা এই ভ্রান্তি দূর হয় না। এই ভ্রান্তিই জীবের সংসার বা বন্ধন। এই বন্ধন নিবৃত্তির জন্য মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মভূত ব্রহ্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার একান্ত আবশ্যক। ইহাই হইল উপনিষৎ সমূহের সারসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের পুনঃ প্রচার করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ভারত হইতে নৈরাত্ম-বাদ বা শূন্যবাদকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্করের গীতাভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা যাহাতে নানা সম্প্রদায়ের বিদ্বদ্গণের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য, প্রশিষ্য ও তদনুগ

আচার্য্যগণের প্রণীত টীকা, বার্ত্তিক ও নানাবিধ নিবন্ধ গ্রন্থরূপ অদ্বৈতবাদের বিশ্ববরেণ্য বিরাট অধ্যাত্মশাস্ত্র ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে আবির্ভূত হইল। এই সকল গ্রন্থ-প্রণেতা আচার্য্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, আনন্দগিরি, বাচস্পতি মিশ্র, বিদ্যারণ্য, মধুসূদন সরস্বতী, চিৎ-সুখ ও অপ্যয় দীক্ষিত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আচার্য্য শঙ্করের তিরোভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী এই সকল মহর্ষিকল্প শাঙ্কর মতানুগ দার্শনিক আচার্য্যগণের গ্রন্থরচনার যুগ ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টির যে পরিচয় দিয়া থাকে তাহা অতুলনীয় বলিলে অনু-মাত্রও অত্যুক্তি হয় না। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক হইলেও সংসারাবস্থায় তাহাদের মধ্যে যে পরস্পর ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, সেই কল্পনার হেতু কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ যে অবিদ্যা অথবা মায়ার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মতে সদ্বস্তুও নহে, অসদ্বস্তুও নহে। বিচার দ্বারা সত্তা সিদ্ধ হয় না, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের তাহা বিষয়ও হইয়া থাকে। এই কারণে তাহা গগন-কুসুমের ন্যায় একেবারে অলীক বা অসৎও নহে। এইজন্য তাহা অনির্ব্বাচ্য। ব্রহ্মাশ্রিত সেই মায়া বা অবিদ্যা হইতে বিশ্বসংসার প্রসূত হইয়াছে। সেই মায়া বা অবিদ্যা অনাদি হইলেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ তাহা বিনাশিত না হয় তাবৎপর্য্যন্ত জীব ঈশ্বর এবং প্রপঞ্চ পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন-ভাবেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এই সকল বস্তুর বাস্তব সত্তা না থাকিলেও ইহারা ব্যবহারিক সৎ। এই প্রকার সিদ্ধান্তকে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ব্যবস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবাদী আচার্য্য-গণ যে সকল গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রতিভাসম্পন্ন কোন ব্যক্তিরও এক জীবনে তাহাদের অধ্যয়ন শেষ করা অসম্ভব ব্যাপা বলিলেও চলে।

বাঙ্গলায় স্বামী মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদের যে সকল অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার শাঙ্করভাষ্যানুযায়িনী গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা, ভক্তিরসায়ন এবং অদ্বৈত-সিদ্ধি এই তিন খানি গ্রন্থই ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। স্বামী মধুসূদন সরস্বতী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। কোটালীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে তিনি জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। কাশী-ধামে তিনি শাঙ্কর দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাশীতেই বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার প্রচারার্থ অধ্যাপনা ও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কুলের পরমাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী নবদ্বীপ হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইবার পথে বেদান্তশাস্ত্রের সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্য কিছুকাল কাশীধামে অবস্থান করেন। প্রবাদ আছে, সেই সময় কাশীতে তিনি স্বামী মধুসূদন সরস্বতীর সহিত পরিচিত হইয়া-ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীজীব গোস্বামী স্বামী মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় এই প্রবাদের উপর অনেকেই আস্থা স্থাপন করেন না। স্বামী মধুসূদন সরস্বতী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতি স্বয়ং অদ্বৈতবাদী হইয়াও যে গৌরববুদ্ধি সম্পন্ন ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার ভক্তিরসা-য়ন ও গীতা গূঢ়ার্থদীপিকায় যথেষ্টরূপে পাওয়া যায়।

গীতার সপ্তমাধ্যায়ে—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' ১৪।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর লিয়াছেন—

"তত্রৈবং সতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে, তে মায়ামেতাং সর্ব্বভূত চিত্তমোহিনীং তরন্তি অতিক্রামন্তি সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ।"

(সেই মায়া দুরতিক্রমণীয় হইলেও যাহারা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই অর্থাৎ মায়াবীকেই নিজের আত্মা বলিয়া সর্ব্বাত্মভাবে প্রপন্ন হয়, তাহারা সর্ব্বপ্রাণিচিত্তবিমোহিনী এই মায়াকে অতিক্রমণ করিয়া থাকে অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।)

আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ ব্যাখ্যায় অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই যে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গলার অদ্বৈতবাদিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী স্বামী এই শ্লোকের কিন্তু অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানকে যেমন মায়াতিক্রমণের হেতু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমলক্ষণা ভক্তিকেও মায়াতিক্রমণের হেতু বলিতে অণুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নাই। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য বর্ণনপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"প্রপদ্যন্তীতি বক্তব্যে 'প্রপদ্যন্তে' ইত্যুক্তেঃ যে মদেকশরণাঃ সন্তো মামেব ভগবন্তং বাসুদেবং ঈদৃশ মনন্তসৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং অখিলকলাকলাপনিলয়মভিনব-পঙ্কজশোভাধিকচরণকমলযুগল-প্রভমনবরতবেণু-বাদননিরতবৃন্দাবনক্রীড়াসক্তমানসহেলোদ্ধৃত-গোবর্দ্ধনাখ্যমহীধরং গোপালং নিষূদিত শিশুপালকংসাদিদুষ্টসংঘমভিনবজলদশোভাহরণ পরমানন্দঘনময়মূর্ত্তিমতিবৈরিঞ্চপ্রপঞ্চমনবরতমনুচিন্তয়ন্তো দিবসানতিবাহয়ন্তি, তে মহাপ্রেম মহানন্দসমুদ্রমগ্নমনস্তয়া সমস্তমায়াগুণবিকারৈর্নাভিভূয়ন্তে, কিন্তু মদ্বিলাস বিনোদ কুশলা এতে মদুন্মূলন সমর্থা ইতি শঙ্কমানেব মায়া তেভ্যোঽপসরতি বারবিলাসিনীব ক্রোধনেভ্যস্তপোধনেভ্যঃ। তস্মান্মায়াতরণার্থী মামীদৃশমেব সন্ততমনুচিন্তয়েদিত্যপ্যভিপ্রেতং ভগবতঃ, শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চাত্রার্থে প্রামাণী কর্ত্তব্যাঃ।"

[(আমাকে) দেখিয়া থাকে ইহাই বক্তব্য হইলেও (এখানে) প্রপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপই বলা হইয়াছে। (ইহার আকার এই যে) যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই অর্থাৎ একমাত্র ভগবান বাসুদেবকে অণুচিন্তন করিতে থাকিয়া দিবসসমূহকে অতিবাহিত করে, তাহাদের মহাপ্রেমরূপ মহানন্দসমুদ্রে মন নিমগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া সমস্ত মায়াগুণ বিকার তাহাদিগকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। আমি বাসুদেব, আমি অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারসর্ব্বস্ব, আমি অখিল কলাকলাপের আবাসস্থল, নব বিকসিত পঙ্কজ শোভা হইতে আমার চরণযুগলের শোভা অধিক, আমি অনবরত বেণুবাদননিরত ও বৃন্দাবনক্রীড়াসক্ত, অবলীলাক্রমে আমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উদ্ধৃত করিয়াছি, আমি গোপাল, শিশুপাল কংস প্রভৃতি দুষ্টসমূহকে বিনাশ করিয়াছি। আমার দেহকান্তি নবোদিত জলধরের শোভাসর্ব্বস্বকে হরণ করে, আমার মূর্ত্তি ঘনীভূত আনন্দস্বরূপ ও সমস্ত প্রপঞ্চকে ব্যাপিয়া আছে। যাহারা এইরূপ আমাকে চিন্তা করে, তাহারাই মদীয় বিলাস-বিনোদে কুশল হইয়া থাকে; ইহারা আমাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিবে এই ভয়ে ক্রুদ্ধপ্রকৃতি তাপসগণ হইতে ভীত বারবিলাসিনীর ন্যায় মায়া ইহাদের নিকট হইতে নিজেই যেন পলাইয়া যায়। এই কারণে মায়া হইতে নিস্তারার্থী মানব এই প্রকার আমাকেই সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, ইহাও শ্রীভগবানের অভিপ্রেত, এই বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।]

গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক আচার্য্য স্বামী মধুসূদন বলিয়াছেন—

"ধ্যানাভ্যাস বশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কেচন যোগিনো যদি পরং
পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎকিমপি তন্নীলং তমোধাবতি॥"

কোন কোন যোগী ধ্যানাভ্যাস দ্বারা বশীভূত চিত্তের সাহায্যে সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মরূপ জ্যোতিকে যদি দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাঁহারা তবে সেই রূপই দেখুন। আমাদের কিন্তু কালিন্দী-পুলিনসমূহে যে এক অনির্ব্বচনী নীলতম ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে, তাহাই চিরকালের জন্য নয়নযুগলের চমৎকারের বিধান করিতে থাকুক।

পঞ্চদশাধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্ যুক্তমেবোক্তং মদ্ভক্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
পরাকৃতনরদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।
সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দেনন্দাত্মজং মহঃ॥"

'সেই হেতু আমার ভক্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া থাকে', এই যে বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে।

নত জননিবহের সকল বন্ধনকে যিনি দূর করিয়া দেন, যিনি পরব্রহ্ম অথচ নরাকৃতি, সেই সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্ব নন্দনন্দনরূপ জ্যোতিকে আমি বন্দনা করিয়া থাকি।

পঞ্চদশাধ্যায়ের শেষ শ্লোকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন—

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাদরবিন্দ নেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপিতত্ত্বমহংনজানে॥"

বংশী বিভূষিতকর, নবনীরদাভ, পীতাম্বর, অরুণ বিম্বফলাধরোষ্ঠ, পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখ ও অরবিন্দ-নেত্র কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন কোন তত্ত্ব আমি জানি না।

গীতাশাস্ত্রের স্বকৃত গূঢ়ার্থদীপিকা টীকার প্রারম্ভেই স্বামী মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—

"ভগবৎপাদ ভাষ্যার্থমালোচ্যাতি প্রযত্নতঃ।
প্রায়ঃ প্রত্যক্ষরং কুর্ব্বে গীতাগূঢ়ার্থদীপিকাম্॥"

ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থে অতিশয় প্রযত্নের সহিত আলোচনা করিয়া আমি প্রায় প্রত্যক্ষরের গূঢ় অর্থ কি তাহা বুঝাইবার জন্য এই গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা নামে টীকা করিতেছি।

বাহুল্য ভয়ে গীতাগূঢ়ার্থ দীপিকা হইতে আর অধিক উক্তি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা গেল না। যাহা কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা হইতে মধুসূদন সরস্বতী স্বামীর ব্যাখ্যায় প্রণিধানযোগ্য বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়। অদ্বয় নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই যে সাধকের দৃষ্টিভেদানুসারে সগুণ সাকারভাবে প্রতীত হইয়া থাকে অথচ সেই সাকার সগুণ তত্ত্ব মায়িক নহে, কিন্তু পারমার্থিক সৎ, এই সিদ্ধান্তই অদ্বয় ব্রহ্মবাদের সারসর্ব্বস্ব। ইহাই হইল বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদাচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী স্বামীর সারসিদ্ধান্ত এবং ইহাই হইল ভারতের 'অধ্যাত্মরাজ্যে বাঙ্গালী মনীষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান। অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে ইহা সূচিত হইল, আবশ্যক হইলে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ধর্ম্ম-সমন্বয়

রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় তাহাদের মধ্যে পার্থক্যটাই যেন খুব বেশী। তাহা বুঝি কিছুতেই বিদূরীত হইতে পারে না। যুগে যুগে কত ঋষি, কত নবী, পয়গম্বর, সাধু, সুফি, ধর্ম্মসংস্থাপক আসিয়াছেন, এবং যুগের দাবী ও প্রয়োজন মত নীতি ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই সব নীতি ধর্ম্ম উপদেশ ও তাহা পালন করিবার জন্য কতকগুলি কর্ম্মধারার সমাবেশ সাধারণতঃ ধর্ম্ম নামে পরিচিত। এই সকল ধর্ম্ম যখন প্রথম প্রচারিত হয় তখন তাহাদের প্রধান ভিত্তি ছিল উদারতা, মানব-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও জনসেবা। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মের এই ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গেল এবং আচারই হইয়া পড়িল সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার-পদ্ধতির মধ্যে সামান্য সামান্য যে সব পার্থক্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা মানুষকে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল। সুতরাং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ আরম্ভ হইল। এই বিরোধ ক্রমে ক্রমে মানববিদ্বেষ তথা জাতিবিদ্বেষে পরিণত হইল। উদার ভিত্তি শিথিল হইয়া যাওয়ার এক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি অপর ধর্ম্মে বিশ্বাসীকে ভ্রান্ত বিপথগামী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিজের ধর্ম্মকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই প্রকার তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের একচেটিয়া অধিকারবোধ হইতে উদ্ভূত হইল ধর্ম্মের লড়াই, "জেহাদ", "ক্রুসেড," মারামারি ও কাটাকাটি। ধর্ম্মের এমন সব ব্যাখ্যা হইতে লাগিল তাহাতে মনে হইল যে কোনও ধর্ম্মের মধ্যে মূলগত কোন সাদৃশ্য নাই, আছে শুধু পার্থক্য ও অপর ধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে অবস্থা এমন হইয়াছে এবং সাধারণের মনে হইতে পারে যে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিরোধী, তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন, আর সে বিভিন্নতা অসমাধ্য। যে কোনও একটি ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলে অপর ধর্ম্মকেও শ্রদ্ধা করা, সম্মান দেখান বা ভাল বলিয়া স্বীকার করা ঘোর অন্যায়—ঈশ্বরদ্রোহিতা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি ধর্ম্মের শেষ কথা? ধর্ম্মসমন্বয় কি কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়? বিশ্বের সকল ধর্ম্মকে একই সঙ্গে ও একই নিঃশ্বাসে মঙ্গলময় ও কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না? ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াও কি সকল ধর্ম্মের সার সত্য ও মূলতত্ত্বগুলিকে আপনার অঙ্গীভূত করা অসম্ভব? একটু ধীরভাবে ও উদারচিত্তে বিভিন্ন ধর্ম্মের পরিচয় লাভ করিলে এইরূপ সমন্বয় সম্ভব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এক ধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্ম হইতে যতই পৃথক্ ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করি না কেন, তাহাদের গভীর তলদেশে একটা মধুর ঐক্যতান ও অনাবিল স্বচ্ছ ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক ধর্ম্মের শিক্ষা ও আদর্শের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে এমন একটা সামঞ্জস্য ও সাধারণ ভাব রহিয়াছে যে তজ্জন্য কোন এক ধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ভাবা যায় না। সুতরাং বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে, বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে সব পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেইগুলিই কি ধর্ম্মের মূলনীতি অথবা তাহাদের গভীরতর

ন্তরে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাই মূলনীতি ও মূলধর্ম্ম ?

পার্থক্য বহু আছে আর তাহা এত পরিস্ফুট ও পরিদৃশ্যমান যে, মনে হইবে ধর্ম্মসমন্বয়ের কথা উঠিতেই পারে না। মুসলমান পুতুল পূজা করে না, খোদাতালার উদ্দেশ্যে কোন মূর্ত্তি গড়ে না, নিরাকার খোদার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে, তাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচারপদ্ধতি অপর হইতে পৃথক্। খৃষ্টান যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ঈশ্বরের মত তাঁহাকেও পূজা করে, তাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার অন্যরূপ, উপাসনাপদ্ধতি পৃথক্। হিন্দু পুতুল পূজা করে, ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন এ 'থিওরী'তে বিশ্বাস করে, তাহার মতে সকল মানুষে ঈশ্বরের অংশ আছে, তাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার খৃষ্টান ও মুসলমান হইতে একটু পৃথক্। বাহ্যদৃশ্যে মনে হইতে পারে এই তিনটি ধর্ম্মমত একেবারেই পৃথক্, ইহাদের মধ্যে মিলন ও সমন্বয় অসম্ভব—অকল্পনীয়।

কিন্তু এই ধর্ম্মত্রয়ের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মূলগত আদর্শের মধ্যে কোনও রূপ পার্থক্য নাই। তিনটি বিষয়ে সব ধর্ম্মই একমত, প্রত্যেক ধর্ম্মই বিভিন্ন নামে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কোন ধর্ম্মই নাস্তিকতার সমর্থন করে না। ঈশ্বর আছেন, তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা, তিনিই সর্ব্বক্ষমতার অধিপতি, মানুষের ভালমন্দ ও জীবন-মরণের তিনিই একমাত্র কর্ত্তা—ইহা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে মনে প্রাণে ও সমস্ত অন্তর দিয়া ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে। এই উপাসনা ও প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার সান্নিধ্য লাভ সম্ভব নহে। পথ বহু, কিন্তু গন্তব্য সেই একই স্থান—ঈশ্বর। এবিষয়ে সকল ধর্ম্মই একমত। দ্বিতীয়তঃ মানুষ সৃষ্টজীব হইলেও তাহার একটা আত্মা আছে; সে আত্মা অবিনশ্বর, সেই জন্য মানুষ এক দিক দিয়া অমর। তাহার মূলসত্তার বিনাশ হয় না—দেহের শেষেই সব শেষ হয় না, আত্মা রহিয়া যায় অবিনশ্বর ভাবে। তৃতীয়তঃ জীবসেবা—এবিষয়ে কোন ধর্ম্মই ভিন্নমত নহে। জীবসেবা সকল ধর্ম্মের একটা সারশিক্ষা। এই জীবসেবার ব্যাপারে মানব-অমানব ও জাতি ধর্ম্ম বিচার নাই, সৃষ্টজীব নির্ব্বিশেষে ইহা পালন করিতে হইবে। মুসলমান নামাজ পড়ে কাহার জন্য? সেই খোদার উদ্দেশ্যেই তাহার সকল উপাসনা, সকল সাধনা সমর্পিত হয়। খৃষ্টান ও হিন্দুও সেই উদ্দেশ্যেই পূজা, যাগযজ্ঞ, উপাসনা করিয়া থাকে। উপাসনার শেষ নিবেদন ঈশ্বর, তাহাতে কোন ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য নাই। যেখানে উদ্দেশ্যে পার্থক্য নাই, সেখানে পদ্ধতির বিভিন্নতা বড় কথা নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাহ্যিক পার্থক্যটা আচার, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও উপাসনার পদ্ধতি লইয়া। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সকলেরই এক। এই তিনটি বিশ্বাসের একটাও বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে কেহই কোনও ধর্ম্মেরই অন্তর্গত থাকিতে পারে না। কিন্তু আচার ইত্যাদির বেলায় এত কড়াকড়ি নিয়ম নাই। দৈনন্দিন জীবনে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কত আচার পদ্ধতিই না বাদ দিয়া থাকি, দরকার বোধে পরিবর্ত্তন করি, কখন কখন অবহেলা করি কিন্তু উপরের তিনটি বিষয়কে অপরিবর্ত্তনীয় নীতি বলিয়া স্বীকার করি এবং একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে ঐ তিনটি বাদ দিলে আমরা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া যাইব। আচারে অবিশ্বাসী মানুষকে আমরা পশু বলি না, কিন্তু পশু বলি জীব-সেবায় কাতর ব্যক্তিকে।

সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যদি মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য নাই, তবে ধর্ম্ম-সমন্বয় কেন সম্ভব হইবে না? যে সব পার্থক্যকে সাধারণ লোক কত গভীর বলিয়া মনে করে, দেখা গেল তাহা ত গভীর নয়, তাহা মৌলিকও নয়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। এমন বহু মুসলমান আছেন যাঁহারা নামাজ পড়েন না, বহু

…ষ্টান আছেন যাঁহারা গীর্জ্জায় যান না এবং বহু …ন্দু আছেন যাঁহারা পূজাপার্ব্বণ পালন করেন না, …কন্তু তজ্জন্য কেহই তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের গণ্ডী …হইতে বাহির করিয়া দেন না। কারণ আচার-…চার লইয়া বাহিরে যতই ঝগড়া বিবাদ করুক না কেন, লোকে মনে প্রাণে বুঝে যে ওগুলি কিছুই নয়। মূলনীতিই ধর্ম্মের আসল বস্তু। সুতরাং এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি, ধর্ম্মের মূল-নীতিতে দৃঢ় থাকিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন অসম্ভব ব্যাপার নহে। একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যখন ধর্ম্মসমন্বয়ের কথা বলি, তখন তাহার অর্থ এ নয় যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্ম হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। ধর্ম্ম-সমন্বয় বলিতে এই বুঝি, নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসী থাকিয়া পরস্পরের সহিত এমনভাবে মিলিতে হইবে, যেন পার্থক্যের কারণে মানুষের সহিত মানুষের কোনরূপ বৈরভাব না জাগে, উদারভাবে প্রত্যেকে যেন অপরকে দেখিতে শিখে। এই উদারতার কারণে ও ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে কালক্রমে মানুষ পরস্পরের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া যাইবে যাহার ফলে মনে হইবে সকলেই যেন একই ধর্ম্মের সেবক, একই আদর্শের পৃষ্ঠপোষক ও একই পথের পথিক। এই ভাবে চলিলে বিভিন্ন ধর্ম্মের সেবকদের মধ্যে এমন একটা সংহতি হইয়া যাইবে, এমন একটা সামঞ্জস্য বিধান হইয়া যাইবে যে মনে হইবে, সমগ্র মানব এক মহাধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। "জগৎ জুড়িয়া এক মহাজাতি, সে জাতির নাম মানবজাতি"—কবির এই বাণী সে দিন সার্থক হইবে।

ধর্ম্মকে যাঁহারা উদার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা সব সময় বিশ্ব-মানবতার ভিত্তিতে ঐক্যকে বড় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এই ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা আপ্রাণ সাধনা করিয়া থাকেন। সব ধর্ম্ম যে মূলতঃ ও কার্য্যতঃ এক, এবং একই কারণে ও একই কেন্দ্র হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র স্বীকার করে। ইসলাম বলিতেছে, প্রত্যেক দেশের জন্য ঈশ্বর পয়গম্বর বা ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রেরণ করেন। আর এই পয়গম্বরগণ যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার নাম ইসলাম (বা শান্তি)। কেবলমাত্র হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মই যে ইসলাম তাহা নহে, প্রত্যেক দেশে যেকোন ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে তাহাও ইসলাম। হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, য়িহুদী ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সবই ইসলাম ধর্ম্ম। এবিষয়ে কোর-আন বলিতেছে, "লে কুল্লে কাও মিন হাদ" অর্থাৎ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক পাঠাইয়াছি' (১৩ : ৭)। আর একস্থানে আছে, 'এমন কোন জাতি ছিল না যাহার জন্য পয়গম্বর বা তত্ত্ববাহক পাঠাই নাই' (৩৫ : ২৪)। অন্যত্র—"নিশ্চয় তোমার পূর্ব্বে পয়গম্বর পাঠাইয়াছি —কতকগুলির নাম তোমার নিকট বলিয়াছি এবং কতকগুলির নাম বলি নাই' (৪০ : ৭৮)। ইসলামের আর একটা শিক্ষা এই যে খোদার প্রেরিত সমস্ত পয়গম্বরকে বিশ্বাস করিতে হইবে। যে কোনও দেশের ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ ইস-লামের ধারক ও বাহক—এই নীতিতেও মুসল-মানকে বিশ্বাসী হইতে হইবে। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতদূর জানি, তাহাতে মনে হয় সেগুলিও বিশ্বধর্ম্মের সমর্থক এবং সব ধর্ম্মের মূলআদর্শকে সত্য ও অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করে। আচার, ব্যবহার ও বহিরাঙ্গনের জাল ভেদ করিয়া ধর্ম্মের অন্তর দেশে প্রবেশ করিলে বুঝা যাইবে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সকলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ধারা স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের মূল শিক্ষণীয় বিষয় এক ও অভিন্ন ইহা বুঝিতে পারিয়াই বহুদিন হইতে

ভারতবর্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। মুসলমানগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন হিন্দুদের আচার ব্যবহার দেখিয়াই মনে করিয়াছিলেন উহাই বুঝি হিন্দুত্বের সার। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন ভারতীয় ভাষা ও বিদ্যা তাঁহাদের আয়ত্ত হইতে লাগিল তখন তাঁহারা বুঝিলেন, হিন্দু ধর্ম্মের আসল বস্তু আচার বিচার বা বাহিরাবরণ নহে, তাহারও গভীর তলদেশে এমন একটা আদর্শ আছে যাহা ইসলাম হইতে বেশী পৃথক নহে। মহাত্মা আলবেরুণী প্রমুখ মুসলিম পণ্ডিতগণ অসাধ্যসাধন করিয়া হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন মুসলমানের নিকট হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মূলতত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আলবেরুণীর পর হইতে বহু মুসলমান ও হিন্দু সুধী উদারদৃষ্টিতে ধর্ম্মালোচনা করিয়া সমন্বয়ের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। আমরা সাধারণতঃ মনে করি, আকবরই বুঝি সর্ব্বপ্রথম এইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব্বে আলবেরুণী যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবরের পর মহাত্মা দারাশিকোহ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধর্ম্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতে হইয়াছিল। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং নিজেও কতকগুলি অনুবাদ করিয়াছিলেন। উপনিষদের ফারসী অনুবাদ তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একখানা মূল্যবান পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তকের নামই বলিয়া দিবে—তিনি সেই যুগেও প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পুস্তকের নাম "মাজমাউল বাহ্‌রায়েন" অর্থাৎ "দুই সাগরের মিলন কেন্দ্র"। এই পুস্তকে তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের কতকগুলি আদর্শকে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে শত পার্থক্য সত্ত্বেও সেগুলি মূলতঃ এক। কিন্তু ঘাতক দারাশিকোহের আরব্ধ ব্রতকে বহুদিনের জন্য পণ্ড করিয়া দিল। এই সব আলোচনামূলক রচনা দ্বারা হঠাৎ কোন সমন্বয় হইয়া যাইত না, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের মনের সংকীর্ণতা, নীচতা ও ধর্ম্মান্ধতা দূর হইয়া যাইত এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে বুঝিত—মূলতঃ সব ধর্ম্ম এক। তখন পরস্পরের সহিত মেলামেশার অধিকতর সুযোগ হইত—এই ভাবে "দুই সাগরের" সমন্বয় হইয়া যাইত। কিন্তু নানাপ্রকার বাধা আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সে বাধা যে অধিক দিন থাকিবে না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত যে সমন্বয়ের কাজ চলিতেছে তাহা শত বাধা ভেদ করিয়া চলিতে থাকিবে। দারাশিকোহ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, সৈয়দ আহম্মদ, কেশবচন্দ্র যাহাকে আগাইয়া দিয়াছেন, তাহা কতদিনে পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে বলিতে পারি না, কিন্তু সে কাজ চলিবে, চলিতে থাকিবে, যতই ধীর মন্থর গতিতে হউক না কেন, সবাই আসিয়া এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরে মিলিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার বলিতেছি ধর্ম্ম-সমন্বয় মানে ধর্ম্ম পরিত্যাগ নহে। উদার ভিত্তিতে ধর্ম্মের মূলআদর্শের উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরস্পরের সহিত যে সদ্ভাব, মিলন ও একতা, তাহারই ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহাকেই বলি ধর্ম্ম-সমন্বয়। এই অবস্থা আনিতে হইলে ধর্ম্মের বহিরাবরণ, আচার অনুষ্ঠান ও চুলচেরা বিচার অপেক্ষা মূলসত্য ও মূলআদর্শের উপর অধিক জোর দিতে হইবে। ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও জীবসেবাই হইবে সকলের প্রধান ব্রত। এই ব্রত লইয়া সকলেই একই ক্ষেত্রে যোগ দিবে, একই

ভাবে কাজ করিবে, একই গতিতে চলিবে। প্রত্যেকের ধর্ম্মমতকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, ধর্ম্ম বিষয়ে আক্রমণাত্মক রচনা বা আলোচনা পরিহার করিতে হইবে। গায়ের জোরে, প্রলোভনে ও চাপ দিয়া অপরকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নীতি পরিহার করিতে হইবে। ধর্ম্মগত ও সংস্কৃতিগত মিলনমূলক ভাল ভাল পুস্তক লিখিয়া তাহার বহুল প্রচার করিতে হইবে এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। একই পরিবারের বিভিন্ন সন্তানগণ রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে যেমন বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ উদার ভাবে যদি তাহারা ধর্ম্মকে ভাবিতে চায়, তবে তাহাতে যেন কোন বাধা দেওয়া না হয়। ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে পৃথক করিতে হইবে, ধর্ম্ম হইবে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা নৈতিক ভিত্তির উপর বেশী জোর দিতে হইবে। এইভাবে যদি বিভিন্ন সম্প্রদায় চলিতে থাকে, তবে অনায়াসে ধর্ম্ম-সমন্বয় সম্ভব হইবে, তাহার ফলে কোন ধর্ম্ম লোপ পাইবে না, বরং ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তি পাইতে থাকিবে। অথচ এমন একটা মনোভাব মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে যাহার জন্য সাম্প্রদায়িক রেশারেশি, বাদানুবাদ থাকিবে না, মিলন সদ্ভাব সম্প্রীতির সহযোগিতার ফলে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-সমন্বয় হইয়া যাইবে; জড়-বাদিতা, নাস্তিকতা, সন্দেহবাদ, বস্তুতান্ত্রিকতা ও অপধর্ম্মের আক্রমণ হইতে ধর্ম্ম সেদিন সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইবে, মানবেরও মুক্তি হইবে।

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

আকাঙ্ক্ষিত আনন্দধাম
ওই যে দেখা যাচ্ছে দূরে,
কনক-কিরণ ঢাল্‌ছে রবি,
মন্দিরের ওই স্বর্ণচূড়ে।
জীব সেখানে শিবের সাথী
তরু কল্পতরুর জ্ঞাতি,
গরুড় পাখীর আত্মীয় সব
বিহঙ্গেরা বেড়ায় ঘুরে।

২

মানব জাতির মাতৃপিঠ ওই
কি মহাপীঠ বলবো তাকে,
মহামায়া দিলেন দেখা
যেখানে হায় ছেলের ডাকে।
পুণ্যময়ী ওই যে ক্ষিতি
অমৃতভোজ হেরতো নিতি,—
সে উৎসবের প্রসাদ বিলি
হচ্ছে যে আজ জগৎজুড়ে।

৩

লুটাই আমি ওই মাটিতে
মাথা কুটি ও প্রাঙ্গণে
সার্থক হক আমার তনু
তরুলতার আলিঙ্গনে।
দেখবে তাপিত দেখবে দুখী,
সেবাব্রতের ওই গোমুখী,
কথায় যে আর কুলায় নাক
আনন্দে মোর নয়ন ঝুরে।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কে-টি, সি-আই-ই, ডি-এস্ সি

আমি যে দিকেই তাকাই না কেন, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখি। একবার কলিকাতার রাস্তায় বাহির হউন, দেখিবেন—মুটে, মজুর, মটর ও রিক্সাপরিচালক, ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হইতে আমাদের ঘরের পাচক, ভৃত্য, দরোয়ান প্রভৃতি সকলেই অবাঙ্গালী। রাস্তার পাহারাওয়ালা এমন কি জল ও পান-বিড়িওয়ালা পর্য্যন্তও অবাঙ্গালী। ইলেকট্রিক্ সরঞ্জাম ও মেরামতাদি কাজে পাঞ্জাবি, এবং জল, গ্যাস্, ড্রেন্ ইত্যাদি প্লাম্বিং (Plumbing)-এর কাজ উড়িয়া মিস্ত্রীদের একচেটিয়া। কিন্তু যখন বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যাই, তখন দেখি, ঐ সমস্ত কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত তাহারা সকলেই স্ব স্ব প্রদেশবাসী। কথাটা বড় সামান্য বোধ হয় কিন্তু গত আদমসুমারীর রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যায় যে, কেবল শ্রমজীবিগণ প্রতি মাসে মনিঅর্ডার যোগে পাঁচ সাত টাকা করিয়া প্রতি বৎসরে বাঙ্গলা ও আসাম (প্রধানতঃ বাঙ্গালা) হইতে সাত আট কোটি টাকা উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর পশ্চিমে পাঠায়। ইহা হইল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১০ বা ১১টা অবধি একবার হাওড়ার পুলের দিকে দৃষ্টি-পাত করুন। দেখিবেন, পিল পিল করিয়া পিপীলিকা সারির মত বাঙ্গালীবাবুরা উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়াছেন, যেহেতু সময়মত আফিসে হাজিরা দেওয়া চাই-ই। এই সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনেও একদিকে রাণাঘাট অপরদিকে দক্ষিণে জয়নগর ও মগরাহাট হইতে আগত ডেলী প্যাসে-ঞ্জাররূপে মসিজীবিগণকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে দেখা যাইবে। কিন্তু একবার ষ্ট্রাণ্ড রোডে বিশেষতঃ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দিকে তাকান, দেখিবেন, বড বড অফিস, রয়াল এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির গগনভেদী অট্টালিকা। ইহার ভিতর বাঙ্গালী বাবুরাও যাতায়াত করিতেছেন কিন্তু কেরানীভাবে। আর এই সমুদয় সওদাগর অফিস ও ব্যাঙ্কে, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া (ইউরোপীয়-গণের তো কথাই নাই) প্রভৃতি যাতায়াত করেন ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে, এবং তাঁহারাই এই সকল অফিসের মালিক। এই সকল ব্যাঙ্কে প্রতিদিন যে লাখ লাখ টাকা এবং কোন দিন বা ক্রোর টাকার আদান প্রদান হয়, ইহার মধ্যে খুব কম টাকারই বাঙ্গালীর চেক্ পাইবেন, প্রায় সকল চেক্ই অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়গণের।

এখন একবার বড বাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে বড বড কুঠিতে মারোয়াড়ী ও ভাটিয়াগণ বিরাজ করেন এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহাদের করতলগত। পুনর্ব্বার চিত্তরঞ্জন এভে-নিউর দিকে লক্ষ্য করুন, দেখিবেন, উভয় পার্শ্বে ৫ তল ৭ তল হর্ম্ম্যশ্রেণী। ইহার ভিতর কদাচিৎ পৈত্রিকসূত্রে দুই একটী বাঙ্গালীর বাড়ী দেখা যায়। সম্প্রতি যে বিবেকানন্দ রোড হইয়াছে, তাহাতেও এই প্রকার অবাঙ্গালীরা অবস্থান করেন। কদাচিৎ কখনও বা ভুলক্রমে দুই একটী বাঙ্গালীর বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়।

এতদ্ভিন্ন যে সকল রপ্তানি ব্যবসায় আছে, যেমন ধরুন কোটি কোটি টাকার কাঁচা চামড়ার ব্যবসায় ইত্যাদি, সে সমস্তও অবাঙ্গালীর একচেটিয়া অধিকারে।

আমার এই সমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এবং আমার আত্মচরিতে দফায় দফায় দেখাইয়াছি যে,

.ই প্রকারে প্রতি মাসে বাঙ্গলা হইতে অবাঙ্গালী ...র্তৃক অন্যূন দশ কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে একশত বিশ কোটি টাকা শোষিত হইয়া বাঙ্গলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—প্রধানতঃ বোম্বাই, .িহার ও উত্তর-পশ্চিমে চলিয়া যায়। এই ত গেল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান বাঙ্গলার প্রধান সহর তথা কলিকাতা বন্দরের কথা।

এখন একবার মফঃস্বলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের রেলওয়ে ষ্টেশন ও বহতানদীর তীরস্থিত বন্দরে যান, দেখিবেন, কোথাও বা ষ্টীমার এবং কোথাও বা শত শত বহরের পাট বোঝাই হইয়া রেলওয়ে মাল-গাড়ীতে চালান হইতেছে। গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানের ষ্টীমার ও বহর হইতে রেলগাড়ীতে এবং রেলওয়ে হইতে ষ্টীমার ও বহরে আমদানী মালের নামান উঠান প্রভৃতি সমস্ত কাজই কয়েক সহস্র পশ্চিমা কুলির একচেটিয়া দখলে। এই সমস্ত পাট বা অপর ক্ষেত্রজ পণ্য, যেমন ধান, চাউল, সরিষা এবং নদীয়া মুর্শিদাবাদের ভূষিমাল অর্থাৎ কলাই প্রভৃতি সমস্তই অবাঙ্গালীর করতলস্থ। অবশ্য এখনও সাহা, তিলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের হাতে ইহার কিছু কিছু ব্যবসা আছে, কিন্তু তাহাও দিন দিন তাহাদের হাত হইতে অপসারিত হইতেছে। এই ত গেল কেবলমাত্র রপ্তানি ব্যবসায়ের কথা। ইহা ছাড়া পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে যত পারঘাটা (ফেরিঘাট) আছে, উহা সমস্তই পশ্চিমাদের দখলে। আমি অনেক সময় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান্‌দিগের নিকট অভিযোগ করিয়াছি যে, কেন এই সমুদয় পারঘাট বাঙ্গালীদের দেওয়া হয় না? কিন্তু সর্ব্বত্রই এক উত্তর পাইয়াছি যে, বাঙ্গালী ওয়াদামত তো টাকা দিতে পারেই না বরং আদায়ী টাকা খাইয়া ফেলে!

এখন আমদানি পণ্যের বিষয় উল্লেখ করা যাউক। ম্যান্‌চেষ্টার, জাপান ও বোম্বের বস্ত্রাদি ও যাবতীয় লৌহ নির্ম্মিত মাল—যেমন কড়ি, বরগা, য়্যাঙ্গ্‌ল্ (angle), করোগেট্‌, কেরোসিন তৈল, কলেরতেল, নারিকেল তৈল, চিনাবাদাম ও মহুয়ার তৈল, চিনি, মশলা এবং বিলাসের দ্রব্য—যথা মটর গাড়ী, সাই-কেল, সিগারেট, সিনেমার ফিল্ম প্রভৃতি কোটি কোটি টাকার মাল সমস্তই ইউরোপীয়, মারোয়াড়ী প্রভৃতি অবাঙ্গালীর করায়ত্তে। এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, কয়েক শত কোটি টাকার ব্যবসা হইতে বাঙ্গালী নিজ কর্ম্মদোষে ও ঔদাসীন্যে বঞ্চিত। এক কথায় বলিতে গেলে ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কবি যে বলিয়াছিলেন, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে", ইহা অন্য অর্থে এখন প্রকৃতই বাঙ্গালীর প্রতি প্রযোজ্য।

এতক্ষণ আমি অর্থনীতির দিক দিয়া বলিতে-ছিলাম, এখন একবার সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়া কিছু বলিব। একথা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালাদেশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রণী এবং এখানে মহাত্মা রামমোহনের সময় হইতে ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ-সিংহের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা সমাজের পূর্ণ ব্যবস্থার জন্য তীব্র আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনও অস্পৃশ্যতা, মন্দির-প্রবেশে অনধিকার প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি আমাদের সোনার বাঙ্গলা কলুষিত করিতেছে। একটী সামান্য উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। একটী বিড়াল মরা ইন্দুর উদরস্থ করিয়া এবং আঁস্তাকুড় ঘুরিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতেছে এবং আগন্তুক জামাইয়ের পাত হইতে মাছের মুড়া মুখে করিয়া দৌড় মারিতেছে। ইহাতে হাঁড়ি কুড়ি ও জলের কলসী ফেলা যায় না। কিন্তু যদি তথা-কথিত কোন অস্পৃশ্য লোক চৌকাঠের সীমানা অতিক্রম করিয়া রন্ধনগৃহে পদার্পণ মাত্র করে, তাহা হইলে রন্ধনপাত্রাদি ও জলের কলসী অপবিত্র

হয় বলিয়া গোঁড়া হিন্দুগণ তাহা ফেলিয়া দিতে ত্রুটি করেন না। আমি বলিয়া থাকি যে, এই হতভাগ্যদের দেহ হইতে অস্পৃশ্যতারূপ বিষ বিকীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের শর সন্ধানের ন্যায় সেই বন্ধনপাত্রে প্রবেশ করে কি? মনস্বী স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম এখন জলের কলসী ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। ছুৎ-মার্গরূপ মহাব্যাধি আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। বাস্তবিক আমার বলিতে লজ্জা হয় যে, এই সমস্ত ব্যবস্থাদি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এখনও আমাদের মধ্যে দেশাচাররূপে প্রচলিত রহিয়াছে। এই কথা ভাবিলে আমাদের শত ধিক্কার আসে। এই কি আমাদের উন্নত শিক্ষার ফল?

আর একটী কথা। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর যে আদমসুমারি হয়, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বাঙ্গালী হিন্দু জাতি তাহাদের লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক নিয়মাদির প্রভাবে কেন সংখ্যায় হ্রাস পাইতেছে এবং মুসলমানগণই বা কেন সংখ্যায় ক্রমাগত বাড়িতেছে। আমাদের বিবাহাদি বিষয়ে কঠোরতা যদি শিথিল না করা হয়, তাহা হইলে হিন্দু এই রকম কমিতে কমিতে একেবারে লোপ পাইবার আশঙ্কা আছে। ৩০ বৎসরের অধিককাল হইল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি (Col U. N. Mookherjee) "বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ জাতি" শীর্ষক প্রস্তাবে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং ইদানীং শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কে কার কথা শুনে? এই অচলায়তনের প্রাচীর না ভাঙ্গিতে পারিলে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঁচিবার আর আশা নাই। অবশ্য ইহা আমি কখনও বলিতে চাহি না যে, সব একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অসংযত উচ্ছৃঙ্খল সামাজিক নিয়মাদির প্রচলন করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ একদিকে যেমন বাঙ্গালীর আয় কমিতেছে, অপরদিকে তদনুপাতে অতিরিক্ত ব্যয় ও বিলাসিতা বাড়িতেছে। আমাদের ছেলে-বেলায় কোন আসর বা মজলিসে এক ছিলিম তামাক দিলে বার চৌদ্দ জনে ধূমপান করিত, কেহ বা একটী পাতার নল করিয়া নিজের আভিজাত্য রক্ষা করিত। ইহাতে প্রথমতঃ তামাকের নিকোটিন্ নামক বিষাক্ত পদার্থ নলিচা বহিয়া হুকার খোলের জলের ভিতর পরিত্যক্ত হইত। দ্বিতীয়তঃ এক ছিলিম তামাকের দামই বা কত? গৃহ সেবনীয় তামাক কাটিয়া ঝোলা গুড়ের সঙ্গে মাখিয়া প্রস্তুত করা হইত। তদ্দ্বারা এক ছিলিম তামাকে বোধহয় এক পয়সার বার ভাগেরও একভাগ দাম পড়িত না, অথচ কত লোকের মনস্তুষ্টি হইত। কিন্তু এখন সিগার ও সিগারেটের প্রচলন এবং চা পানের অভ্যাস যে পরিমাণে বাড়িতেছে, তাহা দেখিলে ভয় হয়। অনেকে এমন কি কেরাণী পর্য্যন্তও প্রতিদিন এক প্যাকেট সিগারেট এই প্রকারে উড়াইয়া দেন! ইহাতে এক দিকে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠান হয় এবং অপরদিকে স্বাস্থ্যের প্রভূত হানি হয়। আমি বিড়ির কথা বলিব না, কেননা ইহার ব্যবহার তথাকথিত সভ্যতার বাহিরে। এইজন্য ইহা সাধারণতঃ মুটে মজুর ও গাড়োয়ানের মধ্যে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে সিনেমা দেখার বাতিক উল্লেখযোগ্য। "This curse is ruining us morally, economically and physiologically." এই অভিশাপ আমাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক ধ্বংস সাধন করিতেছে। সিনেমা দর্শকগণ আবদ্ধবায়ুতে অবস্থানের জন্য স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, উজ্জ্বল আলোকে ক্ষীণদৃষ্টি হইতেছে এবং স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের ছবি দেখিয়া নৈতিক ও শারীরিক অধঃপতন বরণ করিয়া লইতেছে। ইহার উপর বেশভূষার তো কথাই নাই।

বাঙ্গালী এখন যাহা কিছু করে তাহা পেটের পর বাণিজ্য করিয়া। কথায় বলে, 'বাইরে কোঁচার ওন ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন।' এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মাসিক ৪০।৫০ টাকা আয় হওয়া কঠিন, না হয় একশত টাকাই হইল। আজকাল কলিকাতায় যে প্রকার বাড়ী ভাড়া বাড়িয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর লোক এঁদো বাড়ীতে আলো-বাতাস বর্জ্জিত সেঁৎসেঁতে ঘরে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে স্বাস্থ্যের যে কি প্রকার অপচয় হয় তাহা সরকারী দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত জন্ম-মৃত্যুর হিসাব-নিকাশের খতিয়ান দেখিলেই বুঝা যায়। কলিকাতা সহরে জন্মিবার এক বৎসর মধ্যেই শতকরা ৩৩জন শিশু মারা পড়ে। আর বাকী শিশুরা কগ্ন অবস্থায় আধমরা হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

এই জন্য দেখা যায় যে, ক্ষয় রোগ (Tuberculosis) সমাজের মধ্যে অতি ভীতিপ্রদ বেগে বিস্তার করিতেছে এবং সমগ্র জাতিকে সমূহ ধ্বংসের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এমন কি এই ভীষণ ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া সুদূর পল্লী-গ্রামেও বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, অপুষ্টিকর খাদ্যজনিত শারীরিক ব্যাধি-প্রবণতা, মুক্ত বাতাস ও সূর্য্য-কিরণের অভাব এবং তৎসঙ্গে অনিয়মিত অসংযত জীবনযাপন।

বাঙ্গালী কেন যে এই কঠোর জীবন সংগ্রামে দিন দিন হটিয়া যাইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমরা বাল্যকাল হইতেই উপরচালাকি বা ফাঁকিদারি দ্বারা কাজ ফতে করিতে চাই। রীতিমত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করা যেন এখন রেওয়াজের বাহিরে। "ওরে! তুই কি বাঙ্গাল যে ওদের ন্যায় গাধার মত খাটবি? পরীক্ষকের চোখে ধুলো দিয়ে পাশ করতে জানিস নে?" কলিকাতার ছেলেরা এই কথা হামেসা বলিয়া থাকে। আমাদের ছেলেবেলায় অভিধান দেখিয়া প্রত্যেক কথার মানে স্থির করিয়া লইতাম। এমন কি ওয়েবষ্টারের অভিধান ও প্রকৃতিবাদ অভিধান দেখা আমাদের প্রথা ছিল। কিন্তু এখন সমস্তই বাজকীয় পথ। সব সময়েই মানের বই বা নোটের শরণাপন্ন হওয়া এখন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে পাঠ্য-পুস্তক ক্রয় করার আগে উহার বড় বড় নোট বুক সংগ্রহ করা হয়। কথায় বলে "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।" পাঠ্য-পুস্তক অপেক্ষা নোট-বুকের কদর বেশী দেখিয়া এই প্রবাদ-বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া পাঠ্য-পুস্তক পড়া তো একরকম উঠিয়াই গিয়াছে; সহজ (Made Easy), সংক্ষেপ (Abridged) সংক্ষিপ্ত চিত্র (Brief outline) বা টীকা টিপ্পনী পড়িয়াই কাজ হাসিল করা হয়। কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক যদি একটু বেশী রকমের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে ছেলেরা অধৈর্য্য হইয়া উঠে এবং সে অধ্যাপক অপ্রিয় বা ছাত্রদের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। সুতরাং অধ্যাপককে সামলাইয়া চলিতে হয়। নতুবা যে দিনকাল ছাত্রদের ধর্ম্মঘটেরও ভয় আছে। "ও মশায়, ও সব বাজে বিষয় পড়ান কেন? ওতো পরীক্ষার পাশে লাগবে না," এরূপ কথা ছাত্রদের মুখে লাগিয়াই আছে। যে শিক্ষক যত নোট দিতে পারেন তিনি ছাত্র সমাজে তত প্রশংসার ভাজন হন। এইরূপ গোড়াতেই কাঁচা থাকার দরুণ প্রকৃত শিক্ষা হয় না। ছাত্রেরা কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহাতেই পাওয়া যায় যে, এখন বাঙ্গালী গ্রাজুয়েটগণ মাদ্রাজী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিদের সঙ্গে নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছেন। আজকাল আই-সি-এস, হিসাব-রক্ষকের কার্য্য (Accountantship), আয়-ব্যয় বিভাগ ও রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদ সমস্তই ঐ

সমস্ত প্রদেশবাসিগণ একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলস্বরূপ এই বাঙ্গলাদেশেই অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট, সবডিভিসন্যাল্ অফিসার, হাকিম প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশবাসী।

কথায় বলে 'যত চতুর তত ফতুর।' কাক মনে করে বড় চতুর কিন্তু সকলের বিষ্ঠা খাইয়া মরে। আমার বাল্যকালে মারোয়াড়ী প্রভৃতিকে 'ছাতুখোর" সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইত। উড়িষ্যা বাসীকে 'ল্যাজবিহীন জন্তু' বলা হইত বা ভেড়ার সঙ্গে তুলনা করা হইত। কিন্তু এই তথাকথিত 'ছাতু-খোরদের' নিকট আজ বাঙ্গালী যে সমস্ত ব্যবসা ও বাণিজ্য হইতে একপ্রকার পরাভূত ও বিতাড়িত তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আর এই তথা-কথিত "ল্যাজবিহীন জন্তুরাই" (উড়িষ্যাবাসীরা) আজ অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়া বাঙ্গালীর উপর টেক্কা দিতেছেন। কোন বাঙ্গালী যুবককে যদি বলি যে, আর চাকরীর আশা করিও না, ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা কর। সে অমনি মুখের উপর উত্তর দিবে, "মশায়, ব্যবসা করবো যে, ক্যাপিট্যাল (মূলধন) পাবো কোথায়? মূলধন আপনি যোগাড় করে দেবেন?" উত্তর শুনিয়া মনে হয় যেন সোনার চাঁদ যদি একতোড়া টাকা পান তাহা হইলেই ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। তিনি ভুলিয়া যান যে, কত কঠোরতা দৃঢ়তা ও একাগ্রতা অর্জ্জন করিলে ব্যবসায়ে বা কারবারে সাফল্য লাভ করা যায়। মারোয়াড়ী বা পশ্চিমা বালক নয় দশ বৎসর হইতে তাহার পিতা বা অভিভাবকের নিকট হাতে-কলমে শিক্ষানবিসী করিয়া ব্যবসায়ের সকল সন্ধান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। মারোয়াড়ী বা পশ্চিমারা প্রথমতঃ পাঁচ সাত শত টাকার মাল, যেমন কাপড় বড়বাজার হইতে পিঠে করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আনে ও সঙ্গে লইয়া যায়, এবং রেল হইতে নামিয়া—যেমন গোয়ালন্দে, পুনরায় পিঠে কাপড় লইয়া ষ্টীমারে উঠে। তাহার পর ধরুন, নারায়ণগঞ্জে আবার ষ্টীমার হইতে নামিয়া রেলে উঠে, পরে রেল হইতে নামিয়া তাহারা সেই কাপড় পিঠে করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিতে আরম্ভ করে এবং অতি সুলভে—প্রায় কলিকাতার দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে থাকে। দিনান্তে তাহারা দুই তিন পয়সার ছাতু খাইয়া কাটায়। কিন্তু ব্যবসা করিতে হইলে প্রথমেই বাঙ্গালী যুবক দুই চারি হাজার টাকার মাল আনিতে বাধ্য হয় এবং দোকানপাট করিয়া সুরু করে। তাহাকে ঘরভাড়া, মিউনিসিপাল্ টেক্স, লাইসেন্স, কর্মচারীর মাহিনা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি সাজসরঞ্জামের জন্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং সে টাকায় অন্যূন ৵০ আনা মুনাফা না করিয়া মাল ছাড়িতে পারে না। কাজেই মারোয়াড়ীদের নিকট প্রতিযোগিতায় সহজেই পরাস্ত হয়। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ী যুবক অনেকেই বলেন, "মশায়, কি দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে ছেড়ে মাড়োয়ারী বা পশ্চিমাদের কাছে জিনিষ ক্রয় করে। এ জাতির উন্নতি কিসে হবে?" কিন্তু নিজে যে অকর্ম্মণ্যতা ও বিলাসিতার জন্য তাহাদের ন্যায় সুলভে জিনিষ দিতে পারে না, তাহা দেখে না। মারোয়াড়ী ও ইংরাজেরা খরিদদারকে লক্ষ্মী মনে করে এবং তাহাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। খরিদদার যদি অযথা হায়রানিও করে, তথাপি কিছু বলে না। আশা রাখে যে, আজ না কিনিলেও আর একদিন কিনিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী দোকানদারের সে ধৈর্য্য নাই। সে সহজে খরিদদারের সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার রাখিতে পারে না।

মারোয়াড়ীর যে প্রকার কষ্টসহিষ্ণুতা আছে তাহার দশভাগের একভাগও বাঙ্গালীর নাই। সে যত অল্পখরচে চালাইতে পারে, তাহা বাঙ্গালীরা কখনও পারে না এবং সে জন্য মারোয়াড়ী কখন মূলধন ভাঙ্গিয়া মহাজনকে ডুবায় না। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই মারোয়াড়ী

পশ্চিমারা বাঙ্গলা দেশে আগমন করিয়াছে। এমন কি তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে জৈন মারোয়াড়ীগণ আড্ডা গাড়িয়াছে এবং এখনও পুরুষানুক্রমে ব্যবসালব্ধ ধন দ্বারা বড় বড় জমিদারী ক্রয় করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এক সময়ে লোটা-কম্বল সঙ্গে করিয়া বাঙ্গলা দেশে আসিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি যে, সুদূর সিকিম ও ভুটানের প্রান্তদেশে গ্যাংটকের মতন জায়গায় মারোয়াড়ী বণিক গাধা, খচ্চর, বা তিব্বতী ঝব্বুর পৃষ্ঠে মাল চাপাইয়া গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরস্থ অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়া বাঘ ভালুকের ভয় না রাখিয়া ব্যবসা করিতে সুরু করে এবং অচিরে ধনশালী হইয়া উঠে। শুধু কলিকাতা সহরে নয়, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগের-হাট প্রভৃতি মফঃস্বল-সহরেও যত "সেলাই জুতি" সকলেই বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসে, কিন্তু আমাদের দেশের চর্ম্মকারগণ ঐ সব সহরের প্রান্তে হীন অবস্থায় ভিক্ষাজীবী হইয়া অতি কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীরা হিন্দু মুসলমান, ইতর-ভদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেই আলস্যপরায়ণ ও শ্রমবিমুখ। এমন কি পূর্ব্বে কলিকাতায় গঙ্গার ঘাটে পূজার্চ্চনার জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষৌর-কর্ম্মের জন্য বাঙ্গালী নাপিত মিলিত, কিন্তু এখন সেখানেও বাঙ্গালীর কুড়েমির জন্য পশ্চিমা—না হয় উড়িয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িয়া বাঙ্গালী যজমানের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-শান্তি করে ও পশ্চিমা-নাপিতে বাঙ্গালীর ক্ষৌরকর্ম্মাদি ও অঙ্গমর্দ্দন করে। আমি হামেসা এই কলিকাতা সহরে দেখি, কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বা যুবক একটী গঙ্গার ইলিশ মাছ গঙ্গার ঘাট বা কোন বাজার হইতে ক্রয় করিয়া তাহা হাতে করিয়া আনিতে নারাজ। এর জন্য হয় মুটে এবং আজকাল রিক্সা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আমার স্নেহভাজন শ্রীমান রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম যে, সে কয়েকদিন আগে দেখে যে, বাগবাজারের ঘাটে গঙ্গার ইলিশ ক্রয় করিয়া একটী সুসভ্য যুবক বাসে উঠিল মাত্র গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের আগে নামিবে বলিয়া। এইটুকু পথ না হাঁটিয়া বৃথা তিন পয়সা খরচ করিল। ইহা অপেক্ষা আলস্য ও অযথা পয়সা খরচের আর কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

আর একটী কথা। আমার বাল্যকালে অর্থাৎ ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুর ও চেৎলা প্রভৃতি স্থান হইতে জেনারেল এসেমব্লি বা বর্ত্তমান স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ ও ডাফ্ কলেজ বা ফ্রি চার্চ্চ কলেজে (যাহা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল), ছাত্রগণ অবাধে দুই বেলা পদব্রজে যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন করিত। কিন্তু আজকাল ট্রাম ও বাসের ছড়াছড়ি। এখন বালক বা যুবকগণ এক মাইল হাঁটিতে হইলে বিভীষিকা দেখে, কাজেই এক আনা দিয়া বাসে চড়িয়া বসে। আমি অনেক বিলাতী চিকিৎসকের স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, বিলাতে কেরানীগণ সমস্ত দিন আবদ্ধ বায়ুর ভিতর পরিশ্রম করিয়া যখন গৃহের দিকে ফিরেন, তখন দেখেন মোড়ে মোড়ে ট্রাম বাস ও টিউব বা সুড়ঙ্গের মধ্যে রেল, এবং এজন্য পদব্রজে বাড়ী ফিরিবার পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন। ইহার ফলে কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম হয় না। যদি খোদ বিলাতেই এইরূপ হয়, তবে আমাদের দেশে ইহা আরও কত অনিষ্টকর। এখানে আমরা বাল্যকালে দেখিতাম যে, বাগবাজার অঞ্চল হইতে লালদীঘি বা হাইকোর্টে প্রত্যহ অসংখ্য কেরানী হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু এখন হয় বাসে নয় ট্রামযোগে আফিস করেন। ইহাতে পয়সা ও স্বাস্থ্য দুইই নষ্ট হয়। আর এই সমস্ত বাসের মালিক, ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর

সকলেই অবাঙ্গালী—পাঞ্জাবী। শুনিতে পাই, তাহারা বাঙ্গালী যাত্রীদের উপর অনেক দুর্ব্যবহার করে। ইহাও দেখিতেছি যে, এই সকল পাঞ্জাবীরা ভবানীপুরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তাহারা পারতপক্ষে বাঙ্গালীর কোন জিনিষ কেনে না, এমন কি সুদূর পঞ্জাব হইতে ডাক্তার ও ধোপা-নাপিত পর্য্যন্তও আমদানি করিয়াছে। অথচ সেই বাসেই চড়িতে হইবে। এই প্রকারে ছয় পয়সা করিয়া বার পয়সা প্রত্যহ ব্যয় হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখি যে, এই স্বল্পবেতনভুক কেরানীর ছেলেপিলের হয়তো সকালে বিকালে এক পয়সার মুড়িও জোটে না।

আর একটী কথা। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এখনকার নব্যতন্ত্রের কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক, কি যুবতীর সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। প্রতি বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক যে স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির করা হয়, তাহা পাঠ করিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। স্কুল ও কলেজের ছেলেদের মধ্যে শতকরা বেশীর ভাগ ছাত্রেরই দাঁত ক্ষয়িষ্ণু, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, হজমশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত, বক্ষদেশ অপ্রশস্ত। ইহা ছাড়া অনেকের ম্যালেরিয়া-বর্দ্ধিত প্লীহা, নানাপ্রকার ব্যাধিজনিত এবং অপুষ্টিকর (Malnutrition) আহারের জন্য শারীরিক দুর্ব্বলতাও আছে। যদি অল্পবয়সেই ছাত্রেরা এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়, তাহা হইলে যখন সাংসারিক জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন কি প্রকারে ইহারা এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিবে? কথায় আছে, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" আজকাল শারীরিক ব্যায়ামের বড় বড় কথা শুনি। আমি আজ ২৭।২৮ বৎসর নিত্য ময়দানে বেড়াই। প্রত্যহ প্রায় ১॥০-২ ঘণ্টা কাটাই। ইডেন গার্ডেনেই বলুন, আর প্রিন্সেপস্ ঘাটেই বলুন, আজকালের রেওয়াজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন ময়দানের কথাই ধরুন, সব জায়গায় দেখি, মারোয়াড়ী ও ভাটিয়াগণ দখল করিয়াছে। আজকাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াইবার পক্ষে বেশী ফ্যাশান হইয়াছে। সেখানে রাস্তার দুইধারে মোটর গাড়ী কাতার দিয়া দাঁড়ায় এবং ভাটিয়াগণ অর্থাৎ গুজরাটবাসিগণ—যাঁহাদের মধ্যে কোন পর্দা প্রথা নাই, তাঁহারা সস্ত্রীক ঐস্থানে পদব্রজে বেড়ান, কিন্তু কদাচিৎ দুই একখানা বাঙ্গালীর মোটর দেখি। আবার অতি প্রত্যুষে শত শত মারোয়াড়ী ও ভাটিয়াগণ তথায় খুব দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান ও এইরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করেন, কদাচিৎ বা বাঙ্গালী দেখা যায়। কিন্তু ক্রিকেট বা ফুটবল প্রতিযোগিতায়—বিশেষতঃ যদি মোহনবাগান বনাম কলিকাতা বা মোহনবাগান বনাম মহমেডান্ স্পোর্টিং ইত্যাদির খেলা হয়, তখন কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ হাজার বাঙ্গালী দর্শকের সমাবেশ হয়। খেলোয়াড় তো মাত্র ১১জন বনাম অপর ১১জন। আবার ইহার মধ্যেও অনেক খেলোয়াড় ভাড়াটিয়া। প্রতিদিন যে দর্শনী (Gate-money) সংগ্রহ হয়, তৎসহ আনুষঙ্গিক বাস ও ট্রামের ভাড়া ধরিলে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রতি খেলায় ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া নিজের তৃপ্তি লাভ হয়! অথবা যেমন সিনেমাতে "All quiet on the Western front" নামক গ্রন্থঅবলম্বনে চলচ্চিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি দেখিয়া বাঙ্গালী বাবুরা তাহাতে ভাগ লইতেছেন মনে করিয়া বীরত্বের আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

আমি প্রায় প্রতি বৎসরই একবার করিয়া ঢাকায় যাইয়া থাকি এবং রমনাতে অবস্থান করি। এই বয়সেও প্রত্যহ ৫ ঘটিকার পূর্ব্বে প্রত্যুষে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া সেখানে একবার প্রশস্ত রাস্তা ও বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে চক্র দিয়া আসিতাম। সেই সময় দেখিতাম যে, ইহার চারিদিকে ঢাকা-হল, জগন্নাথ-হল, মোসলেম-হল প্রভৃতি

হোষ্টেলে বা ছাত্রনিবাসে শ্রীমানেরা তখনও নিদ্রার ক্রোড়ে মগ্ন। কদাচিৎ তাঁহারা এই ভাবে প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করেন। তবে কোন ক্রিকেট ম্যাচ থাকিলে তখন বাজার একেবারে গুলজার! সে তো পরশ্রমপণ্য, অপরে খেলবে যাহা কিছু পরিশ্রম করিবে, নিজেদের কেবল হুজুকে তৃপ্তি লাভ! ফলকথা যে দিক দিয়া দেখি না কেন, বাঙ্গালী পুরুষের—বিশেষতঃ মহিলাগণের স্বাস্থ্য দিন দিন অবনত হইতেছে।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এই বৃদ্ধ বয়সে এক এক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি। ভাবি, হায়! বাঙ্গালীর কি এই পরিণাম? বাঙ্গালী জাতি কি এই ভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দিন দিন পরাজিত ও পশ্চাৎপদ হইয়া একেবারে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইবে? বাঙ্গালী কি এই ভাবে নিজ বাসভূমে পরবাসী, পরাশ্রয়ী, পরপ্রত্যাশী হইয়া হাস পাইতে পাইতে জীবন-সংগ্রামে হটিয়া শেষে বিনষ্ট হইবে? তবে যেন একটু আশার সঞ্চারও হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে এখন বাঙ্গালীর একটু একটু জাগরণ লক্ষিত হইতেছে। ইদানীং চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্যূন বারটী কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে, আরও দুই তিনটী স্থাপিত হইতে চলিয়াছে এবং অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর কিছু কিছু প্রতিপত্তি দেখা যাইতেছে। এই যে বেকার সমস্যা অর্থাৎ চাকরী মেলা দুঃসাধ্য —ইহাও এক প্রকার শাপে বর অর্থাৎ বাঙ্গালী এখন বাধ্য হইয়া ব্যবসাক্ষেত্রের দিকে মন ফিরাইতেছে। আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকে হয়তো ভাবিবেন যে, আমি এই পরিণত বার্দ্ধক্যের সময় আতঙ্কবাদী (Cynic) হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, আমি এখনও যেখানে বাঙ্গালীর উদ্যমের চিহ্ন দেখিতে পাই—বিশেষতঃ ব্যবসাক্ষেত্রে, সেইখানেই উৎসাহে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, নিজের এই বৃদ্ধ বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও যথাশক্তি সাহায্য করিতে ক্রটি করি না, এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আশা ও উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করি না। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের ব্যবসার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বাল্যকালে দারিদ্র্যবশতঃ মুড়ি ফেরি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং কলিকাতার পথিপার্শ্বস্থ গৃহসংলগ্ন রোয়াক বা বারাণ্ডাতে ইষ্টক মাথায় দিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। অর্থাভাব হেতু অবৈতনিক ছাত্রহিসাবে তিনি মাত্র ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশ্রম অধ্যবসায় ও তৎসঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রেরণার বলে বাঙ্গালীর আদর্শস্থানীয় এই কর্ম্মবীর আজ ভারত-জুট মিল ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের বিরাট কারখানা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ধৈর্য্যশীল পাঠকবৃন্দ হয়তো ইহাকে বৃদ্ধের প্রলাপোক্তি মনে করিয়া ক্ষমা করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং এইক্ষণে আর একটী বিষয়মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে সকল বিরাট প্রতিভাশালী মনীষিগণ এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যথা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ, ধর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ, নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির বার্ত্তাবহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পুরুষসিংহ আশুতোষ প্রভৃতি মনস্বিগণের সমকক্ষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি বঙ্গেতর অন্যান্য প্রদেশে অতি দুর্লভ। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এই পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে— যে দেশে এত অধিক সংখ্যক অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, সে দেশ শ্রীভগবানের কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। ইহাই আশার কথা। বাঙ্গালী আবার উঠিবে। বাঙ্গালী আবার জাগিবে। দুঃখিনী বঙ্গমাতা আবার শত বীণাবেণুরবে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবেন। ব্রহ্মার্পণমস্তু।

বিজ্ঞানের ভিত্তি ও আপেক্ষিকতাবাদ

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে, এম্-এস্‌সি

কোন্ পুরাকালে আদি মানব পৃথিবীতে আসিয়াছিল জানি না, কিন্তু আবির্ভাব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের একই কাজ চলিয়াছে—প্রকৃতির লীলা অনুধাবনের চেষ্টা। নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি আমরা দেখি—পূর্ব্ব-দিকে উঠিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পশ্চিমে অস্ত যায়,—আবার উঠে, আবার অস্ত যায়; গাছ হইতে ফল ঝরিয়া পৃথিবীর দিকে পড়ে, উপর দিকে যায় না; এ সমস্ত ঘটনা বাহ্য দৃষ্টিতেই আমাদের চোখে পড়ে, বিশেষ পরীক্ষায় আরও কত কত ঘটনা যে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা,—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতিতে নিত্য তাহার পরিচয় পাই, কিন্তু শুধু দেখা আর পর্য্যবেক্ষণেই মানুষ তৃপ্ত নয়—সে ভাবে কেন এমন হয়? এই "কেন এমন হয়" প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াই মানুষের বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়িয়া উঠে। কতকগুলি পর্য্যবেক্ষিত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় এরূপ একটা মতবাদ সে সৃষ্টি করে—আর তাহা লইয়া বিজ্ঞানের কাজ কিছুদিন ধরিয়া চলিতে থাকে। তারপর একদিন দেখা গেল, অনুরূপ কোন কোন ঘটনার ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদ দ্বারা হইয়া উঠে না কিংবা পরীক্ষায় উক্ত মতবাদ এবং প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে অসামঞ্জস্য ধরা পড়িল। তখন আর এই মতবাদ টিকে না, নূতন মতবাদের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ পুরাতনের এক আধটু সংস্কার করিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারা যায় না, দুই একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আগে আমরা আকাশের সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র জ্যোতিষ্কগুলির গতি ব্যাখ্যা করিতাম—এই বলিয়া স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘূর্ণ্যমান গোলকের গায়ে জ্যোতিষ্কগুলী সংলগ্ন রহিয়াছে, যেন এক প্রকাণ্ড ইমারতের গায়ে কতকগুলি বিজলী বাতি। এই বিরাট গোলকের গায়ে চন্দ্র একটা রাস্তা ধরিয়া চলিয়া প্রায় মাসেক পরে পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসে আবার আগের নিয়মে চলে—যেন ঘূর্ণ্যমান গোলকের গায়ে একটা পিপীলিকা দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যের একটা দল আছে—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। সূর্য্য সদলে একটা পথ ধরিয়া চলিয়াছে এবং এক বৎসর পরে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে; তাহার দলের অন্য জ্যোতিষ্কগুলি যে শুধু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলে তা নয়—তাহারা আবার সূর্য্যেরই চারিদিকে ঘুরে। যেন চলন্ত ষ্টীমারের উপর একদল যাত্রী—সূর্য্য বেড়াইতেছে আর দলের অন্যান্য সকল তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে এক একজন সমান দূরে থাকিয়া ঘুরিতেছে। বেশ ব্যাখ্যা, ইহা ছাড়া কি-ই বা আর হইতে পারে? ইহাতো আমাদের চোখের উপরই ঘটিতেছে; কিন্তু এই যে আমরা চোখকে বিশ্বাস করিলাম এইখানেই আমরা মজিলাম বা মরিলাম, আমরা দেখিব যে সত্য পথের সন্ধানে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের শত্রু। আর ইহা জড়জগতে যখন ঠিক তখন কেমন করিয়া বলিব যে অতীন্দ্রিয় রাজ্য নাই এবং অতীন্দ্রিয় আনন্দের সন্ধান বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়া পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয় যে আমাদিগকে ভুল বুঝাইয়াই ক্ষান্ত তাহা নহে আমাদিগকে কুসংস্কারে ও অজ্ঞানের এক হীন আবরণে আবৃত

করিয়া রাখে আর কেহ যখন সত্য লইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয় তখন আমাদের মোহপ্রাপ্ত বুদ্ধি, সত্যকে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সত্যদ্রষ্টাকে পর্যান্ত নির্যাতিত করিতে চায়।

যাহা বলিতেছিলাম, এই মতবাদ লইয়া বিজ্ঞানের কাজ অনেকদিন ধরিয়া চলিল, কেহ ভাবিল না কেমন করিয়া পৃথিবী হইতে বহু সহস্র মাইল দূরের এই অগণ্য জ্যোতিষ্কগুলী ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে। এক কল্পনার ইমারত কি ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে! একটি প্রস্তরখণ্ডকে যখন আমরা দড়ির প্রান্তে বাঁধিয়া ঘুরাই তখন কেন্দ্রের দিকে দড়ির টানটুকু তাহাকে তাহার বৃত্তাকার পথে ধরিয়া রাখে —আবার প্রস্তরখণ্ড যত ভারি হয় এবং গতিবেগ যত বেশি হয় টানও তত বেশি। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী লইয়া এই বিরাট গোলকের ঘূর্ণনও অনুরূপ ব্যাপার; কিন্তু এজন্য যে বিরাট শক্তির প্রয়োজন তাহা কেন্দ্রস্থিত ক্ষুদ্র পৃথিবী কোথা হইতে পায়? এই ক্ষেত্রে ত আমরা এই রকমও ভাবিতে পারিতাম—পৃথিবীই ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে তার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে, আর সেই জন্যই এই সূর্য্য, চন্দ্র, এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলো পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায় বলিয়া মনে হয়, অধিকন্তু পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি ইহারাও এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। বর্ত্তমান যুগে পরীক্ষা দ্বারা দেখান যায় যে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরে, আর এখন বালকও এ সত্য অবগত। কিন্তু পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধে ইহা এবং অন্যান্য সত্য যিনি প্রথম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, মানুষের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার সেই সত্যদ্রষ্টাকে নির্যাতিত করিয়াছে।* যখন নিউটন গতির নিয়ম (Laws of Motion) এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন তখন হইতে বিজ্ঞানের এক নব যুগের আরম্ভ। এতদিন ধরিয়া বিজ্ঞানের কাজ-কারবার ইহা দিয়াই চলিতেছিল কিন্তু যখন ইহা দ্বারা কোন কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইতে চাহিল না তখন কি করিয়া নূতন আপেক্ষিতাবাদের আবিষ্কার হইল তাহাই আমাদের বক্তব্য।

মনে করা যাউক, আজ ১২ টার সময় একটা ঘড়ি মিলাইয়া লইয়া অতিবেগে ধাবমান (সেকেণ্ডে লক্ষাধিক মাইল যার বেগ) কোন রেলগাড়ীতে একখানা মাপকাঠিসহ একজন লোক চড়িয়া বসিল, আর রেল লাইনের সর্ব্বত্রই লোক রহিয়াছে এবং সকলের ঘড়িতেই এক সঙ্গে ১২টা বাজে, রেল লাইনে দাঁড়াইয়া রেলগাড়ীর স্থান কালের আমরা যে ধারণা করিব তাহা আশ্চর্য্য রকমের হইবে। গাড়ীর গতির দিকে কোন জিনিষের দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম দেখাইবে, আড়াআড়ি দিকে মাপের কোন ব্যতিক্রম হইবে না; সেখানকার সময়-পরিমাণ হইতে আমাদের সময়-পরিমাণ দীর্ঘতর হইবে, গাড়ীর গোল প্লেটগুলি রেল লাইনে দাঁড়াইয়া ডিম্বাকৃতি দেখাইবে। গাড়ীর বেগ যদি সেকেণ্ডে ১,৪৮,০০০ মাইল হয়, তবে গাড়ীতে বসিয়া মাপিলে গাড়ীস্থ যে কাঠির দৈর্ঘ্য ১০০ হাত, রেল লাইনে দাঁড়াইয়া মাপিলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ৬০ হাত মাত্র। রেলগাড়ীর লোক যদি আমাদিগকে ডাকিয়া বলে যে তার ঘড়িতে ১টা, আমাদের ঘড়িতে তখন দেখিব ১টা বাজিয়া ৪০ মিনিট। আলোকের গতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০

* টলেমি (১৪৭৩—১৫৪৩) প্রথমে এই সত্য উপলব্ধি করেন, গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২) তাঁহার রচনায় ও কাজে ইহা প্রচার করেন—এজন্য তাঁহাকে নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল।

মাইল। যদি একজন লোককে হাউইএর ভিতর পুরিয়া আলোকের গতির কিছু কম বেগে পৃথিবী হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং আমাদেব পার্থিব সময়ের এক শতাব্দী পরে সে ফিরিয়া আসে তবে এই দীর্ঘ যাত্রার সময় তার ঘড়ির হিসাবে একদিন কি দুইদিন মাত্র। সেই যে দেবতাদেব একদিন মানুষেব এক বৎসর বলিয়া একটা কথা আছে, তবে কি দেবতাবা খুব বেগে ধাবমান লোক-নয়নের অগোচর কোন রাজ্যে আছেন? সুধী পাঠক এই বিষয় ভাবিয়া দেখিতে পাবেন।

অনেকেই জানেন যে আইন্‌ষ্টাইন্ আপেক্ষিকতা-বাদেব প্রবর্ত্তক। কি কাবণে আইন্‌ষ্টাইন্ স্থান ও সময় পবস্পব সাপেক্ষ এই কথা ভাবিতে গেলেন তাহাই বলিব। একখানা গাড়ী যদি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটে আব গাডীতে যদি একজন লোক গাডীব গতিব দিকে ৩ মাইল বেগে হাঁটে তবে আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্রানুসাবে লোকটি ৩৩ মাইল বেগে ছুটে এবং ইহাতে যে কিছুমাত্র ভুল থাকিতে পাবে তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। একই বকম হিসাবে একটা ধাবমান বেল-গাড়ীতে আলোকেব গতিবেগ গাড়ীর গতিবেগ সাপেক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। দেখা গেল আলোকেব গতিবেগ সকল অবস্থাতে এবং সকল-দিকে এক—সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এই সমস্যাব কি করিয়া মীমাংসা হয়? কেহ কেহ এরূপ কল্পনা করিতে চাহিলেন যে গাড়ীব গতিবেগ যেমন বাড়ে, সেই অনুপাতে একটা নিয়মাধীনে মাপকাঠিটি ছোট হইয়া যায় এবং আমরা সর্ব্বত্রই আলোকের গতিবেগ একই পাই, কিন্তু আইন্-ষ্টাইনের ব্যাখ্যাতেই আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি।

বিচাব করিয়া দেখা যাউক, পবীক্ষায় আলোকের গতি সকল ক্ষেত্রেই এক পাওয়া যাইতেছে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে আমরা দেখি—রাম রেল লাইনে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে গাড়ী ৫০ মাইল বেগে ছুটিয়াছে; রেলগাড়ীতে বসি... শ্যাম যদি বলে যে রেললাইন ৫০ মাইল বে... (বিপরীত দিকে) ছুটিয়াছে তবে গণিতের হিসাবে কিছুই ভুল হয় না, বিশদভাবে এরূপও ভাবা যায় কতকগুলি রেলগাড়ীই যেন নানাদিকে ছুটিতেছে। গাড়ীর চালক গাড়ী চালাইতেছে কি না তাহা যেন গাড়ীর লোক অবগত নহে—গাড়ী চলুক অথবা না চলুক গাড়ীর লোকেব মনে হয় সে যেন স্থির বসিয়া আছে, অন্যান্য গাডীগুলি বিভিন্ন বেগে ছুটিয়াছে। বাম একগাড়ীতে বসিয়া অন্য গাড়ীকে ৫০ মাইল বেগে ছুটিতে দেখে, আবার সেই গাড়ীব লোক তাহাব গাড়ীকে (বিপরীত দিকে) ৫০ মাইল বেগে ছুটিতে দেখিবে। এখানে দুজনেরই সমান অধিকাব আছে বলিবাব যে অপরে ৫০ মাইল বেগে ছুটিতেছে, আমি স্থির আছি। এই বিশাল বিশ্বেব ব্যাপার ঠিক তাই নয় কি? এক একটা নক্ষত্রলোককে এরূপ এক একটা ধাবমান রেলগাড়ী ভাবিলেই ইহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম হয়, অণুব ভিতবে ইলেক্‌ট্রনের ভীষণ বেগে ছুটাছুটি অনুরূপ ব্যাপার। সে যাহা হউক, আলোকের গতি রেল লাইন হইতে অথবা যে কোন বেলগাড়ীতে বসিয়া মাপিলে একই পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের মাপকাঠি এবং সময়-পরিমাপের মধ্যেই কোথাও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। এতদিন আমরা এ রাজ্যের মাপকাঠি দিয়া ও রাজ্যের জিনিষ মাপিলে যে কিছু ভুল হইতে পারে তাহা ভাবি নাই। সময় পরিমাপের বেলাও সে রাজ্যের ঘটনাকে আমার ঘড়ি দিয়া হিসাব করিলে যে ত্রুটি হয় তাহা দেখি নাই, কিন্তু আইন্‌ষ্টাইনের কাছে এরূপ কোন স্বতঃসিদ্ধের স্থান নাই। এখানেই ত আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে ঠকাইয়াছে —এখানেই আমরা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়াছি। আইন্‌ষ্টাইন বলিলেন যে গোড়াতেই

না পরীক্ষায় এ রকম একটা স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া বি কেন? পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রচলিত শ্বাসের ব্যত্যয় ঘটিতে দেখিলেন, এ রাজ্যের মাপকাঠি এবং ঘড়ি দিয়া এ রাজ্যের জিনিষ এবং সময় পরিমাপ করিলে সে রাজ্যের মাপ হইতে তফাৎ হয়, উভয় ক্ষেত্রেই তফাৎএর পরিমাণ তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে ৩০ মাইল বেগে ধাবমান রেলগাড়ীতে যে তিন মাইল বেগে হাঁটিতেছে, রেল লাইনে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবেগ বলার মধ্যেও ভুল আছে। আইন্-ষ্টাইনের হিসাবের মূলসূত্র—আলোকের গতি (যেখানে থাকিয়াই মাপা যাউক না কেন) সকল রাজ্যে (এবং সকল দিকে) সমান, এই সূত্র ধরিয়া তিনি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন—প্রকৃতির নিয়মগুলি সকল রাজ্যেই এক—"If two systems of reference body are moving relatively to each other then all laws of nature are the same for both systems" তারপর তিনি অন্যান্য প্রকৃতির নিয়ম লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই পরীক্ষায় পদার্থের বস্তু পরিমাণে (mass) ও দুই রাজ্যের মাপে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপে বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের সম্বন্ধের মধ্যেও নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রেই এক একটা রাজ্য সমগতিতে সোজা পথে চলিতেছে ধরা হইয়াছিল এবং প্রকৃতির নিয়ম ঐ সকল রাজ্যেই এক, পরে আইন্‌ষ্টাইন্ ভাবিলেন, এ পক্ষপাতিত্বই বা কেন? পরীক্ষা করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন ইহার কোন প্রয়োজন নাই, যে রকমের গতিই হউক না কেন, প্রকৃতির নিয়ম সকল রাজ্যে এক। এখানে আবার তিনি দেখিতে পাইলেন যে বাস্তব জগৎ ইউক্লিডের জ্যামিতি মানিয়া চলে এই স্বতঃ-সিদ্ধ কল্পনা করিয়াই মানুষ যত গোলে পড়িয়াছিল। তারপর মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। এইভাবে আইন্‌ষ্টাইন্ স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ সত্যকে—Absoluteকে ধরিবার আভাস পাইলেন।

এখন কথা হইতেছে, ৩০ মাইল বেগে ধাবমান গাড়ীতে একজন লোক ৩ মাইল বেগে হাঁটিলে তার গতিবেগ রেল লাইন হইতে ৩৩ মাইল বলার মধ্যে যে ভুল এবং অন্যান্য অনুরূপ ভুল এতদিন ধরা পড়ে নাই কেন? তাহার কারণ—এই ভুলগুলি এত নগণ্য যে আমাদের মাপযন্ত্রে ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই, তবে গাড়ীখানা যদি সেকেণ্ডে লক্ষাধিক মাইল বেগে ছুটিত তাহা হইলে আমাদের মাপযন্ত্রে এই ভুল ধরা পড়িত। তাহাই যদি হয় তবে আপেক্ষিকতাবাদের সার্থকতা কোথায় এবং ব্যবহারিক জগতে তার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যদিও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয় তথাপি এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই ব্যবহারিক জগতে আপেক্ষিকতা-বাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে। তড়িৎ-গতিশাস্ত্রের উন্নতি, মানবিক গঠন পর্য্যালোচনা আপেক্ষিকতাবাদের উপরই নির্ভর করে—নিউটনের গতিশাস্ত্র সেখানে এক রকম অচল। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে লোককে সংস্কারের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আইন্‌ষ্টাইন্ যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা তাঁহার এক বড় দান।

প্রাচীন ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সম্বন্ধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত বলিতে এদেশে আজকাল সকলেই উত্তরভারত প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত বুঝিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বহু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ – সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই কি ভারতের যথার্থ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত? কথাটা বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য। বিষয়টি কিয়ৎপরিমাণে অবান্তর হইলেও ইহার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং আমরা প্রথমে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পরে প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

ইংরেজী ভাষায় গ্রীস ও রোম দেশীয় প্রাচীন উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধে 'ক্ল্যাসিক্যাল' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেই আদর্শে এ দেশেও এখন প্রাচীন সাহিত্য ও কাব্যকলাকে 'ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচার' বলা হয়; এই প্রণালীতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেও প্রাচীন মনে করিয়া 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যে দেশের সিদ্ধান্ত—সামবেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, যে দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের আদিগুরু ভগবান্ মহেশ্বর, নারদ, মতঙ্গ, কোহল প্রভৃতি ঋষিসমাজ যে দেশের সঙ্গীতাচার্য্য, ভরত মুনি যে দেশের সঙ্গীতশাস্ত্র-রচয়িতা, সে দেশে মুসলমান নরপতিগণের রাজত্ব-কালে প্রবর্ত্তিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বুঝাইতে 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' শব্দের প্রয়োগ কি নিতান্তই অপপ্রয়োগ নহে?

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একটি বিদেশী ইংরেজ মহিলা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ বিবৃতির একস্থানে লিখিয়াছিলেন—হিন্দুস্থানী কলাবিদ্‌গণের 'ঘরওয়ানা' নামে যে রাগ-রাগিনীগুলি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বুঝা যায় না। ভারতীয় সঙ্গীতের সে বৈশিষ্ট্য 'নিহিতং গুহায়াম্'—সাধু মহাত্মাদের আনুগত্য করিয়া তাঁহাদের নিকট সঙ্গীতোপদেশ লাভ করিবার সুযোগ যাঁহাদের জীবনে ঘটিয়াছে তাঁহারাই ভারতীয় সঙ্গীতের সে বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিয়াছেন। এই বিদুষীর বক্তব্যে দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে—ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতকলাবিদ্ তানসেন সাধু হরিদাস স্বামীর নিকটেই ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি লাভ করিয়া এদেশে অনন্যসাধারণ কলাবিদ্ হইয়াছিলেন। পরিশেষে যাঁহার নিকট তৎকাল প্রচলিত সঙ্গীতের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীতকলায় পূর্ণতালাভ করেন, তিনিও একজন মুসলমান পীর-ফকির। ফলতঃ আমাদেরও মনে হয়—কি আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের উদ্দীপনে, কি লোকহিত সম্পাদনে সকল বিষয়েই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের একাধার এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপদ্ধতি। ইহা বৈশিষ্ট্যেও যেমন অদ্বিতীয়, প্রাচীনতায়ও তেমনই অতুলনীয়, সুতরাং এই শাস্ত্রব্যাখ্যাত ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীতই 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

আবার কেহ বলেন—নিয়মানুগ যে কোন সঙ্গীতকেই 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' বলা যাইতে পারে। অবিচারে এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যাইবে,—এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন সঙ্গীতই স্থায়ী কোন নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া চলে না। কাল ও রুচির ভেদে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া দেশী সঙ্গীত নিত্যই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে। নিয়মানুগ রহিয়াছে কেবল বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পদ্ধতিই।

'ক্ল্যাসিক্যাল' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও কথা

তুলনীয়—এদেশের লোক যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' বলেন, দাক্ষিণাত্যবাসিগণও তেমনই কর্ণাটকী সঙ্গীতকে 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' বলেন বা বলিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় এক ভারতবর্ষেই ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত দাঁড়াইতেছে অন্ততঃ দুইরূপ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও কর্ণাটকী সঙ্গীত। ইহা কোন দিক হইতেই সুশোভন নহে। তদপেক্ষা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত বলিয়া সম্প্রদায়-ভেদে তাহারই দুইটি ধারা ভারতবর্ষের উত্তরা খণ্ড ও দাক্ষিণাপথে প্রবাহিত হইয়াছে বলিলেই কথাটা সুসমীচীন হয়। অধুনা সম্প্রদায় বিলোপে যদিও এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি আমাদের অনধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে, যদিও কচিৎ নিম্নপরিবর্ত্তনে এই সঙ্গীত জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমাদের মনে হয়—এমন একটা সুসমৃদ্ধ পদ্ধতিকে আমাদের অনুশীলনে অপাঙক্তেয় করিয়া রাখা শুধু অসঙ্গতই নহে, ইহা সঙ্গীতকলার ক্রমোন্নতিরও পরিপন্থী।

যাহা হউক, এইবার আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করিব। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে ক্রম-নিম্ন এই সাতটি স্তর বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহার সর্ব্বোচ্চ স্তরে (১) ধ্রুপদ (২) ধামার (ধামার তালে ব্যবহৃত হোরী প্রভৃতি গীত) (৩) ঝাঁপতালে ব্যবহৃত সাদ্রা (৪) প্রাচীন খেয়াল (৫) টপ্পা (৬) ঠুম্‌রি (৭) গজল, কাওয়ালী প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকার সঙ্গীতকে এবং বিশেষভাবে ধ্রুপদকেই 'ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক' বলা হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত, সুতরাং এই কয় প্রকার হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ক্ল্যাসিক্যাল আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই। আমাদের মনে হয় প্রথমোক্ত যে তিন শ্রেণীর সঙ্গীত ক্ল্যাসিক্যাল সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই অপভ্রংশ বা রূপান্তর। আমরা বিশেষভাবে ধ্রুপদকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি। এই ধ্রুপদ রত্নাকর-ব্যাখ্যাত 'ধ্রুব' বা ধ্রুবক নামক প্রবন্ধগীতিরই কাল-পরিবর্ত্তিত রূপান্তর মাত্র। এই ধ্রুবকই সঙ্গীত পারিজাতে 'ধ্রুবপদ' নামে অভিহিত হইয়াছে। পারিজাত বলেন 'উত্তরাদিকর্ভাষাভির্যত্তু ধ্রুবপদং স্মৃতম্।' অর্থাৎ উত্তরভারত প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় নিবদ্ধ প্রবন্ধ-গীতিকে 'ধ্রুবপদ' বলে। মনে হয় সঙ্গীত-রত্নাকরের ধ্রুবক পারিজাতে 'ধ্রুবপদ' নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহাই হিন্দুস্থানী 'ধ্রুপদ', ও তাহারই অপভ্রংশ 'ধুরপদ'। তৎপর তাহাই বাঙ্‌লায় আসিয়া ধ্রুপদরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে।

পারিজাতে ধ্রুবপদের বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও সঙ্গীত রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে ধ্রুবক প্রবন্ধের বিস্তৃত বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা রত্নাকর বর্ণিত প্রবন্ধ গীতের সাধারণ পরিচয় উল্লেখপূর্ব্বক মর্ম্মানুবাদ সহ এই বর্ণনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সঙ্গীত রত্নাকরে প্রবন্ধ গীতের সাধারণ পরিচয় প্রদানকল্পে যাহা বলা হইয়াছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—

শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়রঞ্জক স্বর সন্দর্ভকে গীত বলে। এই গীত দুই প্রকার (১) গান্ধর্ব্ব ও (২) গান। গন্ধর্ব্বগণের গেয় অপৌরুষেয় গীতকে 'গান্ধর্ব্ব' বলে। রত্নাকরে জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তর ভাষা পর্য্যন্ত যে গীতসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই গান্ধর্ব্বগীত। আর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ অনুসরণে আধুনিক লেখকগণ যে গীত রচনা করেন, তাহাকেই গান বলে। দেশী গীতসমূহ এই গানেরই অন্তর্গত এই গান দুই প্রকার—নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। ধাতু ও অঙ্গযুক্ত গানকে নিবদ্ধ গান বলে। নিবদ্ধ গানের বন্ধনহীন আলপ্তিকে অনিবদ্ধ গান বলে। নিবদ্ধ গানের উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক প্রভৃতি অবয়বের নাম

ধাতু। এই অবয়বসমূহ সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত (১) উদ্‌গ্রাহ (২) মেলাপক (৩) ধ্রুব ও (৪) আভোগ। সালগ-সূড় নামে আরও এক প্রকার গান আছে তাহাতে ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অন্তর নামে আরও একটি অবয়ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গান বা প্রবন্ধ পুনরায় দুই প্রকার—নির্যুক্ত ও অনির্যুক্ত। যাহাতে ছন্দ ও তালাদির নিয়ম আছে তাহার নাম নির্যুক্ত, যাহাতে ছন্দ ও তালাদির নিয়ম নাই এমন প্রবন্ধকে অনির্যুক্ত প্রবন্ধ বলে। এইরূপ প্রবন্ধ আবার তিন প্রকার—(১) সূড (২) আলি সংশ্রয় ও (৩) বিপ্রকীর্ণ। সূড় প্রবন্ধ আবার শুদ্ধ ও ছায়ালগ (সালগ) নামে দুই প্রকার। তন্মধ্যে রত্নাকরের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত জাতি, কপাল, কম্বল, গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা এই গানগুলি শুদ্ধসূড় গানের অন্তর্গত। আর ছায়ালগ বা সালগ-সূড়-প্রবন্ধ গান বা দেশী গীতের অন্তর্গত। শুদ্ধ সঙ্গীতের ছায়াযুক্ত বলিয়া এই শ্রেণীর গীতকে ছায়ালগ বা সালগ-সূড় বলা হয়। সালগ সূড় গান, ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাস ও একতালী নামে সাতপ্রকার। আমাদের আলোচ্য 'ধ্রুপদ' এই ধ্রুব বা ধ্রুবকেরই রূপান্তরিত নাম মাত্র। ধ্রুব গানের নিম্নোক্ত লক্ষণ সঙ্গীত রত্নাকরে লিখিত হইয়াছে—

> একধাতুর্দ্বিখণ্ডঃ স্যাদ্ যত্রোদ্‌গ্রাহস্ততঃ পরম্।
> কিঞ্চিদুচ্চং ভবেৎখণ্ডং দ্বিরভ্যস্তমিদং ত্রয়ম্॥
> ততো দ্বিখণ্ড আভোগস্তস্যাৎ খণ্ডমাদিমম্।
> একধাতু দ্বিখণ্ডক খণ্ডমুচ্চতরং পরম্॥
> স্তুত্য নামাঙ্কিতশ্চাসৌ কচিদ্বৈচেক খণ্ডকঃ।
> উদ্‌গ্রাহস্যাস্য খণ্ডে ন্যাসঃ স ধ্রুবকো ভবেৎ॥

যে গানে দুইটি খণ্ড লইয়া উদ্‌গ্রাহরূপ একটি ধাতু রচিত, যে গানে কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে তৃতীয় খণ্ডটি গান করিয়া প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি খণ্ড দুইবার গান করিতে হয়। তৎপর দুইটি খণ্ডে ইহার যে আভোগ রচিত হয়, তাহার প্রথম খণ্ডটি এক ধাতুবিশিষ্ট। তারপর দুই খণ্ড, তৎপর উচ্চস্বরে গেয় একটি খণ্ড তৎপর স্তবনীয় ব্যক্তির নামাঙ্কিত একটি খণ্ড কোথাও পরিলক্ষিত হয়—এইরূপে গান করিয়া পুনরায় উদ্‌গ্রাহের প্রথম খণ্ডে যে গানের ন্যাস বা পরিসমাপ্তি হয়, তাহাকে ধ্রুবক বা ধ্রুবগান বলে। এই ধ্রুবক এক পদ হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়্‌বিংশতি পদ পর্যন্ত ক্রমিক এক এক পদ বৃদ্ধির নিয়মে ষোল প্রকার। তন্মধ্যে একাদশ পদযুক্ত ধ্রুবকের নাম জয়ন্ত, দ্বাদশ পদ ধ্রুবকের নাম শেখর। এইরূপ আরও চৌদ্দ প্রকার ধ্রুবকের নাম ও সকলগুলির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া পরিশেষে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—

> যথোক্তান্ যো জয়ন্তাদীন্ গায়েন্ নিপুণয়া ধিয়া।
> সর্ব্ব ক্রতুফলং তস্যেত্যাবাচ মুনি সত্তমঃ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ ভরত বলিয়াছেন—যিনি নিপুণ বুদ্ধি সহযোগে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত জয়ন্ত শেখর প্রভৃতি ষোল প্রকার 'ধ্রুব' গান করেন, তিনি সকল প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সঙ্গীত রত্নাকরের উদ্ধৃত বিবৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায়—অধুনিক ধ্রুপদ সঙ্গীত যেমন আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি অবয়বে গঠিত হইয়া থাকে, প্রাচীন ধ্রুব প্রভৃতি প্রবন্ধ সঙ্গীত ও সাধারণতঃ সেইরূপ উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, অন্তর ও আভোগ এই চারিটি ধাতুতে রচিত হইত। কালক্রমে দুইটি অবয়বের নাম পরিবর্ত্তিত হইলেও অন্তর ও আভোগ এই দুইটি নাম এখনও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই রহিয়াছে। আধুনিক ধ্রুপদ যেমন বিভিন্ন রসের অভিব্যঞ্জনায় বিভিন্ন তালে বাদিত হয়, প্রাচীন ধ্রুবকও তেমনই বিভিন্ন রসে ভিন্ন ভিন্ন তালে প্রযুক্ত হইত। সুতরাং আমাদের মনে হয়—শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ধ্রুবক বা ধ্রুবপদ গানই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান 'ধ্রুপদ' আকারে পরিণত হইয়াছে। কেবল ধ্রুপদ নহে, বর্ত্তমান রাগ-রাগিণী বা প্রবন্ধ গীতিসমূহ ও প্রাচীন শাস্ত্রীয় গীতেরই রূপান্তরিত পরিণতি মাত্র। অতীত বীজের পরিণতি যেমন পুষ্প ফল সুশোভিত বর্ত্তমান বৃক্ষ সেইরূপ। বৃক্ষ খুঁজিলে বীজের সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং বীজের পরিণতি বৃক্ষ নহে এই ধারণা যেমন হাস্যোদ্দীপক, বর্ত্তমান সঙ্গীত প্রাচীন সঙ্গীতের সর্ব্বথা সম্বন্ধশূন্য এই সিদ্ধান্তও তেমনই হাস্যজনক। স্নানে পানে ও অবগাহনে গঙ্গাজল তৃপ্তিকর কিন্তু তাই বলিয়া সে তৃপ্তির অতিরঞ্জনে যেমন গঙ্গোত্তরী অস্বীকার করা যায় না, তেমনি ধ্রুপদ প্রভৃতি বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুলির উৎস যে প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

মধ্যরজনীর সূর্য্য]　　　　[সেলা পোলারিয়ো জাহাজ হইতে গৃহীত। দণ্ডায়মান স্বামী নিখিলানন্দ

আমি ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক হইতে ইউরোপ ভ্রমণে যাই এবং মেরু মণ্ডল (Arctic Circle) অতিক্রম করিয়া ইউরোপের উত্তরতম প্রদেশ, নরওয়ের উপবিভাগে অবস্থিত নর্থকেপ্ অঞ্চলে উপস্থিত হই। নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়ে যখন আরোহণ করি তখন ঘড়িতে রাত্রি ১১টা। অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্মুখের মেঘখণ্ড সরিয়া গেল এবং বিচিত্র রঙের মেঘমালার ভিতর হইতে রক্তরাগরঞ্জিত গোলকের মত সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! দুই এক মিনিটের মধ্যে সূর্য্য উপরে উঠিতে লাগিল, পরিষ্কার দিবালোকে আমরা জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম, তখন মধ্যরাত্রি, আকাশে তারা নাই, অন্ধকারও নাই। আমাদের সম্মুখে উত্তরমেরু সাগরের কাল জল, পশ্চাতে ইউরোপের ভূমিখণ্ড। মধ্যরজনীর সূর্য্য ১১ই মে হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে এই অঞ্চলে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না। সহস্র সহস্র দর্শক মধ্য-রজনীর সূর্য্য দেখিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন।

স্বামী নিখিলানন্দ

ধর্ম্ম ও সমাজ

স্বামী রমানন্দ

সমাজের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ এবং ধর্ম্মের সঙ্গেই বা সমাজের কি সম্বন্ধ আবার ধর্ম্ম বলিতে আমরা কি বুঝি আর সমাজ বলিতেই বা কি মনে হয় তাহাই এই নিবন্ধে আলোচ্য। সমাজ শব্দের পর্য্যায়— সমূহ বা সমষ্টি। ধর্ম্ম বলিতে আমরা বুঝি, যাহা ধারণ করিয়া রাখে—ধারণাৎ ধর্ম্মঃ; যাহা আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই আমাদের ধর্ম্ম, যে জিনিষ ছাড়া আমরা অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারি না তাহাই আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে, কাজেই তাহাই ধর্ম্ম।

বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি এই দৃশ্য জগৎ যাহার সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ এবং যাহা ছাড়া আমরা কোন কিছু কল্পনা করিতে পারি না, তাহা চিরকালই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে অর্থাৎ এক কথায় তাহা নিত্য। বেদান্ত বলেন, কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না, অর্থাৎ মৃত্তিকা না থাকিলে কোন কালেই মৃন্ময় দ্রব্য হইতে পারে না। আমরা আজ যে জিনিষ দেখিতে পাই তাহার মূলকারণ চিরকালই ছিল এবং চিরকালই থাকিবে, মাত্র প্রকাশের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এইভাবে স্থূল পঞ্চভূত—মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং তাঁহাদের গুণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ হইতে ভিন্ন আর কোন কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কাল-প্রবাহে এই বৈচিত্র্যময় জগতে কোথাও বা সমগুণবিশিষ্ট কোথাও আংশিক গুণবিশিষ্ট কোথাও বা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট ন সূক্ষ্ম কত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে—সকলই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ও গুণের অধীন থাকিয়াই নানাভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে।

এইভাবেই সবকিছু চিরকাল চলিতেছে। কারণ ছাড়া যেমন কার্য্য হয় না আবার উদ্দেশ্য ছাড়াও কোন কিছুই সৃষ্ট হয় না। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী দ্রব্যবিশেষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকি। মোটর গাড়ী প্রেমিককে প্রেমাস্পদের নিকট দ্রুত পৌঁছাইয়া দেয়, সৈনিককে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছায় এই মাত্র পার্থক্য। প্রত্যেক জিনিষই কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় হইবেই হইবে। এইভাবে মানুষেরও পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজন দেখা যায়। অত্যন্ত হীনচরিত্র মানুষকেও তাহার স্ত্রী পুত্র পিতামাতার প্রয়োজন। দস্যু রত্নাকর আত্মীয় পরিজনের নিকট দস্যু ছিল না, পরম প্রেমিক স্বজন বলিয়াই তাঁহারা তাহাকে দেখিতেন। একটু বিচার করিলেই আমরা দেখিতে পাই—আমরা প্রয়োজনের সংখ্যা বা মাত্রা কমাইতে চেষ্টা করিলেও কোনকালেই একেবারে নিঃসঙ্গ হইতে পারি না; যতক্ষণ মানুষের আমি ও আমার বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ কেহই অন্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না।

এই যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ইহাই আমাদিগকে অন্যের অধীন করিয়া দিতেছে। এই অধীনতা গৃহস্থ সন্ন্যাসী সকলেই অল্পবিস্তর রহিয়াছে। গৃহস্থকে গৃহস্থ সমাজের সঙ্গে চলিতে হয় এবং সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসী সমাজের অধীনে থাকিতে হয়, ইহার ব্যতিক্রমে কাহারও কল্যাণ হইতে পারে না।

এই সমাজ জীবন হইতে আমরা সুযোগ, অভিপ্রায় ও চেষ্টানুযায়ী শিক্ষাদি লাভ করিয়া থাকি—কেহবা চরিত্রবান হইয়া অধিক লোকের সম্মানার্হ হয় আবার কেহবা গর্হিত কর্ম্মের ফলে বহুলোকের ঘৃণার্হ হয়।

মানুষ কিন্তু প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী আইন কানুন প্রস্তুত করে। চিরকালই সাধারণ আইন কানুন পরিবর্ত্তন হয়। অনভিজ্ঞ সমাজ-সংস্কারক কিন্তু অনেক সময়ই ভুলিয়া যান যে তিনি যাহা শ্রেষ্ঠ আইন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন তাহাও অল্প কাল মধ্যেই অন্য সংস্কারক আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবেন। তবে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সংস্কারক উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই দীর্ঘ কালের জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এই প্রকার নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এই দেশের প্রকৃত সংস্কারক গণের কিন্তু দূরদৃষ্টি খুব বেশী ছিল। এখনও আমাদের সমাজ অনেকাংশে তাঁহাদিগকে মানিয়াই চলিতেছে তাহাও দেখা যায়। এই দেশের পক্ষে তো কথাই নাই যে কোন দেশেই এখানকার সামাজিক নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়ম কানুন সংশোধিত আকারে গৃহীত হইতে পারে। সংক্ষেপে তাহাই আলোচ্য।

হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ লাভের অনুকূল ভাবেই গঠিত হইয়াছিল। সকলের পক্ষেই সব কিছু লাভ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ ছিল—মাত্র অবস্থামত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতীয় যুগকে বৈদিক যুগ বলা যায়। শাস্ত্র নির্দ্দেশিত মতে জীবন গঠন করা সেই যুগে স্বাভাবিকই ছিল। রাজাগণ এবং জনসাধারণ সকলই সেইযুগে ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। ঐহিকভোগের সঙ্গে সঙ্গে পরকালের জন্য ধর্ম্মলাভের যাবতীয় ব্যবস্থাই বৈদিক বিধিনিষেধ অনুসারে সকলে পালন করিতেন। সেই যুগে সকলই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতেন, তাই ভ্রান্ত পথে চলিবার কোনই কারণ ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ কাহাকে বলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ধর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম। সামান্য ধর্ম্ম মানুষমাত্রেরই অর্জ্জন করার ব্যবস্থা ছিল। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (পরদ্রব্য হরণ না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এইগুলি সামান্য ধর্ম্ম। বিশেষ ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম অনুযায়ী বেদ নির্দ্দেশ মত যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলন। অর্থবান ও বিশেষ মেধাবী ব্যক্তি ছাড়া যাগযজ্ঞাদি বা বেদাধ্যয়ন সম্ভবপর হইত না।

যে যে গুণকে সামান্য ধর্ম্ম বলা হইল ঐগুলি যদি শৈশব হইতেই মানুষের আদর্শ হয় তবে স্বভাবতই জীবন সৎ আদর্শে গঠিত হইতে পারে। অথচ উক্ত আদর্শ মানুষ মাত্রেরই পালনীয় ছিল বলিয়া সমাজে পরস্পরের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকিত।

অর্থ সম্বন্ধে ব্যবস্থা ছিল অতি সুন্দর। যোগ্যতা অনুসারেই অর্থ উপার্জ্জন মানুষ করে কিন্তু ব্যয়ের দিকে একটা নীতি পালন করিলে বিশেষ সুবিধা হয়। অর্জ্জিতার্থের অর্দ্ধাংশের ভোগ, এক-চতুর্থাংশের সঞ্চয় এবং অপর চতুর্থাংশ ধর্ম্মার্থে—দান প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যয়—ইহাই অর্থের সম্বন্ধে নিয়ম ছিল।

কাম শব্দের অর্থ—অভিমত অভিলাষ বাঞ্ছা ইষ্ট অভিপ্রায় ইত্যাদি। সকল প্রকার কামনাই ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত ছাড়া অন্য জিনিষে কামনা করার নিয়ম ছিল না। ঐ জাতীয় উপভোগ দ্বারা মানুষের মন ক্রমে সংযত হইতে সুযোগ পাইত এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্তির দিকেই অগ্রসর হইত। বিচারজাত উপভোগ ক্রমে মানুষকে শান্ত করে এবং ধীরে ধীরে বাসনা কামনা

-হতে মুক্ত করিতে পারে। কামকে এই জন্যই ;তীয় পুরুষার্থ বলা হয়।

এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় উক্তি :—

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যঃ ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়া সাধ্যঃ সগুণোহধর্ম্ম ইষ্যতে।

তাৎপর্য্য—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে মানুষের সুখ উৎপত্তি হয় এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে দুঃখই জন্মে। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, 'শুভকর্ম্মে শুভ মন্দে মন্দ ফল, এ নিয়ম বোধে নাহি কারও বল।'

পরমপুরুষার্থ মোক্ষ। ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আত্মজ্ঞান লাভ করা বা আত্মার স্বরূপে অবস্থান করাকেই মুক্তি বলে। শাস্ত্রোক্তি—

'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'

স্বামী বিবেকানন্দও ধর্ম্মের সংজ্ঞা এই প্রকারই করিয়াছেন: 'মানুষের ভিতরে যে দেবত্ব রহিয়াছে তাহার প্রকাশই ধর্ম্ম।' বেদান্ত ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়াছেন।

নিষ্কাম কর্ম্ম, বিগ্রহ বিশেষ ঈশ্বরের প্রতীক কল্পনা করিয়া ভক্তিসহ সেবা পূজাদি, সংযত দেহমন দ্বারা গুরুর উপদেশমত ধ্যানাদিযোগ ও যাহাদের বাসনা কামনা এক প্রকার নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে বেদান্তোক্ত বিচার দ্বারা সর্ব্বদা আত্ম-লাভের চেষ্টা—উক্ত যে কোন পথ অবলম্বন করিয়া মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন।

হিন্দু জাতির প্রাচীন সমাজের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত আদর্শ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির ঐতিহাসিকতা কেহ অবিশ্বাস করিলেও হাজারহাজার বৎসর পূর্ব্বে যদি কোন কোন লেখক শুধু কল্পনা হইতেই এত উচ্চ আদর্শ চরিত্রের অঙ্কন করিয়া থাকেন তবে ঐ লেখকদের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কারণ তাঁহাদের কল্পিত আদর্শে গঠিত জীবন হইতে সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণই সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে নৈতিক আদর্শ কত উচ্চ ছিল, শ্রুতির দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

প্রাচীনশাল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছু কয়েকজন ঋষি ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার নিজের রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—

ন মে জনপদে স্তেনঃ পরস্বহর্ত্তা, ন কদর্য্যঃ অদাতা সতি বিভবে, ন মদ্যপঃ দ্বিজোত্তমঃ সন্, ন অনাহিতাগ্নিঃ শতগুঃ, ন অবিদ্বান্ অধিকারানুরূপম, ন স্বৈরি পরদারেষু গন্তা, অতএব স্বৈরিণী কুতঃ? ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য—আমার রাজ্যে পরধনহারী চোর নাই, বিত্ত থাকা সত্বেও অপরকে দান করে না এমন লোক নাই, দ্বিজাতির মধ্যে মদ্যপায়ী নাই, যাহাদের যথেষ্ট গাভী আছে তাহারা সকলই শাস্ত্রোক্ত যাগাদি করে, নিজের অধিকার-সম্মত বিদ্যা লাভ করে না এমন লোক নাই, কোন ব্যভিচারী পুরুষ না থাকায় রাজ্যে ভ্রষ্টা চরিত্রা নারী নাই, ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী রামায়ণযুগেও দেশের অবস্থা কত উন্নত ছিল তাহা অনেকেই জানেন। ধর্ম্ম রাজনীতি সমাজনীতি সর্ব্ববিষয়ে সমাজ অত্যন্ত উন্নত ছিল। মানুষ মাত্রেই জীবনের উদ্দেশ্য অবগত ছিল, তাহার নিদর্শন সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। মহাভারতীয় যুগও ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কাল। রাজারা সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, প্রৌঢ়াবস্থায় বানপ্রস্থ ও বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে উন্নত সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য হইতেই অসংখ্য ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রাচীনকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কৃপাতেই যাবতীয় শাস্ত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগেও ভারতীয় সমাজ কত উন্নত ছিল তাহা আলোচনা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। রাজা চন্দ্রগুপ্তের (মৌর্য্য) রাজত্বকালে গ্রীক্ দূত মেগাস্তেনিস দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া এই দেশের সর্ব্বপ্রকার তথ্য খুব ভাল রকমে অবগত হইয়া বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা গেল:—

ভারতীয়েরা আচার ব্যবহারে অত্যন্ত সরল, চুরি ডাকাতি দেশে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে, বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া ইহারা কখন মদ্যপান করে না, ইহারা কদাচিৎ বিচারালয়ে যায়—সাধারণতঃ সকলেই পরস্পরকে বিশ্বাস করে, কোন ভারতবাসীই মিথ্যা কথা বলে না, অন্যের অনিষ্ট করা চিরকালই ইহাদের নীতিবিরুদ্ধ, দেশের কোন কোন অংশে দাসত্ব প্রথা একেবারেই নাই। জনসাধারণ প্রধানতঃ সাত ভাগে বিভক্ত—দার্শনিক, সৈনিক, বণিক ও শিল্পী, কৃষক, রাখাল ও শিকারী, শাসন পরিষদের সদস্য ও নানা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক।

ইহা ছাড়াও তিনি রাজার সর্ব্ববিধ সুশৃঙ্খল শাসনপ্রণালী, বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইঁহার অনেক পরেও বিদেশী পর্য্যটকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া নানা সময়ে এই দেশের সমৃদ্ধি নীতি প্রভৃতি মানবীয় সম্পদের বহু সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় সময় সময় বিদেশাগত সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতির চাপে পড়িয়া সমাজ কোন কোন বিষয়ে বিব্রত হইলেও কোন কালেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। কিছুকাল পর পর এই সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এমন বহু অসাধারণ মহামানব জন্মিয়াছেন যাঁহাদের চরিত্র চিরকালই মানুষের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন উন্নত করিবে। মধ্যযুগে কতগুলি কারণে ভারতবর্ষ রাজনীতিতে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে ধর্ম্ম সমাজ সংস্কৃতি কথঞ্চিৎ বিপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু গৌরবের বিষয়—সেই যুগেও কয়েক শত বৎসরের মধ্যে এমন বহু মহাপুরুষ জন্মিলেন যাঁহাদের পূজা মানুষ চিরকালই করিবে। ইতিহাস ইহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে গণজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। আধুনিক যুগের উন্নত জাতিসমূহের ইতিহাস আলোচনা করিয়া সময় সময় অনেকে বলেন, ধর্ম্মের অতিরিক্ত অনুশীলনই আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ। চক্ষের সম্মুখে দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্য জাতিগুলি সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইয়াছে অনেকাংশেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া; আমাদের সামাজিক নিয়ম প্রণালী, জাতি বিভাগ প্রভৃতিই আমাদের হীনাবস্থার কারণ, ইত্যাদি।

তদুত্তরে বলা যায়, ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় সমাজ আমাদের অবনতির কারণ তাহাই বা কি করিয়া সমর্থন করা যায়? আমাদের ধারণা ধর্ম্মের বিকৃতার্থই সমাজের আদর্শকে দিন দিন মলিন করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিক কারণও কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া আমাদের যত প্রকার অবনতির সাহায্য করিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি বৃহৎ দেশ। ইহার এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে ভাষায় চালচলনে অনেকাংশে পৃথক্। এখানে নানা ধর্ম্মের উদ্ভব হওয়ায় বিদেশাগত ধর্ম্ম ছাড়াও শুধু এই দেশের ধর্ম্মকে গণ্ডী করিয়াও আমরা অনেক প্রকারে বিভক্ত। যদিও মূলতঃ সকলেই ভারতের সন্তান বলে, ব্যবহারিক ব্যাপারে কিন্তু অসংখ্য গণ্ডী সৃষ্ট হইয়াছে। বিদেশাগত নিত্য নূতন ভাব-তরঙ্গও এই দেশকে মতবাদ হিসাবেও কথঞ্চিৎ বিভাগ করিয়াছে। তদুপরি সমাজনেতাগণের দেশ কালোপযোগী উদারতার অভাব আরও ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞানের কৃপায় কোন দেশই অপর দেশ হইতে এখন আর পৃথক্ নহে, নিত্য নূতন বিলাস সামগ্রী নিত্য নূতন চাল চলন দেশদেশান্তর হইতে আমদানি হইতেছে, এমতাবস্থায় সমগ্র দেশকে অন্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা রাখিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের অবস্থায়ও সমাজকে লইয়া যাওয়া যে প্রকার অসম্ভব আবার অতি আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে এই

সমাজকে গঠন করাও তেমনি অস্বাভাবিক প্রয়াস। আমাদের সব কিছুই যে খারাপ তাহাও নয় আবার সব কিছুই যে নিখুঁত সুন্দর তাহাও নয়। স্বামী বিবেকানন্দের সামঞ্জস্য সূচক দুই একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গেল। এক স্থানে জাতিভেদ প্রথাকে সমর্থন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'লোকে বলিয়া থাকে জাতিভেদ থাকা উচিত নহে, এমন কি যাহারা বিভিন্ন জাতিভুক্ত তাহারাও বলে জাতি বিভাগ একটা খুব উঁচু দরের জিনিষ নয়। * * তোমাদের দেশে তোমরাও তো এইরূপ একটা জাতি বিভাগ গড়িবার চেষ্টা করিতেছ। কোন ব্যক্তি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই বলিয়া বসে, আমিও ঐ বড় মানুষ কয়েক শতের মধ্যে একজন। আমরাই কেবল স্থায়ী জাতি বিভাগ গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের সমাজে অবশ্য কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষ যথেষ্ট আছে। * * * কিন্তু এই জাতি বিভাগ না থাকিলে আপনারা পড়িবার জন্য একখানিও সংস্কৃত বই পাইতেন না। এই জাতি বিভাগের দ্বারা এমন একটা দৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, উহার উপর বহিরাক্রমণের শত প্রকার তরঙ্গাঘাত আসিয়া পড়িয়াছে অথচ কোন মতেই উহাকে ভাঙ্গিতে পারে নাই।' এই প্রসঙ্গেই তিনি পুনরায় বলিয়াছেন 'এইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির অভ্যুদয় হবে শূদ্রজাতি আর থাকবে না। তারা এখন যে কাজ করছে সে সব কলের দ্বারা হবে। ভারতের বর্ত্তমান অভাব ক্ষত্রিয়শক্তি।'

নির্য্যাতীত তথাকথিত শূদ্রজাতিকে শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বারা উন্নয়ন করিলেই অনেকাংশে সমাজের ভেদবুদ্ধি যাইবে সন্দেহ নাই। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রচারেই ভেদবুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে যায়। মানুষে মানুষে য এত ভেদবুদ্ধি তাহার মূল কারণ ধর্ম্মহীনতা। প্রত্যেক মানুষই যে একই পথে চলিতে পারে তাহাও নয়। অবস্থা ক্ষমতা সংস্কার প্রভৃতিই অনেকাংশে আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া থাকে। তাই মূল ধর্ম্ম এক হইলেও সকলের এক পথ হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকে ভুলিয়াই যত অসুবিধা হইয়াছে। সমাজেও এই জন্য এত দৈন্য উপস্থিত। প্রথম অবস্থায়ই সকলে মোক্ষধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে না— অধিকাংশের জন্য সেই পথ প্রথম অবলম্বনীয় কোন কালেই হইতে পারে না। ভগবান শ্রীবুদ্ধের পবিত্র ত্যাগ ধর্ম্ম, শ্রীশঙ্করের জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের পবিত্র প্রেম ধর্ম্ম তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্য-গণ কর্ত্তৃক বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই যুগে সেই জন্যই এমন একজন নূতন ধর্ম্ম প্রচারক আসিলেন যিনি বলিলেন যে, কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নয়, সকল ধর্ম্মেই মানুষ ভগবান লাভ করিতে পারে।

এই মহাপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি চরম ধর্ম্ম নিজ জীবনে পূর্ণভাবে অর্জ্জন করিয়া এবং শিষ্যদিগকে ধর্ম্মলাভ করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা সময়োপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করাইয়া গেলেন। ত্যাগই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইলেও তিনি অধিকারী ভেদে উহা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। সময়ে হয় তো মানুষে মানুষে, দেশে দেশে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপিত করিবে এই ধর্ম্মের প্রভাব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে স্বভাবতই মানুষ অদৃষ্ট বিষয়ে অবিশ্বাসী। প্রায় সকল দেশেই জনসাধারণ এমন কি বিদ্বান পণ্ডিতগণও অনুষ্ঠান সাধ্য ধর্ম্ম এবং অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ নিরবয়ব নির্গুণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের অস্তিত্বে সন্দিহান। অথচ জগতের সকল জাতিই এখন অদম্য কর্ম্ম-প্রেরণায় বিশেষ উদ্বুদ্ধ। আবার সকল দেশই এখন রাজনীতি বাণিজ্য সংস্কৃতি ভিত্তিতে পরস্পর সম্বদ্ধ। ঠিক সেইজন্যই এই মহাপুরুষ সকল ধর্ম্ম নিহিত সত্য উপলব্ধি করিয়া অতি সুন্দর রকমে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধন প্রণালীর মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয়, কোন প্রকার অপ্রকাশ্য কিছু

নাই। অন্ততঃ যুক্তি দ্বারাও যদি কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন তবেও অনেক শান্তি পাইবেন, আর অনুষ্ঠান করিলে তো কথাই নাই। বৈজ্ঞানিক যুগের সঙ্গে এই ধর্ম্মের অদ্ভুত সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মনে হয় এই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র জগত এককালে ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদ লাভ করিয়া কিছুদিনের জন্য প্রকৃত সভ্যতা লাভ করিবে।

উপসংহারে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। চতুর্ব্বর্গের সঙ্গে মোক্ষ ধর্ম্মের সংমিশ্রণেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয় এবং ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ বিকৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের প্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শকে তাঁহাদের অবর্ত্তমানে ধীরে ধীরে প্রচারকগণ নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী জনসাধারণে প্রচার করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য যুগে যুগে ব্যর্থ করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও যে ঐ প্রকার উত্থান পতনের ক্রম না চলিবে তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। কারণ প্রকৃতির ইহাই নিয়ম।

ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সেবা না করিয়া প্রথমেই অশেষ ত্যাগ সম্ভূত পরম ধর্ম্ম অবলম্বন প্রত্যেক যুগেই মুষ্টিমেয় লোকেই করিতে পারেন। অবশ্য শ্রীভগবান নরদেহে যখন আসেন, তাঁহার পবিত্র পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িলে সেই সময়ে ত্যাগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হইতে পারে। অপরে কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সংযত জীবন যাপন করিলে ভবিষ্যতে মুমুক্ষুত্ব লাভ করিতে পারেন। সর্ব্বকালেই এই প্রকার সৎ গৃহস্থ আমাদের সমাজে অল্পবিস্তর আছেন। সংযমকে আদর্শ না করিলে গার্হস্থ্য জীবনও অশেষ দুঃখের কারণই হয়। সংযমই পশু হইতে মানুষকে বড় করে।

পূর্ব্বোক্ত কামাদির সেবা না করিয়া প্রথমেই যাঁহারা মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

স্বভাবতই যাঁহাদের ভোগবাসনা কম তাঁহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগের দিকেই ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হন। সাধারণ লোক যে প্রকার ভোগ অবশ্য উপভোগ্য মনে করে তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদাসীন থাকেন। ভাগ্যক্রমে সৎ সংসর্গের প্রভাবে তাঁহাদের মনে বৈরাগ্য উদয় হয়। উক্ত অবস্থায় সৎগুরুর উপদেশে এবং নিজের অধ্যবসায়ে ধর্ম্মলাভের উপযোগী পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারেন ক্রমে তাঁহাদের মনে নিত্য ও অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণা জন্মে, তাঁহারা নিত্য বস্তু শ্রীভগবানকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করেন এবং অনিত্য বস্তু ঐহিক ঐশ্বর্য্যের দিকে প্রলোভিত হন না। এই জগতের যাবতীয় ভোগবাসনার বিরাম হইলে পরজগতের স্বর্গাদি ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের মন হইতে চলিয়া যায়। উক্ত অবস্থায় তাঁহাদের শমদমাদি সাধনার অনুকূল দৈবী সম্পদ্ লাভ হয়। সংক্ষেপে তাহা বলা যাউক। শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার হইতে মনকে নিবৃত্ত করা। দম—বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ যাবতীয় ভোগ্যবস্তু হইতে চক্ষুকর্ণাদিকে উদাসীন করা। উপরতি—জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক যে-কোন কর্ম্ম ত্যাগ করা। তিতিক্ষা—কোন প্রকার প্রতিকার না করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করা। সমাধান—সমাধি অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়ে একাগ্রতা। শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া। এই প্রকার গুণসম্পন্ন হইলে মানুষের মনে ঠিক ঠিক মুমুক্ষুত্ব বা জন্ম-মৃত্যুর চিরপ্রবাহ হইতে মুক্তির ইচ্ছা দৃঢ় হয়। শাস্ত্র বলেন—ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের কৃপায় মুমুক্ষু ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া মানব জন্ম সার্থক করেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর মানুষের মন হইতে পাঞ্চভৌতিক বিকার সম্ভূত সকল জিনিষের বাস্তব-অস্তিত্ব বুদ্ধি লোপ পায়,—সর্ব্বকার্য্যের মূলকারণকে জানার দরুণ জগতকে অনিত্য বলিয়া প্রকৃত ধারণা জন্মে। ইহার পর তাঁহাদের আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে জগতের কল্যাণের জন্যই তখন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্থূল দেহে বিচরণ করেন। ইহাই ধর্ম্মের শেষ অবস্থা। স্বামীজী ইহাকেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ বলিয়াছেন।

উন্নত সমাজের মধ্যেই ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের আদর্শকে আরও মহৎ আরও উদার করিয়া থাকেন। অতি সাধারণ ভাষায় তিনি বলেন, 'তুমি যা ছিলে আবার তাই হবে, এতে অহঙ্কার করবার কি আছে।'

আগমনী

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

রাঙা উষায় শরৎ হাসে সানাই ভঁয়রো গায়
সবুজ ঘাসে শিউলি ঝরে শিশির-সিক্ত বায়।
ধরার কোলে কাঁদে তখন
আর্ত মানব দুঃখ-মগন
আহার দাও
আশ্রয় দাও
ওগো মা ভবানী।
অন্তর-আত্মা কাঁদলে দুখে
সে দুখ পশে মায়ের বুকে
শক্তিরূপে
মানব হৃদে
জাগেন মা শিবানী,
সিদ্ধি সম্পদ বিদ্যা বীর্যে আসেন বিশ্ব-রানী।
শরৎ-উষায় সুনীল আকাশ সানাই ভঁয়রো গায়

শিশির নীরে শিউলি ঝরে মায়ের রাঙা পায়।
হিমের দেশ কৈলাসপুরী পর্বত হিমালয়
সবাই স্থির সুপ্তিধেয়ানে প্রাণের সেথা লয়।
জাগল মাতা কনক বরণ
মুকুট জ্বলে তরুণ তপন
বদনে তাঁর
পূর্ণিমা চাঁদ
তারার মালা গলে,
করেতে দশ দীপ্ত অনল
দশ প্রহরণ জ্বলে জ্বল্ জ্বল্
করুণ কমল
তিনটি আঁখি
ভিজল অশ্রুজলে,
কাঁদে জননী জগদ্ধাত্রী সন্তান-মঙ্গলে।
হিমের দেশ কৈলাস পুরী পর্বত হিমালয়
সবাই সুপ্ত জাগল শুধু দেবতা শক্তিময়।

শক্তিস্পর্শে হিমের দেশে প্রাণের সাড়া জাগে
হুংকারে তার গগন কাঁপে সিংহ কেশরী ডাকে।
জাগে গণেশ গজ-বদন
সিদ্ধিদাতা রক্ত বরণ
জাগে কমলা
হেম বরণা
ধন ধান্য করে,
জাগল বাণী বিদ্যা-রূপিণী
জ্ঞানে বিজ্ঞানে শুভ্র বরণী
শূর দেবতা
জাগে কার্তিক
ধনুর্বাণ ধরে,
জাগে নন্দি বিজয়া জয়া জাগরণের বরে।
শক্তিস্পর্শে হিমের দেশে প্রাণের চেতনায়
সিদ্ধি ঋদ্ধি বিদ্যা শৌর্য উঠল জেগে তায়।

ব্রহ্মানন্দে সমাধিলীন শংকর পশুপতি,
বাহু-লতায় জড়িয়ে শিবে কহিলা পার্বতী—
খোল নয়ন চাও উদাসী
ভাঙ্গ ধ্যান হে সন্ন্যাসী,
কাঁদে মর্ত্যে
মানব আকুল
চিত্ত বিষাদময়,
তোমায় ফেলে যাই কেমনে
প্রকৃতি যে পুরুষ বিনে

শিবকে ছেড়ে
শক্তি যে গো
বিশ্বে কিছুই নয়,
জাগ দেবতা জগৎপাতা মূর্তি করুণাময়।
আত্মানন্দে লুপ্ত-চেতন শংকর পশুপতি
বাহু লতায় জড়িয়ে শিবে জাগালেন পার্বতী।

জাগে শংকর দিক্-অম্বর শীর্ষে শশধর
পিংগল জটা দীপ্ত ছটা বদনে ভাস্কর।
ববম্ বম্ ডমরু বাজে
শুভ্র অঙ্গে ভস্ম রাজে
শিরে গঙ্গা
কল কল্লোল
পন্নগ অলংকার,
হর শংকর সমস্বরে
পিশাচ ভূত নৃত্য করে
হিমের দেশ
কৈলাস পুরে
আনন্দ অপার,
সুপ্ত আত্মা জাগল ভানু অন্ধকারের পার।
জাগে শংকর দিক্-অম্বর শীর্ষে শশধর
পিংগল জটা দীপ্ত ছটা বদনে ভাস্কর।

শরৎ উষায় অরুণ হাসে সানাই ললিত গায়
শিউলি ঝরে কমল ফোটে মায়ের রাঙা পায়।
মন্দির মাঝ অম্বর তল
শিশির নীরে পূত সজল
গাছের ডালে
গাইছে পাখি
আগমনীর গান।
হৃদয় মাঝে আসলে দেবী
দিব্যরূপে ভাসে সবই
তৃপ্ত হয়
পূর্ণ হয়
ধন্য হয় প্রাণ,
সার্থক হয় মানবকণ্ঠে আগমনীর গান।
সন্তান দিলে জীবন বলি মায়ের রাঙা পায়
ত্রিদিব-আভায় হাসে জগৎ বিশ্ব বিভাস গায়।

চলে খেলা—থামে না যে!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন, বি-এ

ভেবে দেখি লক্ষবার আমাদের সভ্যতার
কোথায় আরম্ভ আর কোথা হয় শেষ তার।
আসলে যে সব লোক, করে সুখদুখভোগ,
সহে সব রোগ শোক সোজা চলে খোলা চোখ
তারা সব সভ্যতার, চিরদিন নব্যতার,
করে দাবী বারবার, এই রীতি দুনিয়ার।
যবনিকা পড়ে গেলে, দেখা আর নাহি মেলে,
নূতনেরা আসে চলে রঙ্গমঞ্চে দলে দলে।
নিত্য নব নানা সাজে, নানা ভাবে, নানা কাজে,
সীমাহীন বিশ্ব মাঝে, চলে খেলা,—থামে না যে!
ভ্রান্ত, মূঢ, ক্ষুদ্রজ্ঞানে কোথা আদি, কেবা জানে!
শেষ আছে কোন্‌খানে ব্যস্ততার অভিযানে?
অতীতের মরণের, সমারোহ জীবনের,
অনাগত জনমের যোগসূত্র মিলনের!

মৈথিল কবি ও তাঁহাদের কাব্য-পরিচয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, তত্ত্বরত্নাকর

মিথিলার সহিত বাঙ্গলার যোগ বহু দিনের। মৈথিল ভাষার সহিত বাঙ্গলা ভাষার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। মৈথিল লিপি ও বাঙ্গলা লিপি অভিন্ন। অবাঙ্গালী কবিদের মধ্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অনুরূপ অন্য কোন কবি বাঙ্গালীদের মন হরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা দেশের শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্ম্মে মৈথিল রীতি এখনও প্রচলিত। সুদূর শ্রীহট্টে বিদ্যাপতি রচিত "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" অনুসারে এখনও দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল যখন মুসলমান অধিকারে, সেই সময় মিথিলা হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হইত। মিথিলাধিপতিরা আবার ব্রাহ্মণ বংশের। এই সব কারণে মিথিলা বহু শতাব্দী ব্যাপী সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র রূপেই পরিগণিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের বহু পণ্ডিত উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সুদূর মিথিলায় যাইতেন। রঘুনাথ শিরোমণির পূর্ব্বে সকল উচ্চ-শিক্ষাভিলাষী ন্যায়ের ছাত্রের পক্ষে মিথিলা যাওয়া অপরিহার্য্য বিবেচিত হইত। রঘুনাথ সমগ্র ন্যায়ের গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে ন্যায়-শিক্ষার্থী বাঙ্গালীদিগের মিথিলা যাওয়া অনেকাংশে কমিয়া যায়। মৈথিল সাহিত্যের মধ্যমণি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব বাঙ্গলা পদাবলী সাহিত্যের উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী ব্যতীত মৈথিল সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গলায় ইতঃপূর্ব্বে কোথাও আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। বাঙ্গালী পাঠক সমাজের নিকট বিদ্যাপতি বহু-পরিচিত। তাই তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থ পরিচয় এস্থাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসকে মিথিলাবাসীরা তাঁহাদের মৈথিল কবি গোবিন্দ দাস ঝার সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া গোবিন্দদাসের সকল পদ গোবিন্দ দাস ঝার উপর আরোপ করিয়াছেন। গোবিন্দ দাস ও গোবিন্দ দাস ঝা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে বলিয়া এই স্থলে এই সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নাই।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে মৈথিল কবি ও তাঁহাদের কাব্য-পরিচয় প্রদত্ত হইল। বিভিন্ন কবির সময় জানা না থাকায় কালানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর

ইঁহার উপাধি ছিল কবিশেখরাচার্য্য। ইনি বিদ্যাপতির আনুমানিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিদ্যাপতির পদাবলীর" ভূমিকায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "কীর্ত্তিলতা"র মুখবন্ধে ইঁহাকে বিদ্যা-পতির খুল্লপিতামহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জ্যোতিরীশ্বরের পিতা ধীরেশ্বর ও পিতামহ রামেশ্বর ঠাকুর ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি মিথিলার রাজা নরসিংহ দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

নান্যদেব ⟶ গঙ্গসিংহদেব ⟶ নরসিংহদেব ⟶ ভবসিংহদেব ⟶ হরসিংহদেব। নরসিংহদেবের সময় মিথিলা দর্পণের মতে ১১৪৯ শকাব্দ বা ১২০১ খ্রীষ্টাব্দ। জ্যোতিরীশ্বর তাঁহার "ধূর্ত্তসমাগম" নামক সংস্কৃত প্রহসনে কর্ণাট বংশীয় রাজা নান্যদেবের পৌত্র নরসিংহদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৈথিল পঞ্জীগ্রন্থে জ্যোতিরীশ্বরের উল্লেখ নাই, ইহাতে বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। এ পুস্তক হরসিংহ দেবের সময় ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

জ্যোতিরীশ্বরের সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈত

বহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ববুআজী মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য অনুমান কবেন যে জ্যোতিবীশ্বব নবসিংহ দেবেব সময় অর্থাৎ ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কাবণ তিনি তাঁহাব 'ধূর্ত্তসমাগম' নামক প্রহসনে নবসিংহ দেবেব উল্লেখ কবিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় অনুমান কবেন যে জ্যোতিবীশ্বব উক্ত বংশীয় (কর্ণাট বংশীয) শেষ নৃপতি হরসিংহদেবেব সভাপণ্ডিত ছিলেন। অধ্যাপক বেণ্ডেল (Bendall) সাহেবেব মতে হবসিংহ দেবেব সময ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ। জ্যোতিবীশ্বব বচিত বর্ণ-বত্না-কব নামক মৈথিল গ্রন্থে অনেক "ফার্সী" শব্দ আছে, যাহা দৃষ্টে ডাঃ সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায মনে কবেন যে মুসলমান আক্রমণেব অন্ততঃ ১০০ বৎসব পবে এই গ্রন্থ বচিত হয় এবং সেই সময় উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত সকল ফার্সী শব্দও সাহিত্যে স্থান পায়। জ্যোতিবীশ্বব সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "ধূর্ত্তসমাগম" নামক একখানি সংস্কৃত প্রহসন ও "পঞ্চসাযক" (মদনেব পাঁচবাণ) এবং "রঙ্গশেখব" নামক কামশাস্ত্রেব দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন কবেন। এই কয় খানি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি মৈথিল ভাষায 'বর্ণ-বত্নাকব' নামক একখানি গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেব "Journal of the Asiatic Society of Bengal" এব ৪১৪ পৃষ্ঠাব পাদটীকায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী জ্যোতিবীশ্ববেব "রঙ্গ শেখব" গ্রন্থেব উল্লেখ কবিযাছেন। "ধূর্ত্তসমাগম" প্রথম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে Christian Lassen কর্ত্তৃক মূল ও তাহাব লেটিন অনুবাদ সহ মুদ্রিত হয। তাঁহাব "পঞ্চসাযক" গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহা কবিতাব বই। জ্যোতিবীশ্বব সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিশেষ পাবদর্শী ছিলেন। M Winternitz তাঁহাব সংস্কৃত সাহিত্যেব ইতিহাসে জ্যোতিবীশ্ববের উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্যোতিবীশ্বর বচিত বর্ণবত্নাকব মৈথিল ভাষায় বচিত সর্ব্বপ্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। এ পুস্তকেব এক খণ্ড Asiatic Society of Bengalএব পুস্তকাগাবে বক্ষিত আছে। ইহা বিনোদবিহাবী কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক মিথিলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। এ পুস্তক তালপত্রে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত হয়। মহামহোপাধ্যায হবপ্রসাদ শাস্ত্রী "Journal of the Asiatic Society of Bengal"এ সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের যে বর্ণনা প্রদান কবেন, তাহাতে বর্ণবত্নাকবেব সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ পুস্তক প্রাচীন মৈথিল অক্ষবে লিখিত। প্রাচীন বাঙ্গলা ও মৈথিল অক্ষবেব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। এত প্রাচীন বাঙ্গলা অথবা অপব মৈথিল গদ্য গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয নাই। হবপ্রসাদ শাস্ত্রীব ভাষায় বলিতে গেলে—"No Bengali or Maithila Ms of that age has yet been discovered This book seems to have guided the genius of Vidyapati" এ পুস্তকে বোধ হয় ৮ অধ্যায় ছিল। প্রথম ৭ অধ্যায় পাওযা গিয়াছে, ইহা ভিন্ন আবও কযেকখানি পৃষ্ঠা আছে। ইহাব প্রত্যেক অধ্যাযকে সমুদ্রেব (বত্নাকবেব) কল্লোলেব সঙ্গে তুলনা কবিয়া "কল্লোল" নামে অভিহিত কবা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক কল্লোলেব নিম্নে সেই কল্লোলে বর্ণিত বিষয়, পুস্তকেব নাম ও গ্রন্থকাবেব নাম দেওয়া আছে, যথা—"ইতি কবি-শেখবাচার্য্য শ্রীজ্যোতিবীশ্বব বিবচিত বর্ণবত্নাকবে নগববর্ণনো নাম প্রথমঃ কল্লোলঃ।" এ পুস্তকে ১৮ পুবাণ, ৪৯ বাযু, ১২ আদিত্য, ৩৬ যুদ্ধাস্ত্র, ১৮ পৌবাণিক সতীনাবী প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বর্ণ-বত্নাকবেব অনুরূপ একখানি বাঙ্গলা পুস্তক ডাঃ রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুব তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেব ইতিহাসে উল্লেখ কবিয়াছেন। বর্ণরত্নাকবে যে ৭টি কল্লোল আছে তাহাব নাম যথাক্রমে নগরবর্ণন, নায়িকা বর্ণন, আস্থান বর্ণন, ঋতু বর্ণন,

প্রয়াণক বর্ণন, ভট্টাদি বর্ণন ও শ্মশান বর্ণন। এ পুস্তক হইতে আমরা নরসিংহ দেবের সমসাময়িক যুগের কথ্যসাহিত্যের পরিচয় পাই। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে স্থান, মৈথিল সাহিত্যে বর্ণরত্নাকরের সেই স্থান। কাহারও কাহারও মতে বিদ্যাপতি ও জ্যোতিরীশ্বর সমসাময়িক।

মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাকুর

ইনি বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপতির পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন। ইনিই ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৭৮ শকাব্দা) আকবর বাদশাহের নিকট হইতে রাজ্য প্রাপ্ত হন। মহেশ ঠাকুর বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপতি কামেশ্বর সিংহের ১৮ পুরুষ পূর্ব্বে ছিলেন। ইঁহার রচিত "ন্যায়চিন্তামণি" প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তক আছে। এতদব্যতীত মৈথিলভাষায় রচিত বহু পদও পাওয়া গিয়াছে। ইনি গঙ্গা, মহাদেব ও অন্যান্য অনেক দেবতার বন্দনাসূচক মৈথিল পদ রচনা করেন। ইনি বিদ্বান ও কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় উমাপতি উপাধ্যায়

উমাপতি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। দ্বারবঙ্গা জেলার মধুবনী সাবডিভিসনের অন্তর্গত কোইলখ গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। এখনও ইঁহার ভিটা ও ইঁহার নির্ম্মিত পুষ্করিণী "দিঘীয়া" লোকে দেখাইয়া থাকে। ইঁহার পুত্রের বংশধর নাই কিন্তু দৌহিত্র বংশধর আছেন। ইনি বহু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, সংস্কৃতে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহাকে সকলে "শতাবধানী" বলিত অর্থাৎ একই সময়ে ইনি একশো লোকের কথা শুনিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন। উমাপতি "অভিনয়" বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন, বহু শিক্ষার্থীকে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। ইঁহার বাড়ীতে "শরযন্ত্র" উপাধি পরীক্ষা হইত, এবং ইনিই এ উপাধি বিতরণ করিতেন। এ উপাধি সর্ব্বজ্ঞতা পরিচায়ক। ইনি অত্যন্ত বিদ্বান ছিলেন, ইঁহার রচিত সংস্কৃত পুস্তকাবলীর মধ্যে "শুদ্ধি-নির্ণয়" "শুদ্ধিচিন্তামণি" প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি মৈথিলভাষায় "পারিজাত হরণ" ও "রুক্মিণী পরিণয়" নামক দুইখানি নাটক রচনা করেন। ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নেপালের তদানীন্তন মহারাজ ইঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। আনুমানিক ১৫১৯ শকাব্দে ক্ষয়মাস সম্বন্ধে পণ্ডিত-দের মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় ইঁহার পল্লীর পশ্চিম প্রান্তবাহী "কমলা"নদীর অপর তীরে মধুবনী সমীপে পণ্ডিতদের এক সভা আহূত হয়। সে সম্মিলনীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য পণ্ডিতরাজ উমাপতি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে উপস্থিত হইতে না পারিয়া তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মহামহোপাধ্যায়, "পদবাক্য-রত্নাকর" প্রভৃতি বহু দার্শনিক গ্রন্থ-রচয়িতা ও টীকাকার, গোকুলনাথ উপাধ্যায়কে নিম্নোক্ত কবিতা সহ প্রেরণ করিয়াছিলেন—

"একঠা নাও নদী মরথাহি।
হম অতি বৃদ্ধ চঢ়ব নহি তাহি॥
গোকুলনাথ ক'ইছথি জয়েহ।
হমরো সম্মতি জানব সয়েহ॥"

উমাপতি "কীর্ত্তনীয়া" নামক নূতন অভিনয় রীতির প্রবর্ত্তন করেন এবং এই নব প্রবর্ত্তিত রীতি অনুসারে অভিনীত হওয়ার জন্য 'পারিজাত হরণ" ও "রুক্মিণী পরিণয়" প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। ইঁহার পরবর্ত্তী বহু কবি, বিশেষতঃ দেবানন্দ, শিবদত্ত, রত্নপাণি, ভানুদত্ত ও হর্ষনাথ প্রভৃতি কবিরা, ইঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইঁহার প্রবর্ত্তিত নাট্যরীতি অনুসারে নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন সাহেবের মতে উমাপতি বিদ্যাপতির সমসাময়িক, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ইনি বিদ্যাপতির বহু পরবর্ত্তী যুগের কবি। উমাপতি মৈথিলভাষার ইতিহাসে

নাটক বচনাব পথপ্রদর্শক হিসাবে চিরদিন শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভ কবিবেন।

উমাপতিব "পারিজাত হবণ" মৈথিল নাট্য-সাহিত্যেব মুকুটমনি। সংস্কৃত নাটকাদিতে যেরূপ বাজা ও সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিবা সংস্কৃত গদ্য অথবা পদ্যে কথাবার্ত্তা বলিযা থাকেন এবং স্ত্রীলোক ও সাধাবণ শ্রেণীব ব্যক্তিবা প্রাকৃতেই কথাবার্ত্তা বলেন, এ পুস্তকেও তদ্রূপ সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার সকল গান মৈথিলভাষায বচিত। জগতের শ্রুতি-সুখকব কোমল শব্দসম্পদপূর্ণ ভাষাসমূহেব মধ্যে মৈথিলভাষা অন্যতম। এই জন্যই বোধ হয় উমাপতি তাঁহাব নাটকেব সকল সঙ্গীত মৈথিলভাষায় বচনা কবিয়াছেন। স্যাব জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন উমাপতিব "পাবিজাত হবণেব" ইংবাজী অনুবাদ কবেন।

উমাপতিব দ্বিতীয় নাটক "রুক্মিণী পবিণয"। ইহাতেও বাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবা সংস্কৃতে, নাবী ও নিম্নশ্রেণীব পুরুষ সম্প্রদায় প্রাকৃতে কথা বার্ত্তা বলিতেছেন দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাব সমস্ত সঙ্গীত মৈথিলভাষাব বচিত।

লোচন কবি

ইনি বর্ত্তমান দ্বাবঙ্গাব মহাবাজেব পূর্ব্বপুরুষ নবপতি ঠাকুবেব সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, বিশেষভাবে ছন্দশাস্ত্রেব উপর ইঁহাব প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। মৈথিলভাষায় রচিত ছন্দশাস্ত্রেব আদিগ্রন্থেব নাম "রাগতবঙ্গিণী"। এ পুস্তক লোচন কবিই প্রণযন কবেন। ইহাতে মিথিলাপ্রসিদ্ধ অথবা মৈথিল ভাষাব উপযোগী সকল ছন্দেব নাম এবং উদাহবণ দেওয়া হইয়াছে। উদাহবণস্বরূপ বহু প্রাচীন কবিদেব বচনা এ পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, বহুস্থলে কবি স্বয়ং পদ বচনা কবিয়া ছন্দের উদাহবণস্বরূপ ব্যবহার কবিয়াছেন। এ পুস্তকে সর্ব্বসমেত ৪৭ জন মৈথিল কবিব কবিতা ছন্দের নিদর্শনস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। এ পুস্তকে বিদ্যাপতির পুত্রবধূ মহামহোপাধ্যায়া চন্দ্রকলার রচিত বহু পদ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থ অত্যন্ত বৃহৎ, ইহার ছন্দ অনুসরণ কবিয়া চন্দ্রকবি তাঁহার রামায়ণে বহু ছন্দ সংযোগ কবিয়াছেন। এই গ্রন্থে যে ৪৭ জন মৈথিল কবিব কবিতা বিভিন্ন ছন্দেব নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওযা হইল :—

১ মহামহোপাধ্যায় দামোদব মিশ্র, ২ কবি শ্রীনিবাস, ৩ কবি বিদ্যাপতি, ৪ কবি গদাধব, ৫ চন্দ্রকলা (বিদ্যাপতিব পুত্রবধূ), ৬ কবিরাজ পুরণমল্ল, ৭ কবি গোবিন্দদাস (কৃষ্ণলীলা নামক গ্রন্থ কর্ত্তা), ৮ কবি হবিদাস, ৯ কবি রামদাস ('আনন্দবিজয় নাটক" বচয়িতা), ১০ কবি গঙ্গাদাস, ১১ কবি যশোধব, ১২ কবি বত্ন (চিন্তামণি ন্যায়গ্রন্থেব টীকা, ক্ষীব, নীব বিবেচন কর্ত্তা), ১৩ কবি উমাপতি ("পাবিজাত হরণ" নাটক বচযিতা),— ১৪ কবি গঙ্গাধব, ১৫ কবি প্রীতিনাথ, ১৬ কবি জয়কৃষ্ণ, ১৭ কবি ভবানীনাথ, ১৮ কবি ধবণীধব, ১৯ গোবিন্দ মিশ্র, ("নলচবিত নাটক" কর্ত্তা), ২০ কবি মধুসূদন মিশ্র, ২১ কবি চতুর্ভুজ, ২২ কবি জীবনাথ, ২৩ কবি শ্যামসুন্দব, ২৪ লাল কবি ("গৌবী পরিণয়" নাটিকা কর্ত্তা), ২৫ বৈয়াকবণ দুর্গাদত্ত ("দুর্গাসপ্তশতী" ভাষাকর্ত্তা), ২৬ কবি মনোবোধ ("কৃষ্ণজন্ম" ভাষা কর্ত্তা), ২৭কবি ভোরানাথ, ২৮ কবি হবিপতি, ২৯ চন্দ্রকবি (প্রাচীন), ৩০ সজ্জন কবি, ৩১ নন্দীপতি, ৩২ কবি দেবানন্দ ("উষাহবণ" নাটক কর্ত্তা), ৩৩ কবি রমাপতি ("রুক্মিণী স্বয়ম্বর" নাটক কর্ত্তা), ৩৪ কবি রত্নপাণি, ৩৫ কবি ভীষ্ম, ৩৬ মহান্ত সাহেব রাম, ৩৭ কবি বঞ্জন, ৩৮ কবি সিংহভূপতি, ৩৯ কবি যশোধব, ৪০ বাজলক্ষ্মীনারায়ণ, ৪১ কবি মুকুন্দী, ৪২ কুমব ভীষ্ম কবি, ৪৩ রাজ কংসনারায়ণ, ৪৪ লখন চন্দ রাজা, ৪৫ অমৃত করকবি শিবসিংহ (মন্ত্রী

ায়স্থ), ৪৬ পণ্ডিতবর হর্ষনাথ ঝা ("উষাহরণ" ·াটক কর্ত্তা), ৪৭ পণ্ডিতবর ভানুনাথ কবি ("প্রভাবতী হরণ" নাটক কর্ত্তা)।

মনোবোধ কবি

ইঁহাকে অনেকে ভোলন কবি বলিয়া অভিহিত করেন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিথিলার অন্তর্গত "মঙ্গলবনী" নামক গ্রামে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি মিথিলার মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের সভাকবি লালকবির সহোদর ছিলেন। ইঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের সরল অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। এ পুস্তকখানিই মৈথিলভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অনুবাদ, এ পুস্তকের কতকাংশ দ্বারবঙ্গা হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এ পুস্তক বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রিয়, সকলেরই উপযোগী; ইহার অংশবিশেষ স্ত্রীলোকেরা গান করিয়া থাকেন। অনেক বিধবা মহিলা স্নানান্তে এ পুস্তকের বহু বন্দনা ও প্রার্থনামূলক কবিতা প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন। ইনি সম্ভবতঃ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৬২৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত) জীবিত ছিলেন। দ্বারবঙ্গা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদের কৃষ্ণের জন্মখণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে এ পুস্তক হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল :—

"প্রণমঞো হিমগিরি কুমরী চরণ।
যে বল কবি সভ ত্রিভুবন বরণ॥
হমহু কয়ল অছি মন বড় গোট।
কৃষ্ণজন্ম পরিণয় নহি ছোট॥
কোন পরি হোয়েত একর নিবাহ।
এখন লগৈ অছি অগম অথাহ॥
হোইত কদাচিৎ হো পুন নীক।
নহি হো তকরো সঙ্কা থীক॥"

লাল কবি

ইনি মনোবোধ কবির সহোদর ভ্রাতা। ইনি মিথিলাধিপতি মহারাজ নরেন্দ্রসিংহের সভাকবি ছিলেন। কন্দর্পীঘাটে মহারাজ নরেন্দ্র সিংহের সহিত যখন জনৈক মুসলমান নরপতির যুদ্ধ হয় সে সময় লালকবি মহারাজের সঙ্গে ছিলেন। ইনি এ যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন; সে পুস্তকের ভাষা শুদ্ধ মিথিলা ভাষা নহে, এই পুস্তকের ভাষা অনেকটা মৈথিল ও ভোজপুরী ভাষার সংমিশ্রণ। কবি যুদ্ধের সঠিক বর্ণনা প্রদান করিবার নিমিত্ত অথবা জনসাধারণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই মিশ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। ইঁহার সময় শকাব্দা ১৬৩৫ অথবা ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি "গৌরীপরিণয়" নামক একখানি মৈথিল নাটিকা রচনা করেন।

রামদাস ঝা

ইনি কুজৌলী মূলের ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার সময়ে মিথিলার রাজসিংহাসনে রাজা সুন্দর ঠাকুর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার সময় আনুমানিক শকাব্দা ১৫২৫ অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইঁহার রচনা "আনন্দ-বিজয়" নাটক। "আনন্দবিজয়" নাটকে রাজা প্রভৃতি প্রধান পাত্রেরা সংস্কৃত গদ্য অথবা সংস্কৃত শ্লোকে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। কিন্তু পাত্রী ও অন্যান্য নীচ জাতীয় পাত্রেরা প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। এই নাটকের সমস্ত সঙ্গীত মৈথিল ভাষায় রচিত। রামদাস ঝার সহোদর ভ্রাতার নাম গোবিন্দদাস ঝা। ইঁহারা মিথিলাধিপতি মহারাজ রামেশ্বর সিংহের মাতামহকুলের ছিলেন। রামদাস রাজা সুন্দরঠাকুরের সভাসদ্ ছিলেন, (মহেশ ঠাকুর—শুভঙ্কর ঠাকুর—পুরুষোত্তম ঠাকুর —সুন্দর ঠাকুর), সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইঁহার অনেক পুস্তক আছে। মৈথিল ভাষায় রচিত ইঁহার একমাত্র পুস্তকই "আনন্দবিজয়"।

গোবিন্দ দাস ঝা

ইনি মিথিলার মহারাজ স্যার রামেশ্বর সিংহের মাতামহকুলে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বহু কবিতা আছে। এই সকল কবিতা "পদ্য সংগ্রহ"

কয়েক ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। মিথিলাতে এখনও গোবিন্দদাস ঝার বংশধরেরা বাস করিতেছেন। ইনি "আনন্দবিজয়" নাটক প্রণেতা রাম দাস ঝার সহোদর ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক পদাবলী ব্যতীত ইনি মৈথিল ভাষায় "কৃষ্ণলীলা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৈথিল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে গোবিন্দ দাস ঝার স্থান অতি উচ্চে। গোবিন্দদাস ঝা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৈয়াকরণিক দুর্গাদত্ত ঝা

দ্বারবঙ্গা জেলার মধুবনীর অন্তর্গত "ভবাম" নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮শ শতাব্দীর লোক। ইঁহার সমসাময়িক বৈয়াকরণিকদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অনেকে পাণিনির অবতার বলিত। ইনি একাধারে ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ব্যাকরণ, ন্যায়, কাব্য, স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত তার্কিক ছিলেন, বহু নৈয়ায়িক ইঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হন। মৈথিল ভাষায় দুর্গাসপ্তশতীর অনুবাদ দুর্গাদত্ত ঝাই প্রথম করেন।

হলি ঝা

ইনি দ্বারবঙ্গার মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহের সমসাময়িক। হলি ঝার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই ব্যাকরণ, তন্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারও ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই জন্য অনেকে ইঁহাকেও পাণিনির অবতার বলিয়া অভিহিত করিত। তর্কশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি একবার কাণপুরে, আর্য্যসমাজের স্রষ্টা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তর্ক করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করেন। মৈথিল ভাষায় সূত্রবদ্ধ ব্যাকরণ ইনি প্রথম প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তী যুগে অনেকে ইঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন।

বাবু দুর্গাদত্ত সিংহ

ইনি মিথিলার মহারাজ বংশের "বাবুয়ান ছিলেন। ইঁহাকে সকলে পরমধার্ম্মিক, দানশীল শাক্ত বলিয়াই জানিত। মৈথিল ভাষায় ইঁহার রচিত বহু পদ আছে। এ ধার্ম্মিকপ্রবর শিব দুর্গা প্রভৃতি বহু দেবদেবীর আরাধনা, প্রণাম ও স্তোত্র বিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়াছেন। নৃত্যব্যবসায়ী ও সাধারণ গায়কেরা ইঁহার বহু পদ গান করিয়া থাকেন। ইঁহার পদের বিশেষত্ব ভাষার সারল্য।

"সিংহ পর এক কমল রাজিত, তাহি উপর ভগবতী।" প্রভৃতি পদে ইঁহার সহজবোধ্য রচনার আভাস পাওয়া যায়।

ভঞ্জন কবি

ইনি দ্বারবঙ্গার মহারাজের বংশধর রাঘব সিংহের দরবারে থাকিতেন। ইঁহার সময় আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইবে। মৈথিল ভাষায় রচিত ইঁহার বহু পদ দৃষ্ট হয়।

নন্দীপতি

ইনি মহারাজ মাধব সিংহের সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। মৈথিল ভাষায় রচিত ইঁহার বহু পদ পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মীনাথ

ইনি উনবিংশ শতাব্দীর লোক, প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইনি গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন এবং আরাধ্য রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ মৈথিল ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ ভানুনাথ ঝা

জ্যোতিষী ভানুনাথ ঝা সাধারণতঃ ভানা ঝা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি দ্বারবঙ্গা জেলার অন্তর্গত

মধুবনীর সমীপবর্তী "পিলখুবাড" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ মহেশ্বর সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল, বিশেষ ভাবে ইনি জ্যোতিষে পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্যে জ্যোতিষের গ্রন্থই অধিক। ইঁহার রচিত কয়খানি সংস্কৃত পুস্তকের নাম নিম্নে দেওয়া হইল, যথা—"ব্যবহার বস্ত্র", "ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত", "সুবোধিনী টীকা", "আর্য্যাসপ্তশতী টীকা"। ইনি মৈথিল ভাষাতেও তিন খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, যথা—"প্রভাবতী হরণ নাটক", "পঠিয়ার চরিত্র" ও "মিথিলা বর্ণন'। ইনি ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, প্রায় ৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে ইঁহার রচনার নমুনা দেওয় হইল :—

"কোকটি ধোতী পটুয়া সাগ তীরভুতি গীত বড়ে অনুরাগ।"

হর্ষনাথ ঝা

ইনি দ্বারবঙ্গার অন্তর্গত "উজান" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হর্ষনাথ ঝা শ্রোত্রিয় কুলোদ্ভূত ডাঃ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের শ্বশুর ছিলেন। ইনি কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন, এবং এই সব বিষয়ে বহু সংস্কৃত পুস্তকও প্রণয়ন করেন। ইঁহার সংস্কৃতে রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে "সংস্কার প্রদীপ" সমধিক প্রসিদ্ধ। হর্ষনাথের সমসাময়িক যুগের পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ মৈথিল ভাষায় কিছু লিখিতে লজ্জা বোধ করিতেন। যিনি মিথিলা ভাষায় লিখিতেন, তিনি প্রায়ই পণ্ডিতদের চক্ষে নিন্দনীয় হইতেন, কিন্তু হর্ষনাথ নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া, অধিকন্তু সংস্কৃত ভাষায় অনেক পুস্তকাদি লিখিয়াও তাঁহার প্রিয়তম মাতৃভাষা ভুলেন নাই, এ ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। মৈথিল আদিনাট্যকার উমাপতির আদর্শ অনুসরণ করিয়া "পারিজাত হরণের" অনুরূপ দুই খানি নাটক কবি হর্ষনাথ প্রণয়ন করেন, যথা—"উষাহরণ" ও "মাধবানন্দ"। ইহা ভিন্ন ইনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মিথিলার কবি শিরোমণি বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুরূপ বহু রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিষয়ক পদ হর্ষনাথ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি আনুমানিক ৬৫ বৎসর বয়সে ২৮।২৭ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হর্ষনাথ রচিত "মাধবানন্দ" নাটকের পাত্র ও পাত্রী কৃষ্ণ রাধা ও ললিতা, ইঁহারা সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, কিন্তু নাটকের গানসমূহ মৈথিলীতে রচিত। ললিতা ও রাধা দুই জনই কৃষ্ণের প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমের ক্ষেত্রে যে বিরোধের সূচনা হইয়াছিল, তাহাই নাটকীয় ঘটনার ভিত্তি।

কবিবর জীবন ঝা

ইনি সাধারণতঃ যজালে জীবন ঝা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মজঃফরপুর মণ্ডলান্তর্গত (জেলান্তর্গত) "হরিপুর" গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। জীবন ঝা মহারাজ কাশী নরেশ প্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সভাপণ্ডিত ও সভাকবি ছিলেন। ইতি অত্যন্ত বিদ্বান ও নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় রচিত ইঁহার বহু পুস্তক আছে। গত শতাব্দীতে ইঁহার সমান প্রতিভাশালী কবি মিথিলায় খুব অল্পই ছিলেন। মৈথিল ভাষায় রচিত ইঁহার অনেক মৌলিক নাটক আছে। ইনি মৈথিল ভাষায় নাটক প্রণয়নের নূতন আদর্শ সৃষ্টি করেন। ইঁহার নাটক হইতে তৎকালীন মৈথিল সমাজের বহু রীতিনীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার "প্রভু চরিত" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে, ইহা "কালিদাসের" কাব্যানুসরণে রচিত। মিথিলা ভাষায় ইনি "সুন্দর সংযোগ" নাটক, "শারবতী পুনর্জ্জন্ম"

নাটক, "নর্ম্মদা সাগর সট্টক" ও "মৈথিল সট্টক" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে কাশীলাভ করেন।

ইঁহার রচিত "সুন্দর সংযোগ" নাটক এক কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে কথাবার্ত্তা ও গান সবই মৈথিলভাষায় বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহা একখানি নূতন ধরণের মৌলিক নাটক। এই নাটক হইতে গ্রন্থকারের সমসাময়িক যুগের সামাজিক রীতিনীতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত "শামবতী পুনর্জ্জন্ম" নাটক ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণের উপাখ্যান অবলম্বনে এবং অম্বিকা দত্তের "শামবৎ" নামক সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে রচিত হইয়াছে, এই নাটকের কথাবার্ত্তা ও গান সমস্তই মৈথিল ভাষায়। ইহা একখানি অতি সুন্দর নাটক।

কবিবর চন্দা ঝা

ইঁহাকে অনেকে চন্দ্র কবি বা চন্দ্র ঝা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইনি ভোলী ঝার পুত্র। প্রথমে ইনি ঠাটী নামক গ্রামে বাস করিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে "পিণ্ডারোছ" নামক স্থানে বসবাস করেন। ইনি মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও রামেশ্বর সিংহের সভাকবি ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইঁহার সদৃশ কবি সেই সময়ে আর কেহ ছিলেন না। ইনি মিথিলা ভাষাতে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র ঝাই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত হইতে মিথিলা ভাষায় রামায়ণ অনূদিত করেন। ইনি বিদ্যাপতির "পুরুষ পরীক্ষা" নামক পুস্তকের মৈথিল অনুবাদ করেন। ইহা ভিন্ন "অহল্যা উদ্ধার" নাটক, "মিথিলার ইতিহাস", "বাতাহ্বান" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পদাবলী রচনায়ও ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত শিব, চণ্ডী, বিষ্ণু ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ পাওয়া গিয়াছে। ইনি গত ১৩১৪ সালে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। *

ইঁহার রচিত অহল্যা উদ্ধার নাটকে গৌতমের শাপে অহল্যার পাষাণমূর্ত্তি পরিগ্রহণ এবং রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তাঁহার শাপমুক্তির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বর ঝা

ইনি দ্বারবঙ্গা জেলার তরুবণী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য ইঁহাকে "বৈয়াকরণ কেশরী" ও "কর্ম্মকাণ্ড উদ্ধারক" এই দুই উপাধি দেওয়া হয়। ইনি মহারাজ রামেশ্বর সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইঁহার বহু পুস্তক আছে। মিথিলা ভাষাতে ইনি "মিথিলা তত্ত্ব বিমর্ষ নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহা এক প্রকার মিথিলার ইতিহাস। এ পুস্তক প্রণয়ন করার জন্য তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে "মিথিলা মিহির" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। ইনি "সীমন্তিনী" আখ্যায়িকা রচনা করেন; ইহা "মিথিলা মোদ" মাসিক পত্রে ক্রমশঃ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইনি ৭০ বৎসর বয়সে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় মুরলীধর ঝা

দ্বারবঙ্গা জেলার মধুবনী সবডিবিসনের অন্তর্গত "শ্যামসিদ্ধপ" গ্রামে মুরলীধর ঝা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি ছিল "জ্যোতিষাচার্য্য"। ইনি মৈথিল ভাষায় বহু ছোটগল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন। মুরলীধর ঝা Benares Queens College এর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ইনি মিথিলা ভাষায় "মিথিলা মোদ" নামে এক মাসিক পত্র নিজ

* বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরের আজ্ঞায় চন্দ্রা ঝা মিথিলার সকল ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অধ্যায়ে ও বহু পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করেন। পত্রিকা ইঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ক্রমাগত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। মিথিলা মোদে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি ইনি নিজে সংশোধন ও পরিমার্জ্জন করিয়া দিতেন। মৈথিল ভাষায় বর্ত্তমান গদ্যসাহিত্য পাওয়া যায় ইহা ইঁহারই সৃষ্টি। বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে রাজা রামমোহন বা বঙ্কিম চন্দ্রের যে স্থান, মৈথিল সাহিত্যের ইতিহাসেও মুরলীধর ঝার সেই স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিহার উড়িষ্যা মিলিত হইয়া যখন এক প্রদেশ গঠিত হয়, তখন ইনি এই দুই নামের সঙ্গে মৈথিল নাম সংযোগ করার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত অসংখ্য প্রবন্ধাদি নিজ নামে অথবা অপর অনেকের নামে "মিথিলা মোদ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি আনুমানিক ৬০ বৎসর বয়সে প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কবি রমাপতি

ইনি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে "রুক্মিণী স্বয়ম্বর" নামক এক খানি নাটক রচনা করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা ছিল। "রুক্মিণী স্বয়ম্বরের" পাত্র পাত্রী সব সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, কিন্তু এ পুস্তকের গান মৈথিল ভাষায় রচিত।

কবি রত্নপাণি

ইনি প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে "ঊষা হরণ" নামক এক নাটিকা রচনা করেন। ইনি সংস্কৃতেও পণ্ডিত ছিলেন, ইঁহার রচিত "হিন্দুদের দেবী প্রতিষ্ঠা পদ্ধতি" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন সংস্কৃতে ইঁহার আরও অনেক গ্রন্থ আছে। "ঊষা-হরণের" পাত্র পাত্রীরা সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন—শুধু গানগুলি মৈথিল ভাষায় রচিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সংঘাত

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বা ভারতীয় ও ইউরোপীয়, উভয় সভ্যতার বা উভয় সাহিত্যের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, তাহার কথা আমরা আমাদের সমাজদেহে, এবং সাহিত্যের নানারূপে, জানিতে ও ধরিতে পারি। নূতন দৃষ্টির সহিত পরিচয় হইলে তাহার মধ্যে যাহা নূতন, অর্থাৎ যাহা আমাদের মধ্যে নাই, তাহাই আমরা গ্রহণ করিতে চাই। উভয়ের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধী ভাব তাহাই প্রথমে চোখে পড়ে। অন্যের সঙ্গে পথে চলিতে দেখা হইলে হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লই। আর পরীক্ষা করিবার সময় নজর থাকে কোথায় কোথায় অমিল তাহার উপর। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মিল আছে যথেষ্ট, মানবতা উভয়ের মধ্যে সাধারণ, উভয়ের গভীর মিলন সেখানে, তা কবি যতই অস্বীকার করুন না কেন। উভয়ের যেখানে পার্থক্য তাহা পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা লিপিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশেও যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, কিংবা দেশান্তরে গিয়াছেন, তাঁহারা সর্বদাই আমাদের সঙ্গে ইউরোপীয়ের পার্থক্যের দিকটা লক্ষ্য করিয়াছেন ও সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এ তো গেল সাধারণ দৃষ্টির কথা। সাহিত্যে ইহার খানিকটা অভিব্যক্তি হইবেই, কারণ সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবিও বটে। তুলনা করিতে বসিয়া, অথবা উভয়ের সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া, উভয়ের দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গীর কথারও খানিকটা বিচার করিতে হইবে।

এখন কথা উঠিতে পারে, সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে দর্শনের কি সম্বন্ধ। ইংরাজ বা ইউরোপের কবি ও ভারতীয় কবি, পরস্পর পরস্পরের কবিতা পড়িয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু বেদান্তদর্শন বা হেগেলীয় দর্শন চর্চা করিয়া কয়জন কবি কাব্যরচনা করিয়াছেন? আমাদের দেশে বা বিদেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক দর্শন শাস্ত্র সম্যক্‌ আলোচনার ফলে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া তবে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও বিরল, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর যদি এরূপ দুই চারিটি দৃষ্টান্ত পাওয়াও যায়, তবে তাহাকে ভিত্তি করিয়া উভয় দেশের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার পক্ষে কোনও যুক্তি আছে কিনা এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়।

সাহিত্যের সঙ্গে দর্শনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে আপাতদৃষ্টিতে তাহা বিসদৃশ মনে হইলেও একটু তলাইয়া দেখিলে আর সেরূপ বোধ হইবে না। সাহিত্য ও দর্শন উভয় পথেই জাতীয় মনের অভিব্যক্তি। সাহিত্যে তাহার সরস প্রকাশ, দর্শনে তাহার ভাবময় প্রকাশ। সাহিত্যের প্রাণবস্তু রস, দর্শনের প্রাণবস্তু যুক্তি বা বুদ্ধি। সাহিত্য চায় মূর্তি দিয়া রূপ দিয়া ভাবকে প্রকাশ করিতে, দর্শন চায় যুক্তি দিয়া বিচার করিয়া জগৎকে বুঝিতে। উভয়ের মধ্যে তাহা হইলে কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইল? উভয়ই জাতীয় চিন্তার প্রকাশ, উভয়েই জাতীয় চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং কোনও বিশেষ সমাজকে জানিতে হইলে এই দুই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু এই দুই পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, সাহিত্যিক দার্শনিক না হইলেও সমাজের যে চিন্তা দর্শনের বিষয়ীভূত সেই চিন্তাকেই রূপ দিতেছেন, দার্শনিক সাহিত্যিক না হইলেও সাহিত্যে যাহার রূপ ফুটিয়া উঠে তাহার কথাই আলোচনা করিতেছেন। সুতরাং সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে পরে, বিশেষ যদি শুদ্ধ প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ, কথা প্রভৃতিতে আবদ্ধ না থাকিয়া তাহার বিষয় ও বিচারের কথাও চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে দর্শনেরও খানিকটা আলোচনা অনিবার্য। যেখানে দুই বিভিন্ন দেশের দুই বিভিন্ন জাতির, আপাত দৃষ্টিতে দুই পরস্পর বিরোধী সভ্যতার তুলনা করিতে হইতেছে, নবযুগের সাহিত্য বুঝিতে হইলে সেখানে ঐরূপ আলোচনার প্রয়োজন আরও বেশী। আমাদের দেশে নবযুগের সাহিত্য শুধু নূতন রূপ, নূতন ছন্দ, নূতন ভঙ্গী লইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, পাশ্চাত্য দেশ হইতে বিচিত্র চিন্তাধারাও গ্রহণ করিয়াছে, ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার মধ্যে খানিকটা দৃষ্টিভঙ্গ বা 'দর্শনের' পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে,—সুতরাং যেখানে সাধারণভাবে সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলেও দর্শনের আলোচনা অপরিহার্য, সেখানে উভয় দেশের সামাজিক সংশ্রবের ফলে যে সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আলোচনায় দর্শনের কথা আসিয়া পড়িবেই।

প্রাচ্যদর্শনের মূলকথা—ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। যে একবস্তুকে জানিলে পৃথিবীর সকল বস্তুকে জানা যায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা। কি করিয়া তাহা

জানা যায়, তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার উপলব্ধি করিলে কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখা দেয়, সবিশেষ তাহারই আলোচনা—প্রাচ্যদর্শনের প্রাণের কথা। কথা চলিত আছে যে, কার্তিক ও গণেশকে ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিতে বলা হয়; দুই ভাইয়ের মধ্যে কার্তিক ময়ূরাসনে সমারূঢ় হইয়া অতি দ্রুতবেগে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করিতে গেলেন; আর গণেশ ছিলেন ইন্দুরবাহন, তিনি অতখানি কষ্ট করিতে না গিয়া ধীরে ধীরে জননীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে, এই উপাখ্যানের কার্তিক গণেশের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। রজোগুণ একের প্রবল, অন্যের কর্মশক্তি মন্থর, কিন্তু জ্ঞান গভীর, একে কর্মী, অন্যে তত্ত্বদর্শী, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায়ও এইরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায়। পাশ্চাত্য ভাবে,—পূরাপূরি, রন্ধ্রে রন্ধ্রে না জানিলে, এই পরিদৃশ্যমান জগতকে আর কি জানিলাম। পৃথিবীর জ্ঞান—ইহার জীবজগৎ, উদ্ভিদবর্গ, ইহার গতি-বিজ্ঞান, এমন কি জ্যোতির্বিজ্ঞান, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলও জানিতে হইবে বই কি। সকলই জ্ঞান-বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা মাত্র। বিজ্ঞান না হইলে জ্ঞানের কোনও ভিত্তি থাকে না। তাই বর্তমান যুগের দর্শন বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রাচ্যের মনে জাগে, উপনিষদের সেই প্রাচীন প্রশ্ন :—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—যাহাতে অমরত্ব লাভ করিতে পারি না, তাহা দিয়া আমি কি করিব—বিজ্ঞান বল আর যাহাই বল, চরম লক্ষ্য হইল অমরত্বলাভ; তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা সকল চেষ্টা সকল সাধনা ব্যর্থ হইবে। এই প্রশ্ন তাহার দর্শনের মূলে তাহাকে দিয়া শাস্ত্রের আলোচনা করাইতেছে—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্য পর্যন্ত বিচার করিয়া দেখা যাইবে ধর্মের আবেষ্টন, অতীন্দ্রিয়ের স্পর্শ, উহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; আমরা সেদিনও 'মধ্যযুগে' বাস করিতেছিলাম, পূরাপূরি 'আধুনিক' এখনও হইতে পারিলাম কই? একদিন ইউরোপেও এই ভাব, এইরূপ ধর্মপ্রাণতা, এইরূপ অতীন্দ্রিয়তা ছিল। কার্লাইল তাহার গুণের দিকটাই উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার Past and Presentএ; রাস্কিন যন্ত্র-যুগের নিন্দাই করিয়াছেন। ক্রমবর্ধমান ভোগসর্বস্বতার নিন্দা করিয়াছেন, অন্ততঃ মধ্যযুগে ইউরোপ যে অবস্থায় ছিল, তাহা সর্বতোভাবে নিন্দনীয় ছিল না,—স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মধ্যযুগের অবসান হইতে যন্ত্র যুগের আবির্ভাব পর্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা কি আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি, না, তাহা পূর্বাপর কালসমুদ্র হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি?

গত শতাব্দীতে আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা ইউরোপের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানের পর হইতে যে সকল দার্শনিক চিন্তা ও সিদ্ধান্ত মানুষের মনকে পরিচালিত করিয়াছিল, আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকেরা তাহাদিগের সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু প্লেটো ও আরিস্ততল, বা গ্রীক দর্শনের দিকে তাঁহাদের মন গেল না, সে দর্শনের পটভূমিকার সহিত ভারতীয় চিত্তের ততখানি দূরত্ব বোধ হয় ছিল না; তাঁহাদের মন গেল কাণ্ট-ফিক্‌টে-শেলিং-হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকের প্রতি, কোঁৎ মিল-হর্বর্টস্পেন্সর-ডারুইন প্রভৃতি মনস্বীদের চিন্তার প্রতি। এই ইউরোপীয় দর্শনের সহিত পরিচয় না থাকিলে আমাদের নবযুগের সাহিত্য সম্যক বুঝিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সেবাধর্ম্ম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সেবার মহান্ দুঃখে মহিমার নব পরিচয়,
দুর্য্যোগ দিনের আশা, দুর্ভোগে যে দিয়েছে অভয়,
সত্য ধর্ম্মে ত্যাগব্রতী মানুষেরে ঊর্দ্ধে দিল ঠাঁই,
নরে নারায়ণ-জ্ঞান, সেই সত্য মানুষের ভাই।

দুর্গত জনের ক্লেশ, তার ব্যথা তা'র অপমান
বুকে ধরি' যে সন্ন্যাসী দুঃখে দিল মহৎ সম্মান,
তাহারে স্মরণ করি' দুর্দ্দশার এ চরম দিনে
দুর্ভাগা দেশের লোক তারি পথ লবে না কি চিনে?

ছদ্ম নামে সেবাব্রতী মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের বিনাশ
বঞ্চনার হীন গ্লানি চোখে মুখে সদা সপ্রকাশ
সেবা করে একগুণ, চতুর্গুণ করে অহঙ্কার
মোহান্ধ দেশের লোক তাদেরে করুক পরিহার।
ধ্বংসেও গৌরব আছে, বেঁচে যাওয়া বঞ্চকের হাতে
সে অপমানের বোঝা কে বহিবে দুর্য্যোগ প্রভাতে?

সাগরপারের স্বর্ণযুগ

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

অনন্ত কাল-প্রবাহের কোন্ দিকে সত্যযুগ—কে বলিবে? সম্মুখে না পশ্চাতে? আদিতে না অন্তে? দেড় শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ধারণা ছিল—স্বর্ণযুগ সুদূর অতীতের গর্ভে লীন। তাহার প্রসিদ্ধি মাত্র আছে—কিন্তু তাহা আর ফিরিবার নহে। আবার যাঁহারা বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া মুগ্ধ—আধুনিক যুগের সেই মনীষিগণ মানুষের সুখ স্বপ্নের এই চরমকাল ভবিষ্যতে নিহিত মনে করেন। কিন্তু তাহাও ত এখনো আসে নাই—সুতরাং কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠার চিত্র-রচনা সকল যুগেই মানবের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে—সাহিত্যের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। এদিকে আমাদের পুরাণের মতে অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনটীকেই স্বর্ণযুগের গৌরবে বঞ্চিত হইতে হয় না। সত্যযুগ গিয়াছে—কিন্তু আবার আসিতেছে। চক্রের মত কালের আবর্ত্তন। কোন জিনিষ চিরতরে নষ্ট হইয়াছে—এই জ্ঞানে নিরাশায় বুক ভাঙ্গিবার হেতু নাই। কিন্তু এ পৌরাণিক যুগ কল্পনাতেও সান্ত্বনা নাই। অতীতই হউক আর ভবিষ্যৎই হউক, বর্ত্তমান নহে ত। আমরা বর্ত্তমানের জীব—কঠিন ভূতলে আমরা বিচরণ করি—নিত্য ক্ষুধা, নিত্য তৃষ্ণা, নিত্য স্পৃহায় আমরা চঞ্চল—স্বপ্ন রাজ্যের, কল্পনালোকের, মেঘের দেশের বার্ত্তা আমাদের তৃপ্তি দিবে কি প্রকারে? আমরা চাই একেবারে মুঠার মধ্যে—আকাশ পানে তাকাইয়া, চাতকবৃত্তি ধরিয়া সুখী হওয়া কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? তাই স্বর্ণযুগ-রহস্যের এ সব প্রাচীন সমাধান থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আবার ভাবিতে হইল। চিন্তার চিন্তামণি মিলে—এবার আবিষ্কৃত হইল সেই সন্তঃপ্রাণারাম তত্ত্ব—যাহাতে মানুষকে আর এদিক্ ওদিক্ কাতর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয় না—নিজের করতলের মাঝেই সেই সত্যযুগ-রহস্য সে পায়। তাই এ যুগের বাণী—বর্ত্তমানই সেই সত্যযুগ—অতীতে ও ভবিষ্যতে উহার সন্ধান করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ-রসিক ভল্‌টেয়ার—ফরাসী-প্রতিভার চিত্রাগারের মাঝে যিনি একটী বিকট অট্টহাসের মত—তিনি ইহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহার Candide নামক উপকথা সেই মর্ম্মান্তিক পরিহাস। এই পৃথিবী সকল সম্ভব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা দারুণ মানব-ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের যথাযথ খবর রাখেন না। ভল্‌টেয়ার তাহারই বীভৎস ও লোমহর্ষণ ছবি আঁকিলেন এই গ্রন্থে। কিন্তু সে অট্টহাস শূন্যে মিলিয়া গিয়াছে, মানুষ আবার দৃঢ় প্রত্যয়ে সেই হাসির কথাই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। বিশ্বের সার বসুধা—বসুধার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ যুগ বর্ত্তমান—স্বদেশ ভূস্বর্গ—স্বজাতিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাণ—এই ধারণাকেই সত্য এবং সুখের বাস্তব নিদান বলিয়া সভ্য মানুষ মনে করিতেছে।

কিন্তু তথাপি ভূতের উৎপাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। প্রেতাত্মাই একমাত্র ভূত নহে। নিজের প্রয়োজন বশে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে মানুষ নানা ফিকির অবলম্বন করে—কিন্তু পরে সেই ফিকিরই তাহাকে পাইয়া বসে। ভূতের

মত অত্যাচার করিতে থাকে। তখন স্রষ্টা সৃষ্ট পদার্থের দাস হইয়া পড়ে। যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাস এই কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কতবার সুখের আগার মনে করিয়া মানুষ ঘর বাঁধিয়াছে—কিন্তু তাহা 'অনলে পুড়িয়া' গিয়াছে। 'অমিয় সাগরে সিনান' করিয়া বুঝিয়াছে 'সকলই গরল ভেল'? দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির জন্য, আনন্দকে অচল করিবার জন্য কত যন্ত্র-মন্ত্র, প্রথা, আচার, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রগঠন, ধর্ম্মসংস্থাপন সে করিয়াছে- কিন্তু যাহা হইতে অনিষ্ট-পরিহারের আশা করিয়াছে, তাহাই অনিষ্টের আকরে দাঁড়াইয়াছে। রাজকতন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, Feudalism, সাম্রাজ্যগঠন, মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তন, —পর পর নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া কল্যাণকে স্থির, শান্তিকে শাশ্বত, দুষ্প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ, ধর্ম্মকে সুরক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বার বার নিজ বজ্রমুষ্টি খুলিয়া দেখিয়াছে শুধু শূন্য, বহু কষ্টার্জ্জিত ফলের আস্বাদ করিতে গিয়া পাইয়াছে ভস্ম ও ধূলা। এযুগেরও নবীন উদ্ভাবন আছে—সমাজতন্ত্র। এবার প্রত্যেকের অঞ্চলে ভোগ, সম্পদ্ ও সুবিধার সমান অংশ গেরো বাঁধিয়া দিবার কল্পনা—যাহাতে কোন মতেই দুর্বুদ্ধিবশে এই নিধি খোয়াইয়া কেহ আর দীন হইতে না পারে—আত্মগ্লানিতে দৈবকে অভিশাপ দিতে না পারে—সমাজব্যবস্থাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতে না পারে। সমান সুযোগ, সমান পাথেয়, সমান শক্তি পাইয়া সকলেই সমান তালে সার্থকতার প্রশস্ত পথে পদক্ষেপ করিয়া আদর্শ লক্ষ্যে পৌছিতে পারে। হয়ত এইবার যুগ-যুগান্তের স্বপ্ন সত্য হইবে—ভূলোক দ্যুলোক হইবে—অলকা মর্ত্যে নামিয়া আসিবে। এ যাবৎ মানবজাতি 'dupe of tomorrow even from a child'—'শৈশব হইতেই পরদিন কর্তৃক বিড়ম্বিত' হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষ আর কিছুতেই কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত হইবে না—এবিষয়ে কৃতসংকল্প। ইহাই বর্ত্তমান যুগলক্ষণ বা যুগধর্ম্ম। তথাপি এ নব উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্রবাদের পরিণামে মনুষ্যজাতি আবার অতীতের মত প্রতারিত হইবে কি না—তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইবে। যে শিশু এখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই, তাহার কোষ্ঠী বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গত শত বৎসরে সভ্য জগতে যে জীবন পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার লাভ-ক্ষতি খতাইয়া দেখা সম্ভব। ইহা শূন্যে রচনা নহে—প্রত্যক্ষের দৃঢ় ভিত্তিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত।

গত শতাব্দীর ইতিহাস—যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্তৃত। ইহা জাতি-প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্যের কাহিনীতে পূর্ণ। তুলনা করিতে গেলে মনে পড়ে Antonie- দিগের রোমক সাম্রাজ্য, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালী, চতুর্দ্দশ লুই'র সময়ের ফরাসী দেশ, বাদশাহ সাজেহানের সময়ের ভারত—প্রভৃতি সমৃদ্ধির যুগ। কিন্তু ব্যাপকতায় ইহা সকল অতীতকে অতিক্রম করিয়াছে। যাহা অভিজাতের সাধ্য ও প্রাপ্য ছিল তাহা জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে, অধিকারের মধ্যে আনিয়া দেওয়ায়—ইহার বৈশিষ্ট্য। লোক শিক্ষার বিপুল বিস্তার, পুস্তক-প্রকাশের অভূত-পূর্ব্ব বৃদ্ধি, আমোদ প্রমোদের অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন,—এক কথায় ভোগ-বিলাস-প্রভুতা-সম্পদের ভূরিসৃষ্টি ও সাধারণীকরণ—ইহার লক্ষণ। যেন সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ পুরুষ নিজ লুণ্ঠনব্যগ্র অযুত বাহু বিস্তার করিয়া ধরিত্রীর বক্ষ এবং জঠর হইতে অশ্রান্ত প্রয়াসে শুধু আহরণ ও সংগ্রহ করিয়াছে—যেখানে প্রকৃতির দানে কুলায় নাই—সেখানে শিল্প ও কলার কৃত্রিম উপায়ে সামগ্রী সকলের উৎপাদন করিয়া নিজের গৃহস্থালি ও ভাণ্ডার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে স্বচ্ছলতার আতিশয্যে সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায় আঁচল ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নিঃস্ব ছিল, বঞ্চিত ছিল, তাহারাও এই ভূরি

উৎপাদনের মহোৎসবে দৈন্য ছাড়িয়া সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বহুদেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—যেখানে হয় নাই সেখানেও রাজতন্ত্রের স্বৈরিতা খর্ব্ব হইয়াছে—নিয়মানুগতা স্থাপিত হইয়াছে—প্রজাবৃন্দের ছন্দানুবর্ত্তিতার দ্বারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সভ্যতার এ সকল অবিসংবাদিত লক্ষণ গত শতকের সম্বন্ধে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি সংখ্যার দ্বারা, ব্যাপকতার দ্বারা পরিমাপ করা প্রকৃত পরীক্ষা হইত, তাহা হইলে বিগত শতাব্দীকে ভূপৃষ্ঠের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগ বলিলে অসঙ্গত হইত না।

কিন্তু এই পর্য্যাপ্ত অভ্যুদয়ের মাঝে পরম কল্যাণ লাভ হইয়াছে বলিয়া মানবের বোধ হয় নাই। কারণ মনুষ্যজাতিকে দ্বিজধর্ম্মী করিয়া বিধাতা সৃষ্ট করেন, তাহার বিশেষ মাহাত্ম্য ইহাই যে সে অসন্তুষ্ট হইয়া নষ্ট হয় না—বরং অসন্তোষই তাহাকে অধিকতর উৎকর্ষের দিকে চালিত করে। সেই জন্য এত অভ্যুদয়ের মধ্যেও মানুষ অপূর্ণতা ও ত্রুটিরই লক্ষণ দেখিতেছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, সকল জিনিষ সুলভ হইলে উৎকৃষ্ট না হইয়া বরং নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। যন্ত্রে যাহা প্রস্তুত হয় তাহা সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যে মনোমত হয় না। পূর্ব্বে মসলিন, বুনিতেও দীর্ঘ সময় ও একান্ত সাধনার প্রয়োজন হইত, কিন্তু এখন যন্ত্রে রাশি রাশি দ্রুত প্রস্তুত হইতেছে। ফলে সূক্ষ্ম বস্ত্র শুধু আজ অভিজাতের অঙ্গশোভা করে না—মধ্যবিত্তেরও তাহা নিত্য ব্যবহার্য্যে দাঁড়াইয়াছে। আসবাবপত্র আর ধনীর গৃহেরই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে না—উহা filter down বা 'তলের দিকে পরিস্রুত' হইয়া সৌখিন অল্পবিত্তেরও গৃহশোভা বাড়ায়। পুস্তক রচিত হয় হাজারে হাজারে—ফলে তীব্র ও নিপুণ মননের ফলে যে সকল চিরন্তন রত্ন সৃষ্ট হইত—এখন তাহা কচিৎ দৃষ্ট হয়। অতীতের নির্ম্মিতিই উচ্চাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে—তাহারই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে—নবীন বা অর্ব্বাচীন রচনা প্রায়ই ফাল্গুনের ঘণ্টাকর্ণ ফুলের মত একবার বনানী ছাইয়া ফেলিয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই সকল ব্যাপার ইয়োরোপ-আমেরিকায় যেরূপ প্রকট হইয়াছে—ভারতে সেরূপ হয় নাই—কারণ প্রাচী ও প্রতীচীর মাঝে ব্যবধান শুধু কয়েক সহস্র যোজনই নহে—এক শতাব্দীপাদও বটে। ইহাতে আমাদের সুবিধা থাকিতে পারে—কারণ অপরের অভিজ্ঞতায় আমরা লাভবান্ হইতে পারি। কিন্তু মানুষ দেখিয়া শিখিয়াছে—ইহার দৃষ্টান্ত বিরল—ঠেকিয়া ভিন্ন শিখা মনুষ্যস্বভাব নহে বলিয়াই মনে হয়। তবে পরের-দৃষ্টান্তে কর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তিত না হইলেও শুষ্ক অভিজ্ঞতা কিছু বৃদ্ধি পাইতে পারে।

সভ্যতার কি লক্ষণ—নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন—তবে ঊনবিংশ শতাব্দী যাহা বুঝিয়াছিল ও তদনুসারে চলিয়া ছিল, তাহা যে অভাবের সংখ্যাবৃদ্ধি ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অভাবের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে মানুষের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে তাহা পূরণ করা ভিন্ন গতি নাই। The material *prosperity of modern civilisation* depends upon inducing people to buy what they do not want and to want what they should not buy.—*The Criterion* কারণ আদিম ও মুখ্য অভাবগুলি দূর করিতে ধাত্রীরূপিণী ধরিত্রী বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতির ক্রোড় হইতে অপসৃত হইয়া পল্লীবাস তুলিয়া যখন নগরে আশ্রয় লই, তখন আমাদের নিজ উদ্ভাবনের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। সর্ব্বত্রই প্রাচীন কালে গ্রাম ও নগরের মাঝে ব্যবধান ছিল সামান্য—ভারতের সভ্যতার পীঠস্থানই ছিল গ্রাম। কিন্তু বর্ত্তমান পরিকল্পনায় সভ্যতা ও নাগরিকতা এক

পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য সুসভ্য দেশে গ্রামগুলিও নগরের আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধা যাহাতে গ্রামে কোন মতে ন্যূন না হয়, তাহারই চেষ্টা চলিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা, টেলিফোন, বেতার যন্ত্র, মোটর প্রভৃতি রাজধানী ও সমৃদ্ধ পল্লীকে সমাবস্থ করিয়াছে। এই চারিটি একালের মানুষের ঋদ্ধি বা অলৌকিক বিভূতি—কল্পবৃক্ষের চারিটি চারা বিশেষ। সঙ্কল্পমাত্রে আলোক ও ব্যজন, সঙ্কল্পমাত্রে সংবাদবিনিময়, সঙ্কল্পমাত্রে বিশ্ববার্ত্তা ও সঙ্গীত শ্রবণ, সঙ্কল্পমাত্রে যথেচ্ছ বিচরণ—মানুষ কামচার হইতে আর বাকী কতটুকু? কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার সিদ্ধাই যেমন বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি এসকল বিভূতিই মানুষকে অসহায় করিয়া তুলিতেছে। খেলানা শিশুকে খেলাইতেছে, ভৃত্য প্রভুর উপরে প্রভুত্ব করিতেছে।

মনের প্রযত্ন ও অন্তঃশক্তির প্রয়োগ অনাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। এযুগের মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে নীরবতা ও নির্জ্জনতার মত যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু নাই। প্রাতঃকালে আটটার সময় হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত রেডিও-মুখরিত গৃহে পরিবারবর্গের জীবন মুহূর্ত্তের জন্যও নীরবতা ও চিন্তার অবকাশে দুর্ব্বহ হইয়া উঠে না। সিনেমাগারেও শুধু চক্ষু দুটি মেলিয়া ও হেলায় কাণদুটি খাড়া করিয়া রাখাই যথেষ্ট—ইহার অধিক মনের ক্রিয়া অনাবশ্যক। যদি বা বায়ুসেবনের প্রয়োজন হয়, তথাপি মুক্ত আকাশের তলে শ্যামল-ধরণী বক্ষে পদসঞ্চালনের প্রয়োজন নাই। কোনমতে গ্যারেজে গিয়া হাওয়া-গাড়ীতে উঠিলেই যথেষ্ট—তার পর কোমল আসনে অঙ্গযষ্টি এলাইয়া চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া থাকাই পর্য্যাপ্ত। যেখানে সকল স্বাচ্ছন্দ্য এমনভাবে নিজের আয়ত্ত, সেখানে পরমুখাপেক্ষিতা অন্তর্হিত—বন্ধুত্বের আবশ্যকতা কম। সুতরাং প্রকৃত সামাজিকতা—সহানুভূতি—সমবেদনা বিড়ম্বনা মাত্র। গোষ্ঠী বা সামাজিক মিলন ঘটে বটে—কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অন্তরের শূন্যতা কয়েক দণ্ড দূর করিবার জন্য কোন এক সাধারণ ব্যসনে লিপ্ত হওয়া। ইহা চিত্তবিনিময়ের জন্য নহে—শুধু সমশ্রেণীর [illegible] প্রাণীর মাঝে যে আমার অস্তিত্ব তাহাই অনুভব করিবার জন্য। নির্জ্জনতা ও নীরবতা দুঃসহ আপদে দাঁড়াইয়াছে—'পরবশ সবই সুখ' এই জ্ঞান আত্মবশ্যতাকে দুঃখের হেতু করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে নিরন্তর আনন্দের সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়াইয়া অন্তরের আনন্দ-প্রস্রবণ অব্যবহারে শুখাইয়া, মজিয়া যাইতেছে।

কালক্ষেপের আর এক সহজ আত্মবশ উপায় বই-পড়া। The difference between the old English and the newer is that people have by now fallen into a habit of perpetual reading, which in the better days the great mass of English men and women did not পুস্তকের রাজা এযুগে উপন্যাস। কারণ এখানেও প্রযত্ন নাই—দুরূহ চিন্তা, সূক্ষ্ম যুক্তি, জটিল তত্ত্ব এ সকল বর্জিত। সুতরাং পাঠেও গভীর অভিনিবেশ অনাবশ্যক। শুধু ঘটনার প্রবাহে, বর্ণনার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া। ইহাতে মননের সুখ আছে—কিন্তু আয়াস নাই। ইহার আকর্ষণের আর এক কারণ—ইহা আধুনিক জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব পরিপূরণ করে। নিত্যকার দিন কাটে—কর্ম্মস্থানে ও ঘরে এবং উভয়ের মাঝে গতায়াতে। সপ্তাহান্তে ছুটীর দিনে সাগরতটে কিংবা পার্ব্বত্য প্রদেশে দ্রুতপরিক্রমা কিংবা পল্লী অঞ্চলে golf খেলা। ইহা ছাড়া নিতান্ত একঘেয়ে জনতার মাঝে বিষাদময় কর্ম্মচক্রে মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়। বিপদের সান্নিধ্যে যে উত্তেজনা, যে রোমাঞ্চ তাহার সহিত সারাজীবনেই অনেকের পরিচয় ঘটে না।

বাস্তব জগতে যাহা মিলিল না—কল্পলোকে তাহার অনুকল্প কতক পরিমাণে পাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই জন্য আদিম, বন্য, বর্ব্বর জীবনের কথায় ও চিত্রে সভ্যসমাজে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। একপ্রকার কল্পনাবিলাসের উপভোগ-আকাশে জাল বুনা—এরূপ অধ্যয়নের নাম চিত্তবিক্ষেপ—জীবনের অপূর্ণতার প্রতীকার। সভ্যতা-বিড়ম্বিত মানুষ সুখদুঃখানুভূতির চরিতার্থতার জন্য গল্প সাহিত্যে আশ্রয় লয়। Stories must have a strong feminine appeal and a happy ending is essential, sad and sordid stories are not wanted. সাধারণ পাঠকের যে সুখ পরিণামী উপকথার প্রতি পক্ষপাত—তাহা এই কারণে। জীবনের চেষ্টাসমূহে আত্মপ্রতিষ্ঠার, চরম সার্থকতার উল্লাস যখন ঘটে না, তখন সান্ত্বনার জন্য আশাহত ব্যক্তি গল্পের আশ্রয় লয় এবং অজ্ঞাতসারে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়া সাময়িক এক মোহময় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। There are thousands who will day dream and night-dream in a cinema while idly allowing meaningless claptrap to float pictorially before them, thousands to one who will make the intellectual and moral effort to read a hard book or hear a symphony concert, where he will encounter real thought and feeling formally expressed It is nobody's business to supply any emotional education to the people

উপন্যাস-রচনার রীতি ও লক্ষ্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ শুধু ভারতে নহে, পরন্তু সকল দেশেই শতাব্দী-কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল—কিন্তু সুসভ্য দেশসমূহে ইহা দূর হইয়াছে এবং এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় মার্কিন। লেখক ও অন্যব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য আর নাই। লেখক ও সমৃদ্ধ নাগরিক—সকল বিলাসের প্রভু। In other countries art and literature are left to a lot of shabby bums living in attics and feeding on booze and spaghetti but in America the successful writer or picture painter is indistinguishable from any other decent business-man—Sinclair Lewis, *Babbitt* এবং ইহার মূলেও সেই একই রহস্য—ভূরি-সৃষ্টি এবং অসংখ্য বিক্রয়। লেখক যদি শুধু প্রতিভার প্রেরণায় রচনা করেন কিম্বা শিল্পের, সত্যের বা নিজ মানসী প্রতিমারই একনিষ্ঠ উপাসক হন—তাহা হইলে বাজার চলন পুস্তক লেখা সম্ভব হয় না। তাঁহাকে গণচিত্তের রহস্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মহান্ আদর্শের দুরারোহ শিখর হইতে নামিয়া আসিতে হইবে। তাঁহার মূলমন্ত্র হইবে—Write down and not up to your audience সাহিত্যের দ্বারা গণদেবতার কোন আধ্যাত্মিক উপকার হইবে এরূপ লক্ষ্য পুস্তক হাটে বিকাইবার অনুকূল নহে। যে সব সমালোচক উপন্যাস-সাহিত্যের অবনতি হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করেন, তাঁহারা আসলেই ভুল করিয়া থাকেন। আধুনিক ভূরিবিক্রেয় উপন্যাসের সম্বন্ধে মনে রাখা উচিত—Best of all it is written not for the soothing of a heart-throb but like Shakespeare's plays—for money Shakespeareকেই এই দলপতি মনে করিয়া অগৌরবের গ্লানি অনায়াসেই মন হইতে মুছিয়া ফেলা যায়। যে রচনায় বাজারে চাহিদা তাহাকে বলে advertising copy The body of a magazine is now carefully selected to endorse the message of the adver-

tisements, and it looks as though a general infection has taken place It would be impossible to find a more complete illustration of what might be called the magazine outlook of modern fiction than Bennett's last novel, *Imperial Palace* It is full of entrancing, perfect and fabulously expensive women, millionaires, luxurious living and bluff men of the world, horse-sense masquerading as psychology and insight The author frankly identifies himself in tastes and standards with the hero (head of the most wonderful hotel in the world).

গ্রন্থকারের লক্ষ্য হয় এরূপ পাঠক-শ্রেণী আকৃষ্ট করা যাহারা ব্যয় করিয়া সুখী। সেরূপ লোক হয় আশাবাদী, ভবিষ্যতের চিন্তায় অকাতর, আমোদ-প্রিয়, লঘুচিত্ত, ভাল-লাগার দাস। সেই জাতীয় লোক যে বিলাস-প্রমোদ-ব্যসনে দিনপাত করে, সাহিত্যে তাহাই যথাযথ প্রতিবিম্বিত হওয়া আবশ্যক। ফলে মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ তাহার অন্তর্ভুক্ত গল্পের দ্বারা আরও বর্দ্ধিত হয়—এবং ইহাতে সকলেই সুখী ও লাভবান্ —বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক ও পত্রিকা স্বত্বাধিকারী। প্রচলিত সভ্যতার আর একটি কৃতিত্ব—বিজ্ঞাপনের কৌশল, এবং তাহার রহস্য—অতি সূক্ষ্মভাবে ক্রেতার তোষামোদ। যন্ত্র-যুগের ভূরিসৃষ্টির মাঝে অশন-বসন-গৃহসজ্জা পুস্তক-সংগ্রহ কোন বিষয়েই অসাধারণতা রক্ষা করা সহজ নহে। সমান ধর্ম্মীদের দলে মিশিয়া যাওয়া অপরিহার্য্য। তবুও আমার একটা বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য আছে—আমি অন্য দশ জনের সামিল নহি, ইহা ভাবিতে না পারিলে সুখ কোথায়? However much we may want to be like other people, we all feel that we are really very special and individual বিজ্ঞাপনের বাহাদুরি এই মোহের নিরন্তর ইন্ধন প্রদানে—অহমিকার এই কণ্ডূয়নের তৃপ্তিসাধনে। দৃষ্টান্ত—A Book for the Few—120th thousand ইহার নাম the Snob Appeal—আত্মগরিমা-বোধের উদ্রেক। এই জন্যই প্রসাধনের সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে অনবদ্য সুপুরুষ বা অনিন্দ্যসুন্দরীর চিত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে—ফলে ক্রেতা বা ক্রেত্রীর মনে হয় তিনিও এই শ্রেষ্ঠতার দাবী করিতে পারেন বা পারিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনে অন্যান্য মনোবৃত্তিরও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করা হইয়া থাকে—যথা বিজ্ঞানের উপর আস্থা। সুতরাং ঔষধের বিজ্ঞাপনে যদি মানব শরীর-বিধানের চিত্র সংযুক্ত থাকে—অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত বিশুদ্ধ পরিভাষার প্রয়োগ থাকে অথবা উহা প্রতিষ্ঠিত কোন চিকিৎসক ভিষক্ সমিতির প্রশংসাসম্বলিত হয়, তাহা হইলে patent ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। ইহা বিজ্ঞানের মোহের কার্য্যতঃ প্রয়োগ। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—Four out of every five men and women over thirty suffer from Capillary Atymosis which turns the hair grey in a single night A bottle of *Antatymo* will ensure complete immunity আবার শ্রেষ্ঠের অনুকরণে যে ইতরের স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদলাভ বিজ্ঞাপনদাতা তাহার দ্বারাও নিজ কার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকেন। যথা একটী সরেস চুরুটের বিজ্ঞাপন—We have no illusions Our *Beaulieu cigars* are not made for the millions We do not want gigantic sales They would make the name *Beaulieu* meaningless We

r to keep our standards intact enjoy the privilege of ministering the perpetual pleasure of the erning few সুতরাং এ জাতীয় চুকট বে যে শ্রেষ্ঠজনের শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়—তে আর সন্দেহ কি? এবং ইহা ব্যবহার করা যে উত্তম পুরুষগণের অন্যতম বলিয়া ভাক বোধ হইবে তাহাও অবধারিত। পশ্চিমের মান সত্যযুগ বিজ্ঞানের যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে—কিন্তু ইহাকে বিজ্ঞাপনের যুগ বলিলেও নয়।

লোকশিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতিও এই যুগপ্রভাবে বিচিত্র আকার ধারণ করিতেছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে সমাবস্থার সৃষ্টি—শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া এই যুগে স্বীকৃত হইয়াছে। সমান আকৃতি, সমান হৃদয়, সমান চিত্তবৃত্তি—ইহাই শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু সমাবস্থা উচ্চস্তরে তুলিয়াও হইতে পারে—নিম্নস্তরে নামাইয়াও হইতে পারে। সার্ব্বজনীন শিক্ষায় levelling up বা levelling down কোনটী সাধিত হইতেছে—তাহা চিন্তনীয়। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মুদ্রিত গ্রন্থপাঠের অভ্যাস সৃষ্টি বলিলে অন্যথা হয় না। এবং কালের শক্তিমত্তম যন্ত্র হইতেছে মুদ্রাযন্ত্র। মুদ্রাযন্ত্রের সাফল্য ও প্রভাবের মূল—পাঠক-সাধারণ যা চাহিয়া থাকে অনবরত তাহারই সরবরাহ। ন যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়—তাহা mass civili tion। ব্যবসা-জগতে যদি খাদে ভরা বা কৃষ্ট ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রাচুর্য্য হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ বা মহার্ঘ ধাতুর মুদ্রা বাজার হইতে তাড়িত হইয়া থাকে—ইহাকে বলে Gresham aw। মনোজগতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। নিম্ন বৃত্তির দ্বন্দ্বে যে কর্ম্ম আদিম ভাব ও প্রবৃত্তির অনুগত, আপাত চিন্তা ও বদ্ধমূল রাগদ্বেষ (prejudices)এর পরিপোষক—তাহাই আধুনিক সংবাদপত্রে প্রোৎসাহিত হইয়া থাকে। কিভাবে ইহা সম্পন্ন করিতে হয় তাহার সম্বন্ধে একজন উপদেশ দিতেছেন—Keep your eyebrows well pinned down কোন উচ্চাদর্শের প্রেরণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিও না। এ যুগ নতভ্রূ (lowbrow)র উন্নতভ্রূ (highbrow)র জন্য নহে। যদি পাঠকসমাজকে তোয়াজ করিতে হয়—Amuse it and cheer it up Chat to it Bully it a little Tickle its funny-bone Giggle with it Confide in it Give it, now and again, a good old cry It loves that But don't, for your success's sake, come the superior highbrow over it—

Michael Joseph, *Journalism for Profit*

এভাবে রচিত গ্রন্থের মুদ্রিত অক্ষরস্রোতে নয়নতরণী বাহিয়া যাওয়ায় যে মননক্রিয়া ঘটে—তাহাতে শিক্ষার কি সার্থকতা ও কি দরের কৃষ্টি লাভ হয় তাহাও ভাবিবার বিষয়।

যন্ত্রযুগের মানুষের বৃত্তি ও ব্যবসা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও একঘেয়ে হইয়া পড়িতে বাধ্য। কোন শিল্প সমগ্রভাবে একজনের আয়ত্ত হওয়া অসম্ভব। কাঁচা মাল তৈয়ারী দ্রব্যে দাঁড়ায় বিপুল যন্ত্রের নানা অংশের ভিতর দিয়া গিয়া। এক এক জন ব্যক্তি এক একটী বিশিষ্ট স্থানে নিযুক্ত। দিনে ৮।১০ ঘণ্টা ধরিয়া একটী চাকা, একটা হাতল তাহাকে ঘুরাইতে বা নাড়িতে হয়। সুতরাং মানুষ এখন আর সমগ্র মানুষ নাই—সে কর্ম্মোপযোগী অঙ্গ বিশেষে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই শ্রমিকের প্রচলিত সংজ্ঞা Hands. শ্রমশিল্পে যেরূপ, উচ্চতর মনন ব্যাপারেও তাহাই। চারিদিকে বিশেষজ্ঞতার সমাদর। রন্ধন ও কেশবিন্যাস এক নারীর পক্ষে আর সম্ভব নহে। পূর্ব্বে যে শকট চালনা করিত, তাহাকে শকটের সকল দিকেই

দৃষ্টি রাখিতে হইত। ফলে নানাদিক্ হইতে পদার্থজ্ঞান, নানা লোকের সহিত পরিচয় তাহার জীবনে বৈচিত্র্য বিধান করিত। আর কর্ম্মে ছিল যুগপৎ শ্রম ও আনন্দ। বিশ্রামের প্রয়োজন হইত—কিন্তু আমোদ-প্রমোদের উপর একান্ত নির্ভর ছিল না। তখন ছিল recreation—বিশ্রামে উপচয়ের পরিপূরণ—এখন দাঁড়াইয়াছে decreation Decreation is compounding the lost balance through unrewarding forms of play

সার্ব্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার পূর্ব্বে ও পরে সভ্যসমাজের অবস্থা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল কলেজের শিক্ষার অভাবে পূর্ব্বে প্রকৃতির পাঠশালায় কর্ম্মের ও বৃত্তির ভিতর দিয়া বিশ্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় জনসাধারণের যে শিক্ষা হয়, তাহা সম্পূর্ণ কেতাবী শিক্ষা নহে—আবার জাগতিক জ্ঞানের পক্ষেও পর্য্যাপ্ত নহে।

যে কুম্ভকার সেকালে মাটির পাত্র গড়িত—তাহাকে মাটি চিনিতে হইত, জাল দিবার জন্য নানাবিধ জ্বালানির গুণ জানিতে হইত, বাজারের খবর রাখিতে হইত, পূজাপার্ব্বণের হিসাব রাখিতে হইত। কোন্ মালের কোন্ সময়ে কাট্‌তি বেশী হয় তাহার প্রতি নজর দিতে হইত—মোটকথা তাহাকেও নানাবিধ বিচিত্র জ্ঞানের একটী জগৎ গড়িয়া তাহার মাঝে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইত কিন্তু চীনাবাসন ও কলাইয়ের বাসন প্রচলিত হওয়ায় ভূরি-উৎপাদনের জন্য যন্ত্রের মালিককে ও উহার পরিদর্শককে বাহিরের খবর ও সমস্ত কারবারের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে শ্রমিক সে আর শিল্পী নহে—তাহার সত্তা এখন যন্ত্রচালনের জন্য একটী সজীব উপায়মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে হইয়াছে। খরিদ্দারও এখন জিনিষ চিনিতে পটু নহে—সে যায় বাঁধা-দামের দোকানে, দ্রব্যের ভালমন্দ, সূক্ষ্ম তারতম্যে তাহার দৃষ্টি নিপুণ হয় না। সমাজে বৃত্তিভেদ, অধিকারভেদ না থাকায় কোন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। একাদিক্রমে পুরুষপরম্পরায় কোন শিল্প, জ্ঞান বা ব্যবসার অনুশীলনে যে একটা পরিবেশের সৃষ্টি হইত, তাহা এখন অসম্ভবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বৃত্তির নির্দ্ধারণ হয় ব্যক্তির রুচি ও প্রকৃতি লইয়া। কিন্তু একটা অঞ্চল বা গণ্ডগ্রাম কোন বিশিষ্ট শিল্প কলা বহুদিন ধরিয়া অনুশীলন করাতে যে চরিত্রের ও ব্যবহারের উপর ছাপ পড়িয়া যাইত তাহা আর হইবার সম্ভাবনা নাই। আচার, ভাষা, আদব-কায়দায় কোন tradition এর চিহ্ন পাওয়া এখন দুরাশা মাত্র। এখন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেশ-ভূষা, অশন-বসন সকলই এক ছাঁচে গড়া হইতেছে। মানুষে মানুষে ইতরবিশেষের পূর্ব্বে যে সকল মাপকাঠি ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়া মানুষকে শুধু economic unit—অর্থনৈতিক জীবরূপে পরিগণনা করা হইতেছে।

সাগর-পারের স্বর্ণযুগের যাহারা মানুষ, তাহাদের চোখে ইহার স্বরূপ যেমন ধরা পড়িয়াছে—তাহার কিছু বিবরণ ভুক্তভোগীদেরই কথায় উপরে দেওয়া হইল। কারণ তাহারাই ইহার দোষগুণ, আলো-ছায়া, ভাল-মন্দের নিপুণ দ্রষ্টা, উপযুক্ত সমালোচক। চিরদিনই মানুষ সচ্চিদানন্দরূপ শিবের উপাসক। জীবনের পূর্ণতা ও বিস্তার, চিৎশক্তির চরম বিকাশ, আনন্দের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা তাহাকে আকৃষ্ট ও কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়াছে। যখনই নূতন কোন তত্ত্ব, কোন উদ্ভাবন করায়ত্ত হইয়াছে, তখনই তাহার মনে হইয়াছে পৃথিবী ও স্বর্গে আর ব্যবধান নাই—মানুষ দেবতা হইয়াছে—অসীম শক্তির সে অধিকারী—সে পূর্ণকাম, আত্মারাম হইয়াছে। ইহাই মহামায়ার ঐন্দ্রজালিক লীলা। তার পর উল্লাস কাটিয়া গেলে মনে

রয়েছে সিদ্ধি এখনও বহুদূরে—সাধনার এখনও অনেক বাকী। প্রচলিত সভ্যতার পরাকাষ্ঠার মধ্যে, যাঁহারা নিপুণ বিবেচক তাঁহারাও তাই অভাব ও অপূর্ণতার বোধ করিতেছেন। মনুষ্য-সৃষ্টিকে বজায় রাখিবার জন্য ইহাই বোধ হয় স্রষ্টার কৌশল। একসাথে দৈহিক ও মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্য্যাভিমুখ প্রযত্নকে বিস্তারে ও গভীরতায় পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত করিবার যে আদর্শ সভ্যতার মূলপ্রেরণা যোগাইয়া থাকে—তাহা বোধ হয়, যুগে যুগে আদর্শ মাত্রেই থাকিবে। সাধারণ মানবকে এই উন্নতি শিখরে উপনীত করিবার আয়োজন হিমালয়-অভিযানের মত বারংবার ঐতিহাসিক যুগে ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় যখন ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসে, তখনও মানুষের আশা নির্ব্বাপিত হয় না—কল্পনা শক্তির সাহায্যে সে বাস্তব অশক্তি ও অপূর্ণতার পূরণ করিয়া লইতে চায়। এই জন্যই অতৃপ্ত বাসনার ভিত্তিতে নিখুঁত মানসী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। Atlantis ও Arcadia, Avalon ও Earthly Paradise, Utopia ও Erewhon জাতীয় সাহিত্যের রচনা হইয়াছে। আবার অন্যদিকে পুঞ্জীভূত বিদ্রূপের ক্রূর হাসি—Voltaire এর *Candide*, Huxleyর *Brave New World* প্রভৃতির মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশ কুসুমগুলিকে শুষ্ক ও ম্লান করিয়া দিয়াছে।

মনুষ্য জাতি—পরিবার এখন আর Noahর পরিজনের মত একখানি ছোট নৌকায় স্থান পাইতে পারে না। অগণিত সংখ্যা ও অসীম বৈচিত্র্য অসংখ্য বিজ্ঞান রচনা করিয়াছে। ইহাই প্রপঞ্চের স্বরূপ। কিন্তু মানুষ চায় সমান করিতে, এক আদর্শে গড়িতে—ফলে প্রকৃতি ও পুরুষের মাঝে দ্বন্দ্ব। কেহই ছাড়িবার পাত্র নহেন—প্রকৃতি দিতেছেন বিক্ষিপ্ত, বিস্তৃত করিয়া। মানুষ চাহিতেছে গুটাইয়া, সংহত করিয়া একাকার করিতে। এক ও বহুর এই পরস্পর আবর্ষণে কালের বিপুল তাঁতে যে বিচিত্র বস্ত্র বয়ন হইতেছে—তাহাই সভ্যতা। স্বর্ণ যুগ বা সত্যযুগ পুরুষের নিখুঁত মানস পরিকল্পনা। আর যেলোকে আমরা জীবন-যাপন করি—নানা দোষ ত্রুটি-অভাব-অপূর্ণতার মসীচিহ্নে অসুন্দর, আশার চাদরে ঢাকা কালের বিছানায় শয়ন করিয়া অপার সৌন্দর্য্য, অনন্ত জ্ঞান, অপরিমেয় আনন্দ, অব্যাহত শক্তির স্বপ্ন দেখি—তাহাই বাস্তব।

শিল্প ও সমাজ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

সুযোগ্য গৃহকর্তা বাড়ীর আওতার সংলগ্ন জমিটুকুতে শুধু ফল আর শাকসজীর বাগান করেন না, ফুলের বাগানও করেন। ফল আর শাকসজী দেহের জন্য আর ফুল হইল মনের জন্য। ফল শাকসজী নিবারণ করে দেহের ক্ষুধা আর ফুল—তার নানা রং, পরিপাটি গঠন, সুগন্ধ আত্মায় দান করে শান্তি।

এক ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে যে কথা খাটে, বৃহৎ জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও সেকথা প্রযোজ্য। কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতিই একটা জাতির পক্ষে শেষ কথা নয়। মানুষের দেহ-ধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন, কিন্তু শুধু এর ভিতরেই জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা পরিসমাপ্তি হইলেই কি সব হইল? মনের আনন্দের জন্য সৌন্দর্যের সাধনা চাই, চিত্র চাই ভাস্কর্য চাই। "শিল্প আত্ম সংস্কৃতির জন্য।"

সমগ্র দিনের কর্ম অবসানে গৃহে যখন বিশ্রাম করি, দেওয়ালে একখানা চিত্র টানান থাকিলে মনে কি আনন্দ দেয় না? চিত্র বা মূর্তি আমাদিগকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ সাধন করাইয়া দেয়। আবদ্ধ গৃহের প্রাচীর হইতে আমাদিগকে বাহিরে লইয়া পর্বত সমুদ্র নদী, অরণ্যের সান্নিধ্যে আনয়ন করে। একখানা ছবি যেন মনের জানালা; মনের স্মৃতির দুয়ার খুলিয়া দেয়। চিত্র দর্শনে রম্য মধুর স্মৃতি সকল উদিত হয়। আমরা অরণ্য পর্বত সমুদ্র প্রভৃতি যে সকল পূর্বে দর্শন করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে বাস করিয়াছি, সে সকল ছায়া আমাদের চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। যাহারা এ সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য ভালবাসে, তাহারা চিত্র ভাল বাসিবেই। এমন কি কেহ আছে, যাহাদের মন সুন্দর দৃশ্য দেখিলে আলোড়িত হয় না? এমন কেহ থাকিলে, তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তাহাদের কাছে হয়ত চিত্রের কোনো মূল্য নাই।

চিত্র-সমালোচকের কাজ চিত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করা, সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা। কোন চিত্র ভাল কোন চিত্র মন্দ, বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু যেখানে চিত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ নাই, সেখানে এই চিত্রের বিচার দ্বারা লাভ কি? প্রথমে কর্তব্য মানুষের সৌন্দর্য বোধকে জাগ্রত করা, পরে হইবে তার বিশ্লেষণ। যে মনুষ্যসমাজের ক্ষমতা শুধু বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সে সমাজের অবস্থা যে খুব স্বাভাবিক, তা বলিতে পারা যায় না। কারণ মনুষ্য স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়। সৌন্দর্যে বীতস্পৃহ তাহারা ক্রমশঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে শিক্ষা করে, এবং চরিত্রে ইহাই বদ্ধমূল হইয়া পড়ে—মনে হয়, সৌন্দর্যের এই স্পৃহাহীনতাই বুঝি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তখন তাহাকে আবার নূতন করিয়া সৌন্দর্যের শিক্ষা করিতে হয়। সভ্যতা এবং শিক্ষার মধ্যে অনেক সময় একটা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় যাহা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে (natural instinct) উদ্বোধিত করে না। মনের ভিতরে অগোচরে যে সকল বৃত্তি রহিয়াছে, তাহাকে বাহিরে ফুটাইয়া তোলাই হইল শিক্ষা।

শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তি হইল সুন্দর জিনিষকে ভালবাসা, সুন্দর জিনিষ দেখিলেই সে হাত বাড়ায়। স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি তাহার রহিয়াছে, অস্বাভাবিকতার চাপে তাহা নষ্ট হয় নাই।

অশিক্ষিত আদিম জাতি যাহাদের বলি, তাহারা রহিয়াছে প্রকৃতির সংস্পর্শে; তাহাদের স্বভাবজাত বৃত্তি রহিয়াছে সুন্দর জিনিষকে ভালবাসা, প্রকৃতিকে ভালবাসা, কারণ তাহারা প্রকৃতিরই যে সন্তান। সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা স্বভাবজাত শক্তিকে হারাইয়া ফেলে নাই। সাঁওতালদের দেখি, ফুলের জন্য কেমন আগ্রহ, সঙ্গীত-নৃত্যে কেমন প্রীতি।

নিগ্রোদের শিল্প এবং সঙ্গীত আজকাল ইউরোপে আমেরিকায় কেমন সমাদৃত। শিল্প-রসিকদের অধুনা নিগ্রোশিল্পের প্রশংসা না করিলে চলে না। অনেক সমালোচক নিগ্রোভাস্কর্য্যকে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের সঙ্গে স্থান দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না—এমন কি গ্রীকভাস্কর্য্যের উপরেও তাহার স্থান দেয়। নিগ্রোবিষয়ক চিত্র ইউরোপের শিল্পীদের কাছে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

শিল্পী এবং শিল্পরসিকদের এই যে নিগ্রোপ্রীতি ইহার উদ্দেশ্য কি? মানবসভ্যতা বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া বর্ত্তমানে নিছক বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া পৌছিয়াছে, পর্ব্বতশিখর হইতে যে স্রোতস্বতী বাহির হইয়াছিল তাহার সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে বিভিন্ন জলধারা। বর্ত্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে গর্ব্বিত সর্ব্বপ্রকার বৈভব, আরাম সুখ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে যেন মূল-স্রোতধারায় ফিরিয়া যাইতে চায়। অভ্রংলিহ স্কাই স্ক্রেপার আকাশে ঊর্দ্ধে মাথা তুলিতেছে, আকাশযান কত উচ্চে উঠিবে, তাই লইয়া প্রতিযোগিতা। কত উচ্চে উঠিবে? তাকে মাটীতে নাবিতে হইবেই। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী মানবজাতিকে অন্ন দিয়া বস্ত্র দিয়া পালন করিতেছে, তাহাকে ত্যাগ করার উপায় নাই। শিশুর মত মানুষকে তাহার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। মানুষের উপর যত প্রকার অভিশাপ আসে, সে যখন প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া নিজের স্বীত শক্তিকে উচ্চে তুলিয়া ধরে, প্রকৃতি তাহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না। অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া শেষে উপলব্ধি করিতে হয়, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তখন তাকে প্রকৃতির সঙ্গে করিতে হয় সখ্য-স্থাপন।

মানবসভ্যতা তীব্রগতিতে ছুটিয়া চলিতেছে, জানে না, কোথায় থামিতে হইবে, শেষে মুখ-থুবড়িয়া পড়িতে হয় যুদ্ধের দাবাগ্নিতে। শিল্প ও যুদ্ধ এই দুই জিনিষ পরিপন্থী।

মন্দির, গির্জ্জা, চিত্রশালা প্রভৃতি যে সকল শিল্পসম্ভার বহন করিতেছে, সে সব মানবজাতির ভিতর মৈত্রী ও শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন ইউরোপে যখন রেনেসাঁর সময় নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, ইটালীর শিল্পিগণ এই নূতন যুগের বার্ত্তা প্রথম প্রচার করিল।

যুদ্ধের রণসম্ভারে এক একটা দেশ যে কত অর্থ নিয়োগ করে তার পরিমাণ নাই। সেই অর্থ যদি মানবজাতির শান্তি-সৌধের জন্য ব্যয়িত হইত, মানুষের দুঃখ লাঘব হইত, অনাগত কালের জন্যও মানুষের আনন্দসম্ভার সঞ্চিত থাকিত। এথেন্সের আক্রিপোলিস, ইউরোপের মধ্যযুগের গির্জ্জা সকল, ফ্রান্সের লুভরে চিত্রশালা, ভারতের অজন্তা, এলোরা, তাজমহল প্রভৃতি হইল মানবজাতির শান্তি সৌধ। বিভিন্ন জাতির মানুষ সেখানে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া এক মহামানবে পরিণত হয়, সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়, মানচিত্র হইতে ভূগোলের সীমারেখা বিলুপ্ত হয়।

চিরকালের এ সকল আনন্দভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে মানুষের কত সাধনা, শক্তি এবং অর্থ নিয়োজিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রসমূহ যদি সৃষ্ট না হইত মানুষ অনেক পরিমাণে আনন্দরস হইতে বঞ্চিত হইত। সঙ্গীত, কাব্য, নাটকাদি যেমন মানুষকে

আনন্দ দেয়, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রও তেমনি দেয়। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, কবি কালিদাস, দান্তে, শেক্সপিয়র প্রভৃতির কাব্য মানুষের মনে যে কতখানি স্থান জুড়িয়া আছে, তার সীমা পরিসীমা নাই। মনুষ্যজীবন হইতে এ সকলের প্রভাব বাদ দিলে মানুষের বর্ব্বর বলিয়া গণ্য হইবার বাকী থাকে কি?

প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরী পারসিকেরা পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, রাষ্ট্রপতি পেরিক্লিস নূতন করিয়া এথেন্স নগরী গঠন করেন। পার্সিপোলিসের অট্টালিকা এবং মন্দিরসমূহ তিনি পুনর্নির্ম্মাণ করেন, এথিনা এবং জিয়াসের মূর্ত্তি-মন্দির নগরের শোভা বর্দ্ধন করে। এই পুনর্গঠনে পেরিক্লিসকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁর বন্ধু শিল্পী ফিডিয়াস। পুনর্গঠনে রাষ্ট্রের ব্যয় হইয়াছিল বহু কোটি মুদ্রা। পেরিক্লিসকে এই অর্থব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট বিরাগ ভাজন হইতে হইয়াছিল। পেরিক্লিস এথেন্সের ফিডিয়াসের কাজকে বাদ দিয়া গ্রীসকে দেখা যায় কি? যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক ঘটনা ভবিষ্যতের মানুষের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখিয়া যায় কি? কিন্তু ফিডিয়াসের মন্দির "পার্থিনন" ও তাঁহার ভাস্কর্য্য চিরকালের, সর্ব্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি।

ভারতের বৃহৎ মন্দির, গোপুরম্‌সমূহ দেখিয়া অনেকে অর্থনৈতিক প্রশ্ন করিয়া থাকেন, প্রাচীন নৃপতিরা যেন এ সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেশের শক্তি এবং অর্থের অপচয় করিয়াছেন। ভারতীয় মন্দিরাদির ধর্ম্ম এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা ছাড়াও ফর্গুসন ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসের একটা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন নৃপতিরা এ সকল বিরাট মন্দিরাদির নির্ম্মাণে জনসাধারণকে কর্ম্ম দিয়া রাষ্ট্রের অর্থ বণ্টন করিয়াছেন। এ সকল কর্ম্ম দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান অনেক পরিমাণে করিয়াছে। ফর্গুসন বরং আধুনিক ভারতীয় ধনীদের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা অর্থব্যয় করিতেছেন ব্যক্তিগত ভোগৈশ্বর্য্যে ও অহমিকায়।

শিল্পী যখন সমাজে নিজের স্থান খুঁজিয়া পায় না, তখন তার ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করা হয় না। বালির মধ্যে স্রোতস্বতীর ধারা অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার মত তার শক্তি লুপ্ত হয়। তাহাকে নিজের স্থানে অভিষিক্ত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সমাজ তাহার নিকট হইতে বেশী কিছু পাইতে পারিত। স্বস্থানে অভিষিক্ত হইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া শিল্পীর অন্য কিছু ব্যবসা গ্রহণ করিতে হয়, এবং সে কাজে তার যথোপযুক্ততা প্রকাশ পায় না। সোনা দিয়া তৈরী করিতে হয় রাজার সিংহাসন, অথবা সোনা দিয়া মুড়িতে হয় মন্দিরের দরজা। সোনা দিয়া ছুরি বা গাড়ীর চাকা তৈরী করিতে পারা যায় না। সোনার ছুরি দিয়া কিছু কাটা যায় না, বা সোনার চাকা কিছু বহন করিতে পারে না। শিল্পী সোনার মত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না, এবং এর ব্যবহারও সীমাবদ্ধ। ঠিক কাজে এর ব্যবহার হইলেই তার যথার্থ মূল্যের যাচাই হয়।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, শিল্পী গোলাপ ফুল সৃষ্টি করে, কিন্তু তার পথের উপরে দুই চারিটা ছড়াইয়া দিতে পারে না, বস্তুত তার পথ কণ্টকাকীর্ণ। অনেক শিল্পীর পরিচয় হয়, তার দেহাবশেষ মাটীর নীচে ধ্বংস পাইলে। ওলন্দাজ শিল্পী ভ্যানগঘ্‌ জীবিতকালে উন্মাদ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং পথে পথে রং, তুলি, ক্যানভাস্‌ লইয়া ভবঘুরের জীবন যাপন করিয়াছেন। জীবিতকালে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসন পান নাই। আজ ভ্যানগঘ্‌ বহু সম্মানিত, তাঁর চিত্রকলা রসিকদের গভীর আনন্দ দিতেছে। তাঁর শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষরাজি, সমুদ্র, মেঘ, আকাশ বাতাস, বর্ণসুষমায় উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে;

চিত্রে সঙ্গীত তরঙ্গ যেন প্রবাহিত হইতেছে। শিল্পীর হৃদয় মথিত করিয়া যে আত্মার ক্রন্দন উঠিয়াছিল, তাই বর্ণে এবং রেখায় যেন স্পন্দিত হইতেছে।

কবি, সঙ্গীতকার, শিল্পী মানুষের আনন্দদাতা। সমাজ যখন তাঁহাদের যথোপযুক্ততা বুঝিতে পারিবে এবং তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান দিতে সক্ষম হইবে, মানুষের অনেক দুঃখ এবং মলিনতা দূর হইবে। নির্ম্মল আনন্দ দিয়া মানুষের মধ্যে সুরুচি সঞ্চার করিয়া কবি ও শিল্পীরা সমাজকে উচ্চস্তরে তোলেন, আবার ইঁহারাই পঙ্কিল সৃষ্টি দ্বারা সমাজকে নীচে টানিয়া লইয়া যান; কাজেই কবি এবং শিল্পীর অদৃশ্য যে শক্তি মানুষের মনের উপরে কাজ করে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। ইঁহারা হইলেন মানুষের মনের রাজা; সমাজের কর্ত্তব্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে অভিষিক্ত করা, তবেই মনুষ্যসমাজ সুশ্রীতে মণ্ডিত হইবে।*

* সুধী পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আমার এই প্রবন্ধে মনীষী রাস্‌কিনের ছায়াপাত হইয়াছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আন্ টু দি লাস্ট্"এর পলিটিক্যাল ইকনমি অফ আর্টের সঙ্গে আমার মিল আছে। আর্ট শুধু জনকয়েকের জন্য নহে, ড্রয়িংরুমের সখের জিনিষও নহে; ইহা জনসাধারণের। সেজন্য সমাজের শিক্ষাদীক্ষা এবং অর্থনীতির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ রহিয়াছে। মানুষের জীবন-ধারণের জন্য যেমন অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজন, তেমনি তার প্রয়োজন আছে শিল্পের। রাস্‌কিন্ গোড়াতে ছিলেন শিল্প-সমালোচক, মানুষের দুঃখ এবং শিক্ষার অভাব দেখিয়া তাঁর চিন্তাধারা অন্য দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে সব নরনারী শিল্পরসবর্জ্জিত, তাহাদিগকে কি করিয়া শিল্পের সৌন্দর্য্যে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তারই অবতারণা রাস্‌কিন্ করিয়াছেন।

হংস-বৃত্তি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

জীবন-যোড়া দুঃখ যখন, জীবন্তও থাকতে হ'বে—
কাজ কি বদন বিরস ক'রে? প্রাণান্ত হয় হেসেই হ'বে।
অশান্তি সে ঘরের ছেলে, বুঝিয়ে দিলে বুঝ্‌বে বেশ ও
মনের কোণে না পুষে তায় বল্‌বো, "বাছা, বেড়িয়ে এসো!"
হাঁসের গায়ে জল জমে না, যতই ভিজুক শ্রাবণ ধারে
দুঃখের ধারা তেমনি আমার মনের মাঝে পশতে নারে।
গর্জ্জে ভীষণ ঝঞ্ঝা-বায়ু,—বজ্র ঝলে, বর্ষা নামে।
বেদন-আঁধার ছায় চারি ধার, যাতনা শোক ডাইনে বামে—
কত না ঢেউ কাটিয়ে শেষে কূলের দেখি নাই ঠিকানা!
মনের মানুষ পেলাম ভাবি, দেখ্‌ছি কারেও নেইক জানা।
তাই ব'লে এর একটি কণাও পশ্‌বে আমার মনের কোণে,
সকল কাজে দিনের মাঝে ঝড় বহাবে সঙ্গোপনে,
এমন ধারা হয় নি কভু, পরেও প্রভু না হয় যেন—
বাইরে তোমায় পাইনে ব'লে অন্তরে বা না পাই কেন?

রামপ্রসাদের সাধনা

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। পরমহংস দেবের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর ব্রিটিশশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ও কুৎসা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সমগ্র পৌরাণিক যুগের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহবি আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় সামাজিক জীবনে এক নূতন সমস্যার সূচনা হয়। এই জন্য রামপ্রসাদের প্রভাব বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাহিত্যের দিক্ দিয়া রামপ্রসাদের স্বগ্রামবাসী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সাধনার দিক্ দিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান করেন।

রামপ্রসাদ যে যুগে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সে যুগে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব কেহ উপলব্ধি করেন নাই। উহার শতবর্ষ পরে পরমহংসদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উদারভূমিতে সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রামপ্রসাদ সেন তাঁহার সমসাময়িক পরস্পর বিবদমান হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলিকে সাম্প্রদায়িক কলহের তিক্ততা ও বিকৃতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব ও গাণপত্যসম্প্রদায়ের সাধনার ঐক্য বুঝাইবার জন্য গাহিয়াছিলেন—

"উপাসনা ভেদে তুমি
প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে
তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥" ২৭

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

"ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক
মন করো না দ্বেষাদ্বেষি॥" ১৩২

তিনি "কালী হলি মা রাসবিহারী" নামক সুপ্রসিদ্ধ পদে শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে প্রচলিত বিবাদের নিবারকরণ করিয়াছেন। তিনি নিজে কালীর সন্তান, সুতরাং কালীর মধ্যেই সকল দেবতাকে দেখিয়াছেন এবং "দ্বেষাদ্বেষি" করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

"মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিবে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে,
করিলাম কত খোঁজ তালাসি,
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম
সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা রামরূপে ধর ধনু,
কালীরূপে করে অসি॥" ৬৬

যেমন উপাস্য দেবদেবী সবই এক, তেমনি তাঁহাদের পুণ্যক্ষেত্র সমূহও এক। যে সাধক বিভিন্ন তীর্থের মাহাত্ম্যের মধ্যে তারতম্য খুঁজিতে যান, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ। কবি বলিতেছেন—

* পদ উদ্ধৃত করিয়া যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা ১৩৩০ সালে প্রকাশিত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "রামপ্রসাদ" নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত পদের সংখ্যা।

"ও মন তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত,
হরিহর তোর এক হলো না॥
বৃন্দাবন আর কাশীধামের মূল কথা মনে বোঝ না;
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে করে আত্ম প্রতারণা।
যমুনা আর জাহ্নবীকে একভাবে মনে মান না;
অসি বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে (তোমার)
কর্ম্মকরা আর হ'ল না।
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা,
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর
চক্ষু থাকতে হ'লে কাণা॥" ১৮১

রামপ্রসাদের এই উদারদৃষ্টি তাঁহার পরবর্তী যুগের শাক্তকবিদিগকে ধর্ম্মসমন্বয় স্থাপনে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গল কাব্যের লেখকগণের মধ্যে যে বিবাদের সুর লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকদের মধ্যে তাহার অভাব বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগৎরাম তাঁহার "দুর্গামঙ্গলে" রামপ্রসাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছেন—

"সে প্রভুর নিবাস কি নিত্যবৃন্দাবন।
মহান গোলক বলি তারে কেহ কন॥
কেহ নিত্য অযোধ্যা বলিয়া বলে তারে।
অন্য মহাবৈকুণ্ঠ বলায় সেই পুরে॥
কেহ নিত্য কাশীভাবে উপাসনা ভেদে।
এক ধামে নানা নাম বলে চারিবেদে॥"

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে গৌরীমঙ্গল" লিখিতে যাইয়া ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্য-বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

'সেই জন ধন্য যে লইবে হরিনাম।
ভব ফাঁস কাটিয়া যাইবে বিষ্ণুধাম॥"

শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের অবসানের এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

রামপ্রসাদের এই উদার সার্ব্বভৌম দৃষ্টি অল্পদিনের সাধনার ফল নহে। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধনার বিভিন্ন স্তরের অনুভূতি তাঁহার পদাবলীর মধ্যে রূপ পাইয়াছে। পদাবলীকে এক সময়ের রচনা বলিয়া ধরিলে এই স্তরগুলির পার্থক্য অনুভব করা যায় না। কবিসাধক যৌবনের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ পদ, পালা ও কাব্য লিখিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি শ্রীরাজকিশোরের আদেশে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা ভগিনী ভগিনীপতি ও ভাগিনেয়ের মঙ্গল কামনা করিয়া পয়ার লিখিয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাসী হইয়া মায়ের স্নেহ ও করুণা পাইয়াছিলেন, অবশেষে বৃদ্ধকালে গাহিয়াছেন—

"প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে
টেনে ফেলো॥" ১৪৫

রামপ্রসাদ কালিকার অনুগৃহীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে তাঁহার কুলে "প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী" এবং তাঁহার পিতার প্রতি 'সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।' *তাঁহার জন্মভূমিও পুণ্যধাম—'ধরাতলে ধন্য সে* কুমারহট্ট গ্রাম, তার মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।' পদাবলী রচনার পূর্ব্বে তিনি "বিদ্যাসুন্দর", "সমরসঙ্গীত," "কালীকীর্ত্তন", "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। পদাবলীতে তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেইজন্য পদগুলিতে তাঁহার সাধনার বিভিন্ন স্তর কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিব।

প্রথম প্রথম কবি মায়ের নিকট তাঁহার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা নিবেদন করিতেন। যথা—

"কেহ থাকে অট্টালিকায় আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি
কেহ নই॥

* * * * *

কেউ বা বেড়ায় পালকী চড়ে, আমি বোঝা বই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছি
গো মই ॥" ৩০২

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব
ভিখারী ॥" ৪৮

"যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে বয়।
ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকোনা রামপ্রসাদের
আশায় ॥" ৫৫

"একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে
পেটের ভুকে ॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখলে
যাবে পরম সুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী, নুণ মেলেনা
আমার শাকে ॥" ১৫২

দরিদ্র হওয়ার দুঃখ নিবেদনের মধ্যে রামপ্রসাদের একটি নিজস্ব ভঙ্গী দেখা যায়। ইহাকে ঠিক সকাম ভজন বলিলে অন্যায় হয়। সংসারের দুঃখে কবি উত্যক্ত হইয়াছেন; তাঁহার দুঃখ মাকে না জানাইয়া আর কাহাকে জানাইবেন? মা-ই যে তাঁহার একমাত্র আপনার জন। তিনি মাকে নিজের দুঃখের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু মায়ের কাছে যে "ধনং দেহি, যশো দেহি" প্রার্থনা করিতেছেন তাহা নহে। অর্থাভাব জানাইবার একটি প্রধান কারণ এই যে তিনি পরের দুঃখ মোচন করিতে পারেন না। দানধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না। কবি ধনরত্ন প্রার্থনা না করিয়া মায়ের কাছে নিজের দুঃখ নিবেদনপূর্ব্বক দারিদ্র্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

"জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দানধর্ম্ম তদুপরি।" ৪৮

"তুমি এভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর ॥" ৫৩

"যদি দিতে পেতে, নিতে থেতে, দিতাম
খাওয়াইতাম তোমারি।" ১১৭

অতি বড় দুঃখেও সাধক একবারও মায়ের কাছে আর্থিক সুবিধা কামনা করেন নাই। তিনি প্রার্থনার সময়ে সর্ব্বদাই বলিয়াছেন—

"ওমা,আমার ইচ্ছা অভয় পদে চরণধূলা হই।" ৩০২

মায়ের পদ ধ্যান করিতে করিতে সাধকের মন হইতে দারিদ্র্যের ক্ষোভ দূর হইয়া গেল। ধ্রুব যেমন রাজসিংহাসন আশা করিয়া পদ্মপলাশলোচন হরিকে ডাকিতে ডাকিতে হরিকেই পাইলেন—রাজঐশ্বর্য্য আর তাঁহার কাম্য রহিল না, তেমনি প্রসাদ কবি মায়ের প্রসাদে সকামভজনের ব্যর্থতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিলেন। এই স্তরে উপনীত হইয়া তিনি গাহিলেন—

"কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা অভয় চরণ, রাখি হৃদি
পদ্মাসনে ॥" ১০৫

প্রত্যেক সাধকের জীবনে প্রথমে সংসারের অনিত্যতা, ও দারাপুত্র পরিজনের প্রতি মমতার অযৌক্তিকতা বোধ জাগে এবং শাশ্বতী শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। সেই সময়ে সাধক তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা বোধ করেন। রামপ্রসাদের জীবনের এই স্তর তাঁহার অনেকগুলি পদে রূপ পাইয়াছে।

"আমি কে বা আমার কে বা, আমি ভিন্ন
আছে কে বা।
মন রে ওবে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা ভাব দুখ সুখ।" ৪৩

"ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন সঙ্গের দোসর
নহে কোন জন।" ৪৫

"যার জন্যে মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবর ছড়া, অমঙ্গল
হবে বলে॥" ১২৫

"তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর
কার ভাবনা।

"ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবে না, ভাব
দেখে কি যায় না জানা॥" ২৫৫

ধনজন সংসার-রসে মত্ত থাকার জন্য এই সময়ে মনে অনুশোচনা জন্মে। জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল এইরূপ বোধ হয়। রামপ্রসাদের পদাবলীতে এই অনুশোচনা এমন সহজ হৃদয়স্পর্শী ভাষায়, সাধারণের পরিচিত বিষয়ের উপমা সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তিনি বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে আজও রাজা হইয়া আছেন। তাঁহার পদ গাহিতে গাহিতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে হয়, এমন দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া কি করিলাম। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছিলাম, অথচ ভাষা পাইতেছিলাম না, রামপ্রসাদ যেন তাহাই বলিতেছেন—

"এমন মানব জমীন্ রলো পতিত, আবাদ
করলে, ফলতো সোণা,॥" ৬

"কেবল অসার আশা, ভবে আসা
আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে,
ভ্রমর ভুলে রলো॥" ১১

"আমি ভাবি এক, হয় আর, সুখ নাই মা
কদাচিত।
পঞ্চদিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত॥
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের
অনুগত॥" ১৪১

"কাজ হারালাম কালের বশে
মন মজিল রতিরঙ্গ রসে॥" ১৪৭

"প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা,
সায়াহ্নে দাও অর্থ চিন্তা, বল মা তোমায়
কখন ডাকি॥" ১৮৩

সংসার অনিত্য বুঝিয়া অনুশোচনায় প্রপীড়িত হইয়া কবি উদ্ধার পাইবার আশায় মায়ের চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই দুঃখময় সংসারসাগরে ডুবিয়া মরিতেছি, এ অবস্থায় মা-ই একমাত্র ভরসা। তিনি যদি রক্ষা করেন তো রক্ষা পাইব—তাহা না হইলে ডুবিলাম। এই প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণ রামপ্রসাদের সাধনার তৃতীয় স্তর। সংসারজ্বালা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা এবং মায়ের নাম ও রূপের সাহায্যে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আশা সাধক রামপ্রসাদের অনেকগুলি পদে প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি—

"একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো,
রামপ্রসাদের এই আশা, মা, অন্তে
থাকি পদানত॥" ৩

"প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নাবাও
ক্ষণেক জিরাই॥" ১৬

"এ ভব-বন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥" ৩৭

"সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে, এ কথা
কাহারে কব॥" ১২৯

"তাই ডাকি শ্রীদুর্গা বলে।
আছে চরণ-তরী ভবের কূলে॥" ২৭২

মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নাম জপ ও রূপ ধ্যান করিয়া রামপ্রসাদ অল্পদিনের মধ্যেই অপূর্ব্ব আত্মবলে বলীয়ান্ হইলেন। পূর্ব্বে

তিনি শমনের ভয়ে ভীত ছিলেন। মায়ের করুণা পাইবার পর তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার অমৃতত্ব লাভ হইয়াছে। বৈদিক ঋষি যে প্রাপ্তির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিশ্বের সমগ্র লোককে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "আমি তাঁহাকে জানিয়াছি, তাঁহাকে পাইয়াছি, যদিও তিনি আদিত্য বর্ণ, এবং তামস লোকের পারে থাকেন," সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া রামপ্রসাদ গাহিলেন—

"ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রিগতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করিল শিবা॥"১০

কবি সাধনার এমন এক উচ্চভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন যে তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিলেন আমার "তৃষা-ভয় ঘুচিল সত্বরে"; এবং "আর জঠরে জন্মগ্রহণ ক্লেশ আমাকে সহ্য করিতে হইবে না।" এই আনন্দলোকে তাঁহাকে লইয়া গেল কে? মায়ের রূপ।

"কাল মেঘ উদয় হোলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে॥" ৩০

মায়ের স্নেহ পাইয়া রামপ্রসাদ শমনকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। বারংবার তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে শমন তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না (৬৯, ৭০, ৭২-৭৬ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। মায়ের স্নেহ ও আদর কবি জীবনের প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতে চাহেন। যদি কোন সময়ে তাঁহার মনে হয় যে মা তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন না, তাঁহার ডাকে সাড়া দিতেছেন না, অমনি তাঁহার অভিমান হয়। আদুরে ছেলে যেমন মাকে ছোট ছোট হাত দু'খানি দিয়া কিল চাপড় মারে, রামপ্রসাদ তেমনি বিশ্বজননীকে গালাগালি দিতেও কসুর করেন নাই।

"গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হোয়েছো কালী।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমার রে॥"৭৮

"মা বলে ডাকিস্ নারে মন,
মাকে কোথায় পাবে ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তলি দহন করে।
ওরে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে,
কালাশৌচে কাশী যাই॥" ১৫৬

এই সময়ে রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। নারীর বিভিন্ন মূর্ত্তি মায়েরই বিভিন্নরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল।

"মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা॥
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
কচিৎ পদ্মিনী নামা কচিৎ চিত্রিণী বামা
শঙ্খিনী হস্তিনীরূপে কটাক্ষেতে মন হরে॥" ২৮৮

কেবলমাত্র নারীর রূপেই তিনি মাতাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, বিশ্বের অণু পরমাণু তখন মা ছাড়া আর কিছুই নহে।

'ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি;
জেনেও কি তাই জান না?
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর
উপাসনা।" ৯২

বেদান্ত প্রতিপাদ্য তত্ত্বমসি উপলব্ধির উপরেও মা-ই প্রতিষ্ঠিত আছেন—সাধক দিব্যচক্ষুতে তাহাই দেখিতে পাইতেছেন—

"কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী॥" ১১২

মাতৃস্নেহ জীবনে মরণে, প্রতি পলে, উপলব্ধি করিবেন বলিয়া রামপ্রসাদ সাধনার চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন সাযুজ্য মুক্তি—যাহাতে মায়ের নিকটে স্থায়ীভাবে বাস করা যায়। তাই তিনি গাহিয়াছেন—

"আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না॥"১২১

সংক্ষেপে কবির সাধ্য নিরূপণ ও সাধনার স্তরভেদ নির্দ্দেশ করিলাম, ভবিষ্যতে রামপ্রসাদের তান্ত্রিক সাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

হিন্দুর শিক্ষা ও জীবন ধারা

অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায়, এম্-এ

আর্য্যজাতি শিক্ষাকে জীবননির্ব্বাহের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া জানিতেন। আর্য্যকুমারের শিক্ষার তাহার জীবনের যোগ থাকিত। তাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটিত। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহে বাস, যৌবনে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন, প্রৌঢ়াবস্থায় সংসার ত্যাগ এবং অন্তিম বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ এই ছিল তাঁহার জীবনের ধারা। এই সকল অবস্থার উপযোগী বিষয় তাঁহারা শিক্ষা করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় তাঁহারা 'বেদ' অভ্যাস ও ধারণা করিতেন, সংসার ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া 'ব্রাহ্মণ' নির্দ্দেশ অনুসারে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিতেন, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া 'আরণ্যক' উল্লিখিত সত্যের ধ্যান করিতেন এবং সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া "উপনিষদ্" বাণী জীবনে উপলব্ধি করিতেন। এই যে সম্যক্ উপলব্ধি ইহাই হিন্দুজীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে জীবন সফলকাম হইত এবং চিরবাঞ্ছিত মুক্তি লাভ হইত।

অতএব দেখা যাইতেছে হিন্দু দর্শনের যে চারিটি ভাগ—বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্, ইহার প্রত্যেকটির সহিত জীবনের যোগ ছিল। অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে—জীবনের গতির সবিশেষ নির্দ্দেশই হিন্দুর শিক্ষা এবং দর্শনের তথ্যসমূহ সম্যক্ ধারণা করাই তাহার ইষ্ট ছিল। দর্শন এবং জীবন্ এই দুইটিকে আর্য্যহিন্দু কখনই পৃথক করিয়া দেখেন নাই। জীবনটাকে দর্শনের সত্য উপলব্ধি করার একটা প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন।

আজকাল দেখা যায়—ভারতবাসীর অন্তরে দর্শনের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা বা অনাস্থা জন্মিয়াছে। এখনকার ছেলেরা দর্শনশাস্ত্র পড়িতে অনিচ্ছুক, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থশাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য তাহারা ব্যাকুল, কারণ এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইবে এই ধারণা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমরা এই বিশ্বাসের পক্ষপাতী না হইলেও ইহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিব না, কিন্তু দর্শনের প্রতি এই যে অনাস্থা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব এবং যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ছাত্রেরা দর্শন পাঠ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা দেখাইব।

আমরা দেখিতেছি ছাত্রেরা দর্শনের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা আদৌ করে না। সাধারণের বিশ্বাস দর্শন মানে উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিকার, অথবা নিরর্থক তর্কবিতর্ক ও কথা-সৃষ্টি। এই বিশ্বাস কতটা ভ্রান্ত তাহা প্রকৃত দার্শনিক ভালো করিয়াই জানেন। দর্শনের প্রতি অনাস্থার আর একটা কারণ এই যে দর্শন পাঠ করিলে মানুষ ইহসংসার ভুলিয়া যায় এবং সকল কাজে অপটু হইয়া পড়ে। এই বিশ্বাসও অনেকে মনে মনে পোষণ করেন।

এখন দেখা যাক্ "দর্শনের" প্রকৃত অর্থ কি? দর্শন মানে দেখা, অর্থাৎ যাহা সত্য, নিত্য, পরম কল্যাণকর তাহা প্রত্যক্ষ করাই দর্শন। এই অর্থ ইউরোপীয়গণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র আলোচনাবহুল। মানুষের জীবন ও জ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন সত্যের স্বরূপ কি এবং তাহা জ্ঞানগোচর হয় কি না। বিচার, তর্ক বিতর্ক, ভাবোন্মাদনা ইউরোপীয় দর্শনের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ফলে জীবনের সহিত

ইহার যোগ বুঝা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এবং সাধারণে দর্শনশাস্ত্রকে হেয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতেছে।

এদেশের লোক দর্শনের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গিয়াছে। একদিন হিন্দুর জীবনে দর্শনের প্রভাব প্রবল ছিল, দর্শনের তথ্যগুলির উপলব্ধির জন্য হিন্দু প্রাণপাত চেষ্টা করিত। আজ সেদিন কোথায়? এখন দর্শনশাস্ত্র মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তাহার কারণ এখন হিন্দুর শিক্ষা-পদ্ধতি লুপ্ত প্রায়। সমস্ত জীবনের গতি বা ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এমন শিক্ষা আর নাই, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্যহীন শিক্ষা বা দিশাহারা জীবন আর্য্যঋষি কল্পনায় আনিতে পারিতেন না। তাঁহারা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই দর্শনের বাণীরূপে ঘোষণা করিয়া জগতের কল্যাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

যদি লক্ষ্য বস্তু ঠিক না থাকে তাহা হইলে শিক্ষার সহিত জীবনের যোগ লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শিক্ষার অবতারণা করিলে সে শিক্ষা সফল ও কল্যাণকর হয়। ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা ঈশ্বরদর্শন যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয় তাহা হইলে হিন্দুগণ যে শিক্ষাপদ্ধতির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করেন জীবনকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে —সুখময় করিতে হইলে পার্থিব কল্যাণই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, কারণ এই জগতে আমাদের বাস করিতে হইবে এবং সেই জন্য জগতের দুঃখ কষ্ট নাশ করিতে পারিলে নিজের দুঃখকষ্ট থাকিবে না এবং পূর্ণ সুখসম্ভোগ সম্ভব হইবে। কিন্তু যে সব দেশের লোক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি বা বাণিজ্য করে, কলকারখানায় পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং এইরূপে সংসারের অভাব দূরীকরণ মানসে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, সেই সব দেশের লোক কি বাস্তবিক সুখী? পার্থিব সুখ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে না।

আর একটা কথা আছে—অনেকে মনে করেন ঈশ্বরপ্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য বা ইষ্ট হইতে পারে না, কারণ ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করা এবং পার্থিব সুখের প্রতি বীত-রাগ হওয়া দরকার। কিন্তু পৃথিবীর সকল মানুষ ঐরূপ ত্যাগ সাধনে সক্ষম নয়। ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য ত্যাগ করিতে হইবে এ কথা সত্য কিন্তু ত্যাগ বা সুখবর্জ্জনের সময় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহার অল্প বয়সে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র, নচেৎ সন্ন্যাস লইবার সময় শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই তিনটি অবস্থা পার হইয়া চতুর্থাবস্থা সন্ন্যাসে উপনীত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এই তিনটি অবস্থার কোনটিতে আজীবন আকৃষ্ট হইয়া পড়েন তাঁহার চতুর্থাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে না, মুক্তিও লাভ হয় না।

মনু লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর যাবৎ বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা যতদিন না তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ হয় ততদিন গুরুগৃহে বাস করিবেন।" বেদ অধ্যয়নের পর অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন "অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।" আবার একথাও বলিয়াছেন, "চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ। দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥" দ্বিজ জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুসমীপে বাস করিয়া দ্বিতীয় ভাগে কৃতদার হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিবেন। বেদ অধ্যয়ন করা, গুরুর সেবা করা, এবং ব্রহ্মচর্য্যের সকল নিয়ম পালন করা আর্য্য-কুমারের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। তৎপরে বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইত। সংসার ত্যাগ করা এ অবস্থায় বিহিত নয়, সংসার করাই

ধর্ম্ম। অবশ্য নিষ্ঠাবান হইয়া এ ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রম শেষ করিয়া তপঃ স্বাধ্যায়াদি নিয়মযুক্ত হইয়া যথাবিহিত বানপ্রস্থ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অরণ্যে আশ্রয় লইবার সময় কি? এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন, "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী-পলিতমাত্মনঃ। অপত্যস্যৈবচাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।" গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, কেশের পক্কতা জন্মিয়াছে, পুত্রেরও পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে তখন তাঁহার অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। পত্নীকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করিয়া কিম্বা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবেন। বনে যাইয়া নিত্যই বেদাধ্যয়নে রত থাকিতে হইবে (স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ) এবং তপস্যা দ্বারা আত্মার দর্শন লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। মৃত্যু না ঘটিলে বানপ্রস্থ্যাশ্রমে জীবনের তৃতীয়ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থভাগে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে (চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ)। গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সদাই ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ করিবে। সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে এবং সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইবে। (অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ)। সর্ব্বদেহে যে পরমাত্মা আছেন তাহা চিন্তা করিবে এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া বাস করিবে। এইরূপে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্তি হইবে।

আর্য্য-হিন্দুর জীবন ধারা আলোচনা করিলে বুঝা যায় হিন্দুরা কিরূপ নিয়মবশবর্ত্তী ছিলেন এবং জীবনের লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য কিরূপ যত্নবান হইতেন। তাঁহারা শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যে যোগ আছে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাকে জীবনগঠন ও জীবনধারণের উপায় বলিয়া জানিতেন। কোনও কালে এবং কোনও দেশে এরূপ শিক্ষাপদ্ধতি এবং এমন জীবন গঠনের ধারা প্রচলিত ছিল না। অতি পূর্ব্বকালে গ্রীশে শিক্ষা-পদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শরীর ও মনকে সবল রাখা এবং রাষ্ট্রের কার্য্য সুন্দরভাবে পরিচালনা করিবার উপায় অবলম্বন করা। দর্শনের আদর ছিল যথেষ্ট কিন্তু দর্শনই যে জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া মানুষকে জীবনের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয় এ ধারণা ছিল না। সক্রেটিস, প্লেটো, আরিষ্টটল্ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন কিন্তু মানুষের জীবনের গতি চিরকালের মত বদলাইয়া দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারাও নিজ নিজ জীবনে যাহা পরম সত্য তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহাদের শিক্ষা প্রভাবে গ্রীশের চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতির বদল হইয়াছিল সত্য কিন্তু সে দেশের লোক চিরন্তন সুখ পায় নাই এবং চিরকালের জন্য তাহারা তাহাদের ইষ্ট স্থির রাখিতে পারে নাই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মত বদলাইয়াছে, জীবনের লক্ষ্য ও গতি অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, নিত্য ও সত্য বস্তুর সাক্ষাৎ তাহারা পায় নাই।

প্লেটো তাঁহার "রিপাবলিক্" (Republic) গ্রন্থে একটা আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়াছেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কিভাবে শিক্ষা পাওয়া উচিত তাহার ধারা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয় প্লেটো অমৃতের সন্ধান জানিতেন। কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তাহা গ্রহণ করে নাই। তাঁহার নির্দ্দেশমত শিক্ষা-পদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত আদর্শই রহিয়া গেল, কার্য্যকরী হইল না।

আজ আমাদের দেশে চলিত শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে মতবাদ রহিয়াছে এবং দিন দিন তাহার যে তীব্র সমালোচনা হইতেছে তাহার কারণ আজ আমরা শিক্ষার সহিত জীবনের যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "ওয়ার্দ্ধা স্কীমে" যে শিক্ষা-পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (individuality) ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের সন্ধান নাই। তাই মনে হয়, আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তির উপর গড়িতে হইবে। অবশ্য স্থান ও কাল ভেদে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বেদের চিরন্তন সত্য বদলাইতে পারে না, তাহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য থাকিবে।

কাব্য-রসের অন্তর-রহস্য

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্-এ
(বিশ্ব-ভারতী, শান্তি-নিকেতন)

মানুষ চারদিকেই উপলব্ধি করে একটী আনন্দের মোহন মূর্তি—প্রতি পরমাণুর অন্তরে বিরাজ করে আনন্দের একটী গুপ্ত ধারা। তাই প্রতিমুহূর্ত প্রতি কর্মের মধ্যে সে খুঁজে বেড়ায় 'অলোক-রতন' আনন্দ ধন। কখনও প্রকৃতির শ্যাম শোভা নিরীক্ষণ করে', কখনও বা অন্তরের ভাবসমুদ্র মথিত করে' তাকে সে রূপ দিয়েছে শব্দে, সুরে, পটে, দৃশ্যে, গন্ধে ও গানে। তাই কল্পলোকে কাব্য, চিত্র ও নৃত্য-গীতের পরিসরে সে ফিরে পেতে চায় তার আপন সম্পদ্—তার অন্তর্লোক পুলকিত হ'য়ে ওঠে আনন্দের উচ্ছ্বাসে। আমাদের চিত্তলোকে এই যে আনন্দের গোপন অভিসার সম্ভব হয়—এটা ভারতের আস্তিক ও নাস্তিক সকল দর্শনশাস্ত্রই স্বীকার করেছেন একাধারে; তবুও কথা ওঠে যে এই আনন্দ কি আমাদের চিত্তের নিজস্ব আন্তর সম্পদ্, না, এটা তার বাহ্যিক অবস্থামাত্র—যা' ক্ষণিকের তরে জাগ্রত হয় চিত্তলোকে আর পরমুহূর্তেই বিলীন হয় বিস্মৃতির গর্ভে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদের; তবে প্রত্যেক আলঙ্কারিক নির্ভর করেছেন এক একটী দর্শনশাস্ত্রের মূলসূত্রের উপর।

তাই প্রথমতঃ মীমাংসাবাদী আলঙ্কারিকরা বলেন যে, কাব্য ও নাটকের বিশিষ্ট শব্দ, অর্থ ও নট-নটীর অঙ্গভঙ্গীর সহযোগে কতকগুলি বিশিষ্ট অবস্থার সমবায়ে আমাদের মনোলোকে এই আনন্দ বা রসের উৎপত্তি হ'য়ে থাকে। অভিনেতার অভিনয়কৌশল, বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা বাঙ্‌নৈপুণ্য দর্শকের মনে একটা প্রত্যয় জন্মিয়ে দেয় যে এই সেই প্রকৃত নায়ক-নায়িকা; আর এই মুহূর্তে আনমনায় দর্শকের মনে এমন একটী ভাবের উৎপত্তি হয়, যাকে আমরা ব'লে থাকি নাট্যরস। এই ব্যাখ্যাকেই আলঙ্কারিকেরা বলেন 'মীমাংসকদের উৎপত্তি বাদ'। তাঁদের মতে সকলই 'অসদুৎপত্তি' অর্থাৎ যা' পূর্বে ছিল না, এ তারই সৃষ্টি। রস আর আর জিনিষের মত একটী কার্য, যা মনোলোকে প্রত্যক্ষ করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এই আনন্দের আদিস্থান নায়ক-নায়িকা; পরে জায়গা দখল করে ভ্রমের বশে অভিনেতা ও অভিনেত্রীতে—পরিশেষে প্রত্যক্ষ দ্বারে উপভোগ করে দর্শক বা শ্রোতা। দর্শকের প্রতীতিতে বা মনে কিন্তু রসের উৎপত্তি ঘটে না, পূর্বের উৎপন্ন রসই ভোগ করে দর্শক।

এই মতবাদ একেবারেই উপেক্ষা করেছে দর্শক বা পাঠকের রসোপলব্ধিকে—কিন্তু সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেন যে পাঠক বা দর্শকের মনের ভাবান্তরই হোল বস্তুতঃ রসোপলব্ধির প্রথম সোপান। তাই ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন মীমাংসকের উৎপত্তিবাদ ত্যাগ করে' রসতত্ত্বকে নিয়ে এলেন সামাজিকের মনোলোকে। তাঁদের মতে রসোপলব্ধি কতকগুলো অনুমানের ক্রমমাত্র। নট-নটীর লীলাচঞ্চল দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে নায়ক-নায়িকার মানসিক অবস্থার বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে একটা অনুমানের আভাস; আর এই অনুমানই এর সঙ্গে বহন করে' আনে একটী আনন্দের অনুভূতি। তাই এ আনন্দের মূলসূত্র হোল সেই

নায়ক-নায়িকার মানসিক অবস্থার একটা কাব্যিক অনুমান—"অনুমিতৌ রসঃ, সা চানুমিতিঃ সামাজিকে। যে কার্যকারণসংঘাতাঃ তাদৃশং অনুমিতিবিশেষমুৎপাদয়ন্তি তে সামাজিকে এব তদ্বিশেষমুৎপাদয়ন্তি, ন তু নায়কনায়িকাসু ন বা অভিনেতৃষু।"—একে বলা যেতে পারে "অনুমিতিসহগত উৎপত্তিবাদ।"

এই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বিশেষ শাখার মতে কিন্তু এই রসোপলব্ধি জিনিষটী শুধুমাত্র অনুমান নয়। অনুমানের যে প্রণালীই এতে জড়িত থাকুক, রস জিনিষটী মানবমনের আপন প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার। এই মতবাদকে বলা যেতে পারে জগদীশের "মানসপ্রত্যক্ষ-বাদ।" তাই 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' বলেন—"অনুমিতিজন্যমানসপ্রত্যক্ষে রসোৎপত্তিঃ ন তু অনুমিতিপরম্পরায়ামেব।"

এই মতবাদকে অগ্রাহ্য করেন সাংখ্যবাদী আলঙ্কারিকেরা। তাঁদের কথায় রস-জিনিষটী কেবলমাত্র বোধের বা অনুমানের বিষয় নয়, এটী বাস্তব প্রত্যক্ষ ভোগের বিষয়—এই ভাবরাজ্যে বুদ্ধি বা জ্ঞানের চেয়ে ভাবের আধিপত্যই বেশী। ভোগনিষ্পত্তির জন্য ভোগেরও একটা শক্তি স্বীকার করা প্রয়োজন—একদিকে মনের একটা শক্তি আর অন্যদিকে রসের আন্তর উপলব্ধি করবার জন্য দরকার হ'য়েছে ভোগব্যাপার। তাই সাংখ্যবাদী আলঙ্কারিকেরা এই রসোপলব্ধির জন্য স্বীকার করেন দুটী শক্তি—ভোজকতাশক্তি আর ভাবকতা-ব্যাপার।

অপর সিদ্ধান্তগুলোর মত রসের বেলাতেও খোঁজ পড়ল সাংখ্যের সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিতত্ত্বের। নটনটীর অভিনয়ে বুদ্ধিমান্ দর্শক বুদ্ধিতত্ত্বতে অনুভব করে আনন্দের শিহরণ—এ শিহরণ বাইরের চেয়ে অন্তর থেকেই এগিয়ে আসে বেশী মাত্রায়। নট-নটীর অভিনয় জাগিয়ে তোলে অন্তর থেকে বিশিষ্ট আনন্দের ভাব—যার প্রয়োজন আছে নাট্যামোদের উপভোগে। একজন তার্কিক, বৈদান্তিক বা তপস্বীর মত যে কোন ব্যক্তিই এই আমোদ ভোগ করতে পারেন না; কারণ, রসোপলব্ধির মধ্যে আছে বিশিষ্ট বুদ্ধির যোগ। এর মূল খুঁজতে হবে সামাজিকের অন্তরে—ভাবগুলি সামাজিকের অন্তরে সুপ্ত থাকে পূর্ব থেকে; আর বাইরের কারণগুলি প্রভাবিত করে সেই ভাবগুলিকেই। শুধুমাত্র তাই নয়—সেই মুহূর্তের জন্য সামাজিকের মনে নায়ক-নায়িকার ভাবগুলিও দেখা দেয়—এই ভাবগুলি নট-নটীর মধ্যেও অভিনীত হয়। কাব্য বা নাটক তখনই সার্থক হয়, যখন সে ডুবিয়ে দিতে পারে সামাজিক তথা নট-নটীর মনকে নায়ক-নায়িকার আদিম ভাবের বন্যায়—এ যেন ভাবসত্তার "সাধারণীকৃতিঃ"। কাব্য নাটকের মধ্যে এই ঐক্যের যোগসঞ্চারে সমবোধ উদ্বোধিত করার শক্তিটী চিরন্তন বিশিষ্ট সম্পদ্। তাই সাংখ্যমতে, নট-নটীর ভাবের ঐক্যবোধের বশে সামাজিকের অবচেতন গুপ্তভাবকে করে জাগ্রত এবং এই জাগরণেই আরম্ভ হয় রসোপলব্ধি। এ সুপ্তভাব দীর্ঘকালের সংস্কার, এমন কি পূর্ব জন্মার্জিতও হ'তে পারে; তবে এই উপলব্ধি সম্ভবে তখনি, যখন বুদ্ধিতত্ত্ব আপনাকে উন্নীত করে সাত্ত্বিক অবস্থায়—কেন না, সত্ত্বোদ্রেক না হ'লে পূর্ব সংস্কারের উদ্বোধন সম্ভবে না অবচেতনার ক্ষেত্র থেকে। তাই সত্ত্ব-গুণের আধিপত্য চাই অব্যাহত।

সাংখ্যের এই সত্ত্বোদ্রেক সহযোগী ভাবকতা ও ভোজকতাকে অনেকে ভুল বুঝে' থাকেন। তাঁদের অনেকে বলেন যে এটা নূতন তথ্য, যাকে ফেলা যায় না কোনও দার্শনিক যুক্তির গণ্ডীতে। কিন্তু একি সত্যি? সাংখ্যবাদীরা প্রত্যেকটী ব্যাপার বুঝিয়ে দেন তাঁদের 'সৎকার্যবাদে'র সহায়তায়। কাব্য বা নাটকের রসভোগও এই 'সৎকার্যবাদেরই' অন্তর্গত ইহা সাংখ্যোক্ত মনের ভাবনা। ভোগ জিনিষটী সেখানে চিরবর্তমান; তবে সেটা ভোগ-

যোগ্য অর্থাৎ রসানুভূতির যোগ্যতা লাভ করে তখনি, যখন সত্ত্বধর্ম হয় জাগরিত। এই সত্ত্ব, যার মূলাধার হ'ল প্রকৃতি,—শুধুমাত্র উদ্বোধক নহে, তাতে সুখও আনন্দ দুইই আছে। আবার এই সত্ত্ব-প্রভাবে প্রতিটী মন বা বুদ্ধিরও রয়েছে সুখও আনন্দের প্রতি সহজ আকর্ষণ। তাই মোটের উপর মন, বাহ্যিক ও আন্তর উপাদান, এই দুই দিক্ থেকে সুখ ও আনন্দ ধনে ধনী। অন্তর ও বাহির, এ তো একেরই দুই অভিব্যক্তি। প্রয়োজনের দিক্ থেকে এই আনন্দলোক তথা জ্ঞানলোক অন্তর্লোক ও বহির্লোক এই দুই ভাগে বিভক্ত। একে যা' আছে বাহিরে, অপরে রয়েছে তা' অন্তরে। এই ভোগব্যাপারেও অন্তরেতে ছাপ রয়েছে বহির্জগতের। তাই বাহিরে আনন্দের যে প্রকাশ দেখি কারণ রূপে, তার প্রতিচ্ছায়া পূর্বেই বর্তমান আছে অন্তরকোণে। তাই মন যখন আনন্দরসে ভরপুর, তখন শুধু বাহিরটাই আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে না, অন্তরের অরূপ অবচেতন সত্তাও রূপায়িত হ'য়ে ওঠে। তাই বহির্লোকের আনন্দের ভাবনা অন্তর্লোকের অনুরূপ উদ্ভাবনা মাত্র—এটা যেন বস্তু সত্তা এবং ভাবসত্তার যোগাযোগ। ভাবনা বা উদ্ভাবনার পথও সুগম হ'য়ে ওঠে অনুরূপ বাসনা বা সংস্কারের অনুশীলনে। সেই বাসনায়, সেই হৃদয়তলে কোথায় যেন অবরুদ্ধ হ'য়ে আছে আনন্দের উৎস; আর তারই উদ্বোধনে আনন্দ হয় প্রত্যক্ষ। বহির্লোকের স্বরূপ যখন চিত্রিত হয় মনোলোকে অন্তররাগে, তখন এই ঘরে বাইরের মিলনেই সম্পন্ন হয় রসভোগ। এ যেন সেই—

"ঘর কৈনু বাহির আমি
বাহির কৈনু ঘর।"

কাশ্মীরের শৈবদর্শনের সঙ্গে যোগ রয়েছে যে প্রত্যভিজ্ঞানবাদের, তাঁর প্রধান প্রচারক ছিলেন অভিনবগুপ্ত; তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর নাম বিশেষ পরিচিত। তিনি এই সাংখ্যমতের সঙ্গে রসের ক্ষেত্রে এক হ'তে পারেন নি। তাঁদের মতভেদটা সংক্ষেপতঃ এই—সাংখ্যবাদীরা রসোপলব্ধির মূল খুঁজলেন সত্ত্বগুণের উদ্বোধনে—আর এই সত্ত্বের মূলাধার হ'ল প্রকৃতি; কিন্তু অভিনবগুপ্ত রসাস্বাদের মূল ধরলেন আত্মাতে—যার স্বরূপ হ'ল সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তাই তাঁর মতে রস-নিষ্পত্তির স্বরূপ বুঝতে হ'লে আত্মার ধর্মকে জানতে হবে, আত্মার স্বভাবকে জানতে হবে। সাংখ্যের মত এখানেও রস জিনিষটী অন্তর্লোকেরই নিজস্ব সম্পদ্; তবে এটা আত্মার বুদ্ধির বিকাশ নহে, আত্মার নিজেরই প্রকাশ। আমরা যা' কিছু জানি, যা কিছু ভোগ করি, এ যে সেই আত্মারই আন্তর সম্পদকে জানি বা ভোগ করে' থাকি—এ বিকাশ বা প্রকাশ শুধু একটা উদ্বোধন বা স্ফুরণমাত্র। কাব্য বা নাটক এমন করে' জাগিয়ে তোলে মানুষের গভীর আত্মাকে, আলোকিত করে মনোমুকুর, আর সেই মুকুরে রূপায়িত হয় আত্মার আনন্দ। মনোলোকে এই যে আলোকপাত তার যোগ্যতা অর্জিত হয় বহুদিনের সংস্কার বা বাসনার ফলে। বাসনার বলে মনোজগৎ এমনি করে' পূর্ত হয় বলেই সে আপনার মাঝে ফুটিয়ে তুলতে পারে আত্মার আনন্দকে। সহজ কথায় বলতে গেলে, সাংখ্যবাদী আলংকারিকেরা বলেন, আনন্দ চিত্তগত; তবে সে উদ্বোধিত হয় বুদ্ধির চেতনায়—আর অভিনব-গুপ্ত বলেন, আনন্দ আত্মগত; কারণ আত্মা যে 'আনন্দরূপম্'; আর এই বিমল আনন্দ প্রতিফলিত হয় নির্মল চিত্তে।

তাই সাংখ্যে যাহা ভুক্তি, প্রত্যভিজ্ঞানে তাই অভিব্যক্তি; একে যা বুদ্ধিতে ভোগ, অন্তত্র তাই নির্মলচিত্তে প্রতিফলিত বিকাশ।

এই আত্মবিকাশবাদে রসোপলব্ধির সময় বহির্লোক বিলীন হয় অন্তর্লোকে; বহির্জগৎ ও বহির্জীবনের বস্তুসত্তা বিচিত্র হ'য়ে ওঠে, রঙীন হ'য়ে ওঠে অন্তরের ভাবসত্তার যোগে; অন্তরের

ভাবরসে রসায়িত হয় নিবিড়ভাবে বাইরের বস্তু-সত্তার। রসানুভূতির আনন্দে মানুষের নিজের শোকহর্ষ বা সুখ-দুঃখকে সে দেখ্‌তে পায় বিশ্ব-প্রাণের মর্ম-তলে বেখায়িত। এই যে সসীম আত্ম-শক্তির সহিত ঐক্যের যোগ-সঞ্চারে বিশ্ব-শক্তির অবাধ আনন্দ-মিলন, ক্ষুদ্র খণ্ডিত জলবিন্দুকে অতল সিন্ধুর অখণ্ড জলরাশিতে বিলীন করে' দেওয়া—একেই বলি সাহিত্যের সাহিত্যত্ব বা কাব্যের কাব্যত্ব। তাই সাহিত্যের রস-প্রতীতিকে সমালোচক বিশ্বনাথ স্থান দিয়েছেন 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ'-রূপে। আত্মোপলব্ধির অবকাশে মানুষ আপন অনুভূতিকে এমন আপন করে' নিবিড় করে' ভাব্‌তে পাবে বলেই, তার আনন্দ সম্ভবে—এই আনন্দের তুলনা হোল "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ"।

আজকালকার বস্তুতান্ত্রিক সমালোচকদেব মত সেকালেও এই রসের স্বরূপ নিয়ে বেশ একটা আলোচনা হয়েছিল। ঐ সাহিত্যিকরা বলেন যে, 'ব্রহ্মাস্বাদ—,'সে তো একটা তুরীয় অবস্থা—ওখানে প্রবেশ পত্রিকা নাই লৌকিক ধ্যান-ধারণার। সাহিত্যের রাজদরবারে তাই 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ' কথাটা একেবারে অচল। শঙ্করাচার্যও এই কথার বিচার করেছেন—তাঁর মতে, আত্মোপ-লব্ধি বা আত্মবোধের যে আনন্দ, সে আনন্দ একটী নির্বিশেষ আনন্দ; এ আনন্দে সবিশেষের কোনও স্থান নেই। আত্মা বা ব্রহ্ম সেখানে আনন্দ, ব্রহ্ম সেখানে চিৎস্বরূপ; আর এই চিদানন্দ বা আত্মোপলব্ধিও নির্বিশেষ। অস্তিত্বের অর্থই তাঁর মতে অস্তিত্ববিষয়ে জ্ঞান—এই সৎ বা অস্তিত্বের সঙ্গে চিৎ বা জ্ঞানের কোনও বিশেষ নেই; আর আনন্দ হোল এই নির্বিশেষ সচ্চিদের অপর একটী স্বরূপমাত্র। মায়াজগৎ, যার সত্যিকার অস্তিত্ব নেই কিছুই, কখনও আনন্দ দিতে পারে না এই নির্বিশেষ বস্তু সহযোগে। অস্তিত্বহীন বাইরের অবস্থা অস্তিত্বময় ব্রহ্মানন্দ দিতে সমর্থ—এ কথাটাই যেন বেদান্তমতে সোনার-পাথরবাটীর মত। যে আনন্দ, সেই চিৎ—তাই কাব্যের কল্পলোকে আনন্দের মধ্যে সেই 'সচ্চিদানন্দ' আত্মার উপলব্ধি সম্ভবে, একথা কোনও সমালোচকই বল্‌তে পারেন না। তাই শঙ্করের মতে, কাব্যের আনন্দ, যতই কেন উচ্চস্তরের না হোক, ওটা মায়ালোকের সম্পদ্—ব্রহ্মলোকে এর স্থান পংক্তির বাইরে। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞানবাদী সমালোচকরা এর উত্তরে বলেন যে, জিনিষটী অত তুচ্ছ বা অপাংক্তেয় নয়; ওরও নিজস্ব মূল্য আছে। তাঁদের মতে আত্মা জিনিষটী নির্বিশেষ নয়, এটা একটী অখণ্ড সর্বব্যাপী সত্তা—যে সত্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে বা লুকিয়ে আছে সমস্ত রকমের আনন্দ-ধারা। রসের আনন্দ তো এই সকল আনন্দের একটী; তাই এই রসও আত্মার চিরন্তন সম্পদ্। কাব্যের রচনাকৌশল যখন সার্থক হয় এই রসোদ্বোধনে, তখন সেই রসাস্বাদজিনিষটী দেখা দেয় বাস্তবসত্তারূপে। তাই রাম-সীতার অপরূপ প্রেম-গীতি-শ্রবণে বাসনার বলে আমার আত্মায় জাগ্রত হয়, মূর্ত হয় তাঁর নিজস্ব প্রীতি-ভাব; আর কাব্যকৌশলে ক্ষণিকের তরে বিশ্বের নরনারী ছুটে' আসে সেই অপরূপ প্রীতি ও আনন্দের সন্ধানে—অবশ্য এ নরনারী তাঁরাই যাঁরা সহৃদয় অর্থাৎ আমার চিত্তের ভাবরসে যাদের চিত্ত হয় রসায়িত, তাঁরাই। আমি যেন প্রত্যক্ষ জীবলোক তথা আকাশ-বাতাস সবাইকে দেখি তখন এক আনন্দের বন্যায় কূলে কূলে পূর্ণ; সেই বিশ্ব-নাট্যে আমি যেন মাত্র একজন ভোক্তা—রাম, সীতা বা তাঁদের প্রীতিভাব যেন তখন ব্যাপ্ত ক'রে দেয় বিশ্বলোকও এ যেন সেই—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছে এ কী সন্ন্যাসী ?
বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে—"

আমার আত্মাও যে ধারণ করে সেই বিশ্বপ্রীতির এক অংশ; তাই সেও জাগ্রত হয় আর প্রতিধ্বনি

দের সেই বিশ্ব-প্রেমের। এযে ব্রহ্মাস্বাদেরই অনুরূপ। 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' তাই ব্রহ্মের তুল্য অনুভূতিসাপেক্ষ, এই কথাই প্রকাশ করে।

শঙ্করাচার্যের মতে সত্যিকার আনন্দোপলব্ধি জিনিষটা একেবারে নির্বিশেষ এটা আত্মার নির্বিকার নির্বিশেষ অবস্থা; কিন্তু আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে কাব্যানন্দ জিনিষটা আত্মার সবিশেষ অবস্থা। তাই শঙ্করের ব্রহ্মানন্দ আর ব্যক্তিবাদী অভিনবগুপ্তের কাব্যানন্দ ঠিক এক আনন্দ নয়—অবশ্য উভয়েই অনির্বচনীয়, উভয়েই অনুভূতির জিনিষ।

এই ব্যক্তিবাদ যে বিনা আপত্তিতে অগ্রসর হ'তে পেরেছিল, তা নয়; বহু সমালোচক এর এক একটা দিক্ আক্রমণ করে'ছিলেন। বৈষ্ণবদর্শন তাই বলেন—কাব্যরসাস্বাদ বস্তুটা আনন্দ মগ্ন আত্মার ক্ষণিক অবস্থা মাত্র; তাই এটা নিঃসন্দেহ যে কাব্যরসাস্বাদ আত্মার অবাধ সদানন্দ পূর্ণতা থেকে অনেকাংশে হীন, কিন্তু এই সদানন্দ পূর্ণতার উপলব্ধিই যে বৈষ্ণবপ্রাণের আকুল প্রণতি। ব্যক্তিবাদীরা বলেন যে, রসানুভূতির অবসরে পাঠকের মন ক্ষণিকের তরে এমন একটা স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে সে সেই ক্ষণকালের জন্য পূর্ণানন্দ বিপুল জীবন-স্পন্দনের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। শিবসূত্রবাদীরা এই আত্মোন্নতিকে, জীবনের বিপুলতাকেই বলে' থাকেন আত্মোপলব্ধির চরম সোপান। এই যে জীবলোকে শিবভাব, এতে সেই এতই উন্নীত যে একই ব্যক্তিবাদী আলংকারিকেরা মনে করেছেন কাব্যানন্দের শেষ কথা। অবশ্য এটা তাঁরা সত্যিই দেখিয়েছেন যে কাব্যের আনন্দ সেই পরম আনন্দের অগ্রদূত; কিন্তু জীবের আত্মোপলব্ধির অবসরে ব্যক্তির বিলয়ে যে অবাধ আনন্দানুভূতি, সেও যে শ্রেষ্ঠতম রসানুভূতি, একথা তাঁরা বলেন নি। এক কথায়, কাব্যজিনিষটাকে ভাবের দিক্ থেকে শুধুমাত্র লোকগণ্ডীর সীমারেখায় আবদ্ধ করবার কোনও প্রয়োজন নেই—কারণ, এতেই ঘটিয়ে তোলে তার মরণ-দশা আর ক্ষণিকতা; বরং চ একে তুলে' ধরা যায় অমরতার বেদীমূলে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, পূর্ণানন্দের প্রতীক অমর আত্মার লীলাভূমি দেবলোকেও স্থান আছে এই কাব্যানন্দের; আর আনন্দস্বরূপ আত্মাই পূত করে অন্তর কোণ এর চিরন্তন হর্ষধারায়। কিন্তু শৈবদর্শন এই ভগবৎ-প্রেমের স্থান মেলাতে পারেন নি তাঁদের চিন্তাধারায় সাধককে কবির কাব্যভূমিতে সমস্তরে ফেল্‌বার অবকাশ পান নি। ব্যক্তিবাদীদের স্নেহচ্ছায়ায় অপ্রাকৃত রস আর অপ্রাকৃত কাব্য মোটেই রক্ষাকবচের রক্ষামন্ত্র লাভ করে নি। শৈবগণের শিবলোককে বলা হয়েছে সদানন্দধাম; শিবরূপী জীব ঐ লোকে উন্নীত হ'য়ে ভোগ করতে সমর্থ হয় সেই সদানন্দধামের প্রতিটী অংশ—এ সবই সত্যি; তবুও এই চিন্তাধারায় কাব্যানন্দের স্থান যেন নাই বল্লেই চলে। শ্রীমদ্ভাগবতকে যাঁরা মনে করেন শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পদে ভূষিত, বৈষ্ণবগণ বিশ্লেষণ করেছেন এই প্রশ্নটা অতি পরিষ্কার করে'। তাঁরা প্রাকৃত রস ও কাব্যকেও তুলে' ধরেছেন অপ্রাকৃত রসের গণ্ডীতে। তাঁরা এখানে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠভাবেও রসের সারতম বস্তু ছাড়া অন্যভাবে ভাব্‌তে পারেন নি। তাঁদের সকল ভাব, সকল অনুভূতি, সব মিশে' এক হ'য়ে গেছে সেই অপ্রাকৃত প্রেমের রসধারায়। এতো সেই "একটী প্রেমের মাঝারে মিশিছে সকল প্রেমের স্মৃতি।" তাঁরা বলেন যে, প্রাকৃত কাব্যের অপর রসধারা তো এই আদি প্রেমের শাখামাত্র। এই প্রেমই প্রকাশ করছে আপনাকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচটী রসধারায়। ক্রোধ, ভয়, হাস্য প্রভৃতি যে অবান্তর অনুভূতি এরা সেই প্রীতি-রসেরই অঙ্গীয় পোষক মাত্র। প্রেম-লোকের আনন্দপিপাসু জীব যখন আনমনায় আপনাকে করে' তোলে চঞ্চল, ক্রুদ্ধ বা ভীত, সে চাঞ্চল্য, ভয় বা

ক্রোধ যে তার নিজস্ব পৃথক একটা বৈশিষ্ট্য তা' নয়—এটা সেই প্রেমিক-পুরুষ আনন্দময়ের প্রতি প্রেম-নিবেদনের ভিন্ন প্রকাশমাত্র। এই প্রেম-নিবেদনে বিয়োগ-ব্যথার কোনও রেশ নাই; আমাদের প্রাকৃত নাট্যের মত সেথানে সবই মিলন-রসে সুমধুর। এই অপ্রাকৃত প্রেমের সম্বন্ধই বুঝিয়ে দিতে পারে প্রাকৃত-কাব্যে বিয়োগশূন্যতা। ভারতবাসীর মন নিয়ত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে এই মরণের মাঝে অমৃতের স্বাদ-লালসায়, সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধির তরে, রূপের মাঝে অরূপের সঙ্গলাভে। তাই আলংকারিকের 'বিয়োগান্তং ন নাটকম্' অপ্রাকৃত-কাব্যে দখল করেছে দর্শনের সূত্রের পদবী। ব্যক্তিবাদীরা এই প্রীতিরসপূর্ণ অপ্রাকৃত কাব্যকে যখন ঠেলে দিয়েছেন ব্রাত্যের দলে, তখন সকল ধর্ম ও দর্শনের মূলভিত্তি যে অমর প্রেম ও আনন্দ তার প্রবেশ পত্রিকা বাজেয়াপ্ত ক'রেছেন তাঁরা রসের যজ্ঞভূমি থেকে। উজ্জ্বল নীলমণি আর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মত গ্রন্থই যুক্তির পতাকা উড়িয়ে এই মতবাদের বিচার-ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এঁরা দেখিয়েছেন যে, সাহিত্য ও প্রেম-সাধনা একই পরম পুরুষের সেবাধর্মের দু'টী প্রকাশ—একজন সেবা করেন আত্মবোধের সাহায্যে, তিনি উপলব্ধি করেন, প্রত্যক্ষ করেন 'আদিত্যবর্ণং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ', আর সাহিত্যিক সেবা করেন, সাহিত্য, চিত্র-কলা বা নৃত্য-গীতের সৌন্দর্য-লোকে—তাঁর অন্তরে প্রকাশ পায় ভূমার বিকাশ "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমাস্ত।" সাধকের পথের আলো—প্রেম, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা; সাহিত্যিকের স্পর্শমণি প্রেম, রসাস্বাদ তথা অন্তরের ব্যাকুল-বাসনা। তাই দেখি, যত সাধক ও সাহিত্যিক, সবারই কাম্য-ধন সেই বিশ্বনাথের অপ্রাকৃত রসোপলব্ধি। আনন্দেরই প্রকাশ দেখেন তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া। তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন যে পুষ্পের বর্ণে, উষা-সন্ধ্যার অপূর্ব রাগে, গিরি-সাগরের গম্ভীর সৌন্দর্যে বিধাতা ডাক দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে "চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' "—যদি আকাশ-ভুবন সকল স্থলেই না রসতো আনন্দের মেলা, তবে কেই বা হোত জীবলোকে জীবন্ত আর প্রাণলক্ষ্মীই বা কেমন ক'রে অবারিত করতেন তাঁর লীলাখেলা। এই যে রসের অনুনয়ে ডাক দিয়ে হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মিলনের চেষ্টা—ইহাই সাধনা বা সাহিত্য।

তাই বৈষ্ণবদর্শনের এই সিদ্ধান্ত যে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত প্রেম সাধনা অথবা সাহিত্য ও সাধনা একই উৎসের দুই অভিব্যক্তি। এঁরা অন্তরের ধন 'অরূপ-রতন' পাবার আশায় পাড়ি ধরেছেন 'নাম-রূপে'র 'অকূল সাগরে'। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে, বৈষ্ণবগণ অনেকটা অতিরঞ্জিত ক'রে ফেলেছেন—অরূপকে রূপের মধ্যে, অসীমকে সীমার মধ্যে আনতে গিয়ে তাঁর অমৃতকে মৃতের স্তরে তথা অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতের সমতটে নামিয়ে দিয়েছেন।

* * * *

মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে কয়েকটী দর্শনের সহিত আমরা সাধারণতঃ পরিচিত, সেগুলি প্রায়ই আমরা আলোচনা ক'রেছি। কিন্তু তাঁদের প্রকাশ-ভঙ্গী যদিও পৃথক্, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই বিভিন্ন রসদর্শন সত্যি সত্যিই একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দর্শনমাত্র অর্থাৎ এ শুধু মাত্র দার্শনিক পরিভাষার ভেদ। দর্শন-শাস্ত্রের যত দর্শন-ক্ষমতাই থাকুক, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত রসোপলব্ধি হোল একটী অলৌকিক আত্মোপলব্ধি, আত্মার অস্তিত্ববোধ। পাঠক আত্মোপলব্ধির অবকাশে আপন অনুভূতিকে এমন আপন ক'রে নিবিড় ক'রে ভাবতে পারে ব'লেই তার আনন্দ সম্ভবে। এই অনুভূতির মুহূর্তটী আবার একটী তন্ময়তার মুহূর্ত; কারণ যেখানে তন্ময়তা নেই, সেখানে সত্যিকার

অনুভূতিও নেই। এই অনুভূতির সাহায্যে মানব-প্রাণ মুক্তি পায় অসীমতার ক্ষেত্রে; সে প্রত্যক্ষ করে যে অস্তিত্ব তথা অসীমতাই তার অন্তরাত্মার সত্যস্বরূপ। এই প্রত্যক্ষ দর্শনই রসরূপ; ইহাই মানব আত্মার চরম লক্ষ্য; এই সুন্দরের সন্ধানেই সে ঘুরিয়া মরে। এই রস-রূপকে লক্ষ্য ক'রেই, বোধ হয় ধ্যানী কবি Wordsworth ব'লে-ছিলেন—

'The gleam,
The light that never was on sea or land,
The consecration, and the poet's dream"

তাই সত্যিকার রসসৃষ্টি একান্ত বহির্জগতের ব্যাপার নয়; এ তো মানবের মর্মলোকের নিগূঢ় কথা। এখানে কবি বা পাঠক রাগবিরাগের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে, ক্ষণিকের তরে নাস্তিত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে, গ্রহণ করেন সমগ্রকে একটী জীবনের অন্তহীন আনন্দের মাঝে; তাঁরা মিলিয়ে দেন আপনাকে বিশ্বলোকে দিকে দিকে অস্তিত্বের অরূপ সত্তাসায়রে। তাই অন্তরটী যার আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে এই উদারতা এই সহৃদয়তা, এই ব্যাপকতার মাঝে, তিনিই কবি, তিনি সহৃদয় সামাজিক, তিনিই এ জগতে রসিক। এতেই তাঁর সুখ-সৌন্দর্য, এতেই তাঁর চরম আনন্দ।*

* এই প্রবন্ধটি শান্তি-নিকেতন ভারতী-সংসদের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

অজানা দেবতা

(স্বামী বিবেকানন্দের "Angels Unawares" শীর্ষক ইংরাজী কবিতার অপ্রকাশিত অনুবাদ)

অধ্যাপক শ্রীদয়াময় মিত্র, এম্-এ

১

মাটিতে লুটায় দেহ মাথে লয়ে জীবনের ভার
নাহি সুখ নাহি শান্তি লয়ে শুধু যাতনা অপার
অন্ধতম ভরা দিশা সে অভাগা যাত্রী নিশীথের
চলে ধীরে পথ বাহি নাহি জানে কারণ কিসের,
বিকল-মস্তিষ্ক হৃদি, সুখ-দুখ জীবন-মরণ
সমতুল তার কাছে, ভালমন্দ জ্ঞান-বিস্মরণ,
—অকস্মাৎ শুভ নিশা একদিন দেখে সে চাহিয়া
ক্ষীণশুভ্র দিব্যদ্যুতি ধীরে ধীরে আসিল নামিয়া—
সে জানে না কিবা তাহা, কোথা হতে তার আগমন
শুধু সে দেবতা ভাবি তারে বরি করিল অর্চন
যে আশা লুকায়েছিল এতদিন তার কাছে আজ
এল তাহা, ভরে দিল হৃদি-মন, দিল নব সাজ,
জীবন নূতন হ'ল, আঁখি চাহি কে বুঝিল আর
অপার্থিব নিত্য সত্য হেথা হ'তে এ জীবন পার।
সুধীবৃন্দ হাসি বলে অবহেলি—'বিভ্রম, বিভ্রম'
সে তবু প্রশান্ত মন, বলীয়ান, নাহি অসংযম,
ধীরে বলে: "ধন্য আমি, ধন্য মোর সকল বিভ্রম"।

২

বৈভবের সম্পদের তীব্র সুরাঁপায়ী সে শ্রীমান
অটুট স্বাস্থ্যের বলে ভুক্তি চলে ঘোর ঘূর্ণ্যমান
ভোগের তাণ্ডব নাচে আত্মহারা তাই অকারণ
ভেবে নিল এ জগৎ তারি তরে প্রমোদ-কানন।
তারি সুখ-বৃদ্ধি তরে অন্য নর সৃষ্ট বিধাতার,
সঞ্চরিছে ধরাধামে, সরীসৃপ মানব আকার।
কামনা-ইন্ধন যোগে আলোকিত নিত্য নব সুখ
সহস্র সহস্রাকার দৃষ্টিপথে সঞ্চরি উন্মুখ
করিত তাহারে সদা বর্ণপাঁতি নানারূপ ভায়
—দৃষ্টি তার হল ক্ষীণ, ভোগখিন্ন হ'ল ক্রমে কায়—
দৃঢ়-গ্রন্থি কূট স্বার্থ ছেয়ে দিল তার মন প্রাণ
বিলাসের কলহাস্য নিরানন্দে হ'ল অবসান।
সর্ব্ব বোধরিক্ত মন ভোগগত সর্ব্ব সুখলেশ,
যা ছিল আনন্দদায়ী, অমূল্য যা, রহিল না লেশ
সবি আজ টুটে গিয়ে জীর্ণ, গলা, শবরৎ হীন
মূর্ত্তি ধ'রে বিভীষিকা হয় তার ক্রোড়ে সমাসীন
সে যত পালাতে চায়, নাহি ছাড়ে বৃথা সে উদ্যম
ঘন আলিঙ্গনে তত বাঁধে তারে বিষম নিয়ম
'মৃত্যু চাহি' মৃত্যু মাগে সে বিকৃত মস্তিষ্ক তাহার
কত মত, মোহিনী মন্ত্রেতে তবু ফেরে বার বার—
তারপর নিদারুণ সুখভরা ক্রন্দনেতে ব্যথা বেদনায়
আধিব্যাধি ক্লেশ সনে পরিচয় যবে হ'য়ে যায়
বিষাদ আনিয়া দিল তারি মাথে দেব-আশীর্ব্বাদ
পূর্ব্বসাথী যত হাসে অবজ্ঞায়—'অমৃতের স্বাদ'
সে বলে 'পেয়েছি দুঃখে, ধন্য মোর দুখের জীবন
দুঃখ ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য মোর তনু প্রাণমন।

৩

আর জন স্বাস্থ্য সুখে সুখী কিন্তু শক্তি নাহি মনে
উদ্দাম মনের গতি বাসনাদি রিপু সহ রণে
ধ্রুব পরাজয় যার। লোকমুখে আছিল সুনাম,
ভাবে মনে 'আমি নিরাপদ, আর যত অবিরাম
ঢেউ মুখে ওঠে পড়ে বৃথা যোঝে হতভাগ্যকুল
মৃতবৎ লুপ্ত-বোধ কভু নাহি বোঝে নিজ ভুল
—মক্ষিকার বৃত্তি তার পূতিগন্ধ তার আকিঞ্চন—
—দিন যায়, ক্রমে তার ভাগ্যোদয় নূতন জীবন
পাপের পঙ্কিল পথে চরণ স্খলন হ'ল শেষে
ঘনঘোর অন্ধকার চেয়ে দেখে গেছে কোথা ভেসে
কঠিন প্রস্তর, তরু সে বুঝিল ভাঙে না নিয়ম—
নিয়ম নিগড়ে বাঁধা তাহাদের জনম করম
সংগ্রাম-শকতি শুধু মানবের,—বিধাতার দান,
নিয়ম-সীমার ঘর লঙ্ঘিয়া সে গাবে জয়গান—
ক্রমে তার ঘুচে গেল তম-ভার জীবনের দ্বার
খুলে গেল, দৃষ্টিপথে উজলিল উন্মুখ, উদার
ভাগ্যের ইঙ্গিত নব, জাগরণে প্রদীপ্ত বিভায়
চিরশান্তিদায় জ্যোতি সমুখেতে চকিতে মিলায়
দৃঢ়ব্রত, সে প্রস্তুত হোক্ দূর সাগর-লঙ্ঘন
ঝঞ্ঝা, বাধা-বিপত্তির—আজ অভীঃ, ধ্বনিল বচন
কাণে তার সাহস-আশ্বাস বাণী। চাহি সবা পরে
সবিস্ময়ে সে বুঝিল দিব্যদৃষ্টি আজ যার তরে
সে তার দুরিত-গ্লানি, সেই তার যত পাপ-ভার
জড়-স্থাণুবৎ হ'তে উদ্ধারিল আত্মারে তাহার
যার লাগি এ জগৎ চেয়েছিল ত্যজিতে তাহারে
সে পাপ-জীবন তার ধন্য ধন্য,—ভুলিবারে নারে।

শক্তিপূজা

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

শক্তির উপাসনা মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। নিজের ভিতরে শক্তির বিকাশ, শক্তির উপচয়, শক্তির সংরক্ষণ ও শক্তির সমুচিত প্রয়োগ দ্বারাই মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সুখশান্তি লাভ করিতে হয়, আত্মোৎকর্ষের পথে অগ্রসর হইতে হয়, স্বকীয় সত্তার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হয়। মানুষের জীবনধারা শক্তিরই পরিণাম প্রবাহ মাত্র। শক্তির যথোচিত বিকাশের পথে বাধা উপস্থিত হইলে তাহার জীবনধারাই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। শক্তির অপচয়েই তাহার মৃত্যু, শক্তির অভাববোধই তাহার নমনুষ্যত্বের নিদর্শন। মানুষের প্রতি ভগবানের সর্ব্বপ্রথম উপদেশই এই যে,

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

মানুষ। তুমি ক্লীবতা, শক্তিহীনতা বা জড়তাকে কখন বরণ করিও না। ক্লীবতা তোমার সাজে না। তুমি যে পার্থ। তোমার জননী পৃথা (অর্থাৎ পৃথিবী) যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমশঃ উদ্বোধন ও বিকাশসাধন করিয়া, তোমাকে বক্ষে ধারণের অধিকার লাভ করিয়াছে। তোমারই ভিতরে তাহার তপঃশক্তি সন্ধান সজ্ঞান সপ্রেম স্বতন্ত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার অন্তর্নিহিত অঙ্গীভূত শক্তি তোমার মধ্যে বিকশিত হইয়াই জ্যোতির্ম্ময় বপু লাভ করিয়াছে। তাহার জীবনব্যাপী অস্বতন্ত্র শক্তিপরিণাম তোমার জীবনে সাধনারূপে অভিব্যক্ত হইয়াই স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার জননীত্ব তোমাকে প্রসব করিয়া সার্থক্যমণ্ডিত হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সবিচারে নূতন নূতন ভাবের সৃষ্টি করিবার অনন্যসাধারণ শক্তি ও অধিকার লইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। নির্ব্বীর্য্য হওয়া বা নিজেকে নির্ব্বীর্য্য মনে করা, তোমার অধিকারানুরূপ সৃষ্টিকার্য্যে বা সাধনব্যাপারে পরাঙ্মুখ হওয়া বা নিজেকে সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ বোধ করা, তোমার পক্ষে শোভা পায় না, তোমার মনুষ্য-প্রকৃতির পক্ষে ইহা কোনক্রমেই যোগ্য হয় না। ওঠ, তোমার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাইয়া তোল,—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। তোমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সাময়িক আগন্তুক তুচ্ছ দুর্ব্বলতা-বোধ ও কর্ত্তব্যবিমুখতাকে এক হুঙ্কারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। তোমার মনুষ্যোচিত জন্মগত অধিকারের কথা স্মরণ কর, তোমার অন্তর্নিহিত অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডারের কথা স্মরণ কর, দেখিবে আপনা আপনি ক্লৈব্য বিলীন হইয়া যাইবে, ভয় আশঙ্কা কুণ্ঠা অবসাদ তিরোহিত হইবে, আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিবে, বীর্য্য প্রকাশ পাইবে।

মানুষের মহিমময়ী প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত মহাশক্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া ও সেই শক্তির পূর্ণবিকাশসাধনে উদ্যোগী হওয়া,—ইহাই ধর্ম্মের ভিত্তি, ইহাই মনুষ্যত্ব-সাধনার ভিত্তি, ইহাই মানুষের প্রতি ভগবানের প্রথম উপদেশ। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই মহাশক্তি মানুষের দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধিকে সর্ব্বদাই প্রেরণা-দান করিতেছে, মানুষের স্বভাবপ্রসূত জ্ঞানবৃত্তি প্রেমবৃত্তি ও কর্ম্মবৃত্তির সম্মুখে সর্ব্বদাই উচ্চ হইতে

উচ্চতর আদর্শ উপস্থিত করিতেছে, কোন প্রকার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, গণ্ডীবদ্ধ প্রেম ও অস্থায়ী ফলপ্রদ কর্ম্মে তৃপ্তি ও কৃতার্থতা অনুভব করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব করিয়া রাখিয়াছে। অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক্ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত, জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই মহাশক্তি আপনার পূর্ণতা আস্বাদন না করা পর্য্যন্ত মানুষের সম্যক্ তৃপ্তির অনুভূতি ও বিশ্রাম লাভ সম্ভব নয়। এই জন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক, শক্তির পূর্ণতা সম্পাদন মানুষকে করিতেই হইবে।

মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরে শক্তির এই অনুপ্রেরণা নিরন্তর বিদ্যমান বলিয়াই, যখন যাহার মধ্যে সে আপনার তুলনায় শক্তির সুষ্ঠুতর বিকাশ, উজ্জ্বলতর প্রকাশ, ব্যাপকতর পরিণাম ও উৎকৃষ্টতর মহিমা দেখিতে পায়, তখনই তাহার নিকট সে নতশির হয়, শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভয়ে আশায় বা অনুরাগে তাহার হৃদয় অবনত হয়। সেই হেতু শক্তির পূজা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। আপনার ভিতরেও সে শক্তিরই আরাধনা করে, বাহিরেও সে শক্তিরই সেবা করে। শক্তির যে বিকশিত রূপটী সে অন্তরে উপলব্ধি করিতে চায়, বাহিরে তাহা মূর্ত্ত দেখিলেই সে সেখানে আত্মনিবেদন করে ও তাহার সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিতে আগ্রহান্বিত হয়। মানব-জীবনের স্বভাবনিহিত শক্তির প্রেরণাই দুর্ব্বলকে বলীয়ানের নিকটে, মূর্খকে জ্ঞানবানের নিকটে, দরিদ্রকে ঐশ্বর্য্যশালীর নিকটে, কুৎসিতকে সুন্দরের নিকটে, ভোগাসক্তকে ত্যাগবীরের নিকটে নতশির ও উপাসনাপরায়ণ করিয়া থাকে। প্রকৃতি-রাজ্যেও সূর্য্য চন্দ্র আকাশ বাতাস পর্ব্বত সমুদ্র প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তির মহত্তর বিকাশ দেখিয়া, সেই অন্তর্নিহিত আদর্শের প্রেরণায়ই মানুষ তাহাদের ভিতরে প্রকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন দেবতার দর্শন লাভ করে এবং তাহাদের উপাসনায় প্রীতি অনুভব করে। কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, বা ভোগের শক্তিতে, ইষ্ট সাধন বা অনিষ্ট সাধনের শক্তিতে, আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মবিসর্জ্জনের শক্তিতে, শক্তিবিকাশের যে কোন বিভাগেই হউক না কেন, কাহাকেও আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া উপলব্ধি করিলেই মানুষের অন্তরে একটা উপাসনার ভাব জাগিয়া উঠে। এই উপাসনার ভাবটী অনেক ক্ষেত্রে ভয়মিশ্রিত, বিদ্বেষমিশ্রিত, বৈরভাব-মিশ্রিত হইতে পারে। কিন্তু শক্তিবিকাশের শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে উপলব্ধি গোচর হয়, ভিতরের অনুপ্রাণনা সেখানেই উপাসনার ভাব জাগাইয়া তোলে।

শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় মানুষ স্বীয় বাসনা প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার মধ্যেই লাভ করিয়া থাকে। সে কিছু প্রাপ্ত হইতে এবং কিছু পরিহার করিতে চায়, এই প্রাপ্তি বা পরিহারের জন্য তাহার একটা উদ্যম জাগিয়া উঠে, তজ্জন্য সে প্রচেষ্টা করে, এই প্রচেষ্টায় সে বাধাপ্রাপ্ত হয়, বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাহার উদ্যম ও প্রচেষ্টার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, উদ্দেশ্যসাধন দ্বারা নিজের পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়। ইহার মধ্যেই শক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয়। তাহার উদ্যম ও প্রচেষ্টার ভিতরেই শক্তিপ্রয়োগের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই শক্তি যেখান হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানেও সে স্বভাবতই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে। তাহার সংকল্পসিদ্ধিতে বাধা পাইয়াই বহির্জ্জগতে সে শক্তির পরিচয় পায়। ক্রমশঃ যেখানে সে ক্রিয়া দর্শন করে, যেখানে কোন ব্যাপার বা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে, তাহারই মূলে সে শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কোন শক্তির সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল জগতে ঘটনা পরম্পরাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, শব্দস্পর্শরূপ-রসাদির পারম্পর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা এই ঘটনাপারম্পর্য্যের অন্তর্যামিনী শক্তির প্রত্যক্ষ

পরিচয় পায় না। মানুষের সাধন জীবনই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের অন্তরালে নিত্য পরিণামময়ী ও বিকাশোন্মুখী কার্য্যজননী ও কারণস্বরূপিণী শক্তির সহিত মানববুদ্ধির পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। তত্ত্বদৃষ্টির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ মানুষ উপলব্ধি করিতে থাকে যে, তাহার নিজের সমগ্র সত্তাই শক্তি হইতে উদ্ভূত, শক্তির পরিণাম দ্বারা নির্ম্মিত, শক্তির ক্রমবিকাশের ধারা দ্বারাই পরিচালিত, এবং বহির্জ্জগতেরও যাবতীয় পদার্থ ও ব্যাপার শক্তি হইতেই সমুদ্ভূত, শক্তির পরিণামেই প্রকটিত, শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই ভাবে মানুষ বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র শক্তির খেলাই দেখিতে থাকে, ভিতরে বাহিরে শক্তির বিচিত্র প্রকাশই অনুভব করিতে থাকে।

আধুনিক জড়বিজ্ঞান এই শক্তির বাস্তব সত্তা অস্বীকার পূর্ব্বক কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে জীব ও জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় দেশকালাবচ্ছিন্ন জড়পদার্থরাজির পরিণামই মৌলিক সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক এই বিশ্বজগতের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই পথে অগ্রসর হইতে হইতে জড়পদার্থ বিজ্ঞানও অবশেষে সমস্ত জড় পদার্থের মূলে শক্তির বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। জড়-পদার্থসমূহ, তাহাদের গতিবিধি, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা, তাহাদের উৎপত্তিস্থিতিবিনাশ, মূলতঃ শক্তি ও তাহার পরিণাম ব্যতীত অন্য কিছু নয়, এই সত্য জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান জড়বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে গৃহীত হওয়ায় এই শক্তি সম্বন্ধীয় ধারণা সেখানে আনুমানিক। শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় আত্মশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র এবং সংকল্পসিদ্ধির জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধের মধ্যে। মানুষ সংকল্পবান্ ও 'পরন্তপ' বলিয়াই শক্তির প্রত্যক্ষানুভূতি লাভে সমর্থ। এই প্রত্যক্ষানুভূত শক্তির মধ্যেই সে যাবতীয় জগদ্ব্যাপারেরও কারণ দর্শন করিয়া থাকে।

নিজের ভিতরে মানুষ যে শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করে, সেই শক্তিকে সে সংকল্পময়ী, ইচ্ছাময়ী ও চৈতন্যময়ী বা চেতনাধিষ্ঠিতা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। শক্তির পরিণাম বা ক্রিয়া জড়রূপে প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু পরিণাম বা ক্রিয়ার মূলীভূতা যে শক্তি, তাহাকে সে সংকল্প বা ইচ্ছা এবং চৈতন্য হইতে পৃথক্‌রূপে কখনো উপলব্ধি করে না। যে ক্ষেত্রে কোন কার্য্যের কারণরূপা শক্তিকে সে জড় বলিয়া অনুভব করে, সে ক্ষেত্রে সেই কারণও তাহার নিকট কার্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়, সেই কারণেরও সে মূলীভূত কারণের অনুসন্ধান করে, কোন জড় কারণকে কোন জড়ীভূত শক্তিকে—সে মূল কারণ বা স্বতন্ত্র কারণ বা স্বতন্ত্রা শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। স্বকীয় জীবনব্যাপার ও দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার সমূহের মূলে যেমন সে চেতনাধিষ্ঠিতা ইচ্ছাময়ী স্বতন্ত্রা শক্তির সত্তা উপলব্ধি করে, জাগতিক সর্ব্ববিধ ব্যাপারের মূলেও সে তেমনি চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ইচ্ছাময়ী স্বতন্ত্র শক্তিরই অনুসন্ধান করে। যেখানে স্বাতন্ত্র্যের অভাব, সেখানে সে কোন ব্যাপারের মূল কারণের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারে না, সেখানে তাহার কারণানুসন্ধানের নিবৃত্তি হয় না। চেতনাধিষ্ঠিতা ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত স্বাতন্ত্র্য কোথাও নাই। সেই হেতু স্বভাবতই মানববুদ্ধি আন্তরবাহ্য যাবতীয় ব্যাপারের, যাবতীয় ইন্দ্রিয়-মনোগ্রাহ্য পরিণামশীল পদার্থের, মূল স্বতন্ত্র কারণ স্বরূপে চৈতন্যময়ী ইচ্ছাশক্তিরই বিদ্যমানতা অনুভব করে এবং সেই শক্তিরই সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্য ধাবিত হয়। বুদ্ধি তার স্বকীয় ব্যাপারের মূলেও সেইরূপ শক্তিরই পরিচয় পায় এবং তাহাকেও

-কীয় জ্ঞানবৃত্তির বিষয়ীভূত করিতে প্রয়াসশীল হয়। -লীভূতা শক্তির সহিত সম্যক্‌ পরিচয় না হওয়া -য্যন্ত কোন বিষয়েরই বিজ্ঞান পূর্ণ হয় না, জ্ঞান -আপনাকে সার্থকামণ্ডিত বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। জড়বিজ্ঞানের আলোচনাপদ্ধতিতে এখনো শক্তির এই তাত্ত্বিক স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই, জড়জগতের যাবতীয় ব্যাপারের মূলীভূতা শক্তির মধ্যে এখনো চৈতন্যাধিষ্ঠান ও ইচ্ছাময়ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানশক্তির প্রতিনিয়ত সাক্ষ্যদান সত্ত্বেও জড়বিজ্ঞান এখনো জড়মূলীভূত শক্তির সম্যক্‌ পরিচয় লাভে সমর্থ হয় নাই।

শক্তির তাত্ত্বিক পরিচয় লাভ করিয়াও মানুষ অনেক সময় শুধু মানুষের ভিতরেই এই চেতনাধিষ্ঠিতা ইচ্ছাময়ী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে, মানবেতর প্রাণী ও জড়জগতের মধ্যে ইহার সত্তা স্বীকার করে না, কখন বা প্রাণিমাত্রের ভিতরে ইহার সত্তা উপলব্ধি করে, কিন্তু জড়ব্যাপারের মধ্যে করে না। তত্ত্বদৃষ্টির বিশেষ বিকাশ হইলেই মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সকল ব্যাপারের মূলে এই চৈতন্যময় ইচ্ছাশক্তির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

বিশ্বের সর্বত্রই যে চৈতন্যময়ী ইচ্ছাশক্তির পরিণাম চলিতেছে, ইহা উপলব্ধিগোচর হইলেও, এই অশেষ বৈচিত্র্যসঙ্কুল জগতের মধ্যে প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড অসংখ্য শক্তিরই সংঘর্ষ ও সহযোগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বব্যাপার যে এক প্রাণসূত্রে গ্রথিত, সকল পদার্থের মূল কারণ যে এক, একই চৈতন্যময়ী ইচ্ছাময়ী স্বতন্ত্রা মহাশক্তির আত্মপরিণামেই যে সকল দেশের সকল কালের সকল প্রকার পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি বিলয় সংসাধিত হইতেছে, এই মহাতত্ত্ব বিক্ষিপ্তচিত্তে খণ্ডিতজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। নিজের জীবনের ভিতরে যত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিচিত্র ব্যাপার সমন্বিত স্বকীয় জীবনের অন্তরালে এক অখণ্ড চিন্ময়ী প্রাণশক্তির উপলব্ধি যত সুদৃঢ় হয়, অশেষ বৈচিত্র্যসমন্বিত আপাত বহুধাবিভক্ত বিশ্বজগতের মূলেও এক অখণ্ড চৈতন্যময়ী ইচ্ছাময়ী মহাশক্তির সত্তা ততই সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে, ভিতরে বাহিরে ততই একই মহাশক্তির বিচিত্র খেলা অশেষবিধ পরিণাম পরিদৃষ্ট হইতে থাকে।

ভারতীয় তত্ত্বদর্শী ঋষিমুনিগণ সুদূর অতীত যুগেই এই বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বনিয়ন্ত্রী চৈতন্যময়ী মহাশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্নেহময়ী প্রেমময়ী কল্যাণময়ী জননীরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এই আপাতবৈষম্যময় সংগ্রাম-কোলাহল-মুখরিত সংসারক্ষেত্রে বিচরণ কালেও তাঁহার সহিত নিজেদের জীবনের ঐকান্তিক যোগ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিজেদের ভিতরে ও বাহিরে অখণ্ড সত্তায় বিরাজমান দেখিয়া তাঁহার সহিত জীবনের ঐকান্তিক যোগ সম্পাদন এবং সজ্ঞানে সপ্রেমে স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিজেদের শক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি ও স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জগতে আমরা যত বিভিন্ন জাতীয় শক্তির সহযোগ ও সংঘর্ষ লক্ষ্য করি, যত বিভিন্ন প্রকার শক্তির পরিণামে বিচিত্র পদার্থ ও ব্যাপারের উৎপত্তি-বিলয় দর্শন করি, এই মহাশক্তি মূলতঃ সেই সব যাবতীয় শক্তির একমাত্র জননী, ব্যক্তাবস্থায় তিনি সেই সব শক্তির সমষ্টিভূতা, তাঁহার পূর্ণ প্রকাশে সব শক্তির পরিপূর্ণতা, এবং প্রলয়ে তাঁহারই স্বরূপে সকল শক্তি বিলীনা।

এই মহাশক্তিকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া মুনিগণ প্রেমগদগদ ভাষায় স্তব করিয়া আত্মনিবেদন পূর্ব্বক প্রণত হইয়াছেন।

> দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
> নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
> তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
> ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥

যে স্বপ্রকাশ স্বরূপা স্বয়ংক্রীড়াশীলা মহাশক্তি আপনার স্বরূপভূতা শক্তির বিলাসদ্বারা এই বিশ্বজগৎ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর ভিতরে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া নিত্য বিদ্যমান, বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে প্রতীয়মান দেবতাবৃন্দের স্বরূপভূতা যাবতীয় শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ যাঁহার মূর্ত্তিতে একত্র অবিভক্ত ও অখণ্ডিতরূপে নিত্য লীলায়মান, নিখিল দেবতা ও মহর্ষিগণ নিয়ত যাঁহাকে মা বলিয়া পূজা করিতেছেন সেই বিশ্বজননী মহাশক্তির চরণে আমরাও 'মা' বলিয়া প্রণত হইতেছি, আমরাও তাঁহাকে আমাদের 'মা' বলিয়া অনুভব পূর্ব্বক তাঁহারই মহাসত্তার ক্রোড়ে আমাদের খণ্ড সত্তার পূর্ণতা উপলব্ধি করিতেছি। তিনিই আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণের বিধান করুন, তাঁহার বিশ্ববিধানের মধ্যে আমরা যেন সর্ব্ববিধ-কল্যাণ উপলব্ধি করি।

জীবন ও জগতের মধ্যে এই মহাশক্তির দর্শন লাভ হইলে, আমাদের ইন্দ্রিয় মনোগোচর অশেষ বৈষম্য-সমাকুল জড় চেতনাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অগণিত খণ্ড সত্তার মধ্যে এক অখণ্ড সত্তার উপলব্ধি, অসংখ্য জড়পদার্থের মধ্যে এক চেতন সত্তার উপলব্ধি, চিত্ত বিভ্রমকারী বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এক সুমহতী ইচ্ছাশক্তির লীলায়িত স্বচ্ছন্দ প্রকাশের উপলব্ধি, বহু প্রকার অন্ধ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ভিতরে এক চক্ষুষ্মান্ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বনিয়ন্তা মহাকারণের উপলব্ধি, অশেষ বৈষম্যময় বহুবিধ প্রাকৃত ব্যাপার তরঙ্গের ভিতরে এক মহাসাম্যময় অপ্রাকৃত জীবন প্রবাহের উপলব্ধি, অনন্তভেদ-বিভক্ত পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি বস্তু ও ঘটনা সমূহের মধ্যে সৌসামঞ্জস্যময় অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের উপলব্ধি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক বিরাট্ দেহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উপলব্ধি,—এইরূপ উপলব্ধির ফলে জীবন ও জগৎ নূতন আকারে প্রতিভাত হয়, জীবন সংগ্রাম লীলাসম্ভোগে পরিণত হয়।

এই মহাশক্তিকে ভিতরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া, আপনাকে এই মহাশক্তি হইতে অভিন্ন অনুভব করিয়া, অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্‌দেবী বলিয়াছিলেন—

> অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত
> বিশ্বদেবৈঃ।
> অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী
> অহমশ্বিনোভা॥
> অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত
> পূষণং ভগম্।
> অহং দধামি দ্রাবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে
> যজমানায় সুন্বতে॥
> অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাঞ্চিকিতুষী
> প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
> তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং
> ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥

আমিই রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই পোষণ করিয়া থাকি। সোম, ত্বষ্টা, পূষা ও ভগকে আমিই ধারণ করিয়া আছি। দেবগণের তৃপ্তিসাধন ব্রতী হবি দ্বারা সুশোভন যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণকে আমিই ধনাদিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকি। আমিই রাষ্ট্রের অধিশ্বরী। আমি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের প্রাপয়িত্রী। আমিই তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপা। যজ্ঞ-ব্যাপার সমূহের মধ্যেও আমিই প্রথমা,—আমিই মহাযজ্ঞস্বরূপিণী। স্থূল প্রপঞ্চরূপে আমিই বহুভাবে অবস্থিতা, আবার আমিই বিশ্বের সকল বস্তুতে অন্তঃপ্রবিষ্টা। দেবতাগণ সর্ব্বত্র আমাকেই বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন,—জীব সমূহ যে

অন্নাদি আহার করে, দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপার সম্পাদন করে, শ্বাস প্রশ্বাসাদি দ্বারা প্রাণধারণ করে,—এ সমস্ত ক্রিয়াই আমাদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমি স্বেচ্ছায় কাহাকেও শিবত্ব, কাহাকেও ব্রহ্মত্ব, কাহাকেও বিষ্ণুত্ব, কাহাকেও ঋষিত্ব প্রদান করি। আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি, আবার এই বিশ্বজগৎ অতিক্রম করিয়াও স্বমহিমায় বিরাজিত থাকি। আমি ছাড়া বস্তুতঃ কিছুই নাই।

বাগ্‌দেবীর অনুভূতিনিঃসৃত এই বাণীসমূহ ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই অনুভূতি—বিশ্ববিধায়িনী বিশ্বস্বরূপিণী পূর্ণ চৈতন্যময়ী স্বতন্ত্রা মহাশক্তির সহিত এই ঐক্যোপলব্ধি—মানুষ-মাত্রেই লাভ করিবার অধিকারী। এই অনুভূতি লাভেই মানুষের আত্মশক্তি সম্যক সার্থক্য মণ্ডিত হয়। মানুষ তখন সমগ্র বিশ্বকে নিতান্ত আপনার বলিয়া অনুভব করে, বিশ্বের সর্ব্বত্র আপনাকেই দর্শন করে, জরা ব্যাধি মৃত্যু নিতান্ত তুচ্ছ বোধ করে, নির্ভীক নিশ্চিন্ত আনন্দের সহিত সংসারবক্ষে বিচরণ করে।

এই মহাশক্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবার জন্য মানবজীবনেরও তদনুরূপ উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। বিভিন্ন দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে এই মহাশক্তির বিভিন্ন আংশিক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অনেক অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন দার্শনিক আচার্য্য নিয়ত-পরিণামশীল জগদ্‌ব্যাপারের মূল উপাদানকারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে এই মহাশক্তিকে 'প্রকৃতি', 'প্রধান', 'অব্যক্ত', 'অব্যাকৃত', 'Primordial Matter', 'Unconscious will' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। জড় পদার্থের মূলীভূতা মহাশক্তিকে তাঁহারা জড় স্বরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু জড়কে স্বতঃ-পরিণামী স্বীকার করিলেও, জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি নিরূপিত হয় না, শুধু জড়কারণ দ্বারা জড়চেতনময় বিশ্বজগতের সুনিয়ত সুশৃঙ্খল উৎপত্তি-স্থিতি-পরিণাম-ধ্বংসাদি বিধিব্যবস্থারও বিচারসহ সমীচীন ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। সেই হেতু মূলা-প্রকৃতির চেতনাধিষ্ঠান স্বীকার করা আবশ্যক হয়। তদনুসারে অনেক আচার্য্য চেতনাধিষ্ঠিত প্রকৃতিকেই বিশ্বের কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ চৈতন্য ও মূলাপ্রকৃতি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও পরস্পরকে নিত্য আলিঙ্গন করিয়া বিশ্বের কারণরূপে বিদ্যমান। নিত্য মিথুনী-ভূত যুগল সত্তাকেই বিশ্বজগতের আদিতে মধ্যে ও অন্তে দর্শন করিয়া তাঁহারা মহাশক্তিময় যুগলের উপাসনায়ই রত হইয়াছেন।

আবার, অনেক আচার্য্য নিত্য মিথুনীভূত চেতন ও প্রকৃতির আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার নিরর্থক ও অযৌক্তিক বোধ করিয়া, প্রকৃতিকে পরমচেতন-স্বরূপ ব্রহ্মেরই প্রকৃতি বা শক্তি বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুভূতিতে ব্রহ্ম নিত্য মহাশক্তিমান এবং মহাশক্তি নিত্য ব্রহ্মময়ী চৈতন্য-ময়ী, তত্ত্বতঃ এই দুইএর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই পরমতত্ত্ব নিত্য পরিবর্ত্তনরহিত কূটস্থ দ্রষ্টৃ-স্বরূপে ব্রহ্ম বা চৈতন্য, এবং নিত্যপরিণামশীল বিশ্ব-কারণস্বরূপে মহাপ্রকৃতি বা মহাশক্তি। যাঁহারা এই মহাশক্তিকে কেবলমাত্র বিশ্বকারণস্বরূপা বিশ্ব জননীরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে তিনি প্রথমতঃ সিসৃক্ষাময়ী, ইচ্ছাময়ী, কামময়ী, কামরূপা, কামাখ্যাদেবী। কূটস্থ ব্রহ্ম বা শিবস্বরূপে তিনি নিত্য স্থির গুণাতীত, কামাখ্যাদেবীরূপে তিনি শিববক্ষে নৃত্যশীলা, নিয়তচঞ্চলা, ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রভাবে আপনাকে বহুধাবিভক্ত, কিন্তু এক সূত্রগ্রথিত ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলিত বিশ্ব-রূপে প্রকটিত করিয়া অনাদি-অনন্তকাল তাঁহার সৃষ্টিলীলা সম্ভোগ করিতেছেন। আবার, এই বিশ্বকে আপনার ভিতরে গুটাইয়া আনিয়া, আপনার বহুভাবকে একীভূত করিয়া, আপনি অদ্বয়

ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া, তিনি আপনার প্রলয়-লীলা আস্বাদন করিতেছেন। অনাদি অনন্ত কাল তাঁহারই অঙ্গীভূত, তাঁহারই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রবাহরূপ আত্মপরিণামে কালিক ভেদের সৃষ্টি; তিনি যেমন নিত্য অখণ্ড সত্তায় বিরাজমান থাকিয়াও বহুধা খণ্ডিতরূপে আপনাকে প্রকটিত করেন, তাঁহার অঙ্গীভূত অখণ্ডকালও তেমনি তাঁহারই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিত্য সহচররূপে ভূত ভবিষ্যত-বর্ত্তমানরূপে বিভক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। এই দৃষ্টি লাভ করিয়া সাধকগণ বিশ্বজননী মহা-শক্তিকে মহাকাল বক্ষোবিলাসিনী মহাকালীরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং এই মহাকালীর অখণ্ড সত্তার সহিত যোগযুক্ত হইয়া বিভক্তকালের প্রভাব অতিক্রমপূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠা-লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আশা পোষণ করেন।

ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ তাঁহার অনুভূতির রাজ্যে শুধু কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাই দর্শন করে না, শুধু সদসৎ, নিত্যানিত্য, স্থিতিগতি, একত্ব বহুত্ব ও ভেদা-ভেদেরই বিচার করে না, শুধু অসতের মূলে সৎ, অনিত্যের মূলে নিত্য, গতির মূলে স্থিতি, বহুত্বের মূলে একত্ব এবং ভেদের মূলে অভেদই অনুসন্ধান করে না। সুতরাং এই প্রকার দৃষ্টিতে বিশ্বের মূলীভূতা মহাশক্তির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াই তাহার সম্যক্ তৃপ্তিলাভ হয় না। সে নিজের ভিতরে স্বভাবতই ধর্ম্মাধর্ম্ম, মঙ্গলামঙ্গল, ঔচিত্যা-নৌচিত্য, শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব অনুভব করে এবং অধর্ম্ম অমঙ্গল অনৌচিত্য ও প্রেয় বর্জন পূর্ব্বক ধর্ম্ম মঙ্গল ঔচিত্য ও শ্রেয়কে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আপনার প্রকৃতিগত স্বভাবসিদ্ধ এই দ্বন্দ্বানুভূতির ও আদর্শানুপ্রাণনার অনুসরণে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরেও এই দ্বন্দ্ব দর্শন করে ও ইহার অন্তরালে একটা আদর্শাভিমুখীনতা উপলব্ধি করে। সে নিজের জীবনের ভিতরে দৈবীপ্রেরণা ও আসুরী তাড়নার সংগ্রাম অনুভব করে, মানবসমাজের ভিতরে কখনো দৈবভাবের প্রাধান্য এবং কখনো আসুরভাবের প্রাবল্য দর্শন করে, বিশ্বজগতের ভিতরেও তদনুরূপ দেবাসুর সংগ্রামের অস্তি-উপলব্ধি করে। তৎসঙ্গে সে ইহাও উপলব্ধি করে যে, তাহার জীবনে আসুরভাবের বিনাশ ও দৈবভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই জীবনের কৃতার্থতা, এবং মানবসমাজ ও বিশ্বজগতের ভিতরেও দৈবভাবের প্রাধান্য ও আসুরভাবের পরাভব দ্বারাই সামাশৃঙ্খলা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়।

বুদ্ধি এইরূপ অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে সর্ব্বকারণকারণরূপা সর্ব্বশুভাশুভপ্রসবিনী বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি অসুরমর্দ্দিনী দেবার্থসাধিনী সর্ব্বকল্যাণগুণময়ী ভগবতী শিবানীস্বরূপে আবির্ভূতা হন। মূলকারণদৃষ্টিতে যিনি সর্ব্ববিধবৈশিষ্ট্য বর্জ্জিতা কামময়ী মহাকালময়ী অব্যক্তা প্রকৃতি, ধর্ম্মময় জীবনের দৃষ্টিতে তিনিই ধর্ম্মের পরিপূর্ণ আদর্শস্বরূপা, তাঁহার সৃষ্টিপ্রবাহ পরিপূর্ণ আত্মা বিহীন একটি বিরাট্ ধর্ম্মময় জীবনেরই ক্রমাভি ব্যক্তির ইতিহাস; তিনি তখন অনন্তাবয়ব শোভমানা, অনন্তদ্বন্দ্বরূপে প্রকাশমানা, সকল বিরোধ অঙ্গীভূত করিয়া পরমৈশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, দেবাসুর সংগ্রামের ভিতর দিয়া, ধর্ম্ম বা দৈবভাব কিরূপ কৌশলে বিশ্বজীবনে আপনাকে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত করিতেছে, বিশ্ববিধান বিচিত্র শক্তি-পুঞ্জের সংঘর্ষ ও সহকারিতার ভিতর দিয়া কিরূপ একটি মহামহিমশক্তি পরমকল্যাণময় আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, বিশ্বজননী মহাকালময়ী মহাশক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও লীলাভঙ্গীতে তাহারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি দেখিতে পান যে বিশ্ববিধানের মধ্যে ধর্ম্মাদর্শানুবর্ত্তী সমষ্টিকল্যাণাত্মক

স্বকীয় শক্তিসমূহকে বাহন ও আয়ুধরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বসাম্যবিরোধী সমষ্টিকল্যাণবিদ্রোহী আত্মম্ভরী অহমিকাপ্রধান আসুরশক্তিসমূহের নিগ্রহসাধন করিয়া, সহস্র বাহু দ্বারা জগতের সহস্রবিভাগের যাবতীয় ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া, সমগ্র জগতের মধ্যে একটি অচিন্তনীয় সুমহান্ আদর্শের কল্যাণময় প্রভাবের প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বজননী সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী মহাশক্তি নির্ম্মলহাস্যসুশোভিত বিরাটমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিয়তচলমান নৃত্যভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন।

মানব জীবনের চিরাভিলষিত বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও তৃপ্তি আসুরিক শক্তিসমূহের আবরণ বিক্ষেপজনক ধর্ম্মগ্লানিকর মলিন প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বোপেত দৈবী মূর্ত্তিতে মহাশক্তির কোলে নিয়ত নৃত্য করিতেছে। বিশ্ববিধায়িনী ধর্ম্মময়ী মহাশক্তিকে যতই গভীর ও ব্যাপকভাবে আপনারই স্নেহময়ী জননীরূপে প্রাণে প্রাণে অনুভব করা যায়, ততই সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত বিদ্যা ও সম্যক্ তৃপ্তি আপনার করতলগত বলিয়া বোধ হয়। তখন এই সংসারে সকল শত্রু নিঃশেষে বিজিত, সকল বিঘ্ন সুদূরে অপসারিত, সকল দৈন্য সম্ভোগে পরিণত, সকল অজ্ঞান এক অখণ্ড জ্ঞানে নিমজ্জিত। তখন মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় নির্ভীক নিশ্চিন্ত সুপ্রসন্ন চিত্তে আনন্দতরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া খেলিয়া দৌড়িয়া সংসারবক্ষে বিচরণ করা যায়। মায়ের যে অসীম সম্পদ, সবই নিজের বলিয়া আস্বাদ্য হয়, অথচ কোন বস্তুই নিজের ভোগের জন্য নিজস্ব বলিয়া আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মহাশক্তির এই অনন্ত বীর্য্যৈশ্বর্য্য জ্ঞানানন্দময় পরমকল্যাণঘন দৈত্যদানববিনাশন বিশ্বব্যাপী রূপের সহিত সাধকজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপিত হইলে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় যে এই জগৎটি ধর্ম্মেরই সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি, জগতের যাবতীয় বিধান বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম্মেরই বিধান, সর্ব্বপ্রকার উৎপত্তিস্থিতিধ্বংসের ভিতর দিয়া ধর্ম্মেরই ক্রমিক স্বরূপাভিব্যক্তি। মা ধর্ম্মময়ী, জগৎ ধর্ম্ম দিয়াই গড়া, জগৎপ্রক্রিয়ার পূর্ণবিকাশের মধ্যেই মায়ের স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকটিত।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দৈব ও আসুর, ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম পূর্ব্বক যাহাদের দৃষ্টি বিশ্বজননী মহাশক্তির নিগূঢ়রহস্যময় পরিপূর্ণ স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে, তাহারা এই মহাশক্তির স্বরূপের ভিতরে দেবাসুর সংগ্রাম দর্শন করে না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংঘর্ষ দর্শন করে না, অধর্ম্ম ও অসুরের ক্রমিক পরাভব এবং ধর্ম্ম ও দৈবভাবের ক্রমোৎকর্ষ লক্ষ্য করে না, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও তৃপ্তিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভব করে না। তাহাদের দৃষ্টিতে মহাশক্তি নিত্য বিশুদ্ধপ্রেমময়ী—পরমানন্দময়ী মহাভাবস্বরূপিনী বিচিত্ররসবিলাসিনী। তাহারা সমগ্র জগতে, বিশ্বের প্রত্যেক বিভাগে, অশেষ বৈচিত্র্য তরঙ্গায়িত প্রেমানন্দ রসেরই উল্লাস দেখিতে পায়। তাহাদের প্রেমানন্দবিলসিত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বজগৎ প্রেমানন্দ হইতে সমুদ্ভূত, প্রেমানন্দ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, প্রেমানন্দ স্বরূপেই বিলয়প্রাপ্ত, বিশ্বজগতের আপাতদৃষ্ট সব দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়া বস্তুতঃ এক অখণ্ড প্রেমানন্দ রসই নিরাবিল ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। সব হাসি ও কান্নার মধ্যে, সব বিরহ ও মিলনের মধ্যে, সব উৎপত্তি ও ধ্বংসের মধ্যে, সব সংগ্রাম ও সন্ধির মধ্যে, সব বিপদ ও সম্পদের মধ্যে, তাহারা প্রেমানন্দময়ী মহাশক্তির রসবিলাসই সম্ভোগ করে। মহাশক্তির এই প্রেমানন্দময়ী মূর্ত্তির সহিত দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্ত সাধকপ্রাণ যোগযুক্ত হইলে, সমস্ত বিশ্বই পরম সুন্দর, পরম মধুর, পরমাস্বাদ্যরূপে অনুভূত হয়, সাধকের জীবন তখন সর্ব্বদ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া প্রেমানন্দরসাভিষিক্ত হয়। মানব জীবন তখনই সম্পূর্ণরূপে সার্থক্যমণ্ডিত, তখনই শক্তিপূজার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু সাধকজীবনের আরো একটি অবস্থা আছে ও দৃষ্টিকেন্দ্র আছে। তখন কার্য্যকারণের কোন ভেদ থাকে না, শক্তি ও ক্রিয়ার কোন ভেদ থাকে না, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের কোন বিভাগ থাকে না, প্রেম ও আনন্দের কোন বিলাস বা তরঙ্গ থাকে না, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কোন বৈচিত্র্যময় প্রকাশ থাকে না। তখন জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়, অহং মিথ্যা হইয়া যায়, সাধনা ও সিদ্ধি, বন্ধন ও মোক্ষ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহাশক্তি তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপা, বিশুদ্ধ সৎ-স্বরূপা, বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপা। জ্ঞান সত্তা ও আনন্দের মধ্যে তখন কোনপ্রকার পার্থক্য নাই। শক্তি ও শক্তিমান্, জ্ঞান ও জ্ঞানবান্, সত্তা ও সত্তাবান, আনন্দ ও আনন্দী, প্রেম ও প্রেমী তখন সম্যক্‌রূপে এক অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বস্বরূপে প্রকাশমান। সাধক নিজে ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত অহংবোধবিমুক্ত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব বিবর্জিত হইয়া সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিতই একীভূত। এই অনুভূতিতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদদর্শন শুধু অনির্ব্বচনীয় মায়াবিলাস, শুধু ভ্রান্তি। পরমার্থতঃ একমাত্র ক্রিয়াবিহীন দ্বৈতগন্ধবিহীন স্বয়ং পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপা মহাশক্তি বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমিই নিত্য বিদ্যমান। এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠালাভ হইলে আর কোন পূজার্চ্চনা থাকে না। সাধক তখন শক্তির পারমার্থিক স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি করে, অথবা নিজেকেই পরমার্থতঃ বিশ্বজননী মহাশক্তির যথার্থ স্বরূপ বলিয়া অনুভব করে।

উৎকলে দুর্গোৎসব

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

বহু শতাব্দী হইতে বাংলা ও উৎকল অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত ছিল। বাংলা ও উড়িষ্যায় কি শব্দতত্ত্বে, কি প্রবাদ-প্রবচনে, কি আখ্যান-গল্পে, কি সাজ-সজ্জায়, কি আচার ব্যবহারে যতটা ঐক্য দেখা যায়, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের সহিত বাংলার এতটা সাদৃশ্য বা ঐক্য দৃষ্ট হয় না। তবুও উড়িষ্যায় তাহার নিজস্ব যে সকল পাল-পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয়—তাহা বাংলায় নাই। বাংলার দুর্গোৎসবও উড়িষ্যায় বাংলার মত অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন প্রবাসী বাঙালীদের গৃহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, আবার কোন কোন পল্লীতে বাঙ্গালীরা অগ্রণী হইয়া চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারীভাবে পূজার আয়োজন করে। উৎকল প্রদেশে দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী দেবীমূর্ত্তির পূজা বিরল দৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপি উড়িষ্যায় "দশহরা বা দশেরা" একটী বিশেষ পর্ব্ব। কটকে অনেকে এই পর্ব্বোপলক্ষে শিবদুর্গা, কালীকৃষ্ণ, গণেশ প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া নানাপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া চালচিত্র রাখিয়া নয়নরঞ্জন বেশে সজ্জিত করে। দুর্গোৎসবের "বিজয়া" বা "দশেরা"র দিন তাহারা দলবদ্ধভাবে দেববিগ্রহকে আলোক সজ্জায় মণ্ডিত করিয়া সহরের চারিদিকে বাদ্যভাণ্ড লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এই সকল দেবদেবী মূর্ত্তির শোভাযাত্রা একপ্রকার দুর্গোৎসবের অঙ্গ বলিয়াই পরিগণিত হয়। সহরে দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি সকল বিজয়ার দিন বাহির করিয়া সমগ্র রাত্রি

পুরী মন্দির (লিথোগ্রাফ)　　　　শ্রীগহ্বমণি প্রস্তরাজ
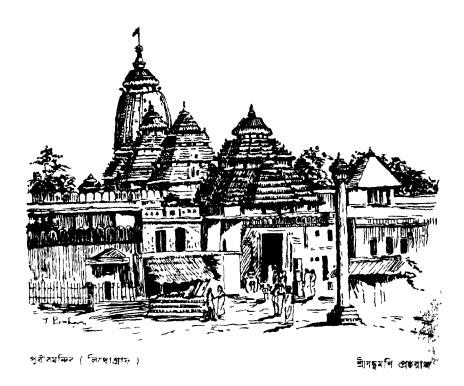
শোভাযাত্রা সহকারে লোকবহুলস্থানে একত্রিত করা হয়। এই জমায়েতের নাম "মেলন"। এই মেলন বাস্তবিকই দেখিবার মত। প্রত্যেক দলই আলো বাজী প্রভৃতির বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা করে। পরে একাদশীর দিন প্রাতঃকালে চাঁদনী চকে "মিলন" হইয়া সমস্ত দেববিগ্রহের শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে নদী অভিমুখে গমন করে। কটকে কাঠজুরীর পুরীঘাটে দেবমূর্তিসকল একে একে বিসর্জ্জন হয়।

কটক জেলার বহু গ্রামে বাঙালী পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়া থাকে। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দেবীপূজা ও চণ্ডীপাঠ করিয়া "নবরাত্রি" পালন করেন। আজকাল উৎকলে অনেকেই দশেরা ও পূজা-পর্ব্বোপলক্ষে নূতন বস্ত্র ও পোষাকে সজ্জিত হইয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া থাকে।

৺পুরীধামেও দুর্গাপূজার পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। পূজার কয়েক দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথের নিত্যসেবা রাত্রিকালে শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইয়া শয়ন হয় এবং অর্দ্ধরাত্রি পরে শ্রীশ্রীবিমলাদেবীর আমিষ ভোগ দিয়া বিশেষভাবে পূজার্চ্চনা আরম্ভ হয়। শ্রীমন্দিরের সমুদায় মন্দির বন্ধ থাকে এবং বাহিরের কোন লোকের তখন প্রবেশাধিকার থাকে না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই পূজা সমাপ্ত হয় এবং প্রভাতেই দেবীর আমিষ ভোগ বিতরিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বে পূজকদিগকে টাকা দিয়া রাখেন তাঁহারা এই ভোগ কিছু পাইয়া থাকেন। এই আমিষ ভোগ তিন দিনই হয়। বিশেষভাবে তান্ত্রিকাচারেই পূজা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত শ্রীমন্দিরের বাহিরে একটী দশভুজা দেবীমূর্ত্তির নিয়মিত ভাবে পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দেবী-দুর্গাপূজা বহু প্রাচীন কাল হইতেই হইয়া আসিতেছে। প্রবাসী বাঙালীদের সহায়তায় পুরী সঙ্গীত-সম্মিলনের উদ্যোগে আজ কয়েক বৎসর ৺পুরীধামে দুর্গাপূজা হইতেছে। কিন্তু স্থানীয় উৎকলবাসীর প্রতিমাসমূহ একাদশী তিথিতেই 'মেলন' হইয়া বিসর্জ্জন হয়। শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে নানাস্থানের বহু প্রতিমা একত্রিত হইয়া "মেলন" হয়। প্রায় অধিকাংশ প্রতিমাই মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশপ্রহরণধারিণী চামুণ্ডা-মূর্ত্তি—দুই পার্শ্বের একদিকে জয়া অপরদিকে বিজয়া। এই সব "মেলনে" বঙ্গদেশের মত দশভুজামূর্ত্তিও শোভা বর্দ্ধন করে। বাংলাদেশের মতই লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক ও গণেশ আছেন কিন্তু সংখ্যার তুলনায় তাহা নগণ্য—৩০।৩৫টী প্রতিমার মধ্যে ৪।৫টী মাত্র।

উড়িষ্যা গড়জাতেও "দশেরা"পর্ব্ব প্রতিপালিত হয়। রাজা বাণের দ্বারা লক্ষ্য বিঁধিয়া বৎসরের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করেন, পাইক জাতি তাহাদের নানা কসরৎ, লাঠিখেলা, তীরধনুকের ক্রীড়া ও অসিযুদ্ধ প্রভৃতি সমাগত দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইতে ও দেখিতে লোকের আকুল আগ্রহ। এই আনন্দোৎসবে সকলের যেন সমান অধিকার। ধনী ও দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উৎকলে বাংলার "মা দুর্গা" নাই, সেই আগমনী-গীতি নাই, মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে মার আগমন প্রতীক্ষা নাই, সেই "মা" "মা" রব নাই। বাংলা-দেশেই কি এখন ত্রিশবৎসর পূর্ব্বের মত পল্লীতে পল্লীতে আগমনী গীতি আছে? তখন শরতের অতি প্রত্যুষেই শোনা যাইত—

"গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণি। তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে মা কৈ, মা কৈ ব'লে
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।
মাগো ত্রিভুবনে মাঙ্গে, ত্রিভুবনে ধন্তে,
তোর মেয়ে সামান্তে নয় গো রাণি!

আমরা ভাবতেম ভবের প্রিয়ে,
আজ শুনি তোর মেয়ে।
উনি নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥"

আর তো সে মায়ের আহ্বান নাই। তবুও গড়জাতে প্রাচীন বীরত্বের অভিনয় আছে। হায় অতীতের কঙ্কালময় স্মৃতি!

উড়িষ্যায় দেখা যায় জিতাষ্টমী হইতেই কোথাও কোথাও দেবীর ঘট স্থাপিত হয়। এই সময় শবরোৎসব চলিতে থাকে। শবরীরা দলবদ্ধ ভাবে গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষা করিয়া থাকে—তাহাদের পূজার আয়োজনের নিমিত্ত। সে গানে একটা মাদকতা আছে। জিতাষ্টমী, জিতুপর্ব্ব, শবরোৎসব—প্রায় সব এক সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে হয় ইহা প্রাচীন শারদোৎসব—বাংলার দুর্গাপূজার আগমনী। উৎকল ও ছোটনাগপুরে—বিশেষ উভয় প্রদেশের পার্ব্বত্য ও আরণ্য অঞ্চলে এইসব পর্ব্বের বিশেষ প্রচলন। নূতন রং করিয়া কাপড় পরিয়া সারি বাধিয়া মেয়েদের দল গীত গাহিতে গাহিতে নাচিয়া নাচিয়া রাত্রি কাটাইয়া দেয়। পরস্পরে হাসি খেলা ও আনন্দে আবালবৃদ্ধ উন্মত্ত। কিন্তু দুর্গোৎসবে ইহাদের সে উন্মাদনা নাই, প্রবাসী বাঙালীর বাড়ীতে দুর্গাপূজা দেখিয়াও তাহারা উহাকে 'আপনার' করিয়া লইতে পারে নাই। তবে উৎকলে ও ছোটনাগপুরে সাধারণ নরনারী দেবীর পূজা দেয় ভয়ে ও বরের আশায়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও জঙ্গল-অঞ্চলে স্থানে স্থানে দেবীপীঠ আছে। কোথাও বৃক্ষমূলে সিন্দুররঞ্জিত প্রস্তরমূর্ত্তি, আবার কোথাও শুধু বেদী। এইসব দেবীর পূজার অর্ঘ্যও আয়োজন করিয়া থাকে দরিদ্র পর্ণকুটিরবাসী নরনারী। মা কোথাও "রঙ্কিনী", কোথাও সর্ব্বমঙ্গলা, কোথাও চামুণ্ডা উগ্রচণ্ডা, কোথাও বিশালাক্ষী, কোথাও খর্পরহস্তা নরমুণ্ডশোভিত রুধিরপায়িনী, কোথাও সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী দশভুজামূর্ত্তি। উৎকলে দেবীমূর্ত্তি পথে ঘাটে মন্দিরে বাজারে পাহাড়ে জঙ্গলে নানাস্থানে পূজিত হইতেছেন। ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলিও হয়। কিন্তু মার সঙ্গে প্রকৃত মার সম্বন্ধ নাই। মা—শুধু আরাধ্যা দেবী বরাভয়প্রদা সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী এবং কোপনস্বভাব ও সংহারময়ী। তাই কেহ সেই জগজ্জননী দেবীমূর্ত্তিকে বাঙালীর মত বলে না—

"ওমা শঙ্করি! আমার স্বর্ণপুরী—
তাজে কেন বিল্বমূলে?
কত কেঁদে মলাম উমা মায়ের কপাল ক্রমে
এমন অবোধ মেয়ে তুমি জন্মেছ কুলে।
দেখ মায়ের কথা কাণে যেখানে সেখানে
বসো না, বসো না ওমা বিমলে!
দুখ পাবি গো উমে! কোলে আয় মা!
তাজে বিল্বমূলে
যেন কণ্টক বেধে না—তোর চরণ কমলে ॥
ঘরে মা! যখন আসিবে, মায়ের দুঃখ নাশিবে
মা বলিবে—তুষিবে - বসিবে কোলে,—
শিবের বামে বসো মা! বসো বসো মা।
একবার মায়ের কোলে।
আর তোর দাস—দাশরথি-হৃদ-কমলে।"

আমরাও গললগ্নীকৃতবাসে মায়ের রাঙ্গা পদকমলে প্রণত হইয়া বলি—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

ভগবান্ বুদ্ধের কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান্ বুদ্ধ যখন আবির্ভূত হন, তখন ভারতের ধর্ম্ম-গগন বহুবিধ বিরুদ্ধ মতবাদে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি সাধারণের আস্থা সন্দেহবাদ ও শূন্য অজ্ঞেয়বাদে দোলায়মান হইতেছিল। একপক্ষ শাশ্বতবাদ ও অপর পক্ষ উচ্ছেদবাদ সমর্থন করিয়া সমাজে এক তুমুল নাস্তিক আন্দোলন সৃষ্টি করিল; ফলে জনসাধারণ আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইল। সেই বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য যুগগুরু বুদ্ধদেব যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতীয় ধর্ম্ম-জগতে যুক্তিকে শীর্ষস্থান প্রদানই তাঁহার বিশেষত্ব, অবশ্য উপায়ান্তর ছিল না। অথচ মীমাংসকগণ কর্ম্মকে সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া সুফলের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফল পাইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। ইহার দ্বারা ভগবান্ বুদ্ধ সমাজের সাধন-স্রোত ঠিক বিপরীতমুখে প্রবাহিত করিলেন।

ধর্ম্মসাধনে সাধারণতঃ লোকে আচার্য্য বা ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় চেষ্টার অন্ত করিয়া বসেন। প্রকৃত নির্ভরশীল বা কৃপাপ্রার্থী কখনও নিশ্চেষ্ট হন না। নির্ভরতার কদর্থ করিয়া বিপদের সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া আমরা অলসতারই প্রশ্রয় দেই। তাহাতে 'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ' হয়, মানুষ সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা, অশ্রদ্ধা জন্মে। এই জন্য বুদ্ধদেব আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব বিষয়ে একেবারে নীরব রহিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণকে এই বিষয়ের বিতণ্ডায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া যুক্তিবাদী ও বিচারশীল হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। উহার দ্বারা তিনি মানুষকে ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া সাধনে সদা সচেষ্ট হইতে বলিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সফলতার সমস্ত দায়িত্ব সাধকের স্কন্ধে চাপাইয়া ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। মহানির্ব্বাণের সময় বুদ্ধদেবের তাই অন্তিম-বাণী হইল 'সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হও'। আত্মা ও ঈশ্বরের কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে, কেহ করিবে না, সুতরাং মতদ্বৈধ অনিবার্য্য। আবার যাঁহারা বিশ্বাস করে বলেন, তাঁহারা অনেকেই মুখস্থ কথা বলেন, তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস ও কার্য্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আত্মা ও ঈশ্বর ব্যতীতও ধর্ম্ম সম্ভব, এই অভিনব বাণী বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন। আত্মা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস অনেকের আবশ্যক না ও হইতে পারে কিন্তু মানবমাত্রেরই ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষ আত্মা ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে পারে না। কে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইতে না চায়? মৃত সন্তানের উন্মাদিনী জননী যখন বুদ্ধদেবকে ধরিয়া বসিলেন তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবন দান করিতে হইবে, তখন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ ঈষৎ হাস্যমুখে মাতাকে যে গৃহে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই সেইরূপ কোন গৃহ হইতে এক মুষ্টি সরিষা আনিতে আদেশ করিলেন। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, মানবজীবনে জরা ব্যাধি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন উঠে, 'এই দুঃখত্রয় হইতে মুক্তির উপায় কি?' এই প্রশ্নের তিনি যে সনাতন সমাধান করিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। জগতের কোন যুগাচার্য্যই এইরূপ অদ্ভুত বাণী মানব জাতিকে শোনান নাই।

'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' অর্থাৎ কাঁটা দিয়াই কাঁটা তুলিতে হয়। বুদ্ধ অনাত্মবাদ ও নাস্তিকবাদ অবলম্বন করিয়াই দুঃখনাশের উপায় আবিষ্কার করিলেন। দুঃখের কারণ বাসনা। এ বিষয়ে বেদ ও বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু বাসনা-নাশের উপায় উভয়ের একবারে বিপরীত। বাসনার আশ্রয় হইতেছে আত্মা (জীবাত্মা)-র অস্মিতা বা অহংভাব। বেদান্ত মতেও জীবাত্মা ছায়ার ন্যায় অলীক। আর পরমাত্মা আছে কি না সেই বিষয় তো বুদ্ধ মৌনাবলম্বনই করিয়াছেন। তাই তিনি অনাত্মবাদ প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে আত্মা (জীবাত্মা) প্রজ্ঞাপ্তিসৎ (Idea) মাত্র, দ্রব্য-সৎ বা বস্তু-সৎ (Entity) নহে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞাদি পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি বা সংহতিই এই শরীর। প্রত্যেক স্কন্ধও যে আত্মা নহে তাহা 'রূপ' স্কন্ধ দ্বারা বুদ্ধদেব এইভাবে উপদেশ দিতেন—"রূপম নাত্মা" (আত্মা রূপ নহে)। বিনয়পিটকের 'মহাবগ্‌গ' নামক গ্রন্থে ভগবান্ তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিতেছেন যে, এই পাঁচটী স্কন্ধের কোনটীই আত্মা নহে।

আত্মা আছে বিশ্বাস করিলে 'অহঙ্কার' কিছুতেই যায় না। এই অহং অবলম্বন করিয়া কামনা উৎপন্ন হয়। তাই নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—"যঃ পশ্যতি আত্মানং তস্যাহম্ ইতি শাশ্বতস্নেহঃ," 'যিনি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাহার 'আমি' এই শাশ্বত স্নেহ থাকে'। আর একটী বৌদ্ধ গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে:—

"সাহংকারে মনসি ন শমং যাতি জন্মপ্রবন্ধঃ।
নাহংকারশ্চলতি হৃদয়াদাত্মদৃষ্টৌ চ সত্যাং॥"

'অহংকার থাকিলে জন্ম স্রোত বন্ধ হয় না। আত্মার ভাব থাকিলে মন হইতে অহংকারও বিদূরিত হয় না।'

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভাষ্যকার চন্দ্রকীর্ত্তি দ্বিতীয় বুদ্ধ নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিককারিকার উপর ভাষ্য করিয়াছেন। বেদান্তে যেমন গৌড়পাদ, বৌদ্ধ দর্শনে তেমনি নাগার্জ্জুন। চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন:—

"সৎকায়দৃষ্টিপ্রভবানশেষান্
ক্লেশাংশ্চ দোষাংশ্চ ধিয়া বিপশ্যন্।
আত্মানম্ অস্যাবিষয়ং চ বুদ্ধা
যোগী করোত্যাত্মনিষেধমেব॥"

'আত্মবিশ্বাস হইতে অশেষ ক্লেশ ও দোষ উৎপন্ন হয়, ইহা প্রজ্ঞা সহায়ে দর্শন করিয়া এবং আত্মাই ইহাদের কারণ জানিয়া যোগী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।' বিখ্যাত বৌদ্ধ দর্শনাচার্য্য শান্তরক্ষিত বলেন—'অহংভাব দূর হইলে মুক্তিলাভ হয় এই বিষয়ে নাস্তিকগণও এক মত। আত্মভাব থাকিলে অহংকার যায় না।'

ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের নৈরাত্ম্যবাদ। এই নৈরাত্ম্যবাদ দুই প্রকার—পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধর্ম্ম-নৈরাত্ম্য। আত্মা শব্দের ধাতুগত অর্থ স্বভাব এবং পুদ্গল—জীব, সত্ত্ব, পুরুষ বা আত্মা। পুদ্গল নৈরাত্ম্য অর্থে পুরুষের আত্মা নাই এবং আত্মা বস্তুসৎ নহে, উহা মরীচিকাবৎ কল্পনা মাত্র। ধর্ম্ম=দ্রব্য বা পদার্থ। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল পদার্থ যথা—গাছ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের আত্মা নাই, ইহাই ধর্ম্ম-নৈরাত্ম্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। পদার্থের আত্মা নাই, কারণ উহা কার্য্যকারণজাত অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদের উপর নির্ভর করে। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ পুদ্গলনৈরাত্ম্যকে পুদ্গলশূন্যতা এবং ধর্ম্মনৈরাত্ম্যকে ধর্ম্মশূন্যতা বলেন।

নাগার্জ্জুন অনাত্মবাদের চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রথ দগ্ধ হইলে যেমন রথের অংশগুলিও সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়, তেমনি আত্মভাব ত্যাগ করিলে 'আত্মীয়' বা 'মম' ভাবও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। তিনি মূল মাধ্যমিক কারিকার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন:—

"আত্মন্যসতি চাত্মীয়ং কুত এব ভবিষ্যতি।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ শমাদাত্মাত্মীয়য়োঃ।

মমেতি অহং ইতি ক্ষীণে বহিরধ্যাত্মম্ এব চ।
নিরুধ্যতে উপাদানং তৎক্ষয়াৎ জন্মনঃ ক্ষয়ঃ॥
কর্ম্মক্লেশক্ষয়াৎ মোক্ষঃ।"

'আত্মা' না থাকিলে 'আত্মীয়' কোথা হইতে হইবে? 'আত্মা' ও 'আত্মীয়' ভাব শান্ত হইলে 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব দূর হয়। বাহিরে ও অন্তরে 'আমি' ও 'আমার' ভাব দূর হইলে কাম, অসৎ দৃষ্টি, শীল, ব্রত, পরামর্শ এবং আত্মভাবাদি উপাদান নিরুদ্ধ হয়। উপাদান ক্ষয় হইলে জন্মক্ষয় এবং কর্ম্ম ও ক্লেশ ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই একই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'আমি' ও 'আমার' ভাব গত হইলেই মানুষ শান্তির অধিকারী হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

'যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন সেই 'আমি' ও 'আমার' ভাববর্জ্জিত ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী হন।'

ভগবান্ বুদ্ধ যে অভিনব ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অত্যদ্ভুত। জগতের কোন ধর্ম্মগুরুই এইরূপ অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাই স্তোত্রকার বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"নান্যঃ শাস্তা জগতি ভবতো নাস্তি নৈরাত্ম্যবাদী।
নান্যস্তস্মাদুপশমবিধেস্ত্বন্মতাদস্তি মার্গঃ।"

'হে বুদ্ধদেব, জগতে কোন ধর্ম্মগুরু আপনার মত নৈরাত্ম্যবাদী নহেন। অতএব আপনার মত ব্যতীত অন্য মুক্তিমার্গ নাই।'

এখন প্রশ্ন হইল আত্মা না থাকিলে সুখদুঃখের ভোক্তা, শান্তি মুক্তির অধিকারী কে হয়? 'মিলিন্দপনহ' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনকে প্রশ্ন করিতেছেন,—"মহাশয়, যদি আত্মা নাই তবে সঙ্ঘের শ্রমণগণকে কে আহার ও বস্ত্রাদি দান করে? কে রুগ্ন ভিক্ষুদিগকে ঔষধ পথ্য দান ও সেবাশুশ্রূষা করে? বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের শরণ কে গ্রহণ করে? কে ধ্যান করে এবং কেই বা নির্ব্বাণ লাভ করে?"

ইহার উত্তরে অনাত্মবাদিগণ দুইটী প্রধান যুক্তি প্রদান করেন। প্রথমটী 'কার্য্য কারণ ভাব প্রতিনিয়ম', দ্বিতীয়টী 'ধর্ম্মসন্ততি'। প্রথম যুক্তির প্রকৃত অর্থ এই যে, কার্য্য কারণের মধ্যে যে ভাব বা সম্বন্ধ আছে তাহা প্রতিনিয়ত (regulated), ইহার দ্বারাই আত্মা ব্যতীত সৃষ্টিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক যে মতবাদ আছে, প্রথম যুক্তিটী উহার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'কে 'ইদং প্রত্যয়তা' বা 'ধর্ম্মসংকেত'ও বলা হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের মতে কোন বস্তুর সৃষ্টি, কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একটী ভাল বীজ বপন করিলে যদি রৌদ্র, বায়ু, জল ও মাটি অনুকূল থাকে, বীজ হইতে অঙ্কুর, পাতা, শাখা, ফুল ও ফল হইবে। উহাতে আত্মার মধ্যস্থতার কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, বীজ মনে করে না যে, আমি অঙ্কুর সৃষ্টি করি এবং অঙ্কুরও মনে করে না যে, আমি বীজ হইতে উদ্ভূত। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এইরূপ কিছু ভাবে না।

এই ভাবের স্বপক্ষে শান্তিদেবের 'বোধিচর্য্যাবতারে' নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে :—

"ন চ প্রত্যয় সামগ্র্যা জনয়ামীতি চেতনা।
ন চাপি জনিতস্যাপি জনিতোস্মীতি চেতনা॥"

'সামগ্রী বা পারিপার্শ্বিক বস্তুর 'আমি সৃষ্টি করি' এই চেতনা নাই, এবং জনিতবস্তুর বা অঙ্কুরেরও চেতনা নাই যে, 'আমি জনিত'।'

আবার অঙ্কুর স্বয়ংকৃত, পরকৃত, উভয়কৃত, ঈশ্বরকৃত বা প্রকৃতিকৃত নহে। কিংবা উহা কাল পরিণাম, এক কারণাধীন বা একেবারে অহেতুক

নহে। প্রতীত্যসমুৎপাদ উচ্ছেদ, শাশ্বত ও সংক্রান্তি কোন বাদেরই পরিপোষক নহে। এইরূপে পঞ্চ স্কন্ধের সংহতি হইতে দেহান্তর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির নিমিত্ত শরীরে আত্মার উপস্থিতির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধ ঘোষ তাঁহার বিখ্যাত 'বিশুদ্ধিমাগ্গ' নামক গ্রন্থে অনাত্মবাদের সার সঙ্কলন করিয়া নিম্নোক্ত পালি শ্লোকে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন :—

"দুক্খ্ এব হি ন চ কোচি দুক্খিতো
কারকো ন, কিরিয়া ন বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি, ন নিব্বুতো পুমা
মাগ্গম্ অত্থি, গমকো ন বিজ্জতি॥"

'দুঃখই আছে কিন্তু কেহ দুঃখিত ব্যক্তি নাই, কারক নাই কিন্তু কার্য্য বিদ্যমান। নির্ব্বাণ আছে কিন্তু নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ নাই, মার্গ আছে কিন্তু মার্গের যাত্রী কেহ নাই।'

অনাত্মবাদের দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, উহা উপাদানের অবিচ্ছিন্নতা (Continuity of Elements) মাত্র। ইহা ক্ষণিকবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পরের বস্তুটী পূর্ব্ববস্তু অপেক্ষা ভিন্নও নহে, আবার একও নহে "ন অঞ্ঞো ন চানঞ্ঞো।" 'মিলিন্দপন্‌হ' গ্রন্থে রাজা মিলিন্দা ভিক্ষু নাগসেনকে প্রশ্ন (পালিতে পন্‌হ) করিলেন—'যাহার জন্ম হয়, সে এক থাকে বা ভিন্ন হয়?' নাগসেন বলিলেন—'একত্র নহে, ভিন্নও নহে।'

'উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিন।'

'মহারাজ, যখন আপনি শিশু ছিলেন, তাহা আর এই বয়স্থ অবস্থা কি এক?'

'শিশু অবস্থা এক, আর বৃদ্ধাবস্থা অন্য।'

'যদি আপনি শিশু নন, তবে শিশু ও বৃদ্ধের মাতা পিতা কি ভিন্ন? যে বালক বিদ্যালয়ে যায় এবং যখন সে শিক্ষা সমাপ্ত করে, এই উভয়ের মাতা কি ভিন্ন? অপরাধী যুবক এবং শাস্তিপ্রাপ্ত যুব[illegible] কি ভিন্ন?'

'নিশ্চয়ই নহে, তবে আপনি কি বলেন?'

নাগসেন বলিলেন—'আমি বলিব যে, আ[illegible] তখন শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এ[illegible] সকল বিভিন্ন অবস্থা একই শরীরের।' রাজ[illegible] মিলিন্দা উদাহরণ প্রার্থনা করিলে নাগসেন বলিলেন—'মহারাজ, যদি কেহ একটী প্রদী[illegible] জ্বালে তবে কি তাহা সমস্ত রাত্রি জ্বলিবে?'

'হাঁ, জ্বলিতে পারে।'

'রাত্রির প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর ও অন্যান্য প্রহরের প্রদীপের শিখা কি এক?'

'না, ভিন্ন। তবে শিখা বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন হইলেও প্রদীপ এক।'

তখন ভিক্ষু নাগসেন বলিলেন—'ঠিক এইরূপেই মহারাজ, ধর্ম্মসন্ততি দ্বারাই একটীর জন্ম, অপরটীর মৃত্যু হয়। ইহাতে মনে হয় যেন জন্ম মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে। রাজা মিলিন্দা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে নাগসেন বলিলেন যে, দেহ ও মনেরই জন্ম মৃত্যু হয় মাত্র। ভিক্ষু তাঁহাকে একটী বিবাহিতা বালিকার উদাহরণ দ্বারা বিষয়টী বুঝাইলেন – একটী বালিকাকে একজন বিবাহ করিয়া চলিয়া যায়, পরে অপর একজন বিবাহ করে; এই দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিয়া আদালতে উপস্থিত হইলে প্রথম ব্যক্তিই বালিকাকে স্ত্রীরূপে পাইল। কারণ, বালিকার দুই অবস্থা ভিন্ন হইলে প্রথমাবস্থা হইতেই দ্বিতীয় অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। নাগসেন বলিলেন—'মহারাজ, সেইরূপ দেহ-মনের সংহতি জন্মে এক এবং মৃত্যুতে অপর হইলেও প্রথম হইতেই দ্বিতীয় উৎপত্তি হয়।'

এই দুই যুক্তি দ্বারাই প্রধানতঃ অনাত্মবাদ স্থাপিত ও রক্ষিত হইয়াছে।

'আমি'র সন্ধানে

স্বামী নির্ব্বেদানন্দ

আলোর নীচেই অন্ধকার। যে বিষয়টির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঠিক সেইটিই থাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকা। এমনকি সেইটিকে জানিবার ইচ্ছাও আমাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। দুনিয়ার খবর তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার আগ্রহ আমাদের দুনিবার, কিন্তু আমাদের নিজের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এক রকম নাই বলিলেই চলে।

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কেন আসিয়াছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?—এই সব প্রশ্ন লইয়া যদি কেহ মাথা ঘামায় তবে সে নিশ্চয়ই পাগল অথবা দার্শনিক। সুস্থ মস্তিষ্ক সাধারণ মানুষের যেন এসব প্রশ্ন মনেই আসে না। যদি বা আসে—ইহার সমাধানের জন্য যেন তাহার রুচিও নাই, অবকাশও নাই।

কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ উপদেশ দিয়াছেন 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ 'নিজেকে জান'। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন আত্ম-জ্ঞান হইলেই মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে, তখনই মানুষ সকল সংশয়, সকল বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। ইহারই নাম মুক্তি। এবং এই মুক্তিলাভরূপ অপূর্ব্ব ফলের জন্যই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। খুব সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিসও উপদেশ করিয়াছিলেন, 'know thyself (নিজেকে জান)।

যদিও আর্য্য ঋষিগণ খুব সহজ এবং স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে নিজেকে ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়,—তথাপি এই পথে চলার রুচি আমাদের একেবারেই নাই। এটি আমাদের মামুলি ধাত। এইজন্যই কঠ-উপনিষদ বলিয়াছেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎস্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্॥
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

[স্রষ্টা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য বহির্জ্জগতটাই আমাদের নজরে আসে, অন্তরাত্মা আসেন না। (অবশ্য) কোন কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় (বহির্মুখ) ইন্দ্রিয় গ্রামকে নিরোধ করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দেখিয়াছেন (উপলব্ধি করিয়াছেন)]

যাহা হউক, ঋষি-প্রদর্শিত মুক্তি-পথে চলার রুচি আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। কারণ অনাবিল, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'—প্রগতির অপর কোন পথ নাই।

আমাদের বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে আমাদের গোড়াতেই গলদ, তাই আমাদের সুখদুঃখ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-জন্মান্তররূপ বন্ধন। নিজেকে একেবারে ভুল বুঝিয়া বসিয়া আছি। যেটা আমি নই সেটাকেই 'আমি' বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। ইহাই আমাদের অনাদি অবিদ্যা। এই অবিদ্যা দূর না হইলে মুক্তির আশা মাত্রও নাই। যেটিকে 'আমি' বলিয়া মনে করিতেছি সেটা আমার আবরণ মাত্র, আমার স্বরূপ নয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এইগুলির সমষ্টিকে আমরা 'আমি' বলিয়া থাকি। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে ইহারা 'আমি'কে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—ইহারা 'আমি'র আবরণ বা উপাধি—'আমি' এইগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এইগুলির পরিবর্ত্তন আছে, ইহারা চিরস্থায়ী নয়, ইহারা জড়, এমনকি ইহারা সত্য বস্তুই নহে—

স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর মত ইহাদের সত্তা একেবারেই অলীক। অথচ এমনই অবিদ্যার কুহক যে ঐ বুদ্ধিই কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিয়া 'দেহেন্দ্রিয় মন'কে নানা কাজে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বপ্নের মধ্যেও মনে হয় আমরা কত কাজ করি, কত সুখ-দুঃখ ভোগ করি,—কিন্তু জাগিবার পর মনে হয় যে স্বপ্নের কর্ত্তা ও ভোক্তা একটা অলীক ব্যাপার। ঠিক এই রকমই যখন মানুষের অতি-জাগরণ (তুরীয়) হয় তখন জাগ্রৎকালের কর্ত্তা ভোক্তাও শূন্যে বিলীন হইয়া যায়।

যাহা হউক মানুষের যাবতীয় কর্ম ও ভোগ হয় এই 'দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি'র মারফৎ। তার আমিটি কিন্তু এই কর্ম ও ভোগ হইতে একেবারে নির্লিপ্ত থাকে। শুধু তাই নয়—তার যথার্থ 'আমি' এই দেহের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। তার আমি ভূমা—বিশ্বব্যাপী চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ এক শাশ্বত সত্তা। যিনি এই প্রপঞ্চের মূল, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি লয় যাঁর মায়া-শক্তিতে ঘটিতেছে, সেই পরব্রহ্ম আর মানুষের যথার্থ 'আমি' একেবারেই অভিন্ন। মানুষের কাজ, কর্ম, চিন্তা, অনুভব প্রভৃতি 'দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি'র মারফৎ হয় বটে কিন্তু তার আমি বোধটির মূল উৎস বিশ্ব-ব্যাপী এক অখণ্ড সত্তা। মানুষ নিজে অকর্ত্তা, অভোক্তা। 'আমি' যাবতীয় কর্ম ও ভোগের একেবারে নির্বিকার সাক্ষিমাত্র। যদি আমার কোন কাজ থাকে তবে তাহা এই সাক্ষিত্ব,—আর যা কিছু কাজ, যা কিছু ভোগ তাহা 'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 'দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি' সংঘাতের।

শুদ্ধ ও একাগ্র মনে বিশ্লেষণ করিলে নিজের মধ্যে এই দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ভাগ কর্ম্ম ও ভোগে ব্যাপৃত, অপরটি শুধু দ্রষ্টা হইয়া বসিয়া আছে। প্রথমটি দৃশ্যস্থানীয়, সুতরাং 'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উপনিষদ এই দুইটি ভাগকে লক্ষ্য করিয়া রূপকের ভাষায় বলিয়াছেন,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-
ঽভিচাকশীতি॥

(ঠিক একই চেহারার দুইটি পাখী একই গাছের উপর বসিয়া আছে; তাদের মধ্যে একটি নানাবিধ স্বাদযুক্ত ফল খাইতেছে—অপরটি কিছুই খায় না, শুধু বসিয়া দেখিতেছে।)

আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, সাক্ষিচেতা। কর্ম্ম-ব্যাপৃত, ভোগ নিরত অংশটি 'আমি'র আবরণ বা খোলসমাত্র। উহার ভালমন্দ, ক্ষয়-বৃদ্ধি এমন কি লোপ হইলেও আমার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। আমি নিত্য, শাশ্বত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ঐ খোলসটারই হয়—আমার কখনও জন্ম-মৃত্যু হয় না,—হইতে পারে না। এই জন্যই গীতায় আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
ন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ॥
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কিন্তু খোলসটিকে যতদিন 'আমি' বলিয়া ভ্রম করিব ততদিন সুখ-দুঃখ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি আমারই হইতেছে এইরূপ ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। জীব-মাত্রই স্বরূপতঃ মুক্ত। কিন্তু অনাদি অবিদ্যার প্রভাবে খোলসটিকে 'আমি' মনে করিয়াই তার সংসারচক্রে আবর্ত্তন।

পবিত্র ও একান্ত মনে বিচার ও ধ্যান করিয়া এই খোলসটাকে চিনিতে হইবে, ইহা যে অনাত্মা—'আমি' হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বুঝিতে হইবে। তখনই আবরণ-মুক্ত 'আমি' নিজের স্বরূপের সন্ধান পাইবে।

বেদান্ত শাস্ত্র এই খোলসটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই খোলস একটি নয়—পাঁচটি। ঠিক যেন পেঁয়াজের খোসার মত একটি খোলসের

, আর একটি। একটি একটি করিয়া এই লসের পরিচয় করিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি খোলসের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উপসংহার করা হইবে।

খোলসের শাস্ত্রীয় নাম 'কোষ'। প্রথম খোলসটির নাম অন্নময় কোষ। রক্তমাংসের এই স্থূল শরীরটিকেই অন্নময় কোষ বলা হইয়াছে। একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে এই শরীরের 'অন্নময়' নামটি সার্থক। আমরা যাহা খাই তাহাই অন্ন,—ইহাই অন্ন শব্দের মূল অর্থ। এই অন্ন হইতে—অর্থাৎ আমাদের ভুক্ত দ্রব্য হইতেই এই শরীরের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি। আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ পরিপাক যন্ত্রের প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, রক্ত, স্নায়ু প্রভৃতি জৈব-পদার্থে পরিণত হয়। আমাদের উদর ও পাকস্থলী যেন একটি রসায়ন আগার। সেখানে ভুক্ত দ্রব্য পৌছিলেই উহার সারাংশ বাছিয়া লওয়া হয় এবং ঐ সারাংশের পরমাণুগুলি নূতন সমাবেশ গ্রহণ করিয়া অস্থি-মজ্জা প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। বস্তুতঃ মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক এই ভাবেই আমাদের ভুক্ত-দ্রব্য বা অন্ন হইতেই এই শরীরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই ইহার অন্নময় কোষ নাম সার্থক।

ঠিক এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে আমাদের প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য পৃথিবীর মাটি, জল ও বায়ুর রূপান্তর। পৃথিবীর জলমাটিবায়ু হইতে আমাদের খাদ্যের উৎপত্তি এবং খাদ্য হইতে আমাদের স্থূল দেহের উৎপত্তি। এই শরীরের প্রত্যেকটি পরমাণু এইভাবে পৃথিবী হইতে আসিয়াছে এবং মৃত্যুর পর প্রত্যেকটি পরমাণু পৃথিবীতেই মিশিয়া যাইবে।

দেখা গেল যে এই শরীরটি কতগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টি এবং পরমাণুগুলি সবই পৃথিবীর সম্পত্তি। শরীরটি ক্ষণিকের জন্য ঠিক বুদ্বুদের মতই পৃথিবী হইতে উঠিয়া পৃথিবীতেই লয় হইয়া যায়। যে পরমাণুর সমষ্টি লইয়া পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে, উহাদেরই এক অংশ জীব ও উদ্ভিদের রূপ ধারণ করিয়াছে অপর অংশ নির্জ্জীবরূপেই আছে। পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, উপত্যকা, অধিত্যকা, খনি প্রভৃতি যেমন পৃথিবীর অঙ্গ, জীব ও উদ্ভিদের শরীরও ঠিক তাহাই। সজীব ও নির্জ্জীব দুই শ্রেণীর স্থূল পদার্থই একই উপাদানে গড়া—পৃথিবীর সত্তারই দুইভাবে বিকাশ। ভাঙ্গা-গড়া এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনের ধারা উভয় শ্রেণীতেই আছে।

একই উপাদানে গড়া জীবের শরীর ও নির্জ্জীব পদার্থ, এই দুই জাতীয় পৃথিবীর অঙ্গের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহা শক্তির তারতম্যেই ঘটে। আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি জড় শক্তির প্রভাবে নির্জ্জীব পদার্থের গতি, পরিণতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, আর জীব-শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, অনুরূপ সৃষ্টি, মৃত্যু প্রভৃতি নির্ভর করে প্রাণ শক্তির উপরে। এই প্রাণ শক্তিই ভুক্ত পদার্থকে দেহ পদার্থে পরিণত করে এবং দেহ-যন্ত্রটিকে চালিত করে। ইহা আত্মার দ্বিতীয় আবরণ, ইহারই শাস্ত্রীয় নাম প্রাণময় কোষ। এই প্রাণ আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতির মতই জড় শক্তি, শুধু জড়-পরমাণুগুলির উপর ইহার প্রভাবের ধারাটা কিছু স্বতন্ত্র। যতক্ষণ এই প্রাণশক্তি শরীরের মধ্যে থাকে, ততক্ষণই শরীরের জড় উপাদানগুলির গতি-ভঙ্গি পৃথিবীর অপর নির্জ্জীব পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। এই শক্তি অন্তর্হিত হইলেই আমাদের শরীর পৃথিবীর নির্জ্জীব পদার্থের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়।

পৃথিবী হইতে কতগুলি পরমাণু লইয়া প্রাণ নামক শক্তি এই দেহটি রচনা করিয়াছে এবং ইহাকে সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ এই শরীরের উপাদানও যেমন জড় ইহার চালক প্রাণশক্তিও তেমনই জড়। ইহার সঙ্গে চেতন

'আমি'র কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের মধ্যে এই শরীরটি যেন একটি তরঙ্গ। আর আমি প্রকৃতিরও ঊর্দ্ধে থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতির দ্রষ্টা বা সাক্ষী হইয়া আছি। শরীরের যাবতীয় কর্ম্মই প্রকৃতির অন্তর্গত ঘটনা, অজ্ঞান-বিমূঢ় হইয়াই শুধু উহার কর্তৃত্বের দাবি আমরা করি।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অথচ এই শরীর লইয়াই আমাদের বংশ, জাতি, নাম, রূপ, যৌবন, সামর্থ্য প্রভৃতি জনিত যা কিছু অভিমান। ইহাকে লইয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব। আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ, সংসারের যাবতীয় ঘাত প্রতিঘাত এই শরীরকে 'আমি' বলিয়া জানার ফলেই নিয়ত ঘটিতে। এমন কি স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধিও এই শরীরে আ[ত্ম]জ্ঞান থাকার ফলেই হয়। বস্তুতঃ এই দেহ[ে] ভ্রান্ত 'আমি' বুদ্ধিই মুক্তিপথের প্রবল অন্তরায়। পৃথিবীর উপাদানে গড়া প্রাণ চালিত এই শরীর চেতন আমি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ,—এ[ই] বাস্তবতাটুকু একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মানুষ অনেক বন্ধনের পাশ হইতে নিষ্কৃতি পাই[য়া] মুক্তির পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত অন্ততঃ অন্নময় ও প্রাণময় কোষের যথাযথ বিচার করিয়া নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকটা খাঁটি ধারণা করার প্রয়াস সকলের পক্ষেই বিশেষ শুভ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুশীলন বলিয়া মনে হয়।

তরণী

(গান)

দিলীপকুমার

তোমারি তারকা তরণী বাহিয়া
অকূলে তুফানে চলিব গাহিয়া।
রজনী নামিলে জপিয়া অরুণা
বিরহে সাধিব মিলন-করুণা।
আঁধার পিয়াসে ঘনালে বেদনা
তোমারি ধেয়ানে জলিবে চেতনা।
সেদিনে মুরলী উঠিবে বাজিয়া:
ঈশ্বর শ্যামলী হাসিবে সাজিয়া।

নীলিমা-কিরণে মরিবে তমসা
বিধুরে অঝোরে ঝরিবে বরষা।
কাননে কাননে নিঝর-ঝলকে
দুলিবে অলকা কুসুম-অলকে।
ললিতা লাবনী নূপুরে নূপুরে
রণিবে সমীপে, রণিবে সুদূরে।
সেদিনে শরণ সাগরে নাহিয়া
চলিব বরণ-তরণী বাহিয়া।

বোধগয়া ও সারনাথ

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

বোধহয় ইংরেজি ১৯৩৬ সনের আগষ্ট মাসের একটী প্রখরদীপ্ত দিনের পড়ন্ত বেলায় গয়া হতে বের হলাম একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে ছয় মাইল যেখানে জগৎ বিখ্যাত উরুবিল্ব গ্রাম বা বর্ত্তমান বোধগয়া দেখতে। গাড়ী চলেছে উঁচু নীচু পথের উপর দিয়ে, তুইদিকে তার বনানীর সবুজ শোভা। অদূরে গয়া সহরের বাড়ীঘর ছেড়ে উঁচু

বোধগয়ার মন্দির

হয়ে উঠেছে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের চূড়া। আমরা চলেছি, বিহারী গাড়োয়ান তার রুগ্ন অশ্বযুগলের পিঠে মাঝে মাঝে সুমিষ্ট যষ্টিসঞ্চালনে ব্যস্ত। আরো এগিয়ে যেতে দেখলাম, ধারেই নিরঞ্জনানদী বর্ত্তমান ক্ষীণস্রোতা ফল্গুগঙ্গা- মাঝে মাঝে তার বালির চরা জেগে আছে বুকভরা জল নিয়ে। ওপারে হাজারীবাগের সীমান্ত রেখায় পাহাড় সারির শোভা, মাঝদিয়ে বয়ে চলেছে ফল্গুনদী। দূরে অদূরে বনানীর অন্তরাল ভেদ করে পাখীর গানও ভেসে আসছে।

খানিকবাদে প্রায় দেড়ঘণ্টায় গিয়ে উপস্থিত হলাম বোধগয়ায়। গাড়ী হতে নেমে কাছেই মোহন্তের প্রশস্ত বাড়ী। একটু এগিয়েই চোখে পড়ল বুদ্ধগয়ার বিরাট মন্দির—তার গগনস্পর্শী উন্নত-শির গৌরবগর্ব্বে অতীতের এক উজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে জগতের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর হতেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে ভক্তিনত প্রাণে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে অবাক বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলাম। পাষাণমন্দির আজ আমাদের চোখের সামনে অতীতের সুমহান রহস্যময় এক পবিত্র স্মৃতি-পট খুলে দিলে। মন্দির মধ্যে ধ্যানগম্ভীর ভাবোদ্দীপ্ত বুদ্ধভগবানের প্রস্তরময় এক মনোহর মূর্ত্তি পূর্ব্বাস্যে স্থাপিত। ধারেই একটী প্রদীপ মিটি মিটি করে জলছে। ভিতরে গিয়ে মাথা নুটিয়ে প্রাণের পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম দেবতার পায়। উপর তলায় উঠেও দেখে এলাম বুদ্ধদেবের নানাভাবের সুশোভন মূর্ত্তি ও সুচারু কারুকার্য্যে উৎকীর্ণ মন্দিরগাত্র।

এখানে একজন হিন্দুসন্ন্যাসী মোহন্তের প্রতিনিধিরূপে আছেন। তিনিই দর্শকদের দর্শনীয় এখানকার যা কিছু বলে দেন। আমরা মন্দির হতে

বাইরে এসে চারদিক প্রদক্ষিণ করে চলেছি, ধারেই মন্দিরের পাশে মাটির উপর অনেকগুলো ছোট ছোট পাথরের স্তূপ দেখে মনে হল ঐগুলো বোধ হয় পরে স্থাপিত প্রাচীন ভিক্ষুদের পবিত্র সমাধি-স্মৃতি। আরো এগিয়ে যেতেই দেখলাম, মন্দিরের পেছনে পুণ্য পবিত্র গৌরবদৃপ্ত জগৎপূজ্য সেই বোধিবৃক্ষ অমর হয়ে আজো সবুজ শাখায় মাটির বুকে দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন অতীত ভারতের সাধনার মহিমোজ্জ্বল এক অধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ হয়ে আছে। দেখেই আকুতিভরা প্রাণে লুটিয়ে পড়লাম ঐ বোধিবৃক্ষমূলে। তার চারদিকের

বোধিদ্রুম

বাঁধান বেদীতলে বসে ভাবতে লাগলাম—এই সেই নিরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্ব গ্রাম—আর এই সেই বোধিদ্রুম, এরই মূলে—যেখানে আমরা বসে আছি, একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিশ্বমানবকে রোগ-শোক-মৃত্যুর যাতনা হতে প্রকৃত শান্তির পথ নির্দ্দেশ করবার জন্য রাজ ঐশ্বর্য্য সব ত্যাগ করে —সত্যের গূঢ় রহস্য নিজ জীবনে উপলব্ধি করতেই অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন অতি কঠোর ও কঠিন তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। সে কি তপস্যা। বৈরাগ্যের তীব্র অনলে প্রাণের সকল বাসনা হয়ে গেল, দেহবোধ লুপ্ত প্রায়, অস্থিচর্ম্মসার দেহে একমাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা—সত্য উপলব্ধি আর কিছুই নয়। কতরূপ কত ভাবের ভয় ভ্রান্তি বাধা বিঘ্ন প্রলোভনই না এল তার সাধনার পথে—কুমার কিন্তু নির্ভীক নিশ্চল, এবার আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির হয়ে বসলেন—ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল,—

> "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
> ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
> অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভম্
> নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

মৃত্যুপণ করে এভাবে তিনি সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে সাধনায় ডুবে গেলেন, যোগিশ্রেষ্ঠ কুমার সন্ন্যাসীর দেহ মন বুদ্ধি যেন কোথায় লয় হয়ে গেল, রহস্যের পর কতই না রহস্য তার প্রাণের ভিতর উদ্ঘাটিত হতে লাগল।

বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ সেদিন আকাশ হতে তার স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোৎস্নার ঝরণা ধারায় শান্তির বিমল পরশ বুলিয়ে দিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করে দিচ্ছিল, বিশ্বের বুকে যেন আলোর প্লাবন বয়ে যাচ্ছে—বোধিবৃক্ষের শাখা বেয়ে চাঁদের সুধাক্ষরিত হচ্ছে—জগৎ শান্ত অমৃতময়, মানুষ মুগ্ধ ও তৃপ্ত। চাঁদিনী রাত প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে—কুমারের মনে ধীরে ধীরে সত্যের অস্ফুট রশ্মিরেখা ফুটে উঠছে। স্নিগ্ধ রাতের গভীরতার সাথে সত্যিই সেদিন নির্ব্বাণ সত্যের প্রকৃত স্বরূপ কুমারের মনের ভিতর ভেসে উঠল। এতদিন পরে তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল—সম্বোধি লাভ করে তিনি বুদ্ধ হলেন, অপার আনন্দে তাঁর মন প্রাণ ভরে গেল।

এখান হতেই সত্যের গভীর রহস্য জ্ঞাত হয়ে বোধিসত্ত্ব মানবকল্যাণে ব্যাকুল হয়ে ছুটে চললেন—সে অমৃতবার্ত্তা বিশ্বমানবকে শোনাতে এবং মায়াময় দুঃখপূর্ণ জগতে প্রকৃত শান্তির পথের সন্ধান দিতে।

অনেকদিন পরে ধনবান বুদ্ধাশ্রয়ী ভক্তগণ সর্বার্থের সিদ্ধিলাভের স্মৃতিময় স্থানটীকে জগতের কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যই বোধগয়ায় এ বিরাট মন্দির তৈরী করেন।

খানিকক্ষণ কেমন যেন আনমনা ভাবে ঐ বৃক্ষতলেই কেটে গেল, মনের সামনে ভেসে উঠল, রাজকুমার বুদ্ধের কঠোর ত্যাগ তপস্যাপূর্ণ জগতের কল্যাণব্রতী করুণার মহিমময় মূর্ত্তিটী। পরে ভাবাচ্ছন্ন মনে এই বৃক্ষমূলে মাথা নত করে প্রার্থনা করলাম, 'হে দেবতা, হে সর্ব্বত্যাগী, তোমার সুমহান তপস্যাপূত বেদীমূলে আজ আমাদের প্রাণেও তোমার মহান ভাবের একটু আভাস জাগিয়ে দাও। হে করুণাময়, নির্ব্বাণ শান্তির শান্ত আলো বিস্তার করো আমাদের প্রাণের ভিতর, জীবন ধন্য ও পবিত্র করি।'

একটু বাদে ধীরে ধীরে বেদীতল হতে নেমে এলাম। অপরধারে মন্দির সোপানে কয়জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভক্ত ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। আমরা মন্দিরের সব দিকটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। সত্যি এস্থানে যেন একটা পবিত্র শান্ত ও শান্তির ভাব ছেয়ে আছে। সবারই মন এখানে এসে তাঁর ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়। প্রতি বৎসরই দেশ বিদেশ হতে অগণিত ভক্ত ও দর্শক আসে এ তীর্থে পবিত্র হতে।

এবার বাইরে গিয়ে অদূরে বৌদ্ধধর্ম্মশালায় দেখলাম, সিংহল ব্রহ্ম শ্যাম নানা দেশীয় অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছেন এ মহান তীর্থে—দর্শনে স্পর্শনে ধন্য হতে। এ বিরাট ধর্ম্মশালাটীও বিদেশী বৌদ্ধ ভক্তদের অর্থে তৈরী। ওখান হতে গিয়ে পথের ধারে মন্দিরের কাছেই একটী ঘরে কতকগুলো পাথরের মূর্ত্তি ও পুরনো দিনের নানাবিধ জিনিষ যাদুঘরের মত সাজান রয়েছে দেখলাম।

পরে বোধগয়ার মোহন্তের বাড়ী গেলাম। তিনি, দশনামী হিন্দুসন্ন্যাসী, প্রবেশ দ্বারেই মোহন্তের প্রতিনিধি একজন সন্ন্যাসী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, ভিতরে গিয়ে মোহন্তের বিরাট প্রাঙ্গণে তাঁর দ্বিতল সুন্দর বাড়ীটীর উপর গিয়ে মোহন্তকে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলে সম্ভাষণ জানালাম, তিনিও প্রতিসম্ভাষণ জানিয়ে আদর আপ্যায়ন করলেন। আমরা বসে দু চারটী কথা বলে ও শুনে বিদায় হলাম, মনে হল বিশাল বিভবের অধিকারী এ হিন্দুসন্ন্যাসী।

বুদ্ধভগবান্ হিন্দুদেরও এক অবতার, তাই হিন্দু সন্ন্যাসী বোধগয়ার মোহন্ত হয়ে পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথেই নিয়মিত সেবসেবা করছেন।

বেলা পড়ে এল, গ্রীষ্মের ক্লান্ত রবি বোধিবৃক্ষের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে দিতে পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছেন, তাঁর শেষ রশ্মিরেখার লালিমাটুকু যেন অনিচ্ছা সত্বে বিদায় চুম্বন জানিয়ে জগতের কাছ থেকে আজ সরে পড়ছে। আবার চেয়ে দেখলাম, মন্দির ও বোধিবৃক্ষের পানে—সত্যিই ঐ স্মৃতিমন্দির ধরার বুকে প্রকৃত সত্যের প্রভায় স্মৃতিময় হয়ে আছে। আর বোধিবৃক্ষের পত্র-মর্ম্মর ধ্বনি যেন বাতাসের সাথে কেঁপে কেঁপে আজও সেদিনের নিগূঢ় বাণী বুদ্ধ ভগবানের সাধনা ও সিদ্ধির অমৃত বার্ত্তা বিশ্ববাসীকে শোনাতে চায়। এবার ভক্তিনত প্রাণে দূর হতেই প্রণাম করে সন্ধ্যার অন্ধকারের বক্ষভেদ করে নিরঞ্জনার ধার দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম গয়াধামে।

সারনাথ

কাশীর কাছেই সাত মাইল দূরে বিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থ সারনাথ। এ স্থানের নাম ছিল ঈষিপতন (ঋষিপত্তন) অথবা মৃগদাব। তবে বুদ্ধের সারঙ্গনাথ নাম হইতেই বোধ হয় এ স্থানের নাম সারনাথ হয়েছে।

এ স্থানটী বৌদ্ধযুগের এক সুমহান পুণ্যপবিত্র উজ্জ্বল স্মৃতি ও কৃতিস্তম্ভ বক্ষে নিয়ে জগতের

সামনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। একদিন খুবই আগ্রহ নিয়ে কাশী হতে একায় চললাম বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ দেখতে। পথের ধূলি উড়িয়ে একা আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। সহরের বাহিরে উভয় পার্শ্বের বড় বড় গাছের ছায়ায় পথটীকে শান্তশীতল করে রেখেছে। বেশ আরামে ও আনন্দেই এগিয়ে চলেছি। কাশী ষ্টেশন হতে বি, এন, ডব্লিউ, আর এর ট্রেনও সারনাথে আসে যায়, একটী ষ্টেশনও আছে। আমরা কয়েক ঘণ্টা পর সারনাথের কাছেই রাস্তার ধারে প্রথমেই দেখলাম একটী ভগ্ন বিরাট স্তূপ, এর নাম চৌখণ্ডী স্তূপ। ভগবান্ বুদ্ধদেব উরুবিল্ব হতে বুদ্ধত্বলাভ করে এখানেই তাঁর পঞ্চ শিষ্যের দেখা পান এবং তাঁদের নিকটেই সর্ব্বপ্রথম তাঁর জীবনের সাধনলব্ধ সত্য প্রচার করেন। এ স্তূপটী তাঁরই স্মৃতি।

স্তূপটী বেশ উঁচু, একধার দিয়ে উপরে উঠে দেখে এলাম। মনে হল এখানেই ত মানবকল্যাণ করুণার অবতার বুদ্ধ ভগবান্ প্রথমেই বিশ্ববাসীকে নির্ব্বাণ মুক্তির মন্ত্র শুনিয়েছিলেন, এখান হ'তেই তাঁর একান্ত অনুগত শিষ্যগণ মানবকল্যাণে কত না কষ্ট সয়ে মৈত্রী ও করুণার বাণী দিকে দিকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বুদ্ধপদরজে পূতপবিত্র এ স্থান, নত হয়ে প্রণাম করলাম।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সরকার রক্ষিত যাদুঘরে উপস্থিত হলাম। একটী প্রশস্ত সুন্দর পাকা বাড়ীতে এখানকার প্রাপ্ত পুরানো বিখ্যাত কীর্ত্তি জড়িত সেদিনের প্রামাণ্য স্মৃতিগুলো যেন বৌদ্ধ ইতিহাসের একটী পুরাতন ছিন্ন পৃষ্ঠার ন্যায় অতি যত্নে সাক্ষ্য স্বরূপ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যাদুঘরের সামনের প্রাঙ্গণের শোভা বড়ই সুন্দর, সুসজ্জিত লতাবীথিকার মাঝে সবুজ ঘাসের দুটী ছোট মাঠ। দেখলে মনে হয় যেন দুখানা সবুজ কোমল গালিচা পাতা রয়েছে। মাঝ দিয়ে সরু পথটী যাদুঘরে এসে মিশেছে। দারোয়ানের কাছ থেকে দুআনা মূল্য দিয়ে একখানা টিকেট নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। যাদুঘরের এদিক হতে ওদিক পর্য্যন্ত সবটা ঘুরে ঘুরে বিশেষ আগ্রহে এখানকার সযত্নে রক্ষিত অতীত ভারতের প্রস্তর-উৎকীর্ণ কত যে দেবদেবী মূর্ত্তি মানুষ, গাছ, লতা, পাতা, স্তম্ভ, জানোয়ার এবং ভগবান্ তথাগতের কতভাবে সুন্দর সুশোভন মূর্ত্তি রয়েছে, তাতেই যাদুঘরটী পূর্ণ হয়ে আছে। নীরস পাষাণের বুকে যে এত সরসতা তা দেখে সবাইকে মুগ্ধ হতে হয়।

অশোক স্তম্ভের সিংহশির

এখানে সবচেয়ে দেখবার বস্তু বিখ্যাত অশোক স্তম্ভের উজ্জ্বল "সিংহশির"। বিরাট স্তম্ভের উপরে চারধারে চারটী তেজোদীপ্ত সিংহমূর্ত্তি। তার উপরেই ছিল ধর্ম্মচক্র, সেটীও ভগ্ন অবস্থায় এখানেই আছে। সিংহমূর্ত্তির নীচে কয়েকটী জন্তু জানোয়ারের মূর্ত্তি আঁকা রয়েছে। সত্যি, এ স্তম্ভ শীর্ষটি অতীত ভারতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এর উজ্জ্বল মসৃণতা বর্ত্তমান জগতের বিখ্যাত শিল্পীদের কাছেও এক বিস্ময়ের ব্যাপার, হয়ে

আছে। দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র এর নির্ম্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। তার পরই বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের মূর্ত্তিটী। ধীর শান্ত ও গম্ভীরভাবে পঞ্চ শিষ্যের নিকট ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করছেন।

বুদ্ধদেব,

শিল্পী এ মূর্ত্তিটিকে এমন ভাবে তৈরী করেছেন যেন জীবন্ত, দেখলেই বুদ্ধের সে ভাবটী মনে পড়ে।

অপর একটী মূর্ত্তি বোধিবৃক্ষমূলে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় তথাগত গভীর তপস্যায় মগ্ন, নানা বাধাবিঘ্ন প্রলোভন অতিক্রম করে তাঁর মন সত্য উপলব্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধদেবের এ ভাবটী এমন সুন্দর ভাবে শিল্পী পাথরের মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলেছে যেন সত্যি প্রাণপ্রদ বলে মনে হয়। আর একটী বোধিসত্ত্বের সুশোভন মূর্ত্তি মথুরার লাল পাথরে তৈরী, তার উপরে একটী ছত্রও আচ্ছাদন রূপে আছে। মথুরায় এক ভিক্ষু এ মূর্ত্তিখানা ওখানকার শিল্পীদের দিয়ে তৈরী করিয়ে সারনাথে ভগবান্ বুদ্ধদেব যেখানে হেটে বেড়াতেন সেখানে স্থাপন করেন। এ মূর্ত্তির নীচের শিলালিপি হতে সব জানা যায়, রাজা কণিষ্কের সময় এ মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হয়। এটীও দেখতে বড় সুন্দর, এ ছাড়া আরও সব বিভিন্ন ভাবের কত যে শান্ত সমাহিত সুন্দর ছোট বড় বুদ্ধবিগ্রহ আছে, সব মূর্ত্তিই যেন বিশ্বমানবকে শান্তি ও আনন্দের বাণী শোনাচ্ছেন।

কয়টী প্রস্তর ফলকে দেখলাম বুদ্ধ জীবনের প্রধান ঘটনাগুলোকে অতি নিপুণভাবে সুদক্ষ শিল্পী পরিস্ফুট করে তুলেছে। এ ব্যতীত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের নিত্য ব্যবহার্য্য ছোট খাট অনেক জিনিষ—আবার শিলমোহর, শিলালিপি অনেক কিছু বৌদ্ধ যুগের উন্নত সভ্যতার নিদর্শন এখানে আছে।

অপর একটী বিরাট শিবমূর্ত্তি দেখেছিলাম, এক অসুরকে সংহারে উদ্যত, এ মূর্ত্তি তৈরী অসম্পূর্ণ। কাশীতে প্রাপ্ত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের একটী সুন্দর মূর্ত্তিও এখানে আছে। এ ছাড়া, তারা, মঞ্জুশ্রী, বসুধারা, মারীচ প্রভৃতি কতকগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর পাথরের মূর্ত্তিও এখানে রয়েছে। এখানকার যা কিছু মূর্ত্তি বা জিনিষ সবই প্রায় সারনাথে প্রাপ্ত। সত্যি সে যুগে ভারতে ভাস্কর্য্য-শিল্পের একটা উজ্জ্বল যুগান্তর এসেছিল। তার প্রভাব পরেও বৌদ্ধ তীর্থের নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

যাদুঘর হতে সব দেখে অপর দুয়ারে বাইরে এসে অদূরেই যেখান হতে এসব বৌদ্ধকীর্ত্তি মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে, সেই স্মৃতিময় স্থানটী দেখতে এগিয়ে গেলাম। অনেকটা যায়গা জুড়ে এ সারনাথ, বুদ্ধপদ স্পর্শে পবিত্র এ স্মরণীয় তীর্থের সব দিকটাই ছড়িয়ে আছে, সে যুগের ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন কীর্ত্তি—কত যে স্তম্ভ-স্তূপ-চৈত্য-বিহার-মূর্ত্তি, মনে হয় কতকটা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েই দেখলাম এখানকার বিখ্যাত অশোক স্তম্ভটীর ভগ্ন কয়েক খণ্ড পড়ে আছে। এর বিরাট আকার ও উজ্জ্বল মসৃণতা সবাইকেই আকর্ষণ করে। এ স্তম্ভের সিংহচূড়াটাই যাদুঘরে রয়েছে। স্তম্ভ গায়ের শিলালিপিতেই, মহারাজ অশোককে সঙ্ঘপতি রূপে দেখা যায়। তার অনুশাসন লিপিতে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে সাবধান ও শাসন বাক্যে বলছেন, "কেহ সঙ্ঘ মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলে তাকে শাস্তি-স্বরূপ শ্বেত বস্ত্র পরে সঙ্ঘ ত্যাগ করতে হবে।" এই আদেশ ভিক্ষুসঙ্ঘে এবং সমস্ত দেশে প্রচার হবে, এবং ভিক্ষু ও গৃহিগণ এ আদেশের মর্ম্ম সর্ব্বদা স্মরণ করবেন। প্রধান মন্দিরের কাছেই এ স্তম্ভের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এর ধারেই ছিল অশোকের "ধর্ম্মরাজিক স্তূপ"। আশে পাশে আরও অনেক স্তূপ চৈত্য বিহার

সারনাথ

স্থাপিত হয়েছিল, কনৌজের রাণী কুমারদেবী সেই "ধর্ম্মচক্র জীন বিহার" তৈরী করিয়েছিলেন, আজ তার ইটের তৈরী সুড়ঙ্গ পথটীর সন্ধান পাওয়া গেছে। অপর একটা বিরাট ভগ্ন স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে সে দিনের সাক্ষীর মত, এর নাম "ধামেক স্তূপ", নীচের দিকটা পাথরে গাঁথা, উপরের ভাগ ইটের তৈরী, এর গায়ে অনেক সুশোভন লতা পাতা ফুল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল, আজও তাহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই, উচুও একশত ফুটের উপর প্রস্থও কম নয়। এ স্তূপটী আজও দর্শকের প্রাণে সে যুগের ধর্ম্ম সঞ্চার করে। কাছেই একটী পুরানো জৈনমন্দির রয়েছে। সারনাথ জৈনদেরও তীর্থ স্থান।

আজ যতই ঘুরে দেখছি সে দিনের কথা মনের সামনে ছবির মত ভেসে উঠছে। এখানকার অনেক কীর্ত্তি এখনও মাটির বুকে লুকিয়ে আছে। আর এখানকার অনেক মূল্যবান পাথর শিলালিপি ও স্তম্ভ অজানিত ভাবে অপসারিত হয়েছে। কাশীর কুইন্স কলেজের সৌধমূলে—বরুণা নদীর পুলের গোড়ায়ও এখানকার অনেক কীর্ত্তিময় পাথর গাড়ী গাড়ী ঢালা হয়েছে। যে দিন এর প্রকৃত সন্ধান আরম্ভ হল, সেদিন হতে যতটুকু যত্ন ও সাবধান হয়ে যা কিছু পাওয়া গেছে, তাতেই আজ ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৌদ্ধভক্তগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত। আজ এই স্মরণীয় পবিত্র তীর্থে দাঁড়িয়ে মনে হয়, বৌদ্ধ যুগের ভারতীয় সাধনার ভাবধারা শিক্ষা সভ্যতায় সবদিকেই যে উন্নতির চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিল, সে উন্নত অধ্যায় আজ বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব ঘোষণা করছে।

শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মানবকল্যাণ বুদ্ধ-দেবের মৈত্রী ও করুণার বাণী দিগ্‌দেশে প্রচার করছিলেন, বিশ্ববাসী সেদিন অবাক হয়ে শুনলে সে শান্তি ও মুক্তির বার্ত্তা, দেশ বিদেশ হতে অগণিত নরনারী রাজা মহারাজা আকুল আগ্রহে ছুটে এলেন দয়াল দেবতার সকাশে। তাঁর করুণার আশ্রয়ে সব ধন্য ও পবিত্র হতে লাগল। ভারতের জাতীয় জীবনে সেদিন সুরু হয়েছিল এক নূতন অধ্যায়। বুদ্ধ-করুণায় কত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভক্ত ভগবান্ বুদ্ধকে স্মরণ ও বরণ করে কতই যে কীর্ত্তি স্থাপন

করেছিলেন, এখানে তার কিছুমাত্র নমুনা দেখে, আমরা অবাক হচ্ছি! ভক্তদের ধর্ম্ম ও ভক্তি নিদর্শন স্বরূপই এসব স্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার শিলালিপি ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছিল।

সে জাগ্রত বৌদ্ধ ভারতের ভক্ত নরনারীই একদিন ভক্তি উচ্ছ্বসিত সমবেত কণ্ঠে, বিশ্ব জগতকে মুখরিত করে প্রাণের পরম শ্রদ্ধায় গেরে উঠেছিল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। আজও তাদের সেই কণ্ঠস্বর যেন আকাশের গায়ে বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ায়। এখানে এলেই যেন মানুষের প্রাণে সে ধ্বনি আজো আবার ঝঙ্কার তোলে। আর মনের সামনে অলক্ষ্যে দেখা দেয়—মহাপতি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোক আর সেই মুণ্ডিত মস্তক কাষায় বস্ত্র পরিহিত শত শত বৌদ্ধ অর্হৎ ভিক্ষুগণ। তাঁদের প্রাণের পবিত্র ভাবেই যেন এ স্থানকে আরও ভাবময় করে রেখেছে। সর্ব্বোপরি ভগবান্ তাঁর পাঁচজন শিষ্যকে প্রথমেই যে এখানে ধর্ম্মের মহান্ তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন সেদৃশ্যটী যেন সর্ব্বদা জেগে রয়েছে। এ পুণ্যতীর্থের সবই তাঁর স্মৃতিতে স্মৃতিময়। যেখানে বুদ্ধের পদরজকণা প্রতি ধূলি কণায় মিশে আছে, এই সেই সারনাথ। প্রতি বৎসর দেশ বিদেশ হতে অগণিত ভক্ত দর্শক আসেন ধন্য হতে এ পুণ্যপীঠে।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে এখানে এসেছিলেন। তিনি সে সময় মৃগদাবে বা বর্ত্তমান সারনাথে চারটী বড় স্তূপ ও ভিক্ষুপূর্ণ কয়টী বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ এখানে এসে অনেক অট্টালিকা, অশোকস্তম্ভ, স্তূপ ও একটী বড় মন্দিরে ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় বুদ্ধদেবের একটী সুশ্রী মূর্ত্তি দেখেছিলেন। এবং অনেকগুলো বিহারে প্রায় দেড় হাজার ভিক্ষু, এছাড়া কতকগুলো হিন্দু মন্দিরও কাছেই দেখেছিলেন।

আমরা আজ এ বৌদ্ধ স্মৃতি তীর্থ দর্শনে ধন্য ও পবিত্র হলাম। এ বিস্তৃত ধ্বংসপ্রায় বিস্মৃত প্রায় স্থানে বর্ত্তমানে একধারে সিংহলী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ধম্মপাল অনেক চেষ্টায় একটী নূতন বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন করেছেন। তার রূপ বৌধগয়ার মন্দিরের মত এবং উঁচুও বেশ, সারনাথে বুদ্ধের "বাস বিহারের" নাম অনুকরণেই এর নামও "মূলগন্ধকুটী বিহার" রাখা হয়েছে। ধর্ম্মপালের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধধর্ম্মকে আবার নূতন করে প্রচারশীল করবার জন্য এখানে মন্দির বিহার বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তিনি বর্ত্তমানে দেহত্যাগ করেছেন। হয়ত তাঁর এই মহৎ ইচ্ছা ভবিষ্যতে কার্য্যে পরিণত হবে।

কয়টী বৌদ্ধ ধর্ম্মশালায় কয়েকজন বর্ম্মা সিংহলী ভিক্ষু এখানে আছেন। কাছেই নিবিড় বনে ফাঁকে ফাঁকে দু একটী হরিণশিশুর স্বাধীন বিচরণ দেখে আমাদের প্রাণে খুবই আনন্দ হল। দিনের শেষে পাখীরা তাদের আনন্দ কূজনে গোধূলী আকাশকে আলোড়ন করে নিজ নিজ আবাসে ফিরছে। ধীরে ধীরে দিনমণি তার শেষ রশ্মিরেখায় গাছের মাথায় সোনা ছড়িয়ে দিলে। ক্রমে দিগন্ত বিস্তৃত সারনাথের নিবিড় বনানীর ভিতর সূর্য্যদেব লুকিয়ে পড়লেন,—তাঁর বিদায় শেষে লালিমার হাওয়া পশ্চিম আকাশকে পিছনে রেখে আমরাও এই দিবানিশির মধুমিলনের সন্ধিক্ষণে—পুণ্য পবিত্র এই স্মৃতিতীর্থ হতে অতীতের বিস্মৃত স্মৃতি প্রাণে জাগিয়ে ভাবাচ্ছন্ন মনে ফিরে এলাম বারাণসীধামে। তখন সহরের পথে পথে আলো-স্তম্ভগুলো বিদ্যুৎ আলো ছড়িয়ে যেন উজ্জ্বল চোখে চাইছে।

রাম ও তাঁহার চরিত

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

উত্তর ভারতে যেখানে যেখানে হিন্দীভাষার চলন আছে সেখানেই তুলসীরত রামায়ণের অর্থাৎ রাম-চরিত মানসের রাজত্ব। বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্চনদ, রাজস্থান, গুজরাট, সর্ব্বত্র ইহার প্রসার। ঘরে-ঘরে জনে জনে এই রাম চরিত মানস ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব দান করিয়াছে।

এই ভারত ভূমিতে সাধনা নানাপথ ধরিয়া চলিয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, বেদান্তের জ্ঞান-ধ্যান, ভাগবতদের প্রেম-ভক্তি সবই পরম পুরুষার্থেরই অন্বেষণে তৎপর। বুদ্ধদেব নিজে জ্ঞান ও চরিত্রের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ বুদ্ধকেই সার করিয়া ধরিলেন। বুদ্ধ অর্থ আদর্শ মানব। মানবের মধ্যেই জ্ঞান কর্ম্ম প্রেমের চরম সামঞ্জস্য। পুরুষোত্তম অর্থাৎ মানব আদর্শই বহুদিন ধরিয়া ভারতের সাধনাকে চালিত করিয়া চলিল।

ক্রমে ভারতের সাধনার জগতে বুদ্ধের স্থান দখল করিলেন রাম ও কৃষ্ণ। রামের মধ্যে দেখি চরিত্র ও কর্ম্মের প্রাধান্য, কৃষ্ণের মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের প্রাধান্য। রামে যে প্রেম নাই অথবা কৃষ্ণে যে কর্ম্ম নাই তাহা নহে—তবে বিশেষত্ব ধরিতে হইলে এই ভাবেই ভাগ করিতে হয়। কৃষ্ণপন্থের প্রেম ভক্তি প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সাধকের উপযোগী। রামপন্থের চরিত্র ও ধর্ম্ম হইল সামাজিক মানুষের চমৎকার আশ্রয়।

ভারতের সাধনা মধ্যযুগে যখন এইরূপ গঙ্গা যমুনার মত দুই ধারায় চলিয়াছিল, তখন উভয় ধারাকে যুক্ত করিলেন মহাপুরুষ তুলসীদাস তাঁহার সৃষ্ট রামচরিতে। পূর্ব্ব কবিদের চিত্রিত কৃষ্ণের প্রেম ভক্তি এবং রামের চরিত্র ও কর্ম্মকে যুক্ত করিয়া তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব যে রামচরিত্র চিত্রিত করিলেন তাহা ভারতের কোটি কোটি লোককে আজ পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।

অনেকে দুঃখ করেন গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে বাল্মীকির রামায়ণকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন নাই। তিনি বালকাণ্ডে বাল্মীকির নাম করিয়াছেন।

> বাল্মীকি নারদ ঘট জোনী।
> নিজ নিজ মুখনি কহী নিজ হোনী॥

কথিত আছে প্রথমে তিনি বাল্মীকির গ্রন্থ অনুসারেই রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার গীতাবলীতে। মধুকর যেইরূপ নানাপুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে সেইরূপ তিনি ভক্তির অনুকূল নানা শাস্ত্র হইতে তাঁহার রচনার মূল সংগ্রহ করেন। তিনি নিজেই বলিলেন—

> নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্
> রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি।
> স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-
> ভাষানিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি॥
>
> (বালকাণ্ড)

"নানা পুরাণ নিগম ও আগমের সম্মত, যাহা রামায়ণে বর্ণিত, ক্বচিৎ (ভক্তদের অনুভূত ও লোকসমাজপ্রচলিত) অন্য অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া তুলসী দাস নিজ অন্তরের আনন্দের জন্য রঘুনাথগাথাকে মনোহর ভাষাতে রচনা করিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"

ভারতের প্রতি প্রদেশের ভাষাতেই বহু

হু রামায়ণকথারচয়িতা জন্মিয়াছেন। কিন্তু হিন্দী-ভাষাতে তুলসীদাস এমন একখানি উৎকৃষ্ট রাম-চরিত লিখিলেন যে হিন্দীতে রামচরিত লেখক আর কোনো কবিই মাথা তুলিতে পারিলেন না। তুলসীর পূর্ব্বে ও পরে বহু বহু ভক্ত ও কবি রামভক্তির প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহাদের কথা আজ আমার আলোচ্য নহে। হিন্দী ভাষায় রামচরিতের কথায় অদ্বিতীয় তাঁহার আসন।

ভারতে ও বৃহত্তর ভারতে রামায়ণ কথা যে কত ভাবে প্রচলিত আছে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে রামকথা বর্ণিত। নানা পুরাণে রাম রচিত নানা ভাবে আখ্যাত। জৈনদের ও বৌদ্ধদের শাস্ত্রে রামায়ণের আরও বহুরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রামায়ণের বহুবিধ রূপ পাওয়া যায়। যবদ্বীপের মন্দিরে ও লোক মধ্যে যে রামায়ণ কথা আছে তাহা বরং আমাদের দেশের ভট্টিকাব্যের সঙ্গে মেলে। আমাদের দেশে ও সিংহল, তামিল, তেলেগু, কর্ণাট, বঙ্গ, মণিপুর, নেপাল প্রভৃতি প্রদেশে নানাগ্রন্থে ও লোকগীতের মধ্যে নানাভাবে রামায়ণ চলিয়া আসিতেছে। সেই সকলগুলি একত্র সংগ্রহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

তুলসীদাস অনেক স্থলেই অদ্ভুত রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রয়াগ হিন্দীমন্দির হইতে প্রকাশিত রামচরিতমানসে শ্রীযুত রামনরেশ ত্রিপাঠী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে তুলসী নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছেন।

(১) অধ্যাত্ম রামায়ণ (২) শ্রীমদ্‌ভাগবত (৩) প্রসন্ন রাঘব (৪) হনুমন্নাটক (৫) গীতা (৬) অগস্ত্য রামায়ণ (৭) অগ্নিবেশ রামায়ণ (৮) আনন্দ রামায়ণ (৯) উত্তররামচরিত (১০) কুমার সম্ভব (১১) গর্গ সংহিতা (১২) গালব সংহিতা (১৩) চম্পূ রামায়ণ (১৪) চাণক্য নীতি (১৫) জাবালি সংহিতা (১৬) জৈমিনি সংহিতা (১৭) জৈমিনি রামায়ণ (১৮) দেবী ভাগবত (১৯) ধনংজয় সংহিতা (২০) নবরত্ন (২১) নারদ রামায়ণ (২২) পঞ্চতন্ত্র (২৩) পদ্মপুরাণ (২৪) পরাশর সংহিতা (২৫) ভট্টিকাব্য (২৬) প্রস্তাব রত্নাকর (২৭) পুলস্ত্য রামায়ণ (২৮) পুলস্ত্য সংহিতা (২৯) বশিষ্ঠ রামায়ণ (৩০) ব্রহ্ম রামায়ণ (৩১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (৩২) বাল্মীকি রামায়ণ (৩৩) বিষ্ণুপুরাণ (৩৪) বৃহস্পতি সংহিতা (৩৫) বিশ্বামিত্র রামায়ণ (৩৬) বিভীষণ রামায়ণ (৩৭) বৃহৎ রামায়ণ (৩৮) ভরদ্বাজ রামায়ণ (৩৯) ভরদ্বাজ সংহিতা (৪০) ভরত রামায়ণ (৪১) ভর্তৃহরিশতক (৪২) ভুশুণ্ড রামায়ণ (৪৩) ভোজ প্রবন্ধ (৪৪) মনুস্মৃতি (৪৫) মহারামায়ণ (৪৬) মহাভারত (৪৭) মঙ্গল রামায়ণ (৪৮) মার্কণ্ডসংহিতা (৪৯) মাতৃকা বিলাস (৫০) যাজ্ঞবল্ক্য রামায়ণ (৫১) রঘুবংশ (৫২) রামনাম মাহাত্ম্য (৫৩) শিব রামায়ণ (৫৪) শ্বেতকেতু রামায়ণ (৫৫) সুভাষিত ত্রিশতী (৫৬) সুগ্রীব রামায়ণ (৫৭) সুতীক্ষ্ণ রামায়ণ (৫৮) হিতোপদেশ (৫৯) হনুমদ্‌ রামায়ণ (৬০) কপিল সংহিতা (৬১) পুরুষোত্তম সংহিতা।

ত্রিপাঠী-জী বলেন, এই ৬১ খানি গ্রন্থ ছাড়াও তুলসীদাস না কি তাঁহার রামরচিতমানস গ্রন্থে অগ্নিপুরাণ, অদ্ভুত রামায়ণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, আনন্দ বৃন্দাবন-চম্পূ, কথা সরিৎসাগর, কামন্দকীয় নীতিসার, কিরাতার্জ্জুনীয়, গীতগোবিন্দ, নলচম্পূ, নারদপঞ্চরত্ন (রাত্র ?) নৈষধ, পরাশরস্মৃতি, পুরুষ-সূক্ত, বরাহপুরাণ, বশিষ্ঠসংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বালরামায়ণ, বিদগ্ধমুখমণ্ডন, মৎস্যপুরাণ, মহা-নির্বাণতন্ত্র (ম ?), মহাবীর চরিত্র, মহিম্নস্তোত্র, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, রুদ্রযামল, বামনপুরাণ, শিবপুরাণ, শিশুপালবধ, স্কন্দপুরাণ, শ্রুতবোধ, হরিবংশ-

পুরাণ, হারীত স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু এই তালিকায় আমার একটু সংশয় হইতেছে এই জন্য যে ত্রিপাঠীজীর উদ্ধৃত বচন অনুসারে সংবৎ ১৬৩১ (১৫৭৫) খ্রীঃ অব্দে রামচরিত নামক গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়। তাহা দেখাইতে তিনি এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সংবৎ সোরহ সৈ ইকতীসা।
করৌ কথা হরিপদ ধরি সীসা॥
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা
অবধপুরী যহ চরিত প্রকাসা॥

"অর্থাৎ ষোলশত একত্রিশ সম্বত, চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে মঙ্গলবারে অযোধ্যাপুরীতে শ্রীহরির চরণ মস্তকে ধরিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।"

কাজেই দেখা যাইতেছে এই গ্রন্থ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ রচয়িতা কবিকর্ণপুর অর্থাৎ পরমানন্দ সেনের জন্ম ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার চৈতন্যচরিতামৃত ও ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যচন্দ্রোদয় রচিত। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও অলঙ্কার কৌস্তুভ ও ইহাঁরই রচনা।

রামচরিতমানস রচনা যখন চলিতেছে তখন হয়তো আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ সদ্য সদ্য রচিত হইয়া থাকিবে। কাজেই এই গ্রন্থের কথা কি তুলসীদাসের জানা সম্ভব? তবে বাঙ্গালী ভক্তদের সঙ্গে তুলসীদাসের পরিচয় যে ছিল তাহা বুঝিতে পারি। পূর্ববঙ্গ নিবাসী মধুসূদন সরস্বতীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। যদি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ তুলসীদাসের আদৃত হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে তখনকার দিনে বিভিন্ন প্রদেশের ভক্তদের মধ্যে কিরূপ প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা ছিল। এক প্রদেশের ভক্তের গ্রন্থ বাহির হইতে না হইতে তাহা দেশ দেশান্তরের ভক্তদের অনুপ্রাণিত করিত।

আসল কথা রামচরিতমানসের যে রাম, তাহা ভক্ত তুলসীদাসের আপন ভক্তিপূত অন্তরের সৃষ্টি। তাহার পোষকরূপে তিনি অবশ্য বহু গ্রন্থ ও শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ।

সাধারণতঃ দেখা যায় পুরাণপাঠক ও কথক মহাশয়েরা শাস্ত্র ও লোকসম্মত নানাস্থান হইতে রাম কথা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের মনঃপূত রাম চরিত্র গান করেন। কাজেই তুলসীদাস অদ্ভুত কিছুই করেন নাই। আসলে ইতিহাসের রাম কেমন ছিলেন তাহা কে-ই বা জানে আর কে-ই বা জানিতে চায়? যে রামের কথা ভক্ত কবিরা বলেন সে হইল তাঁহাদের আপন অন্তরের অনুভূত ও উপলব্ধ রাম।

কবিদের রাম যে ইতিহাসের রাম নহেন তাহা বুঝাইবার জন্যই ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে ক্রমে এই কথা প্রচলিত হইয়াছে যে রামের জন্মের পূর্বেই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। বাল্মীকিতে অবশ্য এইরূপ কোনো উপাখ্যান পাই না। তুলসীদাস কৃত রামচরিতমানসেও এইরূপ কোনো উপাখ্যান নাই। তবু এইরূপ উপাখ্যান ভারতের সকল প্রদেশেই আছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও আছে। বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ডের প্রথমেই দেখি নারদকে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সর্ব্ব গুণান্বিত আদর্শ মানব এখন কে সম্প্রতি এই কালে জন্মিয়াছেন, তাঁহার কথা জানিতে চাহি। এই বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল রহিয়াছে।"

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্॥

বালকাণ্ড, ১ ২,

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে॥

বালকাণ্ড, ১, ৫

বাল্মীকি বলিলেন—"ইক্ষাকু বংশীয় রামনামে পুরুষ সর্ব্বজনের মধ্যে বিখ্যাত।"

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ॥

বালকাণ্ড, ৮

এই কথা বলিয়া তিনি রামের আদি হইতে সকল গুণ বর্ণনা করিয়া আগাগোড়া রামচরিত কহিয়া গেলেন। তাহার সবগুলিতেই দেখা যায় ক্রিয়াপদগুলি অতীত কালের। সর্ব্বশেষে রাম রাবণকে বধ করিয়া সীতাসহ নন্দিগ্রামে আসিলেন ও জটা ত্যাগ করিলেন। রাম সীতাকে লইয়া পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন।

রামঃ সীতামনু প্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্ ॥

বালকাণ্ড, ১,৮৯

রামকথা বলিয়া নারদ স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। বাল্মীকি তমসা তীরে গিয়া ব্যাধশরাহত ক্রৌঞ্চ মিথুনের দুঃখে নূতন ছন্দঃ লাভ করিলেন। তখন ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন, "নারদের নিকট যে রামচরিত শুনিয়াছ তাহা তুমি তোমার এই ছন্দে বল।"

বৃত্তং কথয় ধীরস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্ ॥

বালকাণ্ড ২, ৩৩

"যাহা তুমি জান না তাহাও অতঃপরে তোমার কাছে বিদিত হইবে। এই কাব্যে তোমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না।"

তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥

বালকাণ্ড, ২, ৩৫

এই তত্ত্বটি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় অপূর্ব্বভাবে বর্ণন করিয়াছেন। আদি কবি বাল্মীকি যখন সদ্যোজাত স্বীয় কবিতার আনন্দরসামৃতে বিভোর, তখন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহার কাছে আদর্শ মানব রামের নাম কহিলেন। বাল্মীকি বলিলেন,

জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা
কহিলা বাল্মীকি, তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্য ভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে—
নারদ কহিলা হাসি, সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা' তা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে, পূর্ব্ব খণ্ডে, পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই আদি কবি বাল্মীকির মুখে শ্লোকরূপা সরস্বতী আবির্ভূত হইলে দেবদেব ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "তোমার মুখে নির্ম্মলা ব্রহ্মরূপিণী কবিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

ত্বন্মুখে নির্ম্মলা জাতা কবিতা ব্রহ্মরূপিণী।

১,১,২৫,৭৪

"অতএব ভবিষ্য কালে যে রামচরিত্র ঘটিবে তাহার বর্ণনায় মহাকাব্য তুমি রচনা কর, অন্য কবিরা তোমার সেই মহাকাব্যেরই অনুসরণ করিবেন।" ১,১,২৫,৭৪।

যে কথা জানেন না তাহা লিখিতে হয়তো বাল্মীকি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তাই ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি ত্রিকাল বৃত্তিজ্ঞ, সত্যবাদী, প্রতিষ্ঠিত। আমি (যে সৃষ্টিকর্ত্তা) ও তোমা হইতে পৃথগ্‌ভূত নহি, কবিই অপর সৃষ্টিকর্ত্তা। কবিই ব্রহ্মা, কবিই বিষ্ণু, কবিই স্বয়ং শিব, কবিই ধর্ম্মবক্তা, কারণ কবিই সর্ব্বরসের একমাত্র বেত্তা। কবির বর্ণন কখনই মিথ্যা হইতে পারে না কারণ কবিই পরম সৃষ্টিকর্ত্তা। সকলের উপরে (সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া) কবিরাই সত্যকে দেখিতে পান, অপরেরা তাহা পারে না।……হে মুনে, যে রামচরিত ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে তাহা তুমিই বর্ণন কর, তাহাই রামায়ণ নামে মহাকাব্য হইবে। তুমি যাহা যাহা বর্ণন করিবে বিষ্ণুও তাহা তাহাই কার্য্যতঃ করিবেন।"

ত্বঞ্চ ত্রিকালবৃত্তিজ্ঞঃ সত্যবাদী প্রতিষ্ঠিতঃ।
নাহং ত্বত্তঃ পৃথগ্‌ভূতঃ কবিরণ্যঃ প্রজাপতিঃ ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, ১, ১, ২৫, ৮০

কবির্ব্রহ্মা কবির্বিষ্ণুঃ কবিরেব স্বয়ং শিবঃ।
কবির্বৈ ধর্ম্মবক্তা চ কবিঃ সর্ব্বরসৈকবিৎ ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ১, ১, ২৫, ৮১

ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ।
সর্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যে ন চৈব হি ॥

ঐ, ১, ১, ২৫, ৮২

ত্বং তু রামচরিত্রাণি মুনি ভব্যানি বর্ণয়।
তৎ তু রামায়ণং নাম মহাকাব্যং ভবিষ্যতি।

ঐ, ১, ১, ২৫, ৮৪

বর্ণয়িষ্যসি যদ্ যৎ ত্বং তৎ তদ্ বিষ্ণুঃ করিষ্যতি ॥

ঐ, ১, ১ ২৫, ৮৫

বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দেখা যায় যে যখন বাল্মীকির তপস্যা পূর্ণ হইল তখন ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

সপ্তকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ।

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।)

বাল্মীকি নিজের অসামর্থ্য জানাইলে ব্রহ্মা কহিলেন,—

সরস্বতী রহিলেন তোমার জিহ্বাতে।
হইবে কবিতা রাশি তোমার মুখেতে॥
শ্লোকচ্ছন্দে পুরাণ রচিবে তুমি যাহা।
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা॥

(রামায়ণ, আদিকাণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

পূজারিণী

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

রুদ্রের বেশে যদি এস প্রিয়
আমার ভবন মাঝে,
কালবৈশাখী নাচিবে যখন
প্রলয়-মত্তা সাজে,
সন্ধ্যা-রবির বহ্নি-ঝলকে,—
বিজলী নাচিবে বজ্র-ফলকে,—
মৃত্যু হাসিবে পলকে পলকে ,
সে লগনে প্রিয়তম,
যদি এস তুমি, পূজিব চরণ
বক্ষ-শোণিতে মম।

নিশার আঁধারে যদি তব রথ
আমারি দুয়ারে থামে,
প্রাবৃটে যখন ঘন বরিষণে
রোদন বন্যা নামে ,
তরু-লতা-ফুল রোদন ক্লান্ত,
ব্যথিতা-ধরণী মৌন-শান্ত,
ঝিল্লী বিলাপে অবিশ্রান্ত
আর্ত্ত-করুণ তানে।
পূজিব তোমারে ব্যথিত হিয়ার
অশ্রু অর্ঘ্য দানে।

শরতের প্রাতে যদি এস প্রিয়,
কমল মালিকা শিরে,
আলোকের পরী নাচিবে যখন
শ্যামলা-ধরণী ঘিরে,
পবনে ধ্বনিবে আলোকের সুর,
নীলিম-গগন আলো ভরপুর,
ঝরিবে শেফালি আকুল বিধুর
আলোর পুলকে নব।
প্রেম-শতদলে প্রীতি-পরিমলে
পূজিব চরণ তব।

শত বাসন্তী সম্ভারে রচা
সুন্দর ফুলরথে—
যদি এসো ওগো চিরসুন্দর,
আমার জীবন-পথে,
মঞ্জুলি' মম হৃদয়-কুঞ্জ
হাসিবে সেদিন কুসুম পুঞ্জ,
জাগিবে মধুর মধুপ গুঞ্জ,
সার্থক হবে প্রাণ—
তব পূজারিণী, লভিবে চরণে
নিঃশেষে নির্ব্বাণ।

সাংখ্যের ঈশ্বর বা পুরুষ

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্

সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে সহজ কথায় এবং অল্পের মধ্যে বলতে যাওয়া একেবারে দুঃসাহসের কথা। সাংখ্য বলতে ভয় পাবার কিছু নেই কিন্তু এর মতবাদ বিশ্লেষণ করতে ভয় পেতে হয় এ কথা পরম সত্য। সাধারণতঃ আমরা তিন রকমের সাংখ্য দেখে থাকি। প্রথম হ'ল পাতঞ্জল, দ্বিতীয় হ'ল কাপিল এবং তৃতীয় হ'ল গীতার সাংখ্য। এ তিনটীর মধ্যে কোথাও কোথাও প্রভেদ থাক্‌লেও মূলতঃ তারা এক এবং গন্তব্য স্থানও তাদের এক। এ প্রবন্ধে সব তিনটীর বিষয় লেখার মত স্পর্দ্ধা নাই, কারণ একটীকে যদি জীবনভোর সাধনা ক'রে পাওয়া যায় তবে প্রকৃত উপলব্ধি হ'য়ে কিছু লেখা সম্ভব। এখানে পাতঞ্জল সাংখ্য সম্বন্ধেই অতি সামান্য আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—"ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ অহং তেভ্যোঽন্যঃ তদ্ব্যাপার সাক্ষীভূতো নিত্যো গুণ বিলক্ষণ আত্মা ইতি চিন্তনং সাংখ্য-যোগঃ।" ইহার বাংলা—"এই যে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ এগুলি দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়, আমি এই সকল দৃশ্য পদার্থ হইতে পৃথক আর তাহাদের ব্যাপার সকলের সাক্ষিরূপ নিত্য ও নির্গুণ আত্মা এইরূপ চিন্তনের নাম সাংখ্যযোগ।"

পাতঞ্জল সাংখ্যে জ্ঞেয়প্রকৃতির মূলে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের কথাটী অধিকন্তু জুড়ে দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে "ঈশ্বর নাই" এ মত যে সকল সাংখ্যাচার্য্যেরা বলে থাকেন তাঁরা কি "নাই" শব্দের অর্থ অস্তিত্বই নাই মনে করেন অথবা কাণ্ট (Kant) এর মত ভ্রান্তি (illusion) মনে করেন? আমার মনে হয় ওখানে "নাই" অর্থে বহুত্বের (pluralistic) মধ্যে নাই কিন্তু একত্বের (Monistic) মধ্যে আছে, এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সাংখ্যের মতেই আবার দেখা যায়—

পুরুষবহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যসূত্র। কাজেই "নাই" বলার আর কোন স্থান দেখা যায় না।

মায়া যে বহির্জ্জগতকে ঘিরে আছে আর এই মায়া কি—ইহাই গোলযোগের মূল। শঙ্করের মায়াবাদ সম্বন্ধে বহু ব্যাখ্যাকারীর বহু রকম মত দেখা যায়। কিন্তু সে সকল গণ্ডগোলের মধ্যে যাইয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করায় কোন লাভই হবে না। সহজসাধ্য উপায় দ্বারা পাঠক নিজেই যাতে শঙ্করকে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁর প্রকৃত মত কি, যদি জানতে চান তা হলে সকলের জন্য একটী উপায় স্থির করতে চাই। শঙ্কর আমাদের দৈনিক জীবনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ ক'রে একটা দুর্ম্মোচ্য পরিণতিতে এসে পৌছেছেন। অবস্থাত্রয় এবং পঞ্চকোষ সম্বন্ধে শঙ্কর যে সব কথা বলেছেন সেগুলি পাঠকের মনোনিবেশ ক'রে জানা আবশ্যক। এই দুটীর মধ্য দিয়েই তিনি দেখিয়েছেন যে ইংরাজিতে "সেল্‌ফ" (Self) যাকে বলি অর্থাৎ "অহং" (এখানে "অহং" বৈষ্ণবীয় "অহং" নহে—'শিবোঽস্মি'—"শিবোঽহম্" প্রভৃতি বাক্যে যে ভাবে ব্যবহৃত হয় সে ভাবে লেখা হয়েছে) বা আত্মা তার দুটী রূপ। একটী কায়িক এবং আর একটী আনুভূতিক। যাহা চোখে দেখা যায়, বহির্জ্জগতে উপলব্ধি করা যায় তাহাই কায়িক, আর যাহা অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যাহা মানুষের জ্ঞানচক্ষুর মধ্য দিয়া উপলব্ধি

করতে পারা যায় তাহা হল আনুভূতিক। কায়িক জগৎ বা কায়িক আত্মা যাহাকে সাধারণতঃ আমরা বলি জীবাত্মা তাহাই মায়ার অন্তর্গত। আমরা ভুলে যাই যে জীবাত্মা আমাদের পরমাত্মা নয়। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংমিশ্রণই মায়ার খেলা। যখনই এই দুইয়ের পার্থক্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হবে তখনই আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের উপলব্ধি হবে। অনুভূতিজগতে ক্রমান্বয়ে "নেতি" "নেতি" বিচার দ্বারা আমরা যখন সেই শেষ সত্যে পৌছব তখনই আমাদের সাংখ্যের মতে জ্ঞানলাভ হবে এবং নিত্য ও নির্গুণ আত্মাতে স্থিতি লাভ করতে পারব।

শাঙ্কর বেদান্ত এবং কাপিল সাংখ্যের মধ্যে প্রভেদ ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে শাঙ্কর ভাষ্যে সংক্ষেপে দেখান হয়েছে।

মূলশ্লোক—

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥

শাঙ্করভাষ্য—

প্রোচ্যতে কথ্যতে গুণসংখ্যানে কাপিলশাস্ত্রে তদপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রং গুণভোক্তৃবিষয়ে প্রমাণং এব পরমার্থ ব্রহ্মৈকত্ব বিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যেত।

বাংলা—লৌকিক হিসাবে পুরুষ যে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ভোক্তা এ বিষয়ে শঙ্কর এবং কপিলের মধ্যে মূলে বিভিন্নতা নেই। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর হতে সমূলে স্বতন্ত্র। শাঙ্কর বেদান্তের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে মূলেই বিভিন্নতা নেই। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর হতে সমূলে স্বতন্ত্র, শাঙ্কর বেদান্তের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে পরমার্থতঃ প্রভেদ নাই, কারণ ব্রহ্মই সর্ব্বেসর্ব্বা। সাংখ্য যাকে বস্তুতান্ত্রিক (objective) ভাবে দেখে প্রকৃতি বলেন, বেদান্ত তাকেই মানসিক অনুভূতি (subjective) বা মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে দেখে ঐশী শক্তি বলেন। উভয়েই একই জিনিষকে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দিক হতে দেখছেন এবং পৌছবার চেষ্টাও করেছেন একই স্থানে। আমার বক্তব্য হতে উপরে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হল; যা হোক মোট কথা "ত্রিগুণ" এবং "আত্মার উপলব্ধি' এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ এবং কি উপায়ে একটীকে অতিক্রম করে আর একটী পাওয়া যায় এই হ'ল আমার কথা। যতক্ষণ "মায়া" বা "ত্রিগুণাত্মক" বস্তুভাবে আমরা জগৎকে গ্রহণ করবো বা দেখবো ততক্ষণ পরমাত্মার উপলব্ধি হওয়া সম্ভব কি না। পাতঞ্জল মতে তাহা সম্ভব। কারণ "প্রকৃতি" অথবা "মায়া" যাকে বলি তার মূলে যদি ঈশ্বর থাকেন তা হলে উঁহাকে বাদ দিয়ে চলায় কোন মানে হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্‌রূপে ধ'রে নিয়ে এক রাস্তা দিয়ে যেতে পারা যায় কিন্তু দু'য়ের মিলনেই আত্মার পূর্ণতা সে কথা অস্বীকার করা যায় না। আমি বা অহং সেটা কায়িক বা আনুভূতিক যাই হোক—দুটোর অস্তিত্ব আমার কাছেই আছে এবং এদের দুটীর অস্তিত্বের কারণও নিশ্চয়ই আছে। কারণ যাই থাক, কেহ বলেন লীলা, কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন ভ্রম (Illusion) ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বময় ব্রহ্ম যদি বলি এবং তারপরই "নেতি" বিচার করি তা হলে কি উপায়ে একস্থলে পৌছতে পারি ইহাই হল বিচার্য্য। পূর্ব্বেও বলেছি এখনও বলছি রাস্তা দুটী কিন্তু গন্তব্য একটী। একটী পথ প্রত্যক্ষ (Positive side) আর একটী পথ পরোক্ষ (Negative side)। এই দুটী পথেই পৃথক্‌ভাবে গেলে আমার মনে হয় গমন দুরূহ হয়ে ওঠে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে যদি প্রত্যক্ষ (Positive) এবং পরোক্ষ (Negative) দুটীকে একই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি তা হলে আলোক (Light) বা জ্ঞান শীঘ্রই প্রাপ্তব্য। এই প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি হ'তে একটী স্থান উদ্ধৃত করলাম—

"তিনি জেগে ব'সে থাকেন
আমাদের এই ঘরে,
আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যাপরে।
জগতে কেউ দেখতে না পায়
লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে
জ্বালান সারা রাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই
আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি
আমাদের এই ঘরে॥"

"আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই শয্যাপরে" অর্থাৎ যখন আমরা মায়ার মধ্যে আবৃত থেকে জীবাত্মাতেই স্থিত থাকি। "জগতে কেউ দেখতে না পায় লুকানো তাঁর বাতি", আমরা বাহির থেকে তাঁর সেই জ্যোতি অনুভব করতে পারি না। কিন্তু তিনি ঠিক একই ভাবে রয়েছেন, এবং একই রকমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। "ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই আনাগোনা করে"—অর্থাৎ আমাদের জীবনটা ঠিক স্বপ্নের মত মায়ায় ঘেরা। আমরা বাপ মা ভাই বোন নিয়ে কতরকম ভাবে খেলা করি। সে সব কি থাকে? কিছুই থাকে না—সেই জন্যে কবি বলেছেন "সুপ্তির" স্বপন যেমন আমাদের পরমাত্মার কাছে জীবাত্মার লালাও ঠিক সেই রকম। এখানে মায়ার জগৎকে আলাদা করে দেখার প্রচেষ্টা কবির প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আবার এক যায়গায় তিনি গেয়েছেন—

"দিন রজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
সকাল বেলায় তাঁরই হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠি
নয়ন মেলে চাই
খুসি হ'য়ে আছেন চেয়ে
দেখ্‌তে মোরা পাই।"

এখানে কবি ভাবে ও ছন্দে ব্রহ্মের রূপকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, বাহিরের জগৎকে মায়া ব'লে ঠেলে দেন নি, তিনি তারও মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মের রূপ দিয়েছেন। এই দুটী ছত্রকে নিয়ে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তাহা হ'লে আমার কথা স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে প্রত্যক্ষ (Positive) এবং পরোক্ষ (Negative) দুটীকে নিয়ে যাওয়া আমাদের সাধ্য, তদ্দ্বারা শীঘ্র উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। "সর্ব্বময় ব্রহ্ম" সম্বন্ধে আর একটী ছত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংযত করতে পারলাম না—

'আকাশেতে ঢেউ দিয়েছে
বাতাস ব'হে যায়।
চারদিকে গান বেজে ওঠে
চারদিকে প্রাণ নাচে ছোটে।
গগনভরা পরশখানি
লাগে সকল গায়।
ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে',
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়।" গীতাঞ্জলি।

এত সুন্দর ভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অপূর্ব্ব মিলন ছবি কথায় বলা সাধ্য নহে। যে প্রাণ আমার মধ্যে সেই প্রাণই জগতের মধ্যে ব্যাপিয়া রয়েছে, আমি কি কাউকে ছেড়ে চলতে পারি? না, ছেড়ে চলেই আমার নিজের যাওয়া সম্ভবপর? ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেছেন—

পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যসূত্র।

পুরুষ (free spirit) হ'ল অনাদি, তিনি সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, চেতন, নির্গুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।

গীতাতেও আত্মার রূপ বিশ্লেষণে বলেছে—
"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

সাংখ্যে পুরুষের দুটী রূপ ধরিয়া ব্যাখ্যা করেছে, একটী জীব (the empirical self) আর একটী লিঙ্গ শরীর (mixture of free spirit and mechanism)। (রাধাকৃষ্ণন্)। সাংখ্যের জীবকেই সাধারণে পরমাত্মা ব'লে জানে আর তারই লিঙ্গশরীরকে জীবাত্মা ব'লে ধরা হয়। আবার অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পুরুষ (static force) লিঙ্গ (kinetic force) অর্থাৎ যখন জড়শক্তি ও চলচ্ছক্তি রূপে প্রকাশিত হয় তখনই ব্রহ্মের রূপ শক্তি বা মায়াভাবে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

পুরুষ যখন বৃদ্ধ, তখন তিনি চিদ্রূপ, জ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, প্রকাশস্বভাব—"জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ"। সাংখ্যসূত্র।

তিনি যখন আবার মুক্তস্বভাব, তখন তিনি বন্ধনবিহীন, একেবারে 'অনাবিল মুক্ত আর সর্ব্ব-ব্যাপী। কাজেই এবার নিঃসঙ্কোচে আমাদের কবিসম্রাট রবীন্দ্রের পানে জগতের শ্রেষ্ঠ বাণী বলতে পারি—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।"
এই রকম সম্পূর্ণ ভেদাত্মক বস্তুর মিশ্রণেই ব্রহ্মাণ্ড চল্‌ছে। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছে মাত্র। সেইজন্য বল্‌তে চেয়েছিলাম যে মানুষের বিচার শুদ্ধ প্রত্যক্ষ (Positive) বা শুদ্ধ পরোক্ষে (Negative) ধরে গেলে কোনদিন জ্যোতির বা জ্ঞানের আলোক দেখতে পাবে না। বেল যেমন শাঁস ও বীজ দুই নিয়ে হয়, ব্রহ্ম তেমনি দু'য়ে মিলে হন। প্রত্যক্ষ (Positive) যাহা চলন্ত গতিশীল এবং পরোক্ষ (Negative) যাহা স্থির নিষ্ক্রিয়, এই উভয়কে এক সঙ্গে আনাই হচ্ছে মানুষের সাধনা।

শ্রীজগন্মাতৃপূজা

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য্য, সপ্ততীর্থ

"মান্যতে পূজ্যতে যা সা মাতা।" যাঁহাকে পূজা করা হয় তিনি মাতা। কিম্বা জ্ঞানার্থ মা ধাতু হইতে মাতা—জ্ঞানের হেতু এইরূপ অর্থও পাওয়া যায়। গর্ভধারণ ও পোষণ হেতু মাতা পিতা হইতেও অধিক অর্থাৎ সর্ব্বাধিক পূজ্যা। "পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ"। মাতা এই অক্ষরদ্বয়ের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে আমরা প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, মাতৃসাক্ষাৎকার আমাদের পরমপ্রীতিহেতু, মাতৃপূজা অর্থাৎ মায়ের গৌরবিত প্রীতিহেতুক্রিয়া যতটুকু সম্ভব তাহাতেই প্রচুর সৌভাগ্য সঞ্চিত হইবে এই শাস্ত্রনির্দেশ স্বীকার করিয়া ধীমান্ ব্যক্তিমাত্র সোৎসাহে মাতৃপূজার জন্য যথাশক্তি যত্নবান্ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। পরন্তু আমাদের এই দেহ যে প্রত্যক্ষ দেবতার দান, যাঁহার করুণায় এই স্থূল দেহের উৎপত্তি, যাঁহার রহস্য সাধারণ সমক্ষে আলোচনার অযোগ্য ও অত্যন্ত দুর্ব্বোধ, স্বদেহ-প্রসূতি সেই মাতা যাঁহা হইতে অভিন্ন অথবা যাঁহার অংশ বিশেষ, সেই বিশ্বপ্রসবিনীকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, তাঁহার করুণাকণা পাইবার জন্য ভাগ্য-বান্ ভক্তসাধক তাহাতেই তনুমনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া নিরন্তর তাঁহারই ভাবনায় নিযুক্ত আছেন-- এ বিশ্বকে মায়ের মূর্ত্তি ভাবিয়া প্রতি বস্তুতেই শ্রদ্ধা-বুদ্ধি রক্ষা করিতেছেন। জগন্মাতা যাবদ্বস্তুকে সম্পূর্ণ ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া বিশ্বব্যাপিণীরূপে অবস্থিতা, ইহা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, মাতৃনামোচ্চারণে যাঁহার স্বেদ পুলক রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ভাবোদয় চিহ্ন লক্ষিত হয় তেমন ভক্তের পূজা পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অভীষ্ট ফল দানে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়া থাকে। পরন্তু মায়ের তেমন পূজক এ দুর্দ্দিনে একান্তই বিরল।

শৈশবে মাতৃকরুণায় রক্ষিত ও বৰ্দ্ধিত স্তন্যপায়ী শিশু মাতৃকরুণালব্ধ এ দেহের স্বরূপহেতুফলাদির বিচারণায় একান্ত অসমর্থ হইয়া মাতৃস্বরূপ সম্বন্ধে যেমন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি-গণও বিশ্বমাতার স্বরূপকরুণাদিবিষয়ে তেমন অনভিজ্ঞ এবং ঐ অনভিজ্ঞতাবশতঃই বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতার যথার্থোপলব্ধিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

অতল অকূল বিপুল জলধিতে ফেন তরঙ্গ বুদ্বুদাদির মত বিশাল বিচিত্র সংসারের একাংশে এই নগণ্য দেহ কত শতবার উঠিয়া বিলীন হইতেছে —অতীতে কত যে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও কত যে হইবে তাহা আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হইলেও কেন এই দেহ? কেন এই গতাগতি? তাহা কিছুমাত্র না জানিলেও আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে জ্ঞানী মনে করিতেছি, জ্ঞানাভিমানে নির্ভর করিয়া এ বিশ্বের যাবত্তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইতেছি। যতকাল আমাদের ঐরূপ জ্ঞানাভিমান থাকিবে তাবৎ কাল মাতৃস্বরূপ বোধের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এজন্য প্রথমতঃ অজ্ঞতা সাক্ষাৎকার অর্থাৎ আমি অজ্ঞ এই বোধ আবশ্যক। শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যের প্রারম্ভে জানা যাইতেছে—মহারাজ সুরথ মেধসাশ্রমের নিকটে সমাধি নামক বৈশ্যকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসহ ঋষির সমক্ষে উপনীত হইয়া ঋষিকে বলিতেছেন--

"তৎকেনৈতন্মহাভাগ। যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥"

হে মহাভাগ! ঋষি প্রবর! এই সমাধি বৈশ্য

ও আমি জ্ঞানী, আমাদের এই মোহ কেন ? অর্থাৎ ইদানীং বিনষ্টপ্রায় বিষয়াদির জন্য তথাবিধ খেদাদি রূপ মোহ কেন ? যে জন বিবেকান্ধ অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিবেকহীন তাহার মোহ উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। রাজা সুরথের তথাবিধ জ্ঞানাভিমান লক্ষ্য করিয়া মহামান্য মহর্ষি সম্ভবতঃ ভাবিয়াছিলেন—সত্ত রাজ্যভ্রষ্ট এই রাজাকে তাঁহারই রাজ্যে বাস করিয়া মূর্খ বলিলে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া কি বলেন বা কি করেন তাহার স্থিরতা নাই। এজন্য ধীরে অতি সন্তর্পণে প্রকারান্তরে রাজার মূর্খতা অর্থাৎ পরিপূর্ণ অজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতেছেন—মহারাজ।

"জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥"

মনুষ্য সকল জ্ঞানী ইহা সত্য কিন্তু কেবল মনুষ্যগণই জ্ঞানী নয়, যেহেতু পশু পক্ষী মৃগাদিও জ্ঞানী, অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের জ্ঞান মনুষ্য এবং পশ্বাদি প্রাণীতেও বর্ত্তমান, উহা পরমার্থতঃ জ্ঞান নহে অজ্ঞান মাত্র। রাজা সুরথের প্রশ্নোত্তর দিবার জন্য ঋষির তথাবিধ উক্তি ক্রমে দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঋষি রাজার প্রশ্নোত্তর দিবার জন্য বলিতেছেন—

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা ॥"*

মহতী মায়াখ্যা শক্তি যাঁহাতে অবস্থিতা তিনি মহামায়া, তাঁহার সংসারস্থিতিহেতু যে প্রভাব অর্থাৎ শক্তি বিশেষ, তন্নিবন্ধন মমতারূপ আবর্ত্তযুক্ত যে অজ্ঞানরূপ মোহাখ্য গর্ত্ত তাহাতে সমস্ত জীব নিপাতিত রহিয়াছে।

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥"

হে মহারাজ! সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী নিত্যা, তিনি পরমাবিদ্যা ও মুক্তির হেতুভূতা এবং তিনিই সংসার বন্ধের হেতু। অর্থাৎ সেই মহামায়ার জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ দুইটী শক্তি আছে। অজ্ঞানশক্তি সম্বন্ধবশতঃ তিনি বন্ধহেতু এবং জ্ঞানশক্তি সম্বন্ধ বশতঃ তিনিই মোক্ষহেতু।

"বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণমহমীশ ন এবচ।
কারিতাস্তে ·· · ·· ।"

আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশান এই তিন জনকে তিনিই শরীর স্বীকার করাইয়াছেন,—ব্রহ্মার এবম্বিধ উক্তি হইতে প্রতীত হইতেছে যে, তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশকে শরীরী করিয়া স্বকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন।

সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় রূপ ক্রিয়াও তদ্বিষয়সমূহ মহামায়া মাত্র, মহামায়ার অতিরিক্ত কোন কিছুই নাই।

"ত্বয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যেবিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥
তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈবনৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥"

হে মহারাজ! সেই মহামায়া তোমাকে এবং অপর বিবেকীদিগকে মোহিত করিতেছেন, করিয়াছেন ও করিবেন। তুমি শরণ্যা সেই দেবতাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হও। সেই দেবতাই আরাধিতা হইয়া ভোগ স্বর্গ ও অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন।

নিত্যা জগন্মূর্ত্তি সেই মহামায়া দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রার্থনাবশতঃ যখন আবির্ভূতা হন তখন তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। নিত্যা সেই জগন্মাতা মহারাজ পৃথুর অতীত তপস্যার ফলে অগণিত প্রাণীর পরিরক্ষণার্থ পরমরমণীয়া কন্যকামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এ বিশ্ব যাঁহার শরীর, যিনি জগন্মূর্ত্তি, তিনি স্বেচ্ছায় ভাগ্যবান্ পৃথুর তনয়ারূপে পৃথিবী-সংজ্ঞায় পরিচিতা হইয়াছেন। মধুকৈটভ, মহিষাসুর, রক্তবীজ, শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরদিগের

* সংসারস্থিতিকারিণঃ এইরূপ পাঠও বহু পুস্তকে দেখা যায়।

সংহারার্থ মহামায়ার বিভিন্নরূপপবিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ। নগাধিপতি হিমালয় জগন্মাতাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিতুষ্টা জগন্মাতা মেনকা হইতে আবির্ভূতা হইয়া গৌরী পার্ব্বতী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন উপনিষদ্‌ও মহামায়াকে জগজ্জননীরূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা অকালশরতে নিদ্রিতা মহামায়াকে প্রবোধিতা করিয়া যে নিয়মে মহাপূজা করিয়াছিলেন তথাবিধ নিয়মে তেমন মহাপূজা অদ্যাপি এ দেশে চলিতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র দুর্জ্জয় রাক্ষসপতি রাবণের বিনাশ সাধনের জন্য অকাল-বোধন বিধান করিয়া মহামায়ার যে মহতী অর্চ্চনা করিয়াছিলেন তাহা এদেশের শিশুমাত্রের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। স্নান, পূজা, হোম ও বলিদান এই চতুরবয়বা সেই মহতী পূজার বিশেষ ব্যবস্থা বিভিন্ন পুরাণে সবিস্তর বর্ণিত আছে। কৃপাময়ী জগন্মাতার করুণালাভের জন্য যুগান্তব্যাপিনী দীর্ঘতপস্যার কিছুমাত্র অপেক্ষাই নাই। মায়ের সাধক ভক্ত সন্তান কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিলেই যে তাঁহার করুণা লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন, সাধকের সমুচিত দর্শনাভিলাষ অচিরে অবশ্যই যে পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ—পরম মাতৃভক্ত সুরথ ও সমাধির মাতৃদর্শন লাভ। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মহর্ষি মেধসোপদিষ্ট নিয়মে জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নদীর পুলিনে মায়ের মহীময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়া পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করতঃ বর্ষত্রয় পর্য্যন্ত আরাধনা করিয়াছিলেন। নিরাহার বা যতাহার ঐ সাধকদ্বয় পরমারাধ্যা জগন্মাতায় চিত্ত স্থাপনা করিয়া সমাহিত হইয়াছিলেন। অষ্টাঙ্গ যোগের চরমাঙ্গ সমাধি কিংবা যোগাখ্য সমাধি যে উপাস্য সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ হেতু তাহা সুপ্রসিদ্ধ। ঐ সাধকদ্বয় নিজ প্রিয়তম গাত্ররুধির বলিদান করিয়া মায়ের চতুরবয়বা মহাপূজা সম্পাদন করতঃ জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাধকাভীষ্টদাত্রী বিশ্বমূর্ত্তি জগন্মাতা সাধকের হিতের জন্য কতশতবার পরমরম্যা বা চরমভীমা কত শত মূর্ত্তিতে যে যুগে যুগে আবির্ভূতা হইয়াছেন তাহা নির্দ্দেশ করা একান্তই অসম্ভব। মহাভাগ্য ঐ সুরথ ও সমাধি মায়ের কোন্ মূর্ত্তি মানস পটে অঙ্কিত করিয়া তাহাই দেখিয়া চিরকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা দেবীমাহাত্ম্যে উল্লিখিত হয় নাই।

অমুক্ত সে তত্ত্ব মহাভক্তের পবিত্র চিত্তেই কেবল ব্যক্ত হইতে পারে। "সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারা পূজাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী ভেদে ত্রিবিধা রূপে নির্দ্দেশ করা হইলেও প্রাগুক্ত সাধকদ্বয়ের স্বরুধির দান, মাতৃপূজার যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিতেছে তাহা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধপ্রায়। সম্প্রদায়বিশেষ বলেন, হিমালয়তনয়ার রুধিরমদিরা-প্রীতির বিশেষ হেতু থাকিলেও সাধারণ জন তাঁহার অনুকরণ করিতে পারে না। থাক্ সে কথা।

মাতৃরূপা যে মহাদেবতা নিজ-প্রসূত সন্তানগণকে নিরন্তর পালন করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে অসুর সংহাররূপ মাতৃত্ব বিপরীত কঠোর কর্ম্ম কিরূপে সম্ভব? প্রলয়কালীন সংহার লীলাই বা কেন? সন্দেহাকুল জনগণের এই প্রশ্নের সমাধানচ্ছলে দেবীমাহাত্ম্যের উক্তি এই—

"লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপিহি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষপি তেঽতি সাধ্বী।"

অসুরাদি রিপুগণ তোমার শস্ত্র দ্বারা পবিত্র হইয়া উত্তমলোক লাভ করুক, অসুরদিগের প্রতি তোমার এই যে মতি তাহা অতি সাধ্বী। দেবগণের ঐ স্তুতিবাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে—মায়ের অসুর সংহার অসুরের হিতসাধন। ফলতঃ সন্তানের প্রার্থনার বৈলক্ষণ্যবশতঃই জননীর দান

বিচিত্রাকার হইয়া থাকে, যুদ্ধার্থী যে অসুর যুদ্ধই চাহিতেছে, মাতৃকরুণায় সে তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে। যুদ্ধরত অসুরের মরণান্ত যুদ্ধফল কাম্য বলিয়াই উপস্থিত হয়, দৈববশে যুদ্ধ যাহার রাজ্য হইতেও প্রিয়, মাতৃ সমক্ষে উহাই যে চাহিয়াছিল, অভীষ্টদাত্রী মাতা তাহার সে প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছিলেন, মরণ-ত্রাসহীন অসুরের বাঞ্ছিত ফল সংহার, মাতৃকৃপারূপে উপনীত হইয়া তাহার অবশ্যই কল্যাণসাধন করিয়াছিল। দেবীমাহাত্ম্যের এ সিদ্ধান্তে সন্দেহের কিছুই নাই। স্বকর্মফলভুক্ জনগণ কর্মানুগ কামনার বশে শুভাশুভ প্রাপ্ত হইতেছে। পর্জ্জন্যবৎ অবিশেষে ফলদাত্রী জগন্মাতার অণুমাত্রও দানকার্পণ্য নাই। রাজা সুরথ প্রার্থনানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সাবর্ণিক নামা মনু হইলেন, ঐ মনুত্বপ্রাপ্তি তাঁহার তপস্যার চরম ফল। পক্ষান্তরে সুরথসহচর সম-সাধনসম্পন্ন বিরক্ত সমাধি সঙ্গচ্যুতিহেতু জ্ঞান প্রার্থনা করতঃ মাতৃদত্ত মহামুক্তি প্রাপ্ত হইয়া চিরকৃতার্থ হইলেন। এতাবতা জননীর কর্ম্ম বৈচিত্র্যের প্রতি জীবকৃত বিচিত্র কর্ম্মের হেতুতা একান্ত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছে।

ফলতঃ উপনিষদাদি শাস্ত্র যাহাকে ব্রহ্মসংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, যাঁহা, নিত্য জ্ঞান আনন্দ বস্তু, মহামায়া, পরমেশ্বরী, দুর্গা প্রভৃতি শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তিনিই জগন্মাতা ইহাই সিদ্ধান্ত।

"পরব্রহ্মাত্মিকা নিত্যা পরমাকাশমধ্যগা
সর্ব্বশক্তিময়ী শান্তা নির্গুণা নিরুপদ্রবা।
আদিমধ্যান্তরহিতা সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতা।
স্বভাভির্ভাসয়ন্তীহ বিশ্বমেতৎ সুরেশ্বরী॥"

চৈতন্যগতা অনির্ব্বাচ্যা মায়াতে যেমন আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তিদ্বয় অবস্থিত, জগন্মাতাতে তেমন জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ অনাদিশক্তিদ্বয় বর্ত্তমান। শক্তি ও শক্তিমতী দেবতায় কোনও ভেদ নাই, যেমন বহ্নি ও তদীয়া দাহিকাশক্তি কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। যেমন কোনও ব্যক্তি বহ্নি শক্তিতে আহুতি প্রদান করিলে বহ্নিতেও হোমকার্য্য অর্থসিদ্ধ হয়, কিম্বা বহ্নিতে হোম করিলেও বহ্নিশক্তিতে হোম অর্থ সিদ্ধ হয়, তেমন শক্তিমতী দেবতার ধ্যানাদি করিলে তদীয়া শক্তিতেও ধ্যানাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দৈবশক্তিতে ধ্যানাদি করিলেও শক্ত দেবতার ধ্যানাদি ক্রিয়া অবশ্যই পূর্ণ হইয়া থাকে। নিত্যা জগন্মাতার শরীররূপে এই জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে ইনি দেহভূত এই সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

—

বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়

শ্রীবিনয় কুমার সরকার, এম্-এ, বিদ্যাবৈভব (কাশী), ডক্টর (তেহারাণ)

বর্ত্তমানে মাত্র একটা ক্ষেত্রের দিকে স্বদেশ-সেবকদিগের দৃষ্টি টানিয়া আনিতে চাই। সে হইতেছে উন্নতি-অবনতির কথা, বাড়তি-ঘাটতির কথা। উন্নতি অবনতি কাহাকে বলে, উন্নতি-অবনতির লক্ষণ কি কি, উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ বাঙালী সমাজ-শাস্ত্রীদের অন্যতম গবেষণার বস্তু হওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভারতীয় নবনারীর উন্নতি-অবনতি, আর বিশেষ করিয়া বাংলার নরনারীর বা বাঙালীজাতির উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে পঠন-পাঠন, আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদির চর্চ্চা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। উন্নতি-তত্ত্বের নানা প্রকার অনুসন্ধান বাঙালী সমাজশাস্ত্রীদের মহলে মহলে বাড়িয়া গেলে আমাদের একটা মস্ত অভাব পূরণ হইবে। ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার ক্ষেত্রেও উন্নতিতত্ত্ব বর্ত্তমান লেখকের বিবেচনায় অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। ১৯২৬ সনে এইরূপ গবেষণার সূত্রপাত করা গিয়াছে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার মারফৎ। "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থ (১৯৩৪) উন্নতি-তত্ত্বের বিশ্লেষণ সাহিত্য বিশেষ। সেই উন্নতি-তত্ত্বেরই অন্যান্য দিক্ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের তদ্‌বিরে কিছু-কিছু আলোক ফেলিতে পারা যাইবে বিশ্বাস করি। সামাজিক উন্নতি-তত্ত্বের নানা কথা ইতিমধ্যে "সোশিঅলজি অব পপিউলেশন" (লোক-বিস্তার সমাজশাস্ত্র) গ্রন্থে (১৯৩৬) আলোচনা করিয়াছি।

একটা কথা শুনি, বাঙালী জাতিটা মরিতে বসিয়াছে। সত্যিই কি তাই? আমরা কি সত্যই অবনতির দিকে যাইতেছি? বাংলার অনেক জেলাতে আমাকে যাইতে হইয়াছে। আর অনেক জেলার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতেও চেষ্টা করিয়াছি। দেখিতেছি মাত্র যে যশোহর, নদীয়া আর রাজসাহী বাংলাদেশের একমাত্র "কালো ভেড়া"। কিন্তু আর সব জেলাতেই গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। আর একটা কথা শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে। আগেকার দিনে লোকেরা অল্প পাশে বা বিনা পাশেও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারিত। আর এখন অনেক সংসারে গোটা কতক যুবা এম্-এ, এম্-এস্-সি ইত্যাদি পাশ করিয়াও বসিয়া আছে। কিন্তু একমাত্র বেকারদের নাক গুণিয়া বলা চলে কি যে, বাঙালী জাত আর্থিক অবনতির দিকে যাইতেছে? সোজা বুঝা যাইতেছে একমাত্র যে, লিখিয়ে পড়িয়েদের দল ভারি হইতেছে। কিন্তু মাথাপিছু মধ্যবিত্তের সম্পদ্ কমিয়াছে তাহা বুঝিবার কারণ পাওয়া যায় না। গোটা দেশের সংখ্যা ধরিলে বরং উল্টাই বোঝা যায়। মধ্যবিত্তের সুখ-স্বচ্ছন্দতা হয়ত বাড়িয়াছে। বঙ্কিম-যুগে মধ্যবিত্ত লোক বলিতে আমরা যাহাদের বুঝিতাম তাহাদের মত এবং তাহাদের চেয়েও ভাল অবস্থার লোক এই পঞ্চাশ বছরে ঢের বাড়িয়াছে। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই যে এত সব কংগ্রেস, কনফারেন্স, শিল্প-প্রদর্শনী, সাহিত্য-সম্মেলন হয়, এতে লাগে টাকা। মধ্যবিত্তের ট্যাঁকে টাকার জোর বাড়িয়াছে। না বাড়িলে এসব পোষাকি জিনিষ গণ্ডায় গণ্ডায় চলিত না। আর এত হাজার হাজার লোক এই সবে মস্‌গুল হইতে পারিত না। অধিকন্তু মধ্যবিত্তের সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছে।

বাঙালী আজ কোন্ অবস্থায় আছে সে কথাটা বুঝিবার জন্য ১৮৩১ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের উক্তিটা তলব করা যাউক। বিলাতের কমিশনে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল "তোমাদের দেশের লোক কি খায় ?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ভদ্রলোকেরা, যাহাদের সংখ্যা খুব কম, তাহারা খায় ভাত, মাছ, তরকারী আর মশলা (ডালের নাম করেন নাই), আর সবাই খায় ভাত আর নুন।" ভাত আর নুন একটা অতি-মাত্রায় লম্বা-চৌড়া জীবনযাত্রার উপাদান নয়। ১৮৩১ এর তুলনায় ১৯৩৮এ বাঙালী জাত বড় অবস্থা হইতে ছোট অবস্থায় নামে নাই। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতেছি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া আলোচনা করিলে বুঝিব যে, তাহার মোটকথা ছোট হইতে বড়'য় উঠা। এই সব বিষয়ে বস্তু-নিষ্ঠ আর সংখ্যা-নিষ্ঠ গভীরতর আলোচনা চাই। বর্ত্তমানে মাত্র ঠারে-ঠোরে বলিয়া যাইতেছি। অনেক লোক উন্নতি-অবনতি জরীপ করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন।

এইবার আর এক তরফ হইতে বাঙালী জাতের জরীপ করিব। বাংলার নরনারীকে ভদ্রলোকের "পাতে দেওয়া" যায় কি না, এই প্রশ্নের সমালোচনায়ও অনেক বাঙালীর উঠিয়া-পড়িয়া লাগা উচিত। এ একটা বড় গবেষণার বস্তু। বাঙালীর প্রভাব "অ-বাঙালী" ভারতীয়ের উপর আর অ-ভারতীয় দুনিয়াবাসীর উপর কিছু পড়িয়াছে কি ? যদি পড়িয়া থাকে তবে কবে হইতে, আর কতখানি ? যদি কোনো বাঙালী পুরুষ বা স্ত্রী অবাঙালীদেরকে কোন প্রকারে প্রভাবিত করিয়া থাকে, যাহাকে দেখিয়া, যাহার কাজ হইতে "অন্য জাতের" লোকেরা বলিয়াছে "হাঁ একটা মানুষ বটে", তাহা হইলে আমি বলিব সেই বাঙালীটা ভদ্রলোকের "পাতে দেবার" উপযুক্ত, সেই বাঙালী "বাপকা বেটা"। অবশ্য বাঙালীর সৃষ্টিশক্তিতে বাংলার নরনারীর,—মায়, বুনো-পাহাড়ী-আদিম-দেরও উন্নতি হইয়াছে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি বা কৃষ্টি পাইয়া বাংলার চৌহদ্দির বাহিরের লোকেরা কতটা লাভবান হইয়াছে তাহাই আলোচনার বস্তু। ইংরেজ জাত এমন অনেক মানুষ দিয়াছে, যাহারা না জন্মিলে ইয়োরামেরিকা আর দুনিয়া গড়িয়া উঠিত না। ফ্রান্স ও জার্মাণির বহু সন্তান আছে যাহারা পৃথিবীকে এইভাবে গড়িয়া তুলিতে অনেক সাহায্য করিয়াছে। দুনিয়া এই সব ফরাসী ও জার্ম্মাণের "খাইয়া" মানুষ হইয়াছে। তেমনি এমন কোনো বাঙালী জন্মিয়াছে কি, যে না জন্মিলে অবাঙালী-ভারত আর অভারতীয়-দুনিয়া দরিদ্র থাকিত ? আর জন্মিয়া থাকিলেও কখন কখন ? হাজার পাঁচ ছয় বছর আগে, মহেন্‌জোদড়োর যুগে বাঙালী কিরূপ ছিল জানা নাই। বৈদিক যুগের জানা আছে নামজাদা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা, যেটা বোধ হয় প্রায় পোনে তিন হাজার বছর আগেকার সাহিত্য। কিন্তু তাহা অবাঙালীর সৃষ্টি। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের আদর্শ পাওয়া যাইত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মত গ্রন্থে। বৈদিক সাহিত্যের প্রাণের কথা ছিল দিগ্বিজয়, "অহমস্মি সহমান", "পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি, আমার নাম উত্তর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি জেতা, বিশ্বজয়ী, জগৎ আমায় জানে দিগ্‌বিজয়ী বলিয়া" ইত্যাদি।

এই দিগ্‌বিজয়ের চিন্তায় ও কাজে তখনকার বাঙালীর দান কিছু ছিল কিনা জানা যায় না। সেই সবের সৃষ্টিকর্ত্তা বোধহয় পাঞ্জাবী বা কনৌজিয়া বামুন বা আর কেহ। তারপর তাদের চেলারা—সেই যুগের "বয়স্কাউট" সব দিগ্‌বিজয় চালাইতে চালাইতে যখন সদানীরা দরিয়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহারা দেখিল যে, প্রাচ্য ভারতে, বঙ্গ-বিহারে মানুষ নাই, আছে শুধু জঙ্গল। তাহারা ফিরিয়া গিয়া গুরুদেবকে বলিল, "ওদেশের লোকেরা সব পক্ষি জাতীয় নরনারী, ওরা খালি কিচির-

মচিব করে।” দেখিতেছি যে, তারপর সেই সকল পশ্চিমা বামুন, ঋষি, পণ্ডিত ইত্যাদি লোক আসিয়াছিল আমাদের গুরু হইয়া। বাঙালী আমরা আর্য্যামীর অ-আ-ক-খ পাইয়াছি অ বাঙালীর কাছে। সে যুগে বাঙালীর প্রভাবে অ বাঙালী মানুষ হয় নাই। বাঙালীরা মানুষ হইয়াছিল অ-বাঙালীর খাইয়া।

শাক্যসিংহ নামক বুদ্ধের নাম আমরা নিই বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব বাঙালী নন। বাঙালী বাদশা ধর্ম্মপালের প্রভাব? বাংলার বাহিরের আবহাওয়ায় ধর্ম্মপালের নাম হোমিওপ্যাথিক ডোজে ছড়ানো আছে মাত্র। অধিকন্তু ধর্ম্মপাল খাঁটি বাঙালী কিনা সন্দেহ। এই সঙ্গে গবেষণার বস্তু—বাঙালী কাহাকে বলে। বিক্রমপুরের অতীশ-দীপঙ্করের নাম করিতে পারি। বলিতে চাই যে, দীপঙ্কর বাপকা বেটা বটে। তিব্বতের উপর তাঁহার প্রভাব জবরদস্ত ও বিস্তর। অতীশ দশম শতাব্দীর লোক। আজও তিব্বতে অতীশের নাম-ডাক জবর।

হিন্দু ছাড়িয়া বাঙালী মুসলমানদের কথা ধরিলেও অবস্থা তথৈবচ। বাংলার মুসলমানেরা অবাঙালী মুসলমানদের খাইয়া মানুষ। বাঙালী মুসলমানদেরকে অবাঙালী মুসলমানদের “পাতে দেয়া” চলিবে না। এই সকল দিকে খোঁজ চলিতে থাকুক।

বাঙালী চৈতন্যদেব বোধ হয়, “সমগ্র ভারতের” শ্রদ্ধাযোগ্য ব্যক্তি। কম্-সে-কম্ আসাম ও উড়িষ্যার উপর তাঁহার প্রভাব ছিল ও আছে। অবশ্য তাঁহার সম্প্রদায়েরও আদি গুরু ছিলেন দক্ষিণী মধ্বাচার্য্য। আসল কথা,—শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রামমোহন রায়ই হইতেছেন প্রথম বাঙালী মানুষ, যাঁহাকে ইজ্জৎ দিয়াছে গোটা ভারতের নরনারী। এ ত সেদিনের কথা।

বাঙালীরা চিরকাল মুখস্থ করিয়াছে পাঞ্জাবী পাণিনি, কনৌজিয়া বরাহমিহির, মালবীয়া কালিদাস, দক্ষিণী শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি। কিন্তু অবাঙালীরা কেহ কোনো বাঙালীর জিনিষ এমন “নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে” গিলিতে চেষ্টা করিয়াছে কিনা খোঁজ লইয়া দেখা দরকার। এই সঙ্গে বাঙালীর “নব্য ন্যায়” কতটা বাঙালীর স্বাধীন সৃষ্টি তাহা কষিয়া দেখা আবশ্যক হইবে। অধিকন্তু এই নব্য-ন্যায়ের ইজ্জৎ বাংলার বাহিরে কতটা তাহাও পরীক্ষা চাই। বাঙালী সমাজে অবাঙালী দর্শনের যে প্রভাব, বাংলার বাহিরে নব্যন্যায়ের প্রভাব ততখানি বা সেই ধরণের কি? বাংলাদেশে প্রচলিত গোটা হিন্দু সংস্কৃতি আর ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের তৈয়ারী সভ্যতা বোধ হয় প্রায় ষোল আনা অবাঙালীর সৃষ্টি। রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম “ভারত-প্রসিদ্ধ” বাঙালী। বর্ত্তমান যুগে আমরা বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের গৌরব করি; বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরকে কয়টা অবাঙালী চেনে বা চিনিত? অধিকন্তু ইঁহারা ত একালের লোক, আমাদের সমসাময়িক বলিলেই হয়। তাহাতে বর্ত্তমানে বাঙালীর বাড়্‌তি প্রমাণিত হয়,—কিন্তু বাঙালী-জাতের পুরোণো কোষ্ঠীটা ইজ্জদ্ পায় না।

বিবেকানন্দ প্রথম বাঙালী যার নাম “তামাম দুনিয়ায়” ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ১৮৯৩ সনে বিবেকানন্দে’র হুঙ্কারে সারা দুনিয়ার লোক,—সাদা, কালো ও হলদে—সকলে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, দক্ষিণ গঙ্গার কিনারায় একটা জাত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাদের কাজকর্ম না দেখিলে, না জানিলে পৃথিবী দরিদ্র থাকিয়া যাইবে। তারপর হইতেই, বিশেষতঃ ১৯০৫ সনের গৌরবময় স্বদেশী বিপ্লব হইতেই চলিয়াছে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে—বঙ্গকৃষ্টির, বঙ্গীয় সংস্কৃতির আর বঙ্গসন্তানের দিগ্‌বিজয়। মাত্রাটা অবশ্য অতি ছোট। কুছ পরোয়া নাই। কিন্তু

বাঙালার জয়-পরাজয়, আশা নৈরাশ্যের কাহিনী জগতের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাবে দুনিয়ায় একটা "বাঙালী যুগ" কায়েম হইতেছে।

আজকাল বাঙালীরা নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে-সব গবেষণা করে, তাহার বৃত্তান্ত ফরাসী, মার্কিণ, বিলাতী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, জাপানী কাগজে প্রকাশিত ও বিবৃত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে বিদেশীরা নিজেদেরকে খানিকটা অসম্পূর্ণ মনে করে। ভারতের নানা কেন্দ্রে যে-সব শিল্প-সম্মেলন, বিজ্ঞান-সম্মেলন, সাহিত্য-সম্মেলন, রাষ্ট্র-সম্মেলন, মজুর সম্মেলন হয়, এসবের বৃত্তান্ত যদি ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে পাঠানো যায় তাহা হইলে, এই সকল দেশের লোকেরা সে সব গ্রহণ করিবে, প্রকাশ করিবে, পাঠ করিবে, সমালোচনা করিবে। এই সকল ভারত-সংবাদে বাঙালীর গন্ধও কিছু-কিছু থাকে বলা বাহুল্য।

১৯৩৬ সনে সারা দুনিয়ায়, ইয়োরামেরিকায়, চীন-জাপানে, আফ্রিকায় রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সময় বাঙালীরা নৈরাশ্যে হাবুডুবু সেই সময়েই দিকে-দিকে একটা নবীন ভারতীয় সাম্রাজ্য ভিত্তি গাড়িয়াছে বাঙালী জাতের দৌলতে। অর্থাৎ পাঞ্জাবী বা কনৌজিয়া ঋষিদের "অহমস্মি সহমান" মন্তরটা আজ বাঙালী ঋষিদের বপু হইয়া গিয়াছে। এই বাণী আজ সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হইতেছে বাঙালীর মুখে। অর্থাৎ বাঙালীরা আজ দিগ্‌বিজয়ী।

এই সব দেশী-বিদেশী বঙ্গ-প্রভাব আজও নেহাৎ সামান্য। এই সবের কিম্মৎ বড় বেশী নয়। তাহা লইয়া লাফালাফি করিবার কিছু নাই। তথাপি যদি আমাকে কেহ বলে বাঙালী মরিতে বসিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব বিলকুল উল্টা। আমি বলিব যে, আর্থিক ও আত্মিক পথে এতটা উন্নত অবস্থা বাঙালীর কখনও ছিল কিনা সন্দেহ। সমাজ-শাস্ত্রীরা সকলেই যাঁহার যেরূপ মজি মাপকাঠি লইয়া জরীপ শুরু করুন। এই দিকে অনেকগুলা গবেষণা শুরু হইলে সুখের কথা হইবে।

তবে আমরা উন্নতির বা বাড়তির চূড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছি এরূপ বুঝা ভুল হইবে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবস্থা এখনও আসে নাই। অবশ্য সে অবস্থা কোনো জাতির পক্ষে কোনো দিন আসে না। বৈদিক ঋষিই আবার বলিয়াছেন "অসতো মা সদ্‌গময়।" প্রতি মুহূর্ত্তেই নতুন "সৎ", নতুন "জ্যোতি", আর নতুন "অমৃতের" জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, খাটিতে হইবে, সাধনা চালাইতে হইবে। মানুষ যত বড়ই হউক, যত উঁচুই হউক, তাহার পক্ষে স্বাধীনতার, আলোর, উন্নতির চরম বলিয়া কিছু নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে নতুন স্বাধীনতার জন্য, নতুন জ্যোতির জন্য, নতুন দিগ্‌বিজয়ের জন্য লড়িতে হইবে। হরেক মুহূর্ত্তেই চাই নয়া ঢঙের নয়া সাধনা অর্থাৎ নয়া-নয়া লড়াই। চাই নব-নব সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা, রকমারি স্বর্গীয় অশান্তি।

স্বদেশী যুগে,—১৯০৯ ১১ সনে,—কোনো উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে, বাঙালী জাতির রাষ্ট্রিক ইতিহাস নাই। রাজপুত, শিখ, মারাঠা, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি জাতির মত বাঙালীজাতি রাষ্ট্রিক কর্ম্মক্ষেত্রে গৌরবপূর্ণ কিছু দেখাইতে পারে না। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে সেই মতটা খোদা আছে। তখনও বাংলাদেশে বাঙালীজাতির রাষ্ট্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সেই সময়ে গবেষণার সূত্রপাত হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯১১-১৯১২ সনে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী সুধীরা নানাপ্রকার গবেষণা চালাইতেছেন। আজ এই সকল গবেষণার ফলে বলিতে বাধ্য যে, সেই পুরাতন মতটা অনেকাংশে

ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আনন্দের কথা। এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, বাংলার নরনারীরও রাষ্ট্রিক ইতিহাস আছে। এই বিষয়ে সন্দেহ করা চলিবে না।

বর্ত্তমানে বলিতেছি অন্য ধরণের কথা। সমস্যা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাঙালীজাত অবাঙালী-ভারতীয় নর-নারীকে রাষ্ট্রে, শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কিনা, আর করিয়া থাকিলে কতখানি? দ্বিতীয়তঃ, অভারতীয়-দুনিয়ায়,—যথা এশিয়ায়,—বাঙালীর রাষ্ট্রশক্তি, শিল্পশক্তি, অর্থশক্তি বিদ্যাশক্তি, কলাশক্তি ইত্যাদি শক্তিসমূহ, এক কথায় বঙ্গসংস্কৃতি, প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা, আর করিয়া থাকিলে কতখানি?

প্রত্নতত্ত্বের অতি-ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বলিয়া দিলাম যে, আসাম ও উড়িষ্যার বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় কিছু-কিছু দেখা যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গবেষণা সুরু হইলে আরও অনেক-কিছু বাহির হইয়া পড়িবে বিশ্বাস করি। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল জনপদেই হয়ত বঙ্গীয় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছু কিছু চিহ্নোৎ রাখিয়া ছাড়িয়াছে। অধিকন্তু ভারতের বাহিরে, বর্ত্তমানে একমাত্র তিব্বতে, বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়ের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের পথে বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপময় ভারতে সাধিত হইয়াছে কিনা খতাইয়া দেখা আবশ্যক। তাহা ছাড়া ঘরের কোণে ব্রহ্মদেশ। এই জনপদেও বঙ্গ-প্রভাব বার্ম্মাণ জীবনের কোনো কোনো বিভাগে হয়ত লক্ষ্য করা সম্ভব। ভারতের বহির্ভূত এশিয়ার কোন্ কোন্ মুল্লুকে "বৃহত্তর বঙ্গ" জারি ছিল তাহার গবেষণা বিশেষ জরুরি। বৃহত্তর ভারতের পুষ্টি-সাধনে বৃহত্তর বঙ্গের হিস্যা কিছু-কিছু ছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন-তারিখসহ অকাট্য প্রমাণের জোরে সেই হিস্যাটা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এই দুই দিক্‌কার কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙালীজাতির প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে সকল মত প্রচার করিতেছি তাহা হয়ত বদলাইতে পারিব।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা ভারতবর্ষের ভিতর কোথায় কবে কতখানি সৃষ্টিশক্তি দেখাইয়াছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ খতিয়ান চাই। অধিকন্তু ভারতের বাহিরে বাঙালী স্রষ্টারা কোন যুগে কতটা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পরিচয় দিয়াছে তাহারও হিসাব নিকাশ আবশ্যক। এই দুই দিকেই বর্ত্তমানে কিছু কিছু ঠারে-ঠোরে বলা চলে মাত্র। বিষয়টার দিকে কোনো সুনিয়ন্ত্রিত চর্চ্চা অনুষ্ঠিত হইতেছে এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙালীজাতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার বেলায় বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে প্রত্ন-তত্ত্ব ও ইতিহাসের শরণাপন্ন হইতে হইল। উন্নতি-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আর বিশেষতঃ বাংলার নরনারীর উন্নতি-অবনতি জরীপ করিবার জন্য ঐতিহাসিক মালমশলার দিকেও নজর ফেলা আবশ্যক। সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে ইতিহাস-নিরপেক্ষ আর প্রত্নতত্ত্ব-নিরপেক্ষ হওয়া চলিবে না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে কলা দেখাইলে সমাজ-শাস্ত্রীদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে।

বাড়্‌তি বা উন্নতির গোড়ায় আর একটা সমস্যা আছে। পূর্ব্বেই একবার সেকথা উল্লেখ করিয়াছি। সন্দেহ উঠিয়াছে—বাঙালীজাতটা বাঁচিবে কিনা। বাংলার নরনারী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে,—না খাইয়া মরিতে-মরিতে আজ-না-হয় কাল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে, এই ধরণের সন্দেহ একালের বাঙালী পণ্ডিতের পেটে ঢুকিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান জগতে "বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়" সম্বন্ধে,—একালের দুনিয়ায় "বাঙালীর যুগ" প্রতিষ্ঠা

সম্বন্ধে—যে লোকটা বকিতে চায় তাহার পক্ষে বাঙালী জাতের মরা বাঁচার কথাটা আগে সমঝিয়া লওয়া আবশ্যক। খুব সোজা যুক্তি লওয়া যাউক। ভাতের অর্থশাস্ত্রে প্রবেশ করিতেছি। কেন না বাংলার নরনারী—প্রধানতঃ ভাত খাইয়া জীবন-ধারণ করে। অবশ্য ডাল, শাকসব্জী, তরকারী, মাছ, ফল, দুধ, মাংস, ডিম, গম, যব, ভুট্টা, গুড, তেল, ঘী ইত্যাদি কোনো বাঙালী বৎসরের কোনো দিন কোনো বেলা চোখে দেখে না এরূপ বুঝিতে হইবে না। অধিকন্তু বাংলার নরনারী একদম কপর্দ্দকহীন এরূপ বুঝিবারও কারণ নাই। দরকার হইলে ট্যাকের কড়ি খরচ করিয়া জীবন ধারণের জন্য নানা জিনিষ খরিদ করিতে আর বিদেশ হইতে আমদানি করিতেও অনেক বাঙালী সমর্থ সন্দেহ নাই। দারিদ্র্যের প্রকোপ যতই হউক না কেন ১৯৩০-৩৮ সনের বাঙালিকে একমাত্র চাউল-সম্বল বিবেচনা করিলে অ-বাস্তবের উপর ভর করিতে হইবে। তাহা করিবার দরকার নাই। তথাপি সম্প্রতি একমাত্র চাউলের পরিমাণ দেখাইয়া বাঙালী জাতের পরমায়ুটা কষিয়া দেখিব।

অতএব একবার বাংলা দেশের জেলায়-জেলায় পায়চারি করিয়া আসা যাউক। অধিকন্তু সরকারী চাষ বিবরণীও আছে,—যদিও অপ্রকাশিত। তাহাতে জানা যায় কোন্ জেলায় কত চাউল আজকাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোন্ জেলায় লোকসংখ্যা কত তাহাও জানা আছে। আলোচনা-প্রণালী বুঝাইবার জন্য কয়েকটা মাত্র জেলার বৃত্তান্ত দিয়া যাইতেছি। সবই মোটা হিসাবের কারবার। সূক্ষ্মতর হিসাব চালাইলে পুরাপুরি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। সেদিকে সমাজ-বিজ্ঞানের তরফ হইতে সম্প্রতি পা বাড়াইতে চাই না। কয়েকটা অর্থনৈতিক সংখ্যা সমাজ-বিজ্ঞানের আখড়ায় ফেলিয়া সামাজিক উন্নতি তত্ত্বের বনিয়াদ যে জীবন মরণ তত্ত্ব সেই জীবন-মরণ তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ কাঠামটা দেখাইব মাত্র। এইদিকে গবেষকদের নজর টানিয়া আনাই প্রধান মতলব। আমার মতামত কাহাকেও বিনা বাক্য-ব্যয়ে হজম করিয়া লইতে বলিতেছি না।

মেদিনীপুর জিলায় ২৮ লাখ লোক। এখানে চাউল উৎপন্ন হয় ৩৭০ লাখ মণ। কিন্তু খাদক হিসাবে এই জেলার লোকসংখ্যা কত? আমার বিবেচনায় ২৮ লাখ লোক ধরা চলিবে না। কেননা সাধারণতঃ ১৫ বৎসর বয়সের যাহারা নীচে তাহাদিগকে আধা মানুষ ধরিতে হইবে। আবার বৎসর ৫৫ যাহার পার হইয়াছে তাহারাও প্রবীণ (অর্থাৎ ১৫—৫৫ বয়সের) লোকের আধা আধি খায় এইরূপ ধরা যাইতে পারে। আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে ১৫ বৎসর বয়সের নীচের শিশু ও ছেলেমেয়েরা আর ৫৫ বৎসর বয়সের উপরের বুড়া-বুড়ীরা গুণতিতে ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়সের স্ত্রীপুরুষের প্রায় সমান। অর্থাৎ ১৫—৫৫ বয়সের লোক ২৮ লাখের অর্দ্ধেক বা ১৪ লাখ। অন্যান্য বয়সের লোকেরা ১৪ লাখ। কিন্তু খাদক হিসাবে তাহারা আধা মানুষ। কাজেই গুনতিতে তাহারা ৭ লাখ মাত্র। সুতরাং মেদিনীপুর জেলায় লোকসংখ্যা ২৮ লাখ হইলেও খাদকহিসাবে সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৪ লাখ আর ৭ লাখ অর্থাৎ ২১ লাখ মাত্র। অতএব দেখিতেছি যে, ২১ লাখ লোকের জন্য মজুত ৩৭০ লাখ মণ। গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু প্রায় দুই সেরের কাছাকাছি পড়িতেছে।

এই ধরণের হিসাব চালাইলে নোয়াখালি জেলায় মাথা পিছু চাউল পড়ে দৈনিক ১½ সের। দিনাজপুরে পড়ে ১½ সের, ফরিদপুরেও ঐরূপ। জলপাইগুড়ি আর ময়মনসিংহে ইহার চেয়ে সামান্য কম, আর বাখরগঞ্জে কিছু বেশী। চব্বিশ পরগণায় আর ঢাকা জেলায় গড় দৈনিক মাথাপিছু দাঁড়ায় ⅞ সের অর্থাৎ একসেরের কিছু কম। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এই চার জেলায় গড়

একসের। ইত্যাদি। সব কয়টা জেলার হিসাব দেওয়া বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো জেলায়—যথা হুগলি—বেশ কিছু কম উৎপন্ন হয়।

বাঙালী স্ত্রীপুরুষেরা,—১৫ ৫৫ বৎসর বয়সের প্রবীণদের কথা বলিতেছি,—এক এক বেলায় কতটা চাউলের ভাত খায় এই সম্বন্ধে পাকা গবেষণা আজও হয় নাই। পাড়ায়-পাড়ায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনুসন্ধান চালানো উচিত। কেন না পেশা হিসাবে, রুচি হিসাবে বরাদ্দ বিভিন্ন। প্রবীণ লোকদের কেহ খায় ফি বেলা আধপোআ চালের ভাত, কেহ খায় এক পোআ, কেহ দেড় পোআ, কেহ আধসের। শুনিয়াছি কাহারও কাহারও মাত্রা তিন পোআ আর এমন কি একসের পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকে। জেলখানায় কয়েদিদের জন্য গড় হিসাব দেড় পোআ। বুঝিতেছি যে, বৈচিত্র্য আছে ঢের। এই সম্বন্ধে পাঁচ, চার বা সাড়ে তিন কোটি লোকের উপর আন্দাজ চালাইতে যাওয়া অতি-সাহসের কাজ। একসেরি পালোয়ান বাংলা দেশের চাষী বা মজুর মহলে কত হাজার গুনিয়া দেখা মন্দ নয়। আবার জেল-বয়েদিদের মত দেড়পোআ খোরাকওয়ালা লোক কয় লাখ তাহাও জানিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বহু জেলার বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুঝিয়াছি যে, বোধ হয় মাথা পিছু ফি বেলা পোআটেক চাউলের হিসাব ধরা চলিতে পারে। এই আন্দাজেও ভুলচুক থাকিবার কথা। তবে একপোআ অসম্ভব-কমও না, অসম্ভব-বেশীও না।

যাহা হউক এক-এক বেলা এক এক পোআ ধরিলে জনপ্রতি চাউল দরকার হয় রোজ আধসের। কিন্তু যে-কয়টা জেলার বৃত্তান্ত দেওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সব জেলায়ই মাথাপিছু দৈনিক গড় একসেরের বেশী ছাড়া কম নয়। অবশিষ্ট জেলাগুলার অবস্থাও এইরূপই দেখিয়াছি। দুইএক জেলায় কিছু কমও হয়। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, না খাইয়া মরিবার অবস্থায় অধিকাংশ জেলার নরনারী আসিয়া দাঁড়ায় নাই।

অবশ্য আরও সূক্ষ্ম বিচার চালানো উচিত। জেলায় জেলায় আমদানি-রপ্তানি আছে, প্রদেশে-প্রদেশে আমদানি-রপ্তানি আছে। তবে এই কথাও জানিয়া রাখা ভাল যে, যে জেলায় কম উৎপন্ন হয়, আমদানি-রপ্তানির ফলে সেই জেলার লোক চাউলের অভাবে মরে না, যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত গোটা বাংলা দেশের পাঁচকোটি দশ লাখ লোকের জন্য কত চাউল দেশের ভিতর থাকিয়া যায় তাহার পরিমাণও বাহির করা আবশ্যক। সেই সব দিকেও কিঞ্চিৎ কিছু অঙ্ক কষিয়া দেখিয়াছি। বাঙালী স্বদেশ সেবকদের পক্ষে এই দিকে মাথা খাটানো আবশ্যক। এই বিষয়টা অর্থনৈতিক গবেষণার যোগ্য বস্তু। অনেকগুলা মাথা এই দিকে খেলিলে ভাল হয়। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

বাঙালী জাতের পাঁচকোটি দশলাখ নরনারীর ভিতর আসল খাদক কত তাহা বাহির করিবার জন্য আগেকার কায়দা খাটাইব। সেই কায়দা খাটাইয়া পাই ২ কোটি ৫২½ লাখ আর ১ কোটি ২৫¾ লাখ, মোটের উপর ৩ কোটি ৮¼ লাখ মাত্র। জনপ্রতি আধসের করিয়া রোজ ধরিলে এই তিন কোটি সওয়া আট লাখ নরনারীর জন্য চাই ৬০ লাখ টন চাউল। কিন্তু বাংলাদেশে চাউল উৎপন্ন হয় ৮৮ লাখ টনের বেশী। হিসাব বুঝিবার জন্য ২৮ মণে টন লইতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, মানুষের উদরসাৎ হইবার পরেও চাউল বেশ কিছু বাঁচে। এইবার বলিব যে, চাষীদের জন্য ক্ষেতের বীজ আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি লাগে আন্দাজ সাড়ে তিন সের। প্রায় ২২ লাখ একরের জন্য (১ একর = তিন বিঘা) চাই আড়াই লাখ টনের কিছু কম। দেখা যাইতেছে যে, চাষের জন্য

নেহাৎ অল্প মাত্র বীজ আবশ্যক হয়। তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বাংলা দেশ হইতে রপ্তানি হয় যত চাউল, তাহার পরিমাণ নেহাৎ কম। বিদেশ হইতে যে চাউল আমদানি হয় তাহার হিসাব করিলে রপ্তানিও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

আসল কথা, বাঙালীর খাই-খরচার যত লাগে তাহার চেয়ে বেশকিছু বেশী চাউল বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় এবং থাকিয়া যায়। অর্থাৎ দরকার হইলে কয়েক লাখ লোককে ফি বেলায় এক পোআর ঠাঁইয়ে এমন কি দেড় পোআ পর্য্যন্ত দিলেও বঙ্গজননীর হাঁড়ী অন্নপূর্ণার হাঁড়ীই থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে বাঙালী যত গরীবই হউক, বাংলাদেশে ভাতের পরিমাণ সমগ্র জাতের পক্ষে কম নয়। ভাতের অভাবে বাঙালীকে মরিতে হইবে না। ভাত ছাড়া অন্যান্য জিনিষও অবশ্য আছে ধরিয়া লইয়াছি। তবে "দুধে ভাতের" অবস্থা যাহাকে বলে বাঙালী সেই স্বর্গ-সুখে নাই। কিন্তু আজও "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা ভরা আহ্লাদে।" দারিদ্র্য ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও অনেক দিন থাকিবে। তবে মরিবার অবস্থা এ নয়। সাহসের সহিত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া চলা কর্ত্তব্য। দারিদ্র্য-বিহীন সম্পদ্ আর লড়াই-বিহীন উন্নতির কল্পনা করা অসাধ্য।

জেলার ভিতর অথবা বাংলাদেশে যথেষ্ট চাউল উৎপন্ন হইলেই যে হরেক জেলার প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ বনিতা নিজ নিজ পেট পুরিবার মতন ভাত পাইবে এমন কোনো কথা নাই। কেননা দুইবেলা আঁচাইবার যোগ কোনো লোকের কোষ্ঠীতে লেখা আছে কিনা তাহা পল্লী-কিষাণের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাহা নির্ভর করে প্রত্যেক লোকের রোজগার করিবার ক্ষমতার উপর আর রোজগারের পরিমাণের উপর। ধন-বিতরণ বা সম্পদ্-বণ্টনের মামলায় আসিয়া পড়িলাম। রোজগারের সুযোগ যদি না থাকে অথবা মেহনতের মাপে রোজগার যদি না জুটে তাহা হইলে বাড়ীর পাশে মুদীর দোকানে মণ মণ চাউল বস্তাবন্দি হইয়া পচিলেও,—হাজার-হাজার লোক দুর্ভিক্ষে মরিতে পারে। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিবামাত্র জেলার ভিতর কোথাও চাউল নাই অথবা বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয় না যখন-তখন এরূপ সমঝিয়া রাখা ঠিক হইবে না। "না" "না" করিতে-করিতেও শেষ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানের আসল সমস্যার ভিতরই আসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, বুঝা গেল যে, ধনবিজ্ঞানের কোনো কোনো কোঠে আসিয়া সমাজশাস্ত্রীদিগকেও মাঝে-মাঝে পাঁয়তারা ভাঁজিতে হয়। বাংলার সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা-কারীদের পক্ষে ধনবিজ্ঞানসেবীদের সঙ্গেও ভাব রাখিয়া চলা দরকার হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শ্যাল মিউজিয়াম হইতে প্রকাশিত "কম্পেণ্ডিয়াম" বিবরণীতে (১৯৩১) বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ দেওয়া আছে। সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে, অকণ্ডশা বাংলা সরকারের কৃষি-দপ্তরের অপ্রকাশিত তথ্য ও সংখ্যা-তালিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সংবাদ

বেদান্ত সোসাইটি, হলিউড্, লস্ এঞ্জেলস্, (ক্যালিফর্নিয়া)—গত ৭ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিন প্রাতে এখানকার নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। মন্দিরটি লস্ এঞ্জেলস্ নগরের হলিউড্ নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। চূড়াগুলির প্রাচ্যদেশীয় বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাস্তা হইতে মন্দির পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত সুবিন্যস্ত পথ, প্রবেশদ্বারের উপর গম্বুজ এবং তাহার উপর সোনালী চূড়া। ঠাকুর ঘরের উভয় পার্শ্বে দুইটি কক্ষ আছে। একটি লাইব্রেরী এবং অপরটি অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত।

হিন্দুমন্দির, হলিউড্
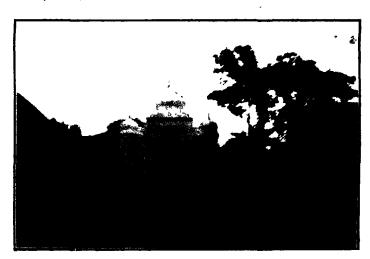
১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্বামী প্রভবানন্দের সুদক্ষ নেতৃত্বে লস্ এঞ্জেলস্ বেদান্ত সোসাইটি স্থাপিত হয়। স্যানফ্র্যান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দের সহযোগিতায় সম্প্রতি এই সোসাইটি হইতে "দি ভয়েস্ অব ইণ্ডিয়া" (ভারতের বাণী) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্দির-প্রতিষ্ঠা সোসাইটির কর্ম্মোদ্যমের একটি বিশেষ অধ্যায়।

মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত। পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা সমূহ হইতে ইহার গম্বুজ ও নাটমন্দির (auditorium)-এ দেড়শত লোক বসিতে পারে।

নবমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যথারীতি ঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। প্রভিডেন্স হইতে স্বামী অখিলানন্দ ও স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আসিয়া যথাক্রমে পূজকের কাজ ও চণ্ডী পাঠ করেন। স্বামী অশোকানন্দ ছিলেন তন্ত্রধারক। পোর্টল্যাণ্ড কেন্দ্রের স্বামী দেবাত্মানন্দ গীতা পাঠ এবং ডেন্ভারের স্বামী বিবিদিষানন্দ রন্ধন কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। যথারীতি হোমের পর ভোগ হয়। পদাগ্র,

তরকারী, পাপর, পায়েস প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল। পরদিন শেষরাত্রে স্বামীজিগণ সকলে একসঙ্গে বিরজা হোম করেন।

১০ই জুলাই তারিখে সাধারণ অনুষ্ঠান হয় এবং ইহাতে তিনশতাধিক বিশিষ্ট লোক যোগদান করেন। বন্ত্রসঙ্গীতের পর অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ সোসাইটি ও মন্দিরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দান করেন। স্বামীজিগণ প্রত্যেকে বেদান্তের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় অক্সিডেন্ট্যাল্ কলেজের অধ্যাপক হাউস্টন্ সুচিন্তিত বক্তৃতা দান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। সভার পর সকলকে খিচুড়ি, জিলিপি ইত্যাদি প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের সময় সকলে সমবেতভাবে স্তোত্র পাঠ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হবিগঞ্জ, (শ্রীহট্ট)—গত ২০শে শ্রাবণ, হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীমৎ-স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের আশীর্ব্বাদপূত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি ইষ্টকখানি বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সৌম্যানন্দ কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। শ্রীহট্টের কনক্রিট্ (Concrete Construction) কোম্পানীর অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত হৃষীকেশ চন্দ্র চৌধুরী, বি-এস্ সি মহাশয়ের অক্লান্ত উদ্যম ও পরিচালনায় মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির হবিগঞ্জ

উৎসব দিবসে পত্র-পুষ্প ও গৈরিক পতাকা সুসজ্জিত সুদৃশ্য মন্দিরখানি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া-

ন। প্রত্যুষে ৪॥ ঘটিকায় ঊষাকীর্ত্তন ও বাস্ত ...পর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহীভক্তগণ ...নিক শঙ্খধ্বনি এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে ...র, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজি মহারাজের ...কৃতি পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে নবনির্ম্মিত ...ন্দিরে স্থাপন করেন। অতঃপর চণ্ডীপূজা, চণ্ডীপাঠ, ...বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা এবং ঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী ও স্বামীজি মহারাজের ষোড়শোপচারে পূজা ও ...হোম হয়।

এই উপলক্ষে সমস্ত দিবসব্যাপী কালীকীর্ত্তন, শ্যামসঙ্গীত, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক ভজনে আশ্রম মুখরিত ছিল। সান্ধ্য আরাত্রিকের পরও রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ভজন হইয়াছিল। হবিগঞ্জ শহর ও মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দেড় হাজার মেয়ে ও পুরুষ ভক্ত আসিয়া প্রসাদগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জ ও শিলচর আশ্রমের স্বামী সৌম্যানন্দ, স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও স্বামী পুরুষাত্মানন্দ যোগদান করিয়া উৎসবটিকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

স্বামী নিখিলানন্দের সম্বর্দ্ধনা—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দকে কলিকাতার নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য গত ৮ই সেপ্টেম্বর সায়াহ্নে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এত লোক হইয়াছিল যে, স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। স্বামী নিখিলানন্দ যখন হলে প্রবেশ করেন তখন জনতা বিপুল আনন্দ ধ্বনির সহিত তাঁহাকে অভিনন্দিত করে ও একটি বালিকা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে।

ভারত-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের গায়কগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে স্যার্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় আমেরিকায় স্বামী নিখিলানন্দের বেদান্ত-প্রচার কার্য্যের প্রশংসামূলক একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন :—

সাত বৎসর চেষ্টার ফলে আমেরিকায় যদি আমি কিছু করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবে আমেরিকাবাসীরাই তাহার প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত। ভারতের বাণী সে দেশে প্রচারের

স্বামী নিখিলানন্দ

মূলে রহিয়াছে তাঁহাদের অনুরাগ, উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা। আমেরিকা আদর্শবাদের কেন্দ্রভূমি। ঐহিক উন্নতি তাঁহাদের আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, পশ্চিমে বিজ্ঞান নব নব আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু সত্যের আলোক বিকাশ হয় প্রাচ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের

সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের বাণী আমেরিকার প্রগতিশীল মনের উপর প্রচণ্ড আঘাত করে। যে চাবিটি আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা হইতেছে—ধর্ম্মের সমন্বয়, মানুষের দেবত্ব, আত্মার অসীমত্ব এবং একেশ্বরবাদ। কেবল জড়জগৎ নহে, অধ্যাত্ম জগতেও বিশ্ব একে লীন হইয়াছে। প্রজ্ঞার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতাসম্ভূত বহু জ্ঞানের লোপ হয়। একেশ্বরবাদ হইতেই ভালবাসা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির উদ্ভব হয়।

মানুষ দেবশিশু, মানবাত্মা অবিনশ্বর, অসীম এবং সৌন্দর্য্য, প্রেম ও জ্ঞানের আধার। জড়তা ও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুষ্কৃতি মানুষের দৈবপ্রকৃতির মধ্যে একখানা আবরণ টানিয়া দেয় মাত্র কিন্তু দেবপ্রকৃতিকে বিনাশ করিতে পারে না। সৎকার্য্য বা সুনীতি সেই দৈবপ্রকৃতিকে পুনঃপ্রকাশ করিতে সাহায্য করে। যে কাজ মানবচিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া বহুর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহাই অসৎ।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বর্ত্তমান জগতে বেদান্তের দান। পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা জগৎকে কলুষিত করিয়াছে। নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ ও ঘৃণা বিস্তার লাভ করে। যে ধর্ম্মে প্রেমের বিকাশ হয়, সেই ধর্ম্ম আজ কোথায়? অবশ্য প্রত্যেক ধর্ম্মই ভগবানের কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধন করে। কিন্তু পবিত্রতা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সকল ধর্ম্মেই পবিত্রাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্ব লইয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ বাধে।

মধ্যযুগে লোকে বিশ্বাস করিত,—ভগবান একজন খামখেয়ালী শাসন-কর্ত্তা। আজকাল ভগবানকে শক্তিরূপে কামনা করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। মানবের উন্নতি সাধন দ্বারাই বিজ্ঞানের সাফল্য সূচিত হয়। বিজ্ঞান ধর্ম্মের গোঁড়ামি হইতে ইউরোপের মনকে মুক্ত করিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্য না পাইলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা নিষ্ক্রিয় নীতিতেই আবদ্ধ থাকিত। বিজ্ঞান মানুষের মনকে নব নব সত্যবিকাশের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখে। যথার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়বাদ বা অন্য কোন বাদের সংস্রব নাই।

আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে স্ব স্ব গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া মিলনের পটভূমি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যান্ত্রিকতা ও অনির্ব্বচনীয়তার সামঞ্জস্যের উপর জগতের শান্তি নির্ভর করে। লীগ্ অব নেশনের ব্যর্থতা জগতের ইতিহাসে এক শোচনীয় ব্যাপার। কোন কোন ক্ষেত্রে লীগ, 'ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মেষ শাবকের' বিনাশ সমর্থন করিয়াছে। ইউরোপের আসন্ন সংগ্রামের পরিণতি কি হইবে ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। পাপ কাজ করিলে এখন লোকে তাহার পূজা করে। ভারতীয় চিন্তাধারার বামপন্থীরা মনে করেন, ইউরোপ হইতে সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজম্ আমদানী করা একান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইউরোপে এখনও উহার শেষ পরিণতি দেখা দেয় নাই। মানুষের ভ্রাতৃত্বকে বাদ দিয়া ইউরোপ বহু শত বৎসর ধরিয়া ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া এখন তাহারা ঈশ্বরের পিতৃত্বকে বাদ দিয়া মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা মনে করে, তাহারা যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। যিশু তাঁহার ভক্তদিগকে নিজেদের দোষ ত্রুটির জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কমিউনিজম্ প্রতিবেশীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিতে উপদেশ দিতেছে। যাহারা উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকে দলিত করিতে কমিউনিজম্ প্ররোচিত করে। জড়ত্বকে ভিত্তি করিয়া এই মতবাদ মানুষের একত্ব সাধন করিতে চাহে এবং মানুষের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে বাধা প্রদান করে। সুতরাং জাতির মুক্তি-

...নে কমিউনিজম্ কোন কাজেই আসিবে না। ...রোপ একটা ভাল জিনিসকে কুৎসিত আকার ...দান করিয়াছে।

হিন্দুজাতির সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে স্বামীজী ...লন যে, বহু নিন্দিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মত সমাজ-...বস্থা মানবজাতি এই পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে ...রে নাই। এই ব্যবস্থায় সমাজে স্বার্থসংঘাত ঘটিত না। সেবা ও ত্যাগই যে জয়যুক্ত হয়, ...র্ণাশ্রম ধর্ম্ম তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

উপসংহারে বক্তা বলেন যে, তাঁহার আশা, এই ভারত আবার জগতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত জগৎকে পরিচালনা করিবে। এই সনাতন ধর্ম্মই জগতের যাবতীয় সমস্যা যথা—নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেন :—

স্বামী নিখিলানন্দ গত সাত বৎসর যাবৎ আমেরিকায় যে প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য ...নি সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। জগতের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় স্বামী বিবেকানন্দের দান অতুলনীয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জগতের জাতি সমূহের মধ্যে মিলন ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। আজ পৃথিবীর এক প্রান্তের বার্ত্তা দুই মিনিটের মধ্যে অপর প্রান্তে পৌঁছিতেছে। কমিউনিজম্ মতবাদ প্রচারের ফলে পৃথিবীতে নূতন ভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাতে বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে মিলন ও একত্ব সাধিত হইয়াছে কি? বিশ্বে আজ শান্তি নাই, কারণ আধ্যাত্মিকতার পটভূমি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদ মুক্তির বাণী প্রচার করিলেও জাতিসমূহ পরস্পর অধিকতর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যখনই শুনি কেহ বলে,—আমাদের ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন বা উহা করিয়াছেন, তখনই মনে হয়, জড়বস্তুর জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছিবার বৃথা চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু ভারতের ঋষিরা গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সত্য উপলব্ধি করিতেন। তাঁহারা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, মানব চেষ্টা করিলে ভাগবৎ সত্তার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে এই সত্তাকে ভারতবাসী জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারে নাই। গ্রীস ও রোমের সভ্যতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারত ও চীন আজও তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, কারণ ভিতরের উৎস তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

আত্মসংযম ও আত্মপরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি বড় হইতে পারে না। ইহাই ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি। বাহ্যবস্তু ও মিথ্যাচারের পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। বাহ্যবস্তু আত্মা বলিয়া যখন জাতি ভুল করে তখন জাতি ও সভ্যতার ধ্বংস না হইয়া পারে না। স্বার্থের ঊর্দ্ধে না উঠিলে সত্যের সন্ধান মিলে না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমাজব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে, তাহার সমর্থন করা যায় না। কারণ জনসাধারণকে শোষণ করিয়া উহা গড়িয়া উঠিয়াছে। কমিউনিজম্ সাম্যবাদ প্রচার করে। কিন্তু ধন-জনের প্রাচুর্য্য দ্বারা মানুষের সুখ ও সন্তোষ সাধিত হইতে পারে না। জড়বস্তু হইতে সুখ ও সন্তোষের উন্মেষ হইতে পারে না। সেইজন্য পৃথিবীব্যাপী অশান্তি দেখা দিয়াছে। ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। সেজন্য মানুষ আধ্যাত্মিকতা খোঁজে, জড় জগতের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষের অন্তরে সুখ ও শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন না করিলে ভারতের মুক্তির আশা নাই।

রামকৃষ্ণ মিশন জনসাধারণের মন হরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে এইজন্য যে, উহা মিথ্যার পূজারী নহে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা স্বার্থপরতার প্রকার-ভেদ মাত্র। অধ্যাত্ম জীবন যাপন করিয়া মানব সমাজকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন তাহাই করিতেছে। তাঁহারা ভারতীয় সভ্যতার ও কৃষ্টির প্রতীক। আমেরিকাবাসীর নিকট তাঁহারা অনুভূতির এমন একটা দিক প্রচার করিতেছেন, যাহার মধ্যে নিঃস্বার্থতা ও নিরাপত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। মিশনের সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। উপসংহারে বক্তা স্বামী নিখিলানন্দকে নিউইয়র্কে তাঁহার কার্য্যের জন্য ও জগতে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ সাধন-প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সর্বশেষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয় স্বামী নিখিলানন্দকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন আমেরিকায় যে বিপুল কর্ম্ম প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা-সেবাকার্য্য

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা-সেবা-কার্য্যের সপ্তম সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। এই সপ্তাহে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমাধীন নিজরা ও শিলনা সেবাকেন্দ্র হইতে রঘুনাথপুর, উলপুর, সাতপাড়া ও ডুমুরিয়া ইউনিয়নের ৪৪ খানা গ্রামের ২৮২৯ জন আর্ত্তের মধ্যে ১০৪ মণ ৮ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বসপ্তাহে এই সেবাকেন্দ্রদ্বয় হইতে ৩৯ খানা গ্রামের ২৪৫১ জন গ্রামবাসীর মধ্যে ৯০ মণ চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। এইরূপে ক্রমেই মিশনের সেবাকার্য্য বিস্তার লাভ করিতেছে।

বন্যাপীড়িত দরিদ্র গ্রামবাসীদের অবস্থা এখনও শোচনীয়। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বন্যার জলে শতকরা প্রায় ৯৫টী গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিগণ চাউল লইবার জন্য নৌকা করিয়া আসে। সেবাকার্য্য পরিচালনের জন্য সম্প্রতি আমাদের সপ্তাহে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা দরকার।

মালদহ কেন্দ্রেও সেবাকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই কেন্দ্র হইতে প্রতি সপ্তাহে ৪৫ মণ চাউল বিতরণ করা হইতেছে।

এখনও জল বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই লোকের দুর্দ্দশা চরম সীমায় উঠিবে। তখন দুর্ভিক্ষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাউলের পরিমাণও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহারা তাঁহাদের দেশবাসী দুঃস্থ ভ্রাতা-ভগিনী-দিগকে বন্যার করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন।

এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :—

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়মঠ,
জেলা হাওড়া।

কার্য্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈতাশ্রম,
৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন অফিস,
১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাক্ষর—স্বামী মাধবানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

গিরিশচন্দ্র

শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর

পতিতপাবন প্রভু পরমহংসের বাণী
লভেছে কোথায়
সব চেয়ে পূর্ণরূপে সার্থকতা, কেহ যদি
আমাকে শুধায়,—
হে গিরিশ রসরাজ, কবির তোমার নাম
অকুণ্ঠিত চিতে,
আপনি তরিয়া তুমি কে না জানে, চিরদিন
তরেছ পতিতে ?
পশ্চিমের প্রভাবিত লোকায়ত জড়বাদ
শাসিছে ভুবন,
লালসার পঙ্ককূপে লুটায় শূকররূপে
এ পৌর জীবন।

অলস বিলাস ভোগে সর্ব্বগ্রাসী ভবরোগে
সবে মুহ্যমান
তার মাঝে কে শুনিবে আত্মার কল্যাণ বাণী,
প্রভুর আহ্বান ?
হে কৌশলী কলকণ্ঠ একথা বুঝিতে তুমি,
রসাল শাখায়
বিলাসের কুঞ্জবনে অন্তরে গোপন করি
বাঁধিলে কুলায়।
লীলায় খেলায় রঙ্গে নৃত্যগীতি নানা ঢঙ্গে
ভুলাইয়া ধীরে
আনিলে হে নটরাজ সবারে মন্দিরতলে
সুরধুনী তীরে।
নিভৃতে গোপনে দেশে রঙ্গরসে ছদ্মবেশে
দিয়াছ যে ধন
তার পরিমাণ কেহ জেনেছে কি ? জানে শুধু
জাতীয় জীবন।
মঠে মঠে বিঘোষিত ইতিহাসে প্রকাশিত
অনেকেরই কথা
জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে তব মন্ত্রবাণী
লভে সার্থকতা।

—০—

মহাত্মা কংফুচের কথা

সম্পাদক

চীন দেশের সর্ব্বত্র তাও কংফুচ্ ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। চৈনিক জীবন এই তিনটী ধর্ম্মমতের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ চীনা-ভদ্রলোক তাঁহাদের বৈঠকখানায় করুণার মূর্ত্ত-প্রতীক বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া পূজা করেন, রান্নাঘরে তাওধর্ম্মোক্ত দেবতা স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মহাত্মা কংফুচের উপদেশ ভক্তিসহকারে পাঠ করেন। ইদানীং অনেক চীনাদের সদর দরজায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রতীক ক্রুশচিহ্ন বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চীনের কয়েকটী প্রদেশে ইস্‌লাম ধর্ম্মও বর্ত্তমানে ক্রমেই মস্তকোত্তোলন করিতেছে। সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন চৈনিক জাতির বিশেষত্ব। সকল শ্রেণীর চীনদেশ-বাসীর উপরই মনস্বী কংফুচের অসাধারণ প্রভাব বর্ত্তমান। এই সর্ব্বজনপূজ্য মহাপুরুষ সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য অতি সহজ ও সরল ভাষায় ধর্ম্মের সারনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে এই মহাত্মার কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কংফুচ্ খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে চীনসম্রাট কিং-লিং-এর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। খৃঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগের পরবর্ত্তী বৎসরে কাং নামক জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক এই মহাপুরুষের প্রথম মন্দির নির্ম্মিত হয়। কংফুচ মতাবলম্বী চীনসম্রাটের আদেশে ৬৩০ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের প্রত্যেক প্রদেশে ও জেলায় কংফুচ্ ও তদীয় শিষ্য য্যান্-য়্যুয়ানের অসংখ্য মন্দির গড়িয়া উঠে। চীনের বিখ্যাত মিং-বংশের রাজত্বকালে এই মন্দিরগুলি 'গ্রন্থ-মন্দিরে' (Temples of Literature) পরিণত হয়। চৈনিক সাধারণ-তন্ত্রের পরিচালকগণ মহামনীষী কংফুচের মহত্ত্বকে কেবল গ্রন্থে বা কলাবিদ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত মনে না করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির-গুলিকে পুনরায় কংফুচ্-মন্দিরে পরিণত করেন।

চীনের বিখ্যাত তাওধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা লাউৎজে কংফুচের শিক্ষাগুরু ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে গুরু শিষ্যের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। চীনদেশে জনশ্রুতি আছে যে, লাউৎজে পক্ক কেশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সকলকে অপ্রতিকার ভাবাবলম্বন করিয়া চলিতে উপদেশ দিতেন। কংফুচ্ ধার্ম্মিকতপস্বী বলিয়া পরিচিত হইয়াও অপ্রতিকারে বিশ্বাস করিতেন না। এ জন্য লাউৎজে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের তপস্বীর মৃত্যু না হলে দেশ হতে দস্যুতা দূর হবে না।" এই উপদেশের অর্থ এই যে, অপ্রতিকার ভাবালম্বনই সকল বিষয়ের প্রতিকারের উপায়। মহাত্মা লাউৎজে ধর্ম্ম, কংফুচ্ নীতি ও মানবতা এবং তাও রাহস্যিকগণ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ এই তিনটীকে পরিপাক করিয়া চীনের সমষ্টি জীবনে উহাদিগকে কাজে লাগাইয়াছেন।

কংফুচ সম্প্রদায়ের সর্ব্বজনপ্রিয় "লাং-য়্যু" নামক গ্রন্থে কংফুচের উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। "মহৎ শিক্ষা" (The Great Learning) ও "সুবর্ণ পন্থা" (The Golden Path) নামক ধর্ম্মপুস্তক দুইখানি কংফুচ্ মতাবলম্বিগণের বিশেষ

প্রিয়। ইহা ছাড়া কংফুচের অন্যতম প্রধান শিষ্য মেন্‌সিসের উপদেশ সম্বন্ধে সাতখানি পুস্তক আছে। ধর্ম্মপ্রাণ চীনাগণ এই পুস্তকগুলি শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। চিং বংশের প্রথম সম্রাট চীনের সকল ধর্ম্মমতকে বিনষ্ট করিয়া নিজস্ব এক অভিনব মতস্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশের সকল ধর্ম্মপুস্তক পোড়াইয়া ফেলেন। ইহার ফলে কংফুচ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ চিরতরে নষ্ট হয়। কংফুচ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কংফুচ ত্যাগ তিতিক্ষাপরায়ণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি বাগ্মিতা ও সাধুত্ব ছিল অসাধারণ। অহংজ্ঞানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। তিনি বলিয়াছেন, "আদি স্রষ্টা নই, আমি প্রাচীন মহাত্মাদের মত প্রচার করি, আমার নিজস্ব কিছু নাই, আমি প্রচারক মাত্র।"

কংফুচের একজন শিষ্যকে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, "কংফুচ কেমন লোক?" শিষ্য কোন উত্তর না দিয়া নীরব থাকেন। কংফুচ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বললে না কেন যে, তিনি পুঁথি পড়তে পড়তে খাওয়া দাওয়া ও বয়স ভুলে যান এবং বুঝতে পারেন না যে, তিনি ক্রমেই বৃদ্ধ হচ্ছেন?" কংফুচের এই বাক্যেই তাঁহার প্রকৃত চরিত্র প্রকট। তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতেন, সাধারণ নিরামিষ আহার করিতেন এবং ঘুমাইবার সময় আপন বাহু উপাধানরূপে ব্যবহার করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি এতেই আনন্দ পাই। অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত ধন ও সম্মান ভাসমান মেঘের মত ক্ষণস্থায়ী।" তাঁহার জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমি জ্ঞান সঙ্গে করে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি ভাল বই পড়ে শিখি এবং পঠিত বিষয়ের ভাব আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি। তোমরা সাধু বা সৎলোক বললেই কি আমি তা হতে পারি? আমি অধ্যয়ন ত্যাগ করি না এবং অপরকে শিক্ষা দিতেও ক্লান্ত হই না। কিন্তু তিন জন মানুষকে একত্র দেখলেই আমি মনে করি যে, এদের মধ্যে অন্ততঃ একজন নিশ্চয়ই আমার শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। আমি তাঁর সচ্চরিত্র অনুকরণ এবং তাঁর গুণ দেখে আমার দোষ সংশোধন করবো।"

যিশুখৃষ্ট এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যায়ের প্রতিদানে ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া কংফুচ বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি মন্দের প্রতিদানে ভাল দাও, তা হলে ভাল-র প্রতিদানে কি দিবে? ভাল-র প্রতিদানে ভাল এবং মন্দের প্রতিদানে ন্যায়বিচার করবে।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এমন একটী শব্দে একটী উপদেশ আছে কি না যা সারাজীবন মানুষ মাত্রই পালন করলে লাভবান হতে পারে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "শু"। চৈনিক ভাষায় এই শব্দটী দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগের অর্থ 'হৃদয়' এবং দ্বিতীয় ভাগের অর্থ 'একই'। উভয় মিলিয়া 'একই হৃদয়' বাক্যের সহজ মানে—"যেমন অপরে তোমার নিকট আশা করে, তুমি তেমন প্রতিকাজে তোমার হৃদয়ের পরিচয় দাও এবং অন্যের মনে যাতে আঘাত না লাগে সর্ব্বদা তার চিন্তা কর।" মহাত্মা কংফুচ বিশ্বাস করিতেন যে, ভ্রম মানুষের স্বাভাবিক হইলেও ইহাকে যে সংশোধন করিতে চেষ্টা না করে তাহারই প্রকৃত ভ্রম হইয়া থাকে। তিনি ভ্রমের তিনটী পর্য্যায় দেখাইয়াছেন। প্রথম—যখন কিছু বলা উচিত তখন তাহা না বলা। দ্বিতীয়—যখন কিছু বলা উচিত নয় তখন বলা। তৃতীয়—না জানিয়া কোন বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা। তাঁহার মতে বৃদ্ধ হইয়া মানুষ যখন জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার লাভের দিকে মন রাখা উচিত নয়। পবিত্রতালাভের

উপায় সম্বন্ধে কংফুচ্ বলিয়াছেন, "কিছু দেখবার সময় মনকে পরিষ্কার রাখতে হবে, স্বভাবে দয়ালু হতে হবে, ব্যবহারে শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, বাক্যে আন্তরিক হতে হবে, কার্য্যে সতর্ক হতে হবে, সন্দেহস্থলে জিজ্ঞাসা করতে হবে, ক্রোধ হলে তার ফল চিন্তা করতে হবে, অর্থোপার্জ্জনে ভালমন্দ বিচার করতে হবে।"

ধন সম্মান ও দারিদ্র্য সম্বন্ধে কংফুচ্ বলিয়াছেন, "ধন ও সম্মান সকল মানুষই চায়, যদি সদ্ভাবে লাভ করা না যায় তা হলে এসব কারো চাওয়া উচিত নয়। দারিদ্র্য ও দাসত্ব কেউ চায় না, যদি ন্যায়-সঙ্গত উপায়ে দূর করা না যায়, তা হলে আমি এ দুটোকেও বরণ করতে প্রস্তুত।" তাঁহার মতে ভদ্রলোক মাত্রেরই ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকা দরকার। পুণ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "যা পুণ্যজনক নয় সে দিকে চেয়ো না, যা পুণ্যজনক নয় তা শুনো না, যা পুণ্যজনক নয় তা বলো না, যা পুণ্যজনক নয় তা করো না।"

দেশ-শাসন সম্বন্ধে কংফুচের অনেক উপদেশ আছে। তিনি চীনের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অনেক রাজা ও শাসনকর্ত্তাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "রাজা শাসন করবেন, মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিবেন, পিতা পিতার কার্য্য এবং পুত্র পুত্রের কার্য্য করবেন।" এই উপদেশ দ্বারা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যদি সমাজের সকলেই ঠিক ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে। রাজ-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "রাজা ভদ্র হবেন, কর্ম্মচারীদের প্রতি ভদ্রব্যবহার করবেন এবং প্রজাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রধান রাজনীতি কি?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "জনসাধারণের প্রচুর খাদ্য ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।"

কংফুচ্ অধিকারভেদে এক এক জনকে এক এক প্রকার উপদেশ দিতেন। তিনি একজনকে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অপরকে আবার তাহাই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একজন শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যা করা দরকার তা কি তৎক্ষণাৎ করা উচিত?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতা ও বড় ভাই আছেন, তুমি তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা না করে কি করে কাজ করবে?" কিন্তু অপর একজন শিষ্য ঠিক ঐ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, সর্ব্বপ্রযত্নে করা উচিত।" এই সময় আরও একজন শিষ্য উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি একই বিষয়ে দুজনকে দুরকম উপদেশ দিলেন, আমি কোনটী গ্রহণ করবো?" তিনি বলিলেন, "প্রথম লোকটী দু জনের কাজ করে, কাজেই আমি তাকে উৎসাহ দিলাম না; দ্বিতীয় লোকটী কাজে বড়ই সতর্ক, কাজেই আমি তাকে উৎসাহ দিয়েছি।"

কংফুচের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য মেন্‌সিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেন্‌সিস্ জাতির সেবাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। তিনি দয়া এবং সেবার উপর জোর দিয়া প্রচার করিতেন এবং লাভ ও মুনাফা পছন্দ করিতেন না। চীন-দেশবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, মানুষমাত্র খারাপ ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কাউ-জি নামক জনৈক চৈনিক দার্শনিক এই সময় প্রচার করিতেন যে, মানুষ ভালও নয় এবং মন্দও নয়, শিক্ষার ফলে সে ভাল বা মন্দ হয়। মেন্‌সিস্ এই মতের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষই ভালভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সকল মানুষই ভাল। তবে মন্দশিক্ষার প্রভাবে পরবর্ত্তী কালে কোন কোন মানুষ মন্দ হয়।

মেন্‌সিস্ ধার্ম্মিক ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি রাজানুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিতেন না। রাজপুত্র স্যুয়ান্‌কে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মনে করুন, আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে কোন বন্ধুর নিকট রেখে আপনি কোন কাজে বের হলেন এবং কিছুকাল পরে এসে দেখলেন যে, আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যা সেখানে নেই, এ অবস্থায় আপনি কি করবেন?" রাজপুত্র বলিলেন, "আমি সেই বন্ধুকে কেটে ফেলবো।" আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনার কোন মন্ত্রী যদি ঠিক ঠিক কাজ না করেন, তা হলে আপনি কি করবেন?" উত্তরে রাজপুত্র বলিলেন, "আমি তাঁকে তাড়িয়ে দিবো।" পুনরায় মেন্‌সিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দেশের রাজপুত্র যদি তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কিছু না করেন, তা হলে কি করবেন?" রাজপুত্র এ কথার উত্তর না দিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিলেন। কংফুচ্ ও বলিয়াছেন, "জাতির বিশ্বাস নষ্ট করলে রাজার মাথা হতে রাজ-মুকুট খসে পড়ে।"

ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাইয়া কংফুচ্ অস্বাভাবিক বিষয় বেশী উল্লেখ করিতেন না। যখন তাঁহার আত্মসমর্পণের ভাব আসিত, তখন তিনি স্বর্গের কথা বলিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "আমরা শক্তি ও দেবতাদের খুব সম্মান করি, কিন্তু তাঁদের দূরে রাখতে চাই।" এই বাণী হইতে অনুমিত হয়, সম্ভবতঃ শক্তি বা দেবতার আরাধনা করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগ করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না।

কংফুচের এইরূপ অসংখ্য উপদেশ আছে। এই উপদেশসমূহ হিন্দুর নিকট নূতন নহে; ইহাদের সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রকারদের নৈতিক উপদেশের কোন পার্থক্য নাই। কংফুচের উপদেশ আলোচনা করিলে বোঝা যায়, প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বমানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

চীনদেশের জনমান্য নায়ক ডক্টর সান্ ইয়াৎ সেন্ মনীষী কংফুচের প্রচারিত নীতি ও মানবতার আদর্শে চীনের জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে চৈনিক সাধারণ-তন্ত্রের পরিচালক চিয়াং কৈসেক্ খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দেশময় "নবজীবন আন্দোলন" (New Life Movement) আরম্ভ করিয়াছেন। এই আন্দোলনকারিগণ প্রধানতঃ তিনটী নীতি প্রচার করেন, যথা—(১) সকল বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, শিক্ষাকর এবং স্বাভাবিক আইন মান্য করিয়া চল। (২) আপন পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমাজ, দেশ এবং পরে সকল জাতির উপর তোমার ভালবাসা বিস্তার কর। (৩) সকল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া বিশ্বমানবের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে সুখ-শান্তি আনয়ন করিবার জন্য জনহিতৈষিতা ও সাধুতাকে উপায় রূপে গ্রহণ কর। মহাত্মা কংফুচের এই সর্ব্বজনকল্যাণপ্রদ নীতির উপর স্থাপিত "নবজীবন আন্দোলন" চৈনিক জাতিকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রাচ্যের মুখোজ্জ্বল করুক, ইহাই আমাদের কাম্য।

অদ্বৈতবাদ

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

অদ্বৈতবাদ বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "অদ্বৈতবাদ" শব্দের অর্থ কি, তাহা জানা আবশ্যক। কারণ, ইহার অর্থ জানিতে পারিলে অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার কারণ নামের সহিত নামীর একটা সম্বন্ধ থাকে। যেহেতু বিষয়ে জ্ঞান হইবার পর তাহার নামকরণ হয়। বিষয়ের জ্ঞান না হইলে নামকরণ হয় না। এজন্য "অদ্বৈতবাদ" শব্দের অর্থ জানিলেই অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় অনেকটাই জানা হইবে। অতএব অদ্বৈতবাদ শব্দের অর্থ কি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা যাউক।

অদ্বৈতবাদ শব্দের অর্থ

"দ্বি" শব্দের অর্থ "দুই"। ইহা সংখ্যাও হয় বস্তুও হয়। এই সংখ্যাবাচক দ্বি শব্দের উত্তর "ই" ধাতুর পর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়া "দ্বীত" পদ হয়। এই ই ধাতুর অর্থ—গতি বা প্রাপ্তি। সুতরাং দ্বীত পদের অর্থ—যাহা দুইকে প্রাপ্ত। দ্বীত+ভাবার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া "দ্বৈত" শব্দ হয়। ইহার অর্থ—যাহা দুইকে প্রাপ্ত, তাহার ভাব। অর্থাৎ দ্বিতীয়ত্ব বা দুই পদার্থের অস্তিত্ব। "দ্বীত" +স্বার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়াও "দ্বৈত" শব্দ হয়। তখন অর্থ হইবে—যাহা দুইকে প্রাপ্ত তাহা। এখন "ন দ্বৈত" এই পদদ্বয়ের সমাস করিলে "অদ্বৈত" পদ হয়। ইহার অর্থ—যাহা দ্বৈত নয়। সুতরাং অদ্বৈত পদের অর্থ—দুই পদার্থের অস্তিত্বের অভাব, অথবা যাহা দুইকে প্রাপ্ত হয় না, তাহা। এস্থলে এই শেষোক্ত অর্থই অভীষ্ট; কারণ, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত বস্তুটী অভাব পদার্থ নহে, কিন্তু উহা একটী ভাব পদার্থ। তাহার পর বদ্ ধাতুর পর ভাবার্থে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া "বাদ" শব্দ হয়। ইহার অর্থ—বলা। কিন্তু অবিচার পূর্ব্বক বলায় বা মিথ্যা বলায় লাভ নাই, এজন্য ইহার অর্থ—যথার্থ বিচার। কারণ, ন্যায়শাস্ত্রে তত্ত্বনির্ণয়-ফলক "কথার" নাম বাদ বলা হয়। এখন "অদ্বৈতের-বাদ" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে "অদ্বৈত-বাদ" পদ হয়। সুতরাং "অদ্বৈতবাদ" পদের অর্থ হইল—দুই পদার্থের অস্তিত্বের অভাব সংক্রান্ত যথার্থ বিচার বা দ্বিতীয়ত্বের অভাব সংক্রান্ত যথার্থ বিচার, অথবা যাহা দুইকে প্রাপ্ত হয় না, তৎসংক্রান্ত যথার্থ বিচার। এক্ষণে যে বস্তুটী অদ্বৈত, অর্থাৎ যাহা দুইকে প্রাপ্ত হয় না, বা যাহার দ্বিতীয়ত্বের অভাব হয়, সেই বস্তুটীই জগতের যথার্থ কারণ হয়, কারণ, জগৎ এক নহে কিন্তু বহু, তাহা অদ্বৈত নহে, কিন্তু দ্বৈত। আর বহুর যাহা যথার্থ কারণ বা দ্বৈতের যাহা যথার্থ কারণ, তাহা এক বা অদ্বৈতই হয়, দ্বৈত বা বহুর কারণ দ্বৈত বা বহু হইলে তাহা বহুর বা দ্বৈতের যথার্থ কারণ হয় না। এজন্য অদ্বৈত বস্তুই জগতের যথার্থ কারণ বলা হয়। তাহার পর সেই অদ্বৈত বস্তুটী জগৎ বা জগতের অন্তর্গত কোন পদার্থ হইতে পারে না। যেহেতু জগৎ বা তদন্তর্গত সকল পদার্থই দ্বৈত, জগতের কোন পদার্থের অদ্বৈতভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব যাহা জগতের অন্তর্গত নহে, তাহাই জগৎকারণ, আর তাহা অদ্বৈতই হয়। অর্থাৎ অদ্বৈত বস্তুই জগৎকারণ হইয়া থাকে। এজন্য যে মতে বলা হয়—জগতের যাহা মূল কারণ, তাহা

দুই নহে, কিন্তু তাহা জগতের অতীত একমাত্র বস্তুবিশেষ অর্থাৎ অদ্বৈত বস্তু, এইরূপ মতবাদের নাম অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ শব্দের অর্থ হইতে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানা গেল। এই-বার দেখা যাউক—অদ্বৈতবাদের মূল কি, এবং তাহার নির্ণয়দ্বারা অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদ্যবিষয় কতটা বুঝিতে পারা যায়।

অদ্বৈতবাদের মূল বেদ

অদ্বৈতবাদের মূল কি বুঝিতে পারিলে অদ্বৈতবাদের স্বরূপ বা প্রতিপাদ্য বিষয় আরও অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। যেমন কোন ব্যক্তির পরিচয়, সেই ব্যক্তির বংশপরিচয় হইতে অধিক বুঝা যায়, অথবা কোন বস্তুর পরিচয় তাহার কারণের পরিচয়লাভে অধিক পরিমাণে জানিতে পারা যায়, এস্থলেও তদ্রূপ অদ্বৈতবাদের উৎপত্তিস্থানের পরিচয়লাভে অদ্বৈতবাদের স্বরূপ বা প্রতিপাদ্য বিষয়, অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। এখন এই অদ্বৈতবাদের মূল কি, ইহার উৎপত্তিস্থল কোথায়, ইহা চিন্তা করিলে দেখা যায়—ইহার মূল বা উৎপত্তিস্থল বেদ। অদ্বৈতবাদ মনুষ্যবুদ্ধির কল্পিত বা আবিষ্কৃত বিষয় নহে। বেদ না বলিয়া দিলে, অর্থাৎ বেদ ইহার সন্ধান না দিলে মনুষ্যবুদ্ধি ইহার কল্পনা বা আবিষ্কার করিতে পারিত না। বেদ ইহার সন্ধান দিয়াছে বলিয়াই মনুষ্যবুদ্ধি ইহার সম্ভাবনা বা অসম্ভাবনা, যুক্তির দ্বারা স্থির করিবা থাকে। যুক্তি বা বিচার বা যোগশক্তি অদ্বৈতবাদের পুষ্টি বিধান করিয়া থাকে মাত্র, অদ্বৈতবাদের পক্ষে ইহারা সহকারী কারণমাত্র, ইহার মুখ্য কারণ—বেদ।

অদ্বৈতবাদের মূল বেদ, ইহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

যদি বলা যায় অদ্বৈতবাদের মূল বেদ ইহাতে প্রমাণ কি? তাহা হইলে বলিব—ইহার প্রথম প্রমাণ—ইহা যুক্তি তর্কের অগম্য, এবং ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ—বেদ ও বেদানুকূল ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র। কারণ বেদমধ্যেই কথিত হইয়াছে—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্"
(ছাঃ উঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ "হে সোম্য শ্বেতকেতো! এই সব অগ্রে সৎই ছিল, তাহা একই অদ্বিতীয়"। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল—জগতের মূলকারণ—একই অদ্বিতীয় বস্তু। যে মতে বলা হয়—জগতের মূলকারণ এক অদ্বৈত বস্তু, সেই মতকে অদ্বৈতবাদ বলা হয় বলিয়া এই বেদবাক্যটীকে অদ্বৈতবাদের মূল বলা হয়, আর তজ্জন্য বেদকে অদ্বৈতবাদের মূল বলা হয়।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ
কিঞ্চন মিষৎ" (ঐঃ উঃ ১।১।২)

অর্থাৎ ইহা অগ্রে এক আত্মাই ছিল, অন্য কিছু ক্রিয়াশীল বস্তু ছিল না। এতদ্দ্বারাও বুঝা গেল জগতের মূলকারণ এক অদ্বৈত বস্তু। এই বাক্য নিমিত্তও অদ্বৈতবাদের মূল বেদ বলা হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ
আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ
আকাশাদ্ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ অগ্নেঃ আপঃ,
অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" (২।১)

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত, সেই এই আত্মা হইতেই আকাশ হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, ইত্যাদি। এতদ্দ্বারাও জানা যায় জগৎ মূলে একই ব্রহ্ম বা আত্মা ছিল। এই বাক্য হইতেও অদ্বৈতবাদের মূল বেদ বলা হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে—

"আত্মা এব ইদম্ অগ্র আসীৎ" (১।৪।১)
"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (১।৪।৯)

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদ্ একমেব" (১·৪।১১)।
"আত্মা এব ইদমগ্র আসীদ্ এক এব" (১।৪।১৭)।

অর্থাৎ এই সব অগ্রে এক আত্মা বা ব্রহ্মই ছিল। এতদ্দ্বারাও জানা গেল যে, জগতের মূল একই ব্রহ্ম বা একই আত্মা। এই বাক্য হইতেও অদ্বৈতবাদের মূল বেদ বলা হয়। এইরূপ ১০৮ উপনিষৎ হইতেই জানা যায় যে, জগৎকারণমূলে এক অদ্বৈত বস্তুই ছিল। এই কারণে বলা হয়—বেদ হইতেই জানা যায় যে, অদ্বৈতবাদের মূল বেদ। সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য অদ্বৈত তত্ত্বে—এই প্রসঙ্গে এই বিষয়টী বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে।

তদ্রূপ ইতিহাস ও পুরাণাদি বেদানুকূল শাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, জগতের মূলকারণ এক অদ্বৈত বস্তু। ইহা এতই প্রচুর যে, ইহার নিদর্শন আর ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে প্রদর্শিত হইল না। কেবল ইহাই নহে, মনুসংহিতা, মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও আছে যে, বেদ হইতেই মনুষ্যের ভাষা এবং মনুষ্যোচিত ব্যবহার প্রভৃতি সমুদয় বিষয় মনুষ্যগণ শিক্ষালাভ করিয়াছে। অধিক কি, যুক্তিও তাহা সমর্থন করে। অতএব অদ্বৈতবাদেরও মূল যে বেদ, তাহাতে আর সন্দেহই থাকিতে পারে না। যথা—

অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
নামরূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥
সর্ব্বেষাং চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাঃ চ নির্ম্মমে॥

(মনু, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ "অনাদি অনন্ত নিত্য বাক্ অর্থাৎ বর্ণাত্মক ভাষা স্বয়ম্ভুকর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়াছে। আদিতে তাহা বেদময়ী ও দিব্যরূপা ছিল, তাহা হইতেই সমুদায় প্রবৃত্তি অর্থাৎ মনুষ্যোচিত ব্যবহার প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভূতগণের নাম ও রূপ এবং কর্ম্মের প্রবর্ত্তন সমুদায়ই মহেশ্বর প্রথমে অর্থাৎ প্রতিসৃষ্টির আদিতে বেদের শব্দ হইতে অথবা বেদরূপ শব্দরাশি হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সকলের নাম এবং পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম এবং পৃথক্ পৃথক্ সংস্থা প্রথমে বেদের শব্দ হইতে অথবা বেদরূপ শব্দরাশি হইতেই সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

অতএব বেদ হইতেই মানব বর্ণাত্মক ভাষা মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলই শিক্ষা করিয়াছে—বলা যায়, অর্থাৎ বেদই সকল জ্ঞানের মূল, ইহাও বলা যায়। এই শ্লোকগুলি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যমধ্যেও সূত্র-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব বর্ণাত্মক ভাষা ও নামরূপঘটিত যে অদ্বৈতবাদ, সেই অদ্বৈতবাদেরও মূল যে বেদ, ইহা শাস্ত্রপ্রমাণবলে নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদের বেদমূলকত্বায় আপত্তি

যদি বলা হয়—শাস্ত্রপ্রমাণবলে বেদ সকল জ্ঞানের মূল বা আকর—ইহা সিদ্ধ হইলেও তাহা যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের মূল—ইহা ত সিদ্ধ হয় না। বেদ পরম্পরাসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের মূল হইলে ত আর বলা যায় না যে, বেদ হইতেই অদ্বৈতবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, বেদই ইহার মূল, ইহা মনুষ্যবুদ্ধির উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত নহে, ইত্যাদি। কারণ, যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারণ হয় না, তাহাকে কাহারও যথার্থ কারণ বলা যায় না। যেমন কুম্ভকারের পিতা কুম্ভের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ হয় না, কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে কারণ হয়, এজন্য তাহাকে কুম্ভের যথার্থ কারণ বলা হয় না। তদ্রূপ বেদ হইতে বর্ণাত্মক ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া মানুষ বুদ্ধিবলে অদ্বৈতবাদ আবিষ্কার করিয়াছে—এরূপ ত হইতে পারে। আর তাহা হইলে বেদকে অদ্বৈতবাদের মূল বলা ত সঙ্গত হয় না। অতএব

শাস্ত্রপ্রমাণবলেই বেদ যে অদ্বৈতবাদের মূল—ইহা বলা সঙ্গত হয় না। শাস্ত্র এস্থলে বেদকে পরম্পরা সম্বন্ধে মূল বলিয়াছে—ইহাও বুঝিতে হইবে। আর এরূপ বুঝিলে শাস্ত্রের অমর্য্যাদাও হইতে পারে না।

উক্ত আপত্তির খণ্ডন

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদের মূল যে বেদ, তাহা পরম্পরাসম্বন্ধে মূল নহে। পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মূল। অর্থাৎ ঘটের পক্ষে কুম্ভকারের পিতা যেরূপ কারণ, অদ্বৈতবাদের পক্ষে বেদ সেরূপ কারণ নহে, পরন্তু ঘটের পক্ষে কুম্ভকার যেরূপ কারণ, অদ্বৈতবাদের পক্ষে বেদও সেইরূপই কারণ। কারণ, উক্ত শাস্ত্রবাক্য মধ্যে "বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ" এইরূপ কথা আছে। এস্থলে "এব" শব্দ এরূপ আশঙ্কার নিরাস করিতেছে। অতএব অদ্বৈতবাদের মূল বেদ—ইহা সিদ্ধ হয়। বেদই অদ্বৈতের সন্ধান দেয়।

যুক্তিতর্কদ্বারা অদ্বৈতবাদ *সিদ্ধ নহে*

বস্তুতঃ অন্য কোন প্রমাণ অদ্বৈতের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, অন্য সকল প্রমাণই জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুইটী বস্তু না থাকিলে অন্য কোন প্রমাণই সম্ভবপর হয় না। এজন্য এই জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবশূন্য অদ্বৈত-বস্তুর কল্পনাও অন্য প্রমাণ করিতে পারে না। অথচ বেদই অদ্বৈতবাদের সন্ধান দেয়, এজন্য অদ্বৈতবাদের মূল বেদ। অন্য প্রমাণদ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না।

শাঁখ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সন্ধ্যার আঁধার যবে ঢেকে আসে নীল নভস্তল
নিঃশব্দ-সঞ্চার-পদে, ভ'রে যায় ছায়া সুশীতল
স্তিমিত মৃত্যুর মত সুবিশাল এ পৃথিবী ঘিরে,
নিকুঞ্জ কাননে বসি' চেয়েছিনু উদভ্রান্ত-তীরে,
তখন মন্দির গৃহে বাজে তীব্র সন্ধ্যা-লগ্ন শাঁখ
ক্ষণ নিস্তব্ধতা ভেঙে, বাণবিদ্ধ কুরঙ্গীর ডাক
কাঁপে যেন নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যা-বক্ষে দু'কর্ণ কুহরে,
বিদ্যুৎ স্পন্দন লাগে সর্ব্ব অঙ্গে, চোখে অশ্রু ভরে
কিছু ত' হোলো না ভেবে, জীবনের প্রতি দণ্ডপল
নিতান্ত মূঢের মত কাটায়েছি আনন্দ-বিহ্বল
স্বপ্নের প্রাসাদ রচি' আজি মোর বিভ্রম চেতনা
ফিরিয়া এসেছে হায়। ছিন্ন-মেঘে ইন্দু-নিভাননা
নিষ্প্রভ করুণ চোখে চায় যেন বঞ্চিতের মত,
অসময়ে ডেকে তোমা বৃদ্ধি পায় নির্লজ্জতা যত,
উদভ্রান্ত পথিক সম চিন্তাভারাক্রান্ত আমি আজ,
হেরি পাশে স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে অসমাপ্ত কাজ;
প্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি চেয়ে থাকে ক্লিষ্ট অবজ্ঞায়
আমার শঙ্কিত ভীরু ম্লানমুখে পরম স্পর্দ্ধায়।

সুফীধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

একদা সমাধি অবস্থায় মহম্মদ তাঁহার পত্নী আয়েষাকে প্রশ্ন করিলেন*—তুমি কে ?

আয়েষা উত্তর দিলেন—আমি আয়েষা।

মহম্মদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আয়েষা কে ?

চকিতা আয়েষা উত্তর দিলেন—সিদ্দিকের কন্যা আয়েষা।

মহম্মদ প্রশ্ন করিলেন—সিদ্দিক কে ?

আয়েষা উত্তর দিলেন—সিদ্দিক মহম্মদের শ্বশুর।

মহম্মদ বলিলেন—মহম্মদ কে ?

এই প্রশ্নে আয়েষা স্তম্ভিত। আয়েষা বুঝিলেন মহম্মদ বাস্তব জগতে নাই। মহম্মদ তখন এক অতীন্দ্রিয় জগতে। সেই অবস্থায় বিশ্ব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি "হামাউস্ত"—"সোঽহম্"। সেই অবস্থার নাম "হাল"—সমাধি। সুতরাং তিনি ইসলামে প্রথম সমাধিস্থ পুরুষ অথবা সুফী।

বল্লীক প্রদেশের রাজপুত্র ইব্রাহিম একদিন মৃগয়ায় চলিয়াছেন; অকস্মাৎ বাণী শুনিলেন "ইব্রাহিম জাগ্রত হও, তুমি কি এই জীবহত্যার জন্য সৃষ্ট হইয়াছ ?" ইব্রাহিম তৎক্ষণাৎ তাঁহার রাজপোষাক ত্যাগ করিলেন, সামান্য মেষপালকের "পালক পরিচ্ছদ" পরিধান করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

প্রাণের আবেগে ইব্রাহিম বলিয়া উঠিলেন 'হে ভগবান! তোমার আদেশ পালনে অবাধ্যতা যেন আমাকে লজ্জা না দেয়।" ইব্রাহিমও ইসলামের একজন প্রথম সুফী, তাঁহার অবস্থার নাম "ত্যাগ"।

শাকিক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবনধারণের কোন চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলেন না। কোন জিনিষ তিনি যাচনা করিতেন না। ভগবানই একমাত্র তাঁহার কাম্য ছিল। তিনি বলিতেন, "জীবনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কাজ হইল লোকালয় হইতে বাহিরে—যাহা কিছু করিবে সমস্তই নীরবে ও নির্জ্জনে।" শাকিক একজন সুফী।

রহস্যময়ী মহীয়সী রাবেয়াকে প্রশ্ন করা হইল—"আল্লাহাকে কি তুমি ভালবাস ?"

রাবেয়া উত্তর দিলেন—"হাঁ নিশ্চয়,—"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল—"তুমি কি শয়তানকে ঘৃণা কর ?"

রাবেয়া উত্তর দিলেন—"আলাহার প্রেমে আমি এমন মুগ্ধ যে শয়তানকে ঘৃণা করিবার অবসর কোথায় ?"

একদা রাবেয়া স্বপ্ন দেখিলেন—মহম্মদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"রাবেয়া তুমি কি আমাকে ভালবাস ?" রাবেয়া বলিলেন—"পয়গম্বর তোমাকে কে না ভালবাসে ? তবে আল্লাহার প্রেমে আমি অমন মুগ্ধ যে অন্য কাহাকে ভালবাসা না-বাসার প্রশ্ন আমার ভিতর উঠে না।" রাবেয়া সুফী, পূর্ণ প্রেমী।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় লোকদের ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলাম নব চিন্তাধারায় রূপায়িত হইয়াছে, ইসলামে ভারতীয় চিন্তা-সংস্পর্শের অন্যতম দান—সুফীমতবাদ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইসলামের সঙ্গে

* কুনহুল আমার উন্, কুদাম্

ইয়ুনান সভ্যতার সংস্পর্শই সুফীমতবাদের মূল ভিত্তি। ইরাণীয়দিগের মতে পারস্যের আর্য্যসভ্যতার সংস্পর্শ আরবের মরুসভ্যতাকে নবরসসিক্ত করিয়াছে—তাহাতেই সুফীমতের উৎপত্তি। আমাদিগের মনে হয় আরবীয় ইসলামের ভিতরেই সুফীমতের অঙ্কুর প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। ক্রমশঃ সুযোগ সময় ও সুবিধা লাভে তাহা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

অনেকে বলেন যে ইসলামের সঙ্গে সুফীধর্ম্মের সম্বন্ধ পরোক্ষ। কারণ মহম্মদের যুগে আরবী ভাষায় "সুফী" শব্দ ছিল না। "তসাউফ" শব্দ আরবী "সিত্তা" (৩০২ হিঃ) কিংবা আরবীয় অভিধান "কামুছ্" গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। যদিও সুফো ভাববাচক ধাতু ছিল—কিন্তু সুফী-পদ ছিল না। মহম্মদের মৃত্যুর ২০০ বৎসরের মধ্যে "সুফী" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে সুফী মত অথবা ধর্ম্ম বাহির হইতে ইসলামে আসিয়াছে।

আমাদের মনে হয় যে সুফীধর্ম্মের উৎপত্তির জন্য ইসলামের বাহিরে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নাই। কারণ ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে বোঝা যায় ইসলাম ধর্ম্মে নীতিবাদের প্রাধান্য—মনো বিশ্লেষণ মনস্তত্ত্বের অবতারণা নাই। নীতিবাদ কিংবা দৈনন্দিন জীবনধারণের পথনির্দ্দেশ সাধারণতঃ মানবকে ধর্ম্মের পথে খানিক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। তারপর মানুষ নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হয়। চিন্তার দিক দিয়া বিচার করিলে ইসলামের সীমা সঙ্কীর্ণ। সুতরাং কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মুসলিম তার নতুন পথের ধারা ইসলামের অভ্যন্তরেই খুঁজিতে আরম্ভ করে। মুসলিমগণের এই নতুন চিন্তা প্রণালী কিংবা মতবাদ অথবা ধর্ম্মধারাকে আমরা সাধারণতঃ সুফীচিন্তা, কিংবা সুফীমতবাদ অথবা সুফীধর্ম্ম বলিয়া আখ্যায়িত করি। বাস্তবিক 'তসাউফ" ভগবানের প্রতি অথবা ভাগবত বস্তুর প্রতি দৃষ্টির ধারা বিশেষ। ইহার মধ্যে আদর্শ বিচার, চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি সকলই আছে। তবে মুসলিম সুফীগণ তাঁহাদের আদর্শ, চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতি সমস্তেই যথাসম্ভব ইসলামের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ইতিহাসের দিক দিয়া অনুসন্ধান করিলেও প্রতীয়মান হয় যে তসাউফের উৎপত্তি ইসলামের অভ্যন্তরেই হইয়াছে। মহম্মদের মৃত্যুর পর ২০০ বৎসরের ইতিহাস বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ ও হত্যার কাহিনী। প্রত্যেক ধর্ম্মের আদিযুগে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব দেখা যায়। ইসলামেও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ধার্ম্মিক মুসলমানগণ বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে যথা-সম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন, এবং জনকোলাহলের বাহিরে তাঁহারা ধর্ম্ম আলোচনা ও অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়াসে তাঁহারা পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন, জাগতিক জীবনধারণের জন্য সকল চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে একটী বিশ্বাসী ধার্ম্মিক মুসলমান মণ্ডলী গড়িয়া উঠিল। তাঁহারা নিজেদের জীবনধারাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে ইসলামকে নতুন রূপ দিলেন। সেই নতুন রূপই ইসলামের আদিম সুফীধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইব্রাহিম শাকিক এবং রাবেয়ার জীবন আলোচনা করিলেও এই তথ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। খাঁজা খাঁন ইসলামের এই নতুন রূপকে সঙ্গীত দ্বারা রূপায়িত করিলেন। তারপর জুন্ জুন্ মিসরী (৮৬০ খৃষ্টাব্দ) এই চিন্তাধারাকে লিপিবদ্ধ করিলেন। বাগদাদের জুনিয়াদ্ নিয়মবদ্ধ করিলেন। (৯১০ খৃঃ অব্দে) পরবর্ত্তী যুগে আবুবকর সিবলী মসজিদের মিনার

হইতে সুফীবার্ত্তা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিলেন।

নিকলসন বলেন যে এই নির্জ্জনতাবিলাসী শান্তিবাদী মুসলিমগণ সিরিয়াবাসী ইউকারিষ্ট খৃষ্টান মত দ্বারা প্রভবান্বিত হইয়াছেন। ইউকারিষ্টগণ ভত প্রার্থনারীতি অবলম্বন করিতেন। সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া নিঃস্ব সম্প্রদায় গঠন করিয়া বিভিন্ন স্থানে সন্ন্যাসীর মতন পরিভ্রমণ করিতেন। ইসলামের আদি সুফীগণ ইউকারিষ্টদের মতন সর্ব্বস্বত্যাগী ভ্রাম্যমাণ ফকিরের বেশে নিয়ত প্রার্থনারত থাকিতেন। ইসলামের মতে সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করা অন্যায়, মঠজীবন মহম্মদ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ। নিকলসনের মতে আদিম সুফীগণ তাঁহাদের প্রতিবেশী মঠস্বামী খৃষ্টান এবং বিহারনিবাসী বৌদ্ধগণের সামীপ্যে সর্ব্বত্যাগব্রত ও মঠজীবন গ্রহণ করিলেন। বল্হীক অধিপতি ইব্রাহিমের সর্ব্বস্বত্যাগের কাহিনী প্রায় গৌতমের রাজ্যত্যাগের কাহিনীর অনুরূপ। গোলজীয়াড়ের মতে বৌদ্ধ নির্ব্বাণ হইতে সুফীগণ তাঁহাদের "ফনা" গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ এই সময়ে বৌদ্ধগণ বল্হীক, হিরাত, তুর্কীস্থান, ট্রানসোক্সিয়ানা প্রদেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আব্বাসিয়া খলিফাগণ সিরিয়ার খৃষ্টান সম্প্রদায়, জ্ঞানদেশ পূর্ব্বের পারসী পণ্ডিতমণ্ডলী এবং মেসোপোটেমীয়ার সেবাইন গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলিয়াছেন এবং ভারতীয় ও গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করিয়াছেন। আব্বাসীয়া চিন্তাধারা বহির্জ্জগতের সম্পর্কে আসিয়া বহু নূতন সত্য ও তথ্যের সন্ধান লাভ করিয়াছে। সুফীধর্ম্মের প্রথম লিপিকার জুনজুন মিসরী জন্মে খৃষ্টান, জাতিতে কপ্টিক, ধর্ম্মে মুসলমান। ইহাও বিবেচ্য বিষয় যে মুতাজ্জালের বিচারবাদ গ্রীক-চিন্তার সংস্পর্শের বহু পরে ইস্লামে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

নিকলসনের আখ্যান বস্তু ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে অনেকটা যথার্থ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার চিন্তাধারা কষ্টকল্পিত। আমাদের ধারণা এই যে কোন ধর্ম্মই অধ্যাত্মবাদ, মনোবিজ্ঞান ও মনোবিশ্লেষণ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। ইসলামে এই তিন বস্তুর অভাব পূর্ণ করার অজ্ঞাত চেষ্টায়ই সুফীমতের ভিত্তি। ইসলামের অর্দ্ধেক জিনিষই নিষেধাত্মক, শাসনবাচক এবং ভীতিসূচক, সুতরাং যাঁহারা দিন দিন সাধারণ জীবনের বিধি-নিষেধের উপরে গিয়াছেন—তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন যে ইসলামের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইসলামাতিরিক্ত এমন কোন তথ্যের আবিষ্কার করিবেন যাহাতে তাঁহাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকে অথচ ধর্ম্মজীবনও অক্ষুণ্ণ থাকে। এই প্রচেষ্টার পরিণতিই "তসাউফ"। ক্রমশঃ এই সকল ধর্ম্মপ্রাণ শান্তিবাদী মুসলিম-গণ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী ইসলামের বিধানকে পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। কোরানের কোন কোন আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য্যকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়া ক্রোধ ও করুণারূপী আল্লাহ্‌কে অতীন্দ্রিয় সত্যরূপ বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন,—কিন্তু আল্লাহ্‌র এই নতুন অভিধানে সুফীগণ বহু শত্রু সৃষ্টি করিলেন, ফলে সুফী ও জ্ঞানবাদিগণ বহুভাবে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন।

নীতিবাদী ইসলামে যদি এই জ্ঞানবাদকে ভিত্তি করিয়া মনস্তত্ত্ব ও মনোবিশ্লেষণ না প্রবেশ করিত তবে হয়ত আমরা ইসলামে অন্য কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখিতাম অথবা ইউরোপের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্ম্মযুদ্ধের ন্যায় কোন ঘটনার সন্ধান পাইতাম।

ইসলামের এই জ্ঞানবাদের পরবর্ত্তী রূপ আমরা খুঁজিয়া পাই বায়াজিদের সর্ব্বেশ্বরবাদের অবতারণায়, বায়াজিদ জন্মে অগ্নিউপাসক, শিক্ষায় কুর্দ্দ জাতীয় বহু ঈশ্বরবাদী এবং ধর্ম্মে মুসলিম

(৮৭৫ খৃঃ অঃ)। তিনি প্রথম ইসলামে "নির্ব্বাণ-বাদের" (ফনা) অবতারণা করেন। এক আনন্দময় মুহূর্ত্তে বায়াজিদ উল্লসিত হইয়া বলিলেন :—

"ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরে সন্ধান করিলাম, কিন্তু ঈশ্বর আমার অন্তরে থাকিয়া অন্তরেই চীৎকারে বলিলেন "আমিই তুমি, তুমিই আমি।"

আর একবার বায়াজিদ বলিলেন :—

"আমিই ঈশ্বর, আমার বাহিরে ঈশ্বর নাই, আমাকেই পূজা কর।"

বিশ্বের একত্ব অনুভব করিয়া বায়াজিদ বলিলেন—"আমি প্রেমিক, আমিই প্রেমাস্পদ, আমিই প্রেম।"

"আমিই সুরা, আমিই সুরাপাত্র, আমিই সাকী।"

বায়াজিদের মৃত্যুর পর শতাব্দীর মধ্যেই শান্তিবাদ ও বৈরাগ্যবাদ পারস্যের সংস্পর্শে আসিয়া সর্ব্বেশ্বর বাদের স্তরে সহজরূপবিণতিলাভ করিল। মহাজনব্যক্তিগণকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ মণ্ডলী গড়িয়া উঠিল। তাঁহাদের আদেশ ও অনুশাসন সংগ্রহ করিয়া সুফীসংঘ গঠিত হইল এবং কুতুল কুলুব্, কিতাবুল্ কুলুব্, রিসালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আদাবী, কাদিরী, রাফিয়া, সাদিলী প্রভৃতি সুফীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুঃখবাদী জালালুদ্দিন তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া সর্ব্বেশ্বরবাদের মূলমন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। "বাঁশরীর ক্রন্দনের" অন্তরালে রুমী ভগবানের সান্নিধ্যলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করিয়াছেন। এক অতীন্দ্রিয় ভগবৎ প্রীতি জালালুদ্দিন রুমীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

এই সময়ে সুফীদের উদারমতপ্রচারের বিরুদ্ধে একদল পুরাতনপন্থী গড়িয়া উঠিল। তাহারা সুফীদিগকে তীব্র আঘাত করিতে লাগিল। সৌভাগ্য যে ইমাম গজ্জালীর চেষ্টায় সুফীসম্প্রদায় ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে স্থান পাইল। ইমাম গজ্জালী ইস্লামের মন্ত্রকে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন—রহস্য বাদকে ইসলামের ভিতর প্রত্যক্ষ আসন দান করিলেন। ক্রমশঃ ইসলামের নীতিবাদের সঙ্গে সুফীর উদারমতের সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন, সুফী ঋষিদের বাণীকে হাদিছের পার্শ্বে স্থান দিলেন। বিচার ও বিশ্লেষণকে ধর্ম্মবিশ্বাসের মতনই শ্রদ্ধার্হ বলিয়া প্রচার করিলেন। কালক্রমে প্রাচীনপন্থী মুসলিমগণও মহাপুরুষের সেবা, আউলিয়াদের অসীম শক্তিতে বিশ্বাস এবং পুণ্যাত্মাদের সমাধির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বরিশালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্ এস্‌সি

(শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ১৯৩৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৩৬ সালের ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত বরিশালে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রার্থনা-গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়া এই কয়দিন স্থানীয় ভক্ত ও ভদ্রলোকগণের সহিত যে সকল ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ সম্বন্ধে যে সকল কথা এখানে লেখা হইল তাহা লিখিবার পর (প্রাত্যহিক) উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেককে পড়িয়া শুনান হইয়াছিল এবং সকলের স্মৃতিশক্তির সাহায্যে মূললেখা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, সুতরাং তিনি যে রকম তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা যথাসম্ভব অবিকৃত আকারে রক্ষা করার চেষ্টা হইয়াছে।)

জীবনে যে সকল সাধু-মহাপুরুষদের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁদের অন্যতম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সন্ন্যাসী শিষ্য বলে তাঁকে দেখবার যেমন একটা আগ্রহ ছিল তেমনি আবার সুযোগ উপস্থিত হবার পর অপরিচিত বলে তাঁর কাছে যেতে একটা সঙ্কোচও ছিল। ইতিপূর্ব্বে তাঁর সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছিলাম তাতেই সঙ্কোচ অনুভব করার যথেষ্ট কারণ ছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তাঁহার আনন্দপূর্ণ জীবনের এমন একটী মধুররূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন যে তার স্পর্শে তাঁর বরিশাল প্রবাসের শুধু নয়টী দিনের জন্য নয়, আমার এবং অন্যান্য অনেকের জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে। তাঁকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে ঠাকুর নিজেই তাঁর সন্তানদের ভিতর শক্তি যোগাচ্ছেন এবং কখনো বা কৃপা করে আমাদের সংশয় দূর করছেন। ইং ১৯৩৫ সনের ২৫শে নভেম্বর সোমবার বিজ্ঞানানন্দজীর বরিশালে পদার্পণ হবে শুনে আমরা অনেকে সকাল ৭½ ঘটিকার সময় ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন অত্যধিক কুয়াশা হওয়ায় ষ্টীমার আসতে বিলম্ব হয় এবং আমাদের অনেককেই বাসায় ফিরে আসতে হয়। আমরা কলেজে কাজের ফাঁকে তাঁর আগমন বার্ত্তা পেয়েছিলাম এবং কখন তাঁকে দেখতে যাব মাঝে মাঝে তাই ভাবছিলাম।

বৈকাল ৪½ ঘটিকার সময় আমরা তাঁকে দেখতে আসি। তিনি সে সময় শঙ্কর মঠের সামনে শ্রীযুক্ত সারদা ঘোষ মহাশয়ের দালানের একতলার উত্তর দিকের কোঠায় দক্ষিণাস্য হয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর ডানদিকে একটী টেবিলের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বড় ফটো ছিল। আমরা উত্তরাস্য হয়ে বিজ্ঞানানন্দজীর সামনে খুব কাছেই বসেছিলাম। ঘরে আরও অনেকে ছিলেন এবং আমরা বসবার পর অল্প সময়ের মধ্যে আরও কয়েক-জন ভদ্রলোক এসে বসলেন। ঘরটী ভরে উঠলো। সকলেই প্রণাম করে বসে তাঁর দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি অল্প সময় মৌন ছিলেন, পরে কিছু বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে আমাদের নিকট তাঁর নিজের কয়েকটী অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম সারনাথে বুদ্ধদেবের প্রস্তর মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিব্য জ্যোতিঃসমুদ্র দর্শনের কথা সংক্ষেপে বললেন। কিছু সময়ের জন্য তাঁর দেহবোধ ছিল না এবং পরে সারারাত ধরে তাঁর যে আনন্দের নেশা ছিল তা-ও বললেন। বলতে

বলতে তাঁর মুখে চোখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। আমরা সকলেই নিঃশব্দে ঐ দর্শনের বিষয় কল্পনা করতে ছিলাম। একটু পরে তিনি ঠাকুরের পট দেখিয়ে বললেন, "ইনি সব শুনতে পারছেন।" বলা বাহুল্য যে আমাদের সন্দিগ্ধ মন ঠাকুরের ছবিতে তাঁর প্রকাশ ভাল দেখতে পায় না সুতরাং বিজ্ঞানানন্দজীর ঐ কথার পর ঠাকুরের পটের দিকে তাকালাম এবং কিছু সময়ের জন্য আমার মনের সন্দেহ চলে গেল। বিজ্ঞানানন্দজী একটু পরেই ঠাকুর সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বললেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলাম এমন সময় তাঁকে দেখতে কোন্নগর থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। কিছুসময় কথাবার্ত্তার পর যখন ভদ্রলোক চলে গেলেন তখন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'আমি সকলের অন্তর ঠিক কাচের আলমারীর মধ্যে জিনিষ পত্র রাখলে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখতে পাই।' ঠাকুরের মুখে ঐ কথা শুনে আমি ভাবলাম, তাহলে ত আমার ভিতরও কিসব আছে দেখতে পাচ্ছেন। ইনি ত দেখছি একজন 'dangerous man' (ভয়ঙ্কর লোক)। ঠাকুর লোকের ভালটাই বলতেন, খারাপটা বলতেন না।"

"প্রথম যে দিন পরমহংসদেবের মুখে শুনে ছিলাম, 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এ শরীরে (নিজ দেহ দেখাইয়া) রামকৃষ্ণ।' তখন আমার তত বিশ্বাস হয় নি। আমি মনে করেছিলাম 'তা একটু আবোল তাবোল বললেই বা, লোকটী ত ভাল—সরল।' পরে ঠাকুর একদিন তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, "যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল সেই এই শরীরটাতে আছে।" তাঁর তখনকার মুখ চোখের ভাব দেখে আমার ওকথায় বিশ্বাস হয়েছিল। পরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন উর্দ্ধরেতা হওয়া জিনিষটা কী।"

আমাদের লক্ষ্য করে একটু পরেই বললেন, "আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন যে আমি hypnotised (সম্মোহিত) হয়েছিলাম।" তিনি মধুর ভাবে চোখে চোখে হেসে যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বেয়াড়া স্বভাবকে বিদ্রূপ করলেন।

একটু গম্ভীর হয়ে আবার বললেন, "আমি যখন পরমহংসদেবকে দেখেছিলাম তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বয়স ১৭ বৎসর ছিল। অল্পদিনই তাঁর সঙ্গ করেছি, অল্পই বুঝতে পেরেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ ঠাকুর দেখতে কিরূপ ছিলেন?' উত্তরে তিনি শ্রীশ্রী-ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বললেন, "তিনি এই মূর্তিই ধ্যান করতে বলতেন।"

মঙ্গলবার ২৬শে নভেম্বর

সকাল ৮½ টার সময় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে শুনলাম, পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পুরাতন ঠাকুর ঘরে স্থানীয় ভক্তদের দীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁকে একবার প্রণাম করে আসব মনে করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা ৯½ টার সময় তিনি ঠাকুর ঘর হতে বের হলেন। স্বামী প্রণবেশানন্দ বিজ্ঞানমহারাজকে নূতন ঠাকুর ঘর দেখালেন, পরে মিশনের পুকুর এবং সেখান হতে ওপারের জায়গাগুলো দেখালেন। ফাঁকা জায়গা দেখে বিজ্ঞান মহারাজ বালকের মত আনন্দ করে বললেন, "all right, all right, all right, very good, পাউরুটি বিস্কুট।" তারপর ধীরে ধীরে যে বাড়ীতে উঠেছিলেন (শ্রীযুক্ত সারদা ঘোষের বাড়ী) সেখানে এলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গী আমার কাছে খুব ভাল লেগেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন রাজপুত্র আপন মনে চলছেন।

মিশন হতে সারদাবাবুর বাড়ী প্রায় এক ফার্লং হবে। এর মধ্যে তিনি কোন কথা বলেন নি, কিন্তু তাঁর পিছনে চলতে চলতে এবং তাঁর হাঁটা দেখে ক্ষণিকের জন্য মনে হল তাঁর যেন

রাজাধিরাজের সঙ্গে নিকটসম্বন্ধ আছে। এই রূপ ধারণা পাকা হলে পথ চলতেও আনন্দ হয়।

এ বাড়ীতে এসে তিনি নিজের ঘরটীতে চেয়ারের উপর উত্তরাস্য হয়ে বসলেন। আমি প্রণাম করে একাই তাঁর সামনে শতরঞ্জির উপর বসলাম। প্রায় তিন চার মিনিট বসবার পর আমাকে বললেন, "এখন একটু নির্জ্জনে বসবো।" আমি অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি প্রণাম করে উঠে যখন দ্বারের কাছে আসলাম তখন তিনি আমাকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলেন এবং দুবার "আনন্দম্" "আনন্দম্" বললেন। এই কথাগুলো বলবার সময় তাঁর মুখে চোখে এমন একটী মধুরভাব ফুটে উঠেছিল যে তাতে আমার প্রাণও আনন্দিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেন যে তিনি হঠাৎ ঐ রকম করলেন তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলাম না।

আমি যখন ঘরের বাইরে আসলাম তখন একজন ভক্ত ঘরে ঢুকে বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করলেন। তিনি খুব সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করলেন।

নায়ক মহারাজের নিকট শুনলাম যে, আজ খুব সকালে স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসেছিলেন এবং তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও (৭০ বৎসর) যে খুব সকালে উঠেন ও বেড়াতে বের হন সে কথা একটু গর্ব্ব করে বলেছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ নাকি হেসে উত্তরে বলেছিলেন,"আমি কিন্তু মশাই সকালে উঠতে পারি না।" মনোমোহন বাবু নাকি ৺কাশীধামে বহুদিন পূর্ব্বে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ ঐ কথা শুনে তাঁকে বেণীমাধবের ধ্বজা দেখার কথা ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেছেন কিনা এবং কেমন দেখেছিলেন তা-ও জিজ্ঞাসা করেন। মনোমোহন বাবু একটী কালো পাথরের ঢিপির মত দেখেছিলেন শুনে বললেন, "আমি কিন্তু তাঁকে স্বপুরুষ জ্যোতির্ম্ময় দেখেছিলাম।" ঐ দর্শন বোধ হয় বিজ্ঞান মহারাজের আধ্যাত্মিক দর্শন, কারণ আমরাও শুনেছি ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী নাকি সাধারণের চক্ষে সুপুরুষ দেখাতেন না।

বৈকাল ৪ ঘটিকার পর আমরা কয়েকজন কলেজ হতে ফিরবার পথে বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম। প্রণাম করে কিছু সময় বসবার পর মহারাজ সারনাথে তাঁর দিব্য জ্যোতিঃ দর্শনের বিষয় আবার বর্ণনা করলেন। দ্বিতীয় বার শুনে যেন একটু বিশ্বাস হলো যে ভগবানের জ্যোতির্ম্ময়রূপ বাস্তবিক মানুষের নিকট প্রকাশিত হয়।

একটু পরেই তিনি ৺পরমহংসদেব সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন :—

"একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসে আছি, —হঠাৎ ঠাকুর বললেন, আয় দেখি—তোর গায়ে কেমন জোর আছে। প্রথমটা একটু সঙ্কোচ হলো। তা উনিই আগে আমায় ধরলেন; তখন আমিও ধরলাম। দুজনে কে কাকে ঠেলে হটাতে পারে সেই চেষ্টা চলছিল। তখন গায়ে আমারও শক্তি ছিল, আমি ঠেলে ঠেলে ঠাকুরকে কোণঠাসা করলাম। ঠাকুর তখন বললেন, 'আগুতে গায়ে শক্তি ছিল; হেগে হেগে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি।' আমি তখন ভেবেছিলাম জিতেছি। এখন কিন্তু দেখছি—হেরে গিয়েছি, তাঁর মত আমাকেই গ্রহণ করতে হলো।"

বিজ্ঞান মহারাজের মুখে এ সব শুনে আমারও যেন সঙ্কোচ কেটে গেল। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে ঠাকুরের শরীর সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে জানলাম যে, বিজ্ঞান মহারাজ যখন দেখেছিলেন তখন তাঁর দোহারা চেহারা ছিল; খুব কর্সা রঙ ছিল না এবং তিনি নাকি তাঁর বসা ফটোর মূর্ত্তিই বিশেষ করে চিন্তা করতে বলতেন।

এরপর বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "এবার

তিনি (ঠাকুর) গোপনে এসেছিলেন; আবার নাকি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শারীরিক শক্তি নিয়ে রাজা হয়ে দুইশত বৎসর পরে আসবেন।”

প্রশ্নের উত্তর জানলাম, ঠাকুর নিজ মুখে পাঞ্জাব প্রদেশে আসবেন একথা বলেন নাই।

বিজ্ঞান মহারাজ পাশের শঙ্কর মঠ থেকে এসে কিছুক্ষণ খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “এরা প্রণাম ক'রে যেন বুঝাতে চায় যে আমি বড়। কই আমিত বড় বলে বুঝতে পারছি না।”

একটু পরে নিজেই বললেন, “স্বামীজীর খুব কঠোরতা ছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই বকুনি দিতেন।” জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, “আমি বকুনি খাই নাই। বেলুড়ে একবার তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে সারারাত ধ্যান করতে আদেশ দিলেন। একদিন মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে) মাধুকরী করে খেতে বললেন। সেদিন মহারাজের জন্য রান্না হলো না। তিনি মাধুকরীতে বেরুলেন। স্বামীজী নিজে খেতে বসলেন। তাঁর খাওয়া শেষ না হতেই মহারাজ মাধুকরী করে ফিরলেন। তখন আবার বললেন ‘মাধুকরীর অন্ন খুব পবিত্র, দেখি কি আনলি?’ এই বলে মহারাজের কাছ থেকে চেয়ে খানিকটা খেলেন।”

বিজ্ঞান মহারাজ একটু নির্জ্জনে বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমরা সকলে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম।

বুধবার ২৭শে নভেম্বর, সকাল বেলা

সকালে প্রণাম করে বসবার পর হনুমানের কথা উঠলো। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন—“একবার আমাদের ওখানে (বোধ হয় এলাহাবাদের কথা বলেছিলেন, কেহ এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই) হনুমান খুব অত্যাচার করতে থাকে। মিউনিসিপালিটি থেকে নোটিশ দেওয়া হলো ওদের মারবার জন্য। একদিন আমি শৌচে বসেছিলাম, হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো। আমার কাছেই একটা হনুমান পড়ে গেল। আমি দেখলাম যে হনুমানটা হাত দুটো একত্র করে বুকে ঠেকালো আর তিনবার বললো—রাম, রাম, রাম; তার পরেই মরে গেল।”

বৈকালে কলেজ থেকে এসে প্রণাম করে বসতেই তিনি বেড়াতে বেরুলেন। বিজ্ঞান মহারাজ প্রথম জগদীশ-আশ্রম দেখতে গিয়েছিলেন। আমি পদব্রজে যখন জগদীশ আশ্রমের কাছে এলাম, তখন তিনি আশ্রম দেখে গাড়ীতে উঠছিলেন। আমি নায়ক মহারাজকে লক্ষ্য করে বললাম, “মহারাজ ফিরতে তো ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হবে।” বিজ্ঞান মহারাজ ও নায়ক মহারাজ এক সঙ্গে বললেন, “হাঁ ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরব।” আমি সন্ধ্যার পর বিজ্ঞান মহারাজের উপদেশাদি শুনবার আশায় আবার সাবদা বাবুর বাসায় যাব ঠিক্ করলাম।

রাত প্রায় ৭টা

বিজ্ঞান মহারাজ চেয়ারে বসেছিলেন এবং তাঁর সামনে ঘর ভরে ভক্তরা বসেছিলেন। কলেজের অধ্যাপক শ্রী—ও উপস্থিত ছিলেন। ইনি ৺জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনেক দিন সঙ্গ করেছেন। তাঁর শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের অনেকের চেয়ে বেশী জানা শুনা আছে।

কথা-প্রসঙ্গে পৃথিবীর মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় হজরত মোহম্মদের বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয় জানতে চাইলেন। অনেকেই প্রথমটা একটু হতাশ হলেন, কেননা হজরতের চেয়ে আমাদের দেশের মহাপুরুষদের সম্বন্ধে—বিশেষতঃ ঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয় শুনবার ইচ্ছা ছিল। বিজ্ঞান মহারাজ কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হজরতের জীবনের কতকগুলি ঘটনা, তাঁর গুহায় ৪০ দিন তপস্যার কথা, সেখানে তখনকার সামাজিক প্রথাগুলোকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপনের কথা, এবং

তাঁর সংগঠন শক্তির কথা বলতে আরম্ভ করলেন। হজরত মহম্মদ যে বাল্যকালে বিশেষ কিছু লেখা-পড়া শিখেন নাই সেই কথা উল্লেখ করে তাঁর ঐশী শক্তির খুব প্রশংসা করলেন। হজরত মহম্মদ যে জীবনে অতিশয় কঠোর তপস্যা না করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন তা-ও উল্লেখ করলেন।

ইতিপূর্ব্বে পরমহংসদেবের সাধনার বিষয় পড়েই হজরত সম্বন্ধে কতকটা শ্রদ্ধা হয়েছিল। বিজ্ঞান মহারাজের মুখে তাঁর জীবনী শুনে আমার হজরতের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। আমার বুদ্ধি স্বামীজীর "Mohamad stumbled on spirituality"র কথা না বুঝ্‌তে পেরে একটু দ্বিধা ভাব পোষণ করছিল; আজ তা বুঝ্‌তে পেরে হৃদয়ের শ্রদ্ধা একটা "intellectual assent"ও পেলো।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদের কথা বলতে গিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের কথা উঠ্‌লো। সে সমাজের অনেকের সম্বন্ধে খুব সশ্রদ্ধভাব নিয়ে তিনি কথা বললেন। পরে ৺পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর এক-দিনকার বক্তৃতার কথা বললেন। শাস্ত্রী মহাশয় নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজের প্রতি পদাঘাত (পা দিয়ে মাটিতে আঘাত) করে বলে-ছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা তুললেন। বিজ্ঞান মহারাজ বল্‌লেন, "ভগবানকে জানা ও বুঝা খুব অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। অন্তর শুদ্ধ না হলে হয় না। খুব সাবধানে থাক্‌তে হয়; একটা খারাপ ভাব এলে সমস্ত blood (রক্ত) দূষিত হয়ে যায়। Time, space ও causation রূপে যিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছেন, তাঁর পূজা (অর্থাৎ উহার নিয়ম মেনে চলা) পাশ্চাত্যের লোকেরা'ই কর্‌ছে—এই জন্যই মহামায়া তাদের প্রতি সুপ্রসন্না।"

প্রশ্ন হলো ভগবান কি law (আইন)? বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "হাঁ তিনি law, law নিজেও মেনে চলেন (যেমন অবতার শরীরে) আবার তিনি law তৈরী করেন।"

তিনি আমাদের সকলকে Time, space causationএর সম্মান রেখে নিয়ম মেনে চল্‌তে বল্‌লেন ও আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন।

(ক্রমশঃ)

অহিংসার প্রতিষ্ঠা

শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—অনেকের ধারণা এটী বৌদ্ধ বচন এবং শাক্যসিংহ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে অহিংসার প্রতিষ্ঠা ধর্মজগতে ছিল না। এ ধারণা ভুল। অহিংসাতত্ত্বের আত্ম-প্রকাশ মানুষের ধর্মভাব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে। শাক্যসিংহ ও মহাবীরের আবির্ভাবের আনুমানিক চার হাজার বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ রচিত। সে দিনের সেই সুপ্রাচীন আর্য সমাজেও অহিংসার আদর দেখা যায়। ঋগ্বেদে ঋষি গোধা বলছেন—আমরা বিধান উপাসকেরা কিছুই হিংসা করি না। (ঋগ্বেদ—১০।১৩৪।৭)। আর এক স্থানে ঋষি ভরদ্বাজ বলছেন—পরমাত্মা তীক্ষ্ণ তেজ দ্বারা সকল

হিংসাকারী অবিদ্যাকে নাশ করুন (ঋগ্বেদ—৬।১৬।২৮)।

বেদ সংহিতায় বৈদিক যজতগণের পূজার জন্য যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে তা 'অধ্বর' অর্থাৎ হিংসা রহিত যজ্ঞ, সে যজ্ঞে পশুবলির স্থান নাই। পশুবলির বিধান দেখা দেয় প্রায় ২৫০০ বৎসর পরে বৈদিক যুগের মধ্যকালে। ১৩৪৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় "ভারতীয় সাধনার অভিব্যক্তি ধারা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলেছি।

প্রায় আরও এক হাজার বৎসর পরে বৈদিক যুগের অন্তকালে অর্থাৎ উপনিষদ্ যুগে ব্রহ্মবাদী ঋষি চরম সত্য দর্শনের বিধান দিলেন।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥"

অর্থাৎ, জগতে সকল পদার্থ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত করবে—ত্যাগের দ্বারা আপনাকে রক্ষা করবে—অপর কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করবে না।

ঋষির এ মহৎ ও উদার বাণীর পর মানুষে মানুষে, মানুষে-পশুতে কোনরূপ হিংসা-দ্বেষের অবকাশ থাকে না—এ বিশ্ব-জোড়া ভ্রাতৃ-প্রেম।

এই সময় সমাজের বিস্তৃতি ঘটে, চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, স্মৃতিশাস্ত্রও রচিত হয়। মানবধর্মকে বাদ দিয়ে মানবসমাজের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করা চলে না। কাজেই স্মৃতিকার প্রথমেই ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন, সেই প্রসঙ্গে বললেন—জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ করুন আর নাই করুন ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপবলে সিদ্ধিলাভ করবেন যেহেতু দয়াশীল ব্রাহ্মণই মুক্তিলাভের যোগ্য (মনুসংহিতা ২।৮৬-৮৭)।

বৈদিক যুগের অন্তকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। যাগ-যজ্ঞমত্ত বৈদিক সমাজে তিনি জ্ঞান-প্রধান উপনিষদ্ ধর্মের সঙ্গে ভক্তিরস মিশিয়ে অবতারবাদমূলক ভাগবত ধর্ম প্রবর্তন করেন, তার প্রচার করেন বাদরায়ণ ব্যাস মহাভারতরূপ পঞ্চম বেদে। অহিংসাই এই ভাগবৎ ধর্মের ভিত্ত।

উপনিষদের ঋষি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছিলেন দেহরথের ভিতর আছেন এক আত্মা-রথী। বহির্মুখ মনকে অন্তর্মুখ করে এই আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে, ত্রিতাপদগ্ধ জীব ত্রিতাপজ্বালার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না—শান্তি পেতে পারে না। যে কৌশল প্রয়োগে চিত্তচাঞ্চল্যের নাশে মনকে অন্তর্মুখ করে ঐ আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে। ঐ যোগসূত্রে কথিত যোগমার্গের প্রথম বীজই হল অহিংসা-সাধন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে শাক্যসিংহ ও মহাবীরের আবির্ভাব। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হওয়ার পর গোঁড়া ব্রহ্মণ্য সমাজ স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠাকল্পে হিংসামূলক যাগযজ্ঞের পুনঃ প্রচলনে অনাচার-অত্যাচারের সৃষ্টি করেন। এর হাত থেকে হিন্দুসমাজের উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল এই যুগল ধর্মবীরের। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবই প্রকাশ্যে ঐ ব্রহ্মণ্যধর্মের মূলে ঠারাঘাত করেন। তাঁর প্রবর্তিত নবধর্মে জন্মগত জাতিভেদ প্রথাও ব্রাহ্মণের জন্মগত স্বাধিকার তুলে দেন এবং সহিংস যাগযজ্ঞের সমাধি রচনার জন্য বজ্রকণ্ঠে প্রচার করেন—অহিংস পরমো ধর্মঃ।

বৌদ্ধধর্মের ভারতবর্ষ ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তখন ভারতের বাহিরে মিসর গ্রীস প্রভৃতি দেশে মুসার ধর্ম প্রচলিত। সে ধর্মে বৈদিক পশুযজ্ঞের ছাপ পড়ায় জিহোবার মন্দিরে নিত্য পশুবলি দেওয়া হতো। শাক্যসিংহের অহিংসার বাণী সম্ভবতঃ যিশুর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে। তিনি তাই তাঁর ধর্মে (New Testament) অহিংসার জয়গান করে বললেন—"Ye resist not evil * * Love your enemies,

bless those that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you" (Bible, St Matthew Chap V) সার মর্ম,—'প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় কর, হিংসার দ্বারা নয়।' যিশুর এই পবিত্র মোহন প্রেম বাণী প্রচারের ফলে জিহোবার মন্দিরে পশুবলির প্রথা লুপ্তপ্রায় হয়।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ পতিত হয়ে কদাকার ধারণ করে এবং অবশেষে জন্মভূমি হতে বহিষ্কৃত হয় কিন্তু ঐ সনাতন অহিংসাবাদ এ দেশ ত্যাগ করে যেতে পারে নি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবৎ ধর্মের উপর শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ যে নূতন বৈষ্ণব ধর্মের কাঠামো গড়ে তুললেন তাতে এই অহিংসাতত্ত্ব অনেকখানি স্থান জুড়ে বসলো। যে প্রেম যিশুর ধর্মে সাধকের কাছে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল সেই প্রেমকে শ্রীচৈতন্য দেব বৈষ্ণবধর্মের ভিতর নিয়ে এসে কার্যকরী শক্তিতে পরিণত করলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ জ্বলে ওঠে। এই ধর্ম-সংঘর্ষ নিবারণের জন্য আবির্ভূত হলেন যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ঐ অহিংসাতত্ত্বের রূপ দিলেন ধর্ম-সমন্বয়ে। বর্তমান ধর্মজগৎ চলতে আরম্ভ করেছে সেই সমন্বয়ের পথে—সেই প্রেম ও মিলনের পথে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে ধর্মজগতে অহিংসার উদয় হয়েছে মানবের ধর্মজ্ঞানের প্রথম প্রভাতে এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তার তেজ ছড়িয়ে পড়ছে নানাদিকে নানারঙ্গে।

বর্তমানের প্রশ্ন, রাষ্ট্রনীতিতে অহিংসার প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব?

রাষ্ট্রনীতিতে অহিংসা-প্রতিষ্ঠার অর্থ এক কথায় যুদ্ধ-বিগ্রহের লোপ। এ প্রশ্ন যে আজই উঠেছে তা নয়, উঠেছিল সুদূর অতীতে পরোক্ষভাবে। বৈদিক সাহিত্যে আর্য-অনার্য সংঘর্ষের অনেক খবর পাওয়া যায় কিন্তু ঠিক সে সময় এই প্রশ্নটা উঠেছিল কিনা বুঝা যায় না, তবে রামায়ণী যুগে এর একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র পিতার আদেশে বনবাসে চলেছেন, সঙ্গে লক্ষ্মণ ও সীতা। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ মাত্র তথাকার তপস্বী আশ্রমিগণ নালিশ করলেন—হে রাম, বনেই থাক আর অযোধ্যা নগরীতেই থাক তুমি আমাদের রাজা। রাজার কর্তব্য প্রজা-পালন। রাক্ষসেরা আমাদের অনেককে মেরে ফেলেছে—আমরা সংযমী তপস্বী, কাজেই তার প্রতিহিংসা নিতে পারি না। তুমি রাক্ষসদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।

শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন সত্য সত্যই সেই অরণ্যের মাঝে বহু আশ্রমীর মৃতদেহ। তখন তিনি অভয় দিলেন রাক্ষসদের বধ করবেন। দেবী সীতা এই সময় আপত্তি করে বললেন—সে কি! রাক্ষসেরা তোমার কোন শত্রুতা করে নি, বিনা শত্রুতায় তাদের তুমি হত্যা করবে? এ হত্যায় মানুষের যে তৃতীয় কামজ ব্যসন তাতে তোমায় লিপ্ত হতে হবে—বিনা বৈরিতায় নিষ্ঠুরতা!

শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিলেন—ক্ষত্রিয় ধনু ধারণ করে কেন? যাতে আর্তের রোদন না শুনতে হয়। রাক্ষসদের অত্যাচারে উৎপীড়িত তপস্বিগণ আমার শরণাপন্ন হয়েছেন, অতএব রাক্ষসদের বধ করে তাঁদের রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীরামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি রাখলেন—দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসদের বধ করলেন। তারপর যখন তিনি রাবণের হাত থেকে সীতা-উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে কপিরাজ বালীকে নিধন করেন তখন ঠিক সীতারই প্রশ্ন তোলেন কপিরাজ নিজে। শ্রীরামচন্দ্র তখন উত্তর দিলেন—এ ভারতভূমি ইক্ষ্বাকুদের, পশু-পক্ষী-নর সকলের দণ্ড

ও পুরস্কারের ক্ষমতা ইক্ষ্বাকুদের হাতে। তুমি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ করে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করেছ, সেইজন্য দণ্ডের যোগ্য, তাই আমি তোমায় বধ করলাম। তোমার এই শাস্তি জগতে সর্বথা ধর্মসম্মত বলেই গণ্য হবে।

শেষে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ ও তৎপক্ষীয় রাক্ষসদের সংহার করলেন, তখন তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ আর হল না। রাবণ সীতাহরণ করে তাঁর বৈরিতা করেছে, অতএব এ ক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদের কথাই ওঠে না।

শ্রীরামচন্দ্র-চরিত্র থেকে আমরা এই বুঝি যে তখনকার দিনে বৈরিতা বা অধর্ম আচরণ করলে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রাণিবধ রাষ্ট্রনীতিসম্মত ছিল, কিন্তু এই দুই ক্ষেত্র বাদে অপরের প্রাণনাশ রাষ্ট্রনীতিও অনুমোদন করতো না, অর্থাৎ অহিংসা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে দেখা যায় তিনিও শ্রীরামচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন। পুতনা, তৃণাবর্ত, অরিষ্ট, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্যোধন প্রভৃতি অনেক অত্যাচারী তাঁর হাতে নিহত, কিন্তু স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কোন যুদ্ধে তিনি লিপ্ত হন নি। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি নিজে কৌরব সভায় গিয়ে এ যুদ্ধ নিবারণের জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে দুর্যোধনকে অনুনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন পাণ্ডবগণের পিতৃরাজ্যের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অংশ দিতে। দুর্যোধন উত্তর দিলেন—বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও আমি দিব না। যখন তাঁর এই শুভ উপদেশ দুর্যোধন শুনলেন না তখন শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন যে এই পাপমতিদের প্রতি চতুর্থ উপায় যে দণ্ড তাই অবলম্বনীয় তিনি ফিরে এসে পাণ্ডবদের বললেন—

"তথ্যং পথ্যং হিতং চোক্তো ন চ গৃহ্লাতি দুর্মতিঃ।
দণ্ডং চতুর্থং পশ্যামি তেষু পাপেষু নান্যথা॥"

মহাযুদ্ধের অবসানে শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব রাষ্ট্র-নীতি-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—বিনা যুদ্ধে জয়লাভ রাজার কর্তব্য, যুদ্ধে জয় জঘন্য—

"অযুদ্ধেনৈব বিজয়ং বর্ধয়েদ্বসুধাধিপঃ।।
জঘন্যমাহুর্বিজয়ং যুদ্ধেন চ নরাধিপ॥"

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যুদ্ধনীতি নিকৃষ্ট। কেন? না, হিংসামূলক। এই গেল প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-সমাজের ধারণা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দেড় হাজার বৎসর পরে যিশুর আবির্ভাব। রাম-কৃষ্ণ বুদ্ধ-যিশুর মত ধর্মগুরু, কিন্তু তাঁদের জীবন-ধারা বিভিন্ন। শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন গৃহী ও রাষ্ট্রনায়ক আর বুদ্ধ-যিশু ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। কাজেই শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণের রাষ্ট্রনীতির ধারণা বুদ্ধ-যিশুর ছিল না। রাষ্ট্রনীতিতে অহিংসাতত্ত্ব কতদূর প্রযোজ্য এ চিন্তার প্রয়োজন বুদ্ধ-যিশুর হয় নি।

বুদ্ধ-যিশুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে পাতঞ্জল যোগ সূত্র সাধক-সমাজে সুপরিচিত। তাই দেখা যায় বুদ্ধ-যিশুর মতবাদ ঐ যোগ-সূত্রের অহিংসা-ভাবে প্রভাবান্বিত।

অহিংসা যোগ-পথের প্রথম ধাপ। প্রশ্ন উঠলো—হিংসাশীল শত্রুকে জয় করা যায় কি উপায়ে? পতঞ্জলি উত্তর দিলেন—অহিংসার দ্বারা, কেননা যার মধ্যে সত্যকার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি বিদ্বেষভাব কেউ বহন করতে পারে না, তার শত্রু কেউ থাকে না। অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ (যোগসূত্র—২।৩৫)। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, এরূপ অহিংসানিষ্ঠ যোগীর সম্মুখে বাঘে ভেড়ায় এক সঙ্গে খেলা করে, "The tiger and the lamb will play together before that Yogi" (*Raja Yoga —p 185*)। এটা যোগদর্শনের শ্রেষ্ঠকল্পনা মাত্র নয়। কিছুদিন পূর্বে সংবাদ-পত্রে এ রকম একটা কাহিনী অনেকের চোখে বোধ হয় পড়ে থাকবে।

পতঞ্জলির ঐ উত্তর ভাষান্তরে ফুটে উঠে বুদ্ধ-যিশুর মুখে। বুদ্ধ বললেন—শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার শান্তি হয় না, অশত্রুতার দ্বারাই শত্রুতার শান্তি হয়, এই সনাতন ধর্ম।

যিশু বললেন—"Resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also * * * * * Love your enemies, bless them that curse you, Do good to them that hate you" (*Bible—St Matthew, Chap 5*)

যিশু ও শ্রীচৈতন্যের জীবনী পাঠে দেখা যায় যে পতঞ্জলি-বুদ্ধ-যিশুর এই মহৎ বাণী—অহিংসা বা প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় কর—ব্যক্তিগত-ভাবে অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—ইহা রাষ্ট্রনীতিতে সমষ্টিগত ও দেশগত-ভাবে সফল হবে কি?

বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ প্রশ্নটা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। ঘোর জড়বাদী প্রতীচ্যও ধ্বংসাত্মক জড়বাদের চরম ফল ভোগ করতে আরম্ভ করে। যিশুর ঐ Resist not evil বাণীর উপর নির্ভর করে সেখানে এতদিনে একটা সাম্প্রদায়িক দল গড়ে উঠেছে—নাম শান্তি-বাদী (Pacifists)। তাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধী এবং বিনা বৈরিতায় শত্রু জয় করতে চান। তাঁরা বলেন—খৃষ্টীয় জগৎ, যদি সত্য সত্যই খৃষ্টধর্মানুরাগী হও তবে শত্রু ঘরের দরজায় এলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো না, আমাদের এই শান্তিবাদ খৃষ্টীয় ধর্মের ব্যবহারিক দিক, "Pacifism is applied-Christianity."

আক্রমণকারী সশস্ত্র শত্রুকে বিনা অস্ত্রে কেমন করে জয় করা যাবে? তদুত্তরে তাঁরা বলেন—

তারা এলে হাসতে হাসতে অতিথিবোধে তাদের আদর অভ্যর্থনা করবো, থাকবার জায়গা দেব, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে খেতে দেব। তারা রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও রাগবো না, বরং তার পরিবর্তে অতিপ্রিয়ের মত ব্যবহার করবো। তখন তারা নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হবে এবং পাছে আমাদের এই অসাধারণ শান্তিবাদ সংক্রামক ব্যাধির মত চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে, শেষে তাদের অস্ত্রধারী সৈন্য-সামন্তদের নিস্তেজ ও নিরস্ত্র করে ফেলে সেই ভয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে ত্বরায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে (Ahimsa and World Peace by Wilfred Wellock)।

কল্পনাটা বেশ। তবে কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বর্তমান খৃষ্টীয় জগতে ত আমরা এখন পর্যন্ত কিছু দেখছি না—অস্ত্রের ঝনৎকার আর সাজ-সাজ-সাজ রবই শুনছি। অস্ত্র-শস্ত্রের বহর (Armament) ত কমছে না, বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। নিরস্ত্র নিদ্রিত দেশের বুকে হঠাৎ আকাশ থেকে বোমাপাত ও বিষ-বাষ্প প্রয়োগ বর্তমান খৃষ্টীয় জগতেরই উদ্ভাবিত মারণ প্রণালী।

বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রনীতিতে অহিংসা-প্রয়োগ-প্রচেষ্টা আজ কিছু দিন যাবৎ চলে আসছে, আশার আলোও দেখা দিয়েছে। যদি জগতে কোথাও এই নবীন রাষ্ট্রনীতিক মতবাদের অভিযান জয়-মণ্ডিত হয় তবে হবে এই ভারতবর্ষে, এই আমাদের স্থির বিশ্বাস। কারণ, ভারতের শিক্ষা-কৃষ্টি-দর্শনের মূল সাম্যবাদে ও শান্তিবাদে। অহিংসার বাণী প্রথম প্রচারিত এই আর্যাবর্তে, তার প্রথম সাধনা এইখানে এবং রাষ্ট্রনীতিতেও তার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা এইখানেই সম্ভব।

পূজা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

হে দেবতা, তোমা লাগি নহে মোর,
ধন, জন, আশা,
প্রীতি ভালবাসা,
কামনার কাম্যবনে বিলাস ব্যসন,
ইন্দ্রিয়ের ভোগারতি দেহপীঠে
স্থূল আকিঞ্চন;
যে দেহের প্রতি অণু, দেহীশ্বাসে
অবিরল সমুচ্ছল পুলক রোমাঞ্চ রসে ভাসে।
অস্বীকারি প্রাণের বারতা
ডুবাইতে আপনার শ্রীহীন মত্ততা,
লক্ষ্যহীন বাসনার অসুন্দর ফেনিল উচ্ছ্বাস
পরাণের আশ,
শূন্যতার অন্ধকারে ডুবাইতে চায়
হয়ে অসহায়।
নির্মেঘ অম্বর যবে প্রশান্তি মগন,
ক্লান্ত আঁখি প্রতীচি-তপন,
ধীর পদক্ষেপে চলে বিশ্রামের তিমির আলয়ে
আনন্দে নির্ভয়ে,
মোহের স্বপন নামে পরাণে উছল
মনে লয় তৃপ্তি অচপল।
তারে জীবনের সত্যবলে মানি
কর্ম্মের সাধনা হ'তে অমৃতের বাণী
আর যেন চাহি না খুঁজিতে
সাধ যায় নির্ব্বাণ লভিতে।
কিন্তু হায়, ওগো যাদুকর
ভুলি আত্মপর।
ছুটিয়াছি তোমা পানে,
তোমার আহ্বানে,
মাতৃহারা শিশুসম ধূলিম্লান পথে
ক্ষুদ্র মনোরথে।
হৃদয়ের প্রত্যয় বর্ত্তিকা,
তব অমূর্ত্তের দীপ্ত শিখা,
অবসন্ন প্রাণে মোর
কাটে অমানিশাঘোর॥
মানস বিহঙ্গ ভেসে চলে
মুকুলিত চেতনার হৈম উপকূলে;
পরমের পরাপ্রেমের নিলয়ে
দিগ্বলয়ে,
মনসিজ কল্পনার শূন্যরেখা হারায় যেথানে
তার স্বপন বিজ্ঞানে।
ওগো জ্যোতির্ম্ময়,
আমার জীবনযজ্ঞে তব অভ্যুদয়
প্রাণ অর্ঘ্যে মম করিতে গ্রহণ
হরিতে মরণ।
শান্তি লভি
ঋত্বিকের করস্পর্শে কৃতকৃত্য হবি।
সহস্রলোচন
করিল দেহের ধূলি কলঙ্ক মোচন।
জ্ঞানাতীত, বিশেষণ বিভূষিতে পারে না তোমায়
নিজ যোগ্যতায়,
জানিব তোমারে হেন স্পর্দ্ধা মোর
ওগো মনচোর
জীবনের ধর্ম্মে কর্ম্মে নহে প্রকাশিত
অভীপ্সার ঊর্দ্ধরতি তব প্রেমে হয়েছে সিঞ্চিত।
হোতা ও আহুতি তুমি, যজ্ঞ ও যাজ্ঞিক,
পূজা মোর আনিয়াছি তবু, দৈহিক ও মানসিক॥

দশগ্রীব রাবণ

শ্রীসাহাজী

রাবণ পুলস্ত্যবংশীয় লঙ্কার রাক্ষস রাজাদের সাধারণ নাম ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তিনি ছাড়া অন্তত আরও নয়জন রাবণ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। রাবণ নামে যে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন, পুরাণে তাহার প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি অনরণ্য এক রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন দেখা যায়।

তেতোঽনরণ্য স্তং রাবণো দিগ্‌বিজয়ে জঘান।১৩

—৩।৪। বিষ্ণুপুরাণ

ইক্ষ্বাকু হইতে অনরণ্য পর্যন্ত প্রায় ২২ পুরুষের ব্যবধান, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ইক্ষ্বাকুর ব্যবধান প্রায় ৬৩ পুরুষের। সুতরাং অনরণ্য-অরি রাবণ এবং রামারি রাবণ কখনও এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। এবং তাঁহারা যে বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাহা রাবণের প্রতি অনরণ্যের অভিশাপ উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়।

ইক্ষ্বাকু-পরিভাবিত্বাদ্ বচো বক্ষ্যামি রাক্ষস।
যদি দত্তং যদি হুতং যদি মে সুকৃতং তপঃ॥
যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্ তদা সত্যবচোস্তু মে॥২৯
উৎপৎস্যতে কুলেহস্মিন্ ইক্ষ্বাকুণাং মহাত্মনাং।
রামো দাশরথি র্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥৩০

১৯। উঃ। রামায়ণ

দ্বিতীয়তঃ শিবলোকের অন্তর্গত কার্তিকেয়ের জন্মভূমি শরবন অভিযান সময়ে শিব-কিঙ্কর নন্দিকেশ্বর কর্তৃক নিবারিত হইয়া রাবণ তাঁহাকে বানরমুখ বলিয়া উপহাস করিলে নন্দিকেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহা হইতেও রাবণ যে একাধিক ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়।—

তস্মান্ মদ্‌বীর্য-সংযুক্তা মদ্রূপ সম তেজসঃ।
উৎপৎস্যন্তি বধার্থং হি কুলস্য তব বানরাঃ॥১৭
তে তব প্রবলং দর্প মুৎসেধঞ্চ পৃথগ্‌বিধং।
ব্যপনেষ্যন্তি সম্ভূয় সহামাত্যসুতস্য চ॥ ১৯

—১৬।উঃ।রামায়ণ

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রথমতঃ তাহার শত্রুকেই নিগৃহীত করিতে চায়, কিন্তু তাহাতে সে যখন অসমর্থ হয়, তখনি সে তাহার কুলের নিপাত কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু নন্দিকেশ্বরের ন্যায় বীরপুরুষ যে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার কুলের নিপাত কামনা করিয়াছিলেন, তাহা কখনও সম্ভবপর মনে হয় না। বিশেষতঃ তিনি যে রাবণ কর্তৃক সবিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাও নয়। সুতরাং তাঁহার উক্ত অভিশাপ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য কী, তাহা বস্তুতঃই বুঝিয়া দেখিবার বিষয়।

বলা বাহুল্য ব্রহ্মার অনুগ্রহে বৈশ্রবণ কুবেরের যেমন অমরত্ব অর্থাৎ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুবের রাজ-বংশের দীর্ঘ স্থায়িত্বলাভ হইয়াছিল,তাঁহার বরে রাবণ রাজারাও তেমনি অমর হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নন্দিকেশ্বরের অভিশাপেই তাঁহাদের সেই অমরত্বের অবসান ঘটিয়াছিল, এইমাত্র। আদি রাবণ সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার ৩।৪ পুরুষের অধিক পরবর্তী ছিলেন না, (১) কিন্তু অন্তিম রাবণ (শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া) তাঁহার প্রায় ৬৮ পুরুষ পরবর্তী ছিলেন। সুতরাং রাবণ

(১) পরে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বংশতালিকা দেখুন।

রাজারা প্রায় ৬৫ পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, দেখা যায়। কাজেই, তাঁহারা যে এক প্রকার অমর ছিলেন, সে কথা তাই অস্বীকার করা যায় না। অত্যাচারী দশম রাবণের বিরুদ্ধে দেবতাদের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, নন্দিকেশ্বর সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন, এবং ত্রৈলোক্য জয় করিলেও তিনি যে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানর-রাজ বালীর (২) হস্তে সবিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, সে সংবাদও সম্ভবতঃ তিনি রাখিতেন। এই হেতু, রাবণের মৃত্যুবাণ কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, বিচক্ষণ নন্দিকেশ্বর সম্ভবতঃ তাহা অনুমান করিতে পারিয়াই ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

রাবণকে ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন, এইরূপ বাক্যের তাৎপর্য এই যে তাঁহার অভ্যুদয়ের তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন, এইমাত্র, নতুবা, তিনি যে শুধু ফাঁকা কথায় চিড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমত নয়। বলা বাহুল্য, দেবতারা তাঁহাদের ভক্তদিগকে শুধু যে ফাঁকা কথায় বর দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নয়, পরন্তু তাঁহাদের সেই কথা যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তাহারও চেষ্টা করিতেন। রাবণ ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাঁহার অনুগৃহীত এবং প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার অসন্তুষ্টির ভয়ে, অনেকে আবার তাঁহার প্রতি সম্ভ্রম বশতঃও, রাবণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিতেন না। দশম রাবণের সময়ে বলীর (৩) রাজ্যে বিষ্ণুর যিনি প্রতিনিধি ছিলেন, তিনিও যে তদানীন্তন ব্রহ্মার (৪) প্রতি সম্ভ্রমবশতঃই ("ব্রহ্মণঃ প্রিয়কাম্যয়া") তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চান নাই, সে কথা আমরা পরে বিবৃত করিয়াছি। যাহা হোক, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া নানাভাবে, বিশেষতঃ জনবল প্রদানে দশম রাবণকে যে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য (৫)। জনবল ভিন্ন কোনও বৃহৎ কার্যই যে সুসম্পন্ন হইতে পারে না, সে কথা, আশা করি কেহই অস্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে নন্দিকেশ্বর যে তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য আবার এই যে তাঁহার ধ্বংসের পথ তিনিই সুপ্রশস্ত করিয়াছিলেন, এই মাত্র। পূর্বোক্ত শ্লোকের "মদ্বীর্য সংযুক্তাঃ" পদটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, শিক্ষায় দীক্ষায় রাবণের বিরুদ্ধবাদী করিয়া বানরজাতিকে তিনিই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সীতা-উদ্ধার কালে শ্রীরামচন্দ্র যে তাঁহাদিগকে অতি অল্প আয়াসেই হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাহার কারণ, নন্দিকেশ্বরকে তাঁহার সমসাময়িক দশম রাবণের (৬) প্রতি ঐ প্রকার ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া সে সময়ে দেবতারাও তাই খুসি হইয়াছিলেন, দেখা যায়।

(২) রামায়ণে বালি এবং বালী, এই দুই প্রকার বানানই দেখা যায়। (৩) বলি এবং বলী, সুমালি এবং সুমালী ইত্যাদিরও এইরূপ দুই প্রকার বানান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, আধুনিক ব্যাকরণের সূত্র তখনও পাকাপাকি ভাবে বিধিবদ্ধ হয় নাই। এই সকল ঘটনার প্রাচীনত্ব ইহা হইতেও অনুমান করা যায়। (৪) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ এবং কুবের, এগুলি বিভিন্ন লোকাধিপতিদের সাধারণ উপাধি ছিল, মাত্র। সুতরাং বিভিন্ন রাবণের সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবাদি ছিলেন, সে কথা ভুলিয়া যাওয়া কর্তব্য নয়। তাঁহারা অমর ছিলেন, এ কথার তাৎপর্য আবার এই যে, তাঁহাদের বংশ চিরদিন (সুদীর্ঘকাল) অক্ষুণ্ণ ছিল। এক বিষ্ণু গত হইতেন, তাঁহার স্থান অন্য বিষ্ণু আসিয়া গ্রহণ করিতেন; ফলে বিষ্ণুর অভাব কোনও দিনই হইত না এইরূপে, আমরা দৈত্যরাজ বলীর সময়ে বামন এবং সমুদ্র-মন্থন সময়ে আবার অজিত বিষ্ণু ছিলেন, দেখিতে পাই। সপ্তম এডওয়ার্ড বা পঞ্চম জর্জ মরিতে পারেন সত্য, তাই বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের কিন্তু মরণ নাই। দেবতারাও যে সেই হিসাবেই অমর ছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। (৫) ব্রহ্মা যে জনলোকের অধিপতি ছিলেন এবং জন-বহুল বলিয়াই যে তাঁহার রাজ্যের নাম জন-লোক (মহাচীন ?) হইয়াছিল, সে কথা পরে বলিয়াছি। (৬) দশম রাবণ এবং উক্ত নন্দিকেশ্বর যে সমসাময়িক ছিলেন, তাহা পরে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

ইত্যাদীরিতবাক্যেতু দেবে তস্মিন্ মহাত্মনি।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্প-বৃষ্টিশ্চ খাচ্চ্যুতা॥ ২১
—১৬উঃ।রামায়ণ

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, রাবণের ন্যায় অসাধু ব্যক্তির অভ্যুদয়ে সাহায্য করা অন্যায়, ব্রহ্মার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির সে-কথা বুঝা কর্তব্য ছিল। কিন্তু কথা এই, সৃষ্টির দেবতার—কে অসাধু, কে সাধু হইবে, তাহা ভাবিয়া কাজ করিতে গেলে চলে না। সে ভাবনা পালন-কর্তা বিষ্ণুর। ব্রহ্মার কর্তব্য শুধু,—প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। কুসন্তানের জনক জননীর শাস্তি হইবে, এইরূপ বিধি যদি প্রবর্তিত থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী সম্ভবতঃ এতদিন জন-বিরল অরণ্য ভূমিই থাকিয়া যাইত। সুতরাং ঐরূপ ভাবনা করিতে গেলে সৃষ্টি করা যায় না। অতএব, সেজন্য ব্রহ্মাকে দোষী করা ঠিক নয়। এবং তাঁহাকে পাপাসক্ত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা যে পরিশেষে তাঁহার সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। যাহা হৌক, সামান্য দৃষ্টিতে বিচার করিলেও দেখা যায়, পাপী হইলেও রাবণের কর্মশক্তি এবং তপস্যার প্রভাব কিন্তু তাই বলিয়া অল্পছিল না এবং তাহারই ফলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব যত বড় দেবতাই হউন, তাঁহারা সকলেই জীবের কর্ম-বশ। জীবের কর্মানুরূপ ফল দিতে তাঁহারা বাধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ অন্যের অনিষ্ট না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাজার সাধ্য নাই, তিনি তাহাকে শাস্তি দেন। অর্থলাভ বিনা পরিশ্রমে হয় না। যে ব্যক্তি দস্যুতা করে, তাহাকেও পরিশ্রম করিতে হয়; কাজেই, উক্ত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ অর্থও সে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই অর্থ সে অন্যায় ভাবে অর্জন করে, অতএব, ধরা পড়িয়া তাহাকে তাহার ফলও ভুগিতে হয়। জীবের কর্ম এবং উহার ফল, দুইটিই প্রায়শঃ এইরূপ শুভাশুভ মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই শুভ অংশটুকুর ফল ব্রহ্মা এবং অশুভ অংশটুকুর ফল আবার শিব দিয়া থাকেন, এইমাত্র। তবে, কোনটুকু শুভ এবং কোনটুকু অশুভ, তাহার বিচারের ভার কিন্তু পালন-কর্তা বিষ্ণুর। সুতরাং ব্রহ্মার সৃষ্টি যে পর্যন্ত বিষ্ণু কর্তৃক পরীক্ষিত এবং শুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত না হয়, সে পর্যন্ত উহা স্থায়ী হইতে পারে না, এবং শিবের ধ্বংসও যে পর্যন্ত বিষ্ণু কর্তৃক মঞ্জুর না হয়, সে পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত করা হয় না। অবশ্য, বিষ্ণুও আবার ব্রহ্মা এবং শিবের কার্যকারিতা ভিন্ন এক মুহূর্তও চলিতে পারেন না (৭)। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রও, সেই জন্যই, শিব-শক্তির (৮) বিরাগ-ভাজন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শিবশক্তির অবতার স্বরূপ বানর জাতির সহায়তা লাভ না করা পর্যন্ত দশাননকে নিহত করিতে পারেন নাই এবং শিবাবতার বানরেরাও শ্রীরামচন্দ্র অস্ত্রধারণ না করা পর্যন্ত তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মা আবার যতই সাহায্য করুন, বিষ্ণুর অনভিপ্রেত বলিয়া শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই ত্রিবিধ শক্তির আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ফলেই যে মানবের জন্ম মৃত্যু এবং স্থিতি, সে কথা বলাই বাহুল্য।

(৭) ডিক্‌টেটরি শাসন প্রাচীন ভারতীয়েরা আদৌ পছন্দ করিতেন না। দেবতাদের কল্পনা করিতে গিয়াও তাঁহারা তাই সর্বময় দেবতার কল্পনা করিতে পারেন নাই। যাহা অস্বাভাবিক, তাহার অস্তিত্ব কুত্রাপি সম্ভবপর নয়। "যা আছে ভাণ্ডে", ব্রহ্মাণ্ডেও তাহার অধিক নাই, একথা তাঁহারা বুঝিতেন।

(৮) শিবশক্তি স্বরূপিণী উমা যে রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের নিম্নোক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়,—

উমানন্দীশ্বরশ্চাপি রম্ভা বরুণ কন্যকা।
যথোক্তাস্তন্ মযাপ্রাপ্তং ন মিথ্যা ঋষিভাষিতম॥ ১২
৬০।লঃ। রামায়ণ

সে যাহা হউক, রাবণকুলের (গণের) ধ্বংস হইবে, ভবিষ্যতে আর কেহ রাবণ হইবে না, ইহা ছিল নন্দিকেশ্বরের উক্ত অভিশাপ-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য। এবং ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, রাবণ একাধিক ছিলেন। বস্তুতঃও, রাম-রাবণের যুদ্ধের পর বিভীষণ রাজা হইয়াছিলেন এবং অতঃপর রাবণ নাম গ্রহণ পূর্বক লঙ্কায় আর কেহই রাজা হন নাই। রাবণশব্দ যে সে-সময়ে অধর্ম এবং আতঙ্কের সহিত একার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই, ঐ নাম গ্রহণ করিতে লঙ্কার পরবর্তী রাজাদের কাহারও আর প্রবৃত্তি হয় নাই। ফলে, বিভীষণও তাই বিভীষণই থাকিয়া গিয়াছিলেন, দেখা যায়।

কুল শব্দের অর্থ যে এস্থলে বংশ নয়, তাহার আরও একটি প্রমাণ এই যে, রামের সহিত যুদ্ধে রাবণের বংশ নষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না। কেননা, তাঁহার বংশের বিভীষণই অতঃপর রাজা হইয়াছিলেন, দেখা যায়। দশম রাবণের মৃত্যুর সহিত রাবণ রাজাদেরই শুধু পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল এইমাত্র। নন্দিকেশ্বরের উক্ত অভিশাপ-বাক্যের তাৎপর্যও যে তাহাই ছিল, তাহা বুঝা এইজন্যই কঠিন নয়। বিশেষতঃ, "পৃথগ্‌ বিধমুৎশেধঞ্চ" ইত্যাদি বাক্য হইতেও বিভিন্ন রাবণের অস্তিত্বের অনুমান করা যায়। দশজন রাবণের দশটি পৃথক দেহ ছিল, ইহার মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নাই। এক রাবণ যাইতে-ছিলেন, পরে আর এক রাবণ আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিতেছিলেন অর্থাৎ রাবণদের একদেহ যাইতেছিল, পুনরায় অন্য দেহ হইতেছিল। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ পুনঃপুনঃ পৃথক্ দেহ ধারণের সৌভাগ্য বানরদের হস্তেই ঘুচিয়া গিয়াছিল।

তৃতীয় প্রমাণ আবার রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হইয়া কুশধ্বজ কন্যা বেদবতী সে সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পাওয়া যায়—

যস্মাত্তু ধর্ষিতা চাহং ত্বয়া পাপাত্মনা বনে।
তস্মাত্তব বধার্থংহি সমুৎপৎস্যাম্যহং পুনঃ ॥৩১
যদি স্বস্তি ময়াকিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা।
তস্মাত্ত্বযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্মিণঃ সুতা ॥৩৩

—১৭। সঃ। রামায়ণ

কুশধ্বজ বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন। ব্রহ্মা হইতে কুশধ্বজ পর্যন্ত প্রায় ৪ পুরুষের, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ৬৯ পুরুষের, ব্যবধান। সুতরাং বেদবতী-দূষণ রাবণ অন্য ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য, এ কথা হইতে পারে যে, ব্রহ্মা বা বৃহস্পতি কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম নয়, ব্রহ্মা জনলোকাধি-পতিদের এবং বৃহস্পতি দেবপুরোহিতদের সাধারণ উপাধি ছিল মাত্র। সুতরাং বেদবতী শ্রীরামচন্দ্রের সম-সাময়িক বৃহস্পতির পৌত্রী ছিলেন। কিন্তু ইনি যে ত্রেতাযুগের নন, পরন্তু সত্যযুগের লোক ছিলেন, রামায়ণে তাহার স্পষ্টোক্তি আছে।—

এষা বেদবতী নাম পূর্বমাসীৎ কৃতে যুগে।
ত্রেতাযুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ।
উৎপন্না মৈথিল কুলে জনকস্য মহাত্মনঃ ॥৩৮

—ঐ,ঐ,ঐ

পক্ষান্তরে, বেদবতী যে আদি বৃহস্পতির পৌত্রী এবং তাঁহার ধর্ষণকারী রাবণও যে আদি ব্রহ্মার পৌত্র ছিলেন, তাহার প্রমাণ আবার এই যে, যযাতি দশম প্রজাপতি ছিলেন।—

যযাতিঃ পূর্বজোঽস্মাকং দশমো যঃ প্রজাপতিঃ।১

—৭৬। আঃ। মহাভারত

এবং বলা বাহুল্য, আমাদের কৃত বংশতালিকার সহিত তাহা মিলিয়াও যায়।

যাহা-হৌক, পূর্ববর্তী রাবণ বেদবতীকে ধর্ষিতা করিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলেন, পরবর্তী রাবণ সীতা হইতে তাহার প্রতিফল পাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই, পরবর্তী সময়ে বেদবতীই সীতা-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাবণকৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন ইত্যাকার কাহিনীর উৎপত্তি হয়।

এক পুরুষে বোনে তাল, আর পুরুষে খায়,
একপুরুষে করে পাপ, আরপুরুষে পায়।—

ইত্যাদি উক্তি এইজন্যই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।

চতুর্থতঃ, কার্ত্তবীর্য্যার্জুন কর্ত্তৃক রাবণের পরাভব পুরাণের অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—

মাহিষ্মত্যাং দিগ্‌বিজয়াভ্যাগতো নর্মদা জলাবগাহন ক্রীড়া নিপান মদাকুলেনা-যত্নেনৈব তেনাশেষ দেব দৈত্যগন্ধর্বেশ জয়োদ্ভূত মদাবলেপোপি রাবণঃ পশুরিব বধ্বা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতঃ।৬

—১১।৪। বিষ্ণুপুরাণ

এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তি আবার এইরূপ,—

বীরমানী দশাননঃ।
গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃত কিল্বিষঃ।
মাহিষ্মত্যাং সন্নিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা।২২

—১৫।৯। শ্রীমদ্‌ভাগবত—

কিন্তু এই অর্জুন শ্রীরামচন্দ্রের বহু (প্রায় ১৭পুরুষ) পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, দেখা যায়। পক্ষান্তরে, রাবণ কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ মরুত্ত যজ্ঞ-নাশের প্রয়াসও পুরাণের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহারাজ মরুত্ত অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং উক্ত অর্জুনেরও বহুপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। কাজেই, তাঁহাদের সমসাময়িক রাবণেরা যে রামারি রাবণ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন এই, রাবণ তাহা হইলে কয়জন ছিলেন?—কয়জন ছিলেন এক্ষণে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে অন্ততঃ দশজন যে ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দশজনের বেশি যদি কেহ থাকেন, তবে তাঁহার তেমন প্রসিদ্ধি ছিল না, সুতরাং তিনি নগণ্য বলিয়া ধর্ত্তব্য নন।

রাবণ দশগ্রীব (দশানন) ছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার নামও দশগ্রীব হইয়াছিল।

অথ নামাকরোত্তস্য পিতামহ সমঃ পিতা।
দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি।৩৩

—৯।উঃ।রামায়ণ

ইনি ব্রহ্মার তুষ্টি সাধনার্থ দশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এক এক হাজার বৎসর পর পর এক একটি করিয়া মাথা কাটিয়া ব্রহ্মার তৃপ্ত্যর্থ অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন। এইরূপে, ক্রমান্বয়ে নয়বারে নয়টি মাথা কাটিয়া দিবার পর, অবশিষ্ট দশম মাথাটিও কাটিয়া দিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তখন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ অভীষ্ট প্রদান করিতে সম্মত হন।—

দশবর্ষ সহস্রন্তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্চাগ্নৌ জুহাবসঃ।১০
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ।
শিরাংশি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনম্।১১
অথ বর্ষসহস্রেতু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তু,কামে দশগ্রীবে প্রাপ্ত স্তত্র পিতামহঃ।১২

—১০।ঐ।ঐ—

যাহা হৌক, এই দশগ্রীব যদি একই ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে নয়বারে নয়টি মাথা কাটিয়া দেওয়া এবং কাটিয়া দিয়া জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইত না। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, রাবণ দশজন ছিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ত্রৈলোক্যের—স্বর্গ (ইলাবৃত বর্ষ), মর্ত্ত্য (পৃথিবী বা উত্তর ভারত) এবং পাতাল (দক্ষিণভারত) প্রদেশের একাধিপত্য অর্জন করা। কিন্তু ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য অর্জন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক জনবল। ব্রহ্মার জনলোকের (মহাচীন?) অধিপতি ছিলেন। জন-বহুল বলিয়াই তাঁহাদের রাজ্যের ঐরূপ নাম হইয়াছিল এবং তাঁহারা নিজেও সৃষ্টির দেবতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া সাহায্য না করিলে সে যুগে ত্রিভুবন জয় করা কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর

হইত না। ফলতঃ অভ্যুদয় প্রার্থী অধিকাংশ ব্যক্তিকেই যে সে সময়ে ব্রহ্মাদের শরণাপন্ন হইতে হইত, ইহাই তাহার কারণ। পূর্বোক্ত নয়জন রাবণ ক্ষমতাশালী হইলেও ব্রহ্মাদের অনুগ্রহ লাভ করিতে না পারায়, অথবা, তাঁহাদের অত্যল্প মাত্র অনুগ্রহ লাভ করিতে পারায়, ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু দশম রাবণ নিজের তপস্যাবলে সেই অসম্ভবও সুসম্ভব করিয়াছিলেন। এইরূপে, তিনি দশগ্রীব এবং দশানন নামের সার্থকতা প্রতিপাদন পূর্বক জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। কিন্তু করিলে কী হইবে?—অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া তিনি শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সম্রাট ঔরঙ্গজেব যেমন তাঁহার বীর্যবত্তা এবং অবি মৃশ্যকারিতা হেতু মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি এবং অবনতি দুইয়েরই কারণ হইয়াছিলেন, দশম রাবণও, সেইরূপ, নিজ ভুজবলে লঙ্কার চরম সৌভাগ্য বিধান করিয়াও পরিশেষে নিজ কর্মদোষে উহাকে দুর্ভাগ্যের অতল অন্ধ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই দশম রাবণই শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন এবং ইনিই রাবণগণের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন।

এক হাজার বৎসরের পরিমাণ যে কিঞ্চিদল্প তিন বৎসর এবং দশ হাজার বৎসরের পরিমাণ যে কিঞ্চিদল্প আটাশ বৎসর কাল মাত্র, তাহা 'পুরু ও যযাতি' প্রসঙ্গে সপ্রমাণ করিয়াছি (১)। সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ প্রত্যেক রাবণের ব্রহ্মার আরাধনায় অল্পাধিক তিন বৎসর করিয়া সময় লাগিয়াছিল। এবং এই কার্যে প্রথম নয়জন রাবণের মাথা কাটা গিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন,—ব্রহ্মার আরাধনা করিতে গিয়া তাঁহাদের শুধু শক্তি, সামর্থ্য এবং পরিশ্রমের বৃথা অপব্যয় ঘটিয়াছিল, এই মাত্র। কিন্তু সর্বশেষ দশম রাবণ সেই নয়টি মাথাই মায় নিজেরটি সহ ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের অপূর্ণ উদ্দেশ্য তিনি সম্পূর্ণ এবং সেই নয় জনের অসমাপ্ত কার্য তিনি একাকী সুসমাপ্ত করিয়া তাঁহার দশগ্রীব নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং দশগ্রীব বা দশানন নাম যে নিরর্থক নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ইঁহারা সকলেই সতত হিংসা করিয়া বেড়াইতেন বলিয়া ইঁহাদের নাম রাবণ হইয়াছিল।—

রাবয়ামাস লোকান্ যস্তস্মাদ্রাবণ উচ্যতে। ৪০

—২৭৪। রঃ। মহাভারত

পরে দশম রাবণ হইতেই রাবণ নাম ত্রিলোকময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। স্বর্গ বিজয় যে দশম রাবণেরই কীর্তি, তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। সেই অভিযান সময়ে তাঁহাকে শিবের রাজ্য মধ্য দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু নন্দিকেশ্বর তাহাতে বাধা দেন। রাবণের পুষ্পকরথের গতিরোধ হওয়ার কথা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।—

স পর্বতং সমারুহ্য কঞ্চিৎ রম্যবনান্তরং।
প্রেক্ষতে পুষ্পকং তত্র রামবিষ্টম্ভিতং তদা॥ ৩

—১৬। উঃ। রামায়ণ

অবশ্য, শিবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তিনি শুধু তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, এই মাত্র। কিন্তু নন্দিকেশ্বর তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কৈলাসগিরি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হন। এবং অবশেষে শিব কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া রোষে ও ক্ষোভে বিকট চীৎকার করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর হইতেই তাঁহার রাবণ নাম ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়া পড়ে। স্বয়ং শিবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বড় সহজ কথা নয়। শিবের নিজেরই উক্তি—

(১) মৎপ্রণীত "মহাভারত মঙ্গল" পুস্তক দেখুন।

প্রীতোঽস্মি তব বীরস্য শৌণ্ডীর্য্যাচ্চ দশানন।
শৈলাক্রান্তেন যোমুক্ত স্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ॥ ৩৬
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্! ভবিষ্যসি ॥৩৭
—ঐ।ঐ।ঐ

রাবণ নিহত হইলে মন্দোদরী যে—

জেতারং লোকপালানাং ক্ষেপ্তারং শঙ্করস্য চ ॥৪৮
এবংপ্রভাবং ভর্তারং দৃষ্ট্বা রামেণ পাতিতং।
স্থিরাস্মি যা দেহমিমং ধারয়ামি হত-প্রিয়া ॥৫৫
১১৩।লঃ।রামায়ণ

ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, সে কথা বস্তুতঃই অত্যুক্তি নয়।

যাহা হৌক, এই দশজন রাবণের মধ্যে কাহার কীর্তি কীরূপ ছিল, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা কিন্তু সহজ নয়। এবং তাহা নির্ণয় করিতে হইলে সর্বাগ্রে আবশ্যক—প্রথম এবং অন্তিম রাবণ কে ছিলেন, তাহাই নির্ণয় করা।

লঙ্কায় পূর্বে সালকটঙ্কটা-বংশীয় রাক্ষসেরা বাস করিতেন। ইঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন, দেখা যায়। সৃষ্টির অর্থ এ স্থলে creation নয়। বলা বাহুল্য, ইঁহাদেরই এক সম্প্রদায় যক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (৪ উঃ রামায়ণ)। কুবেরেরা এই যক্ষ-বংশীয়দেরই অধিপতি ছিলেন। যাহা হৌক, কালক্রমে উক্ত রাক্ষস-বংশে হেতির জন্ম হয়। হেতির পুত্র বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যার কন্যা সালকটঙ্কটার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে অতঃপর ইঁহারা সালকটঙ্কট খ্যাতি লাভ করেন। বিদ্যুৎকেশের সুকেশ নামে এক পুত্র এবং সুকেশের আবার মাল্যবান্, সুমালী এবং মালী নামক তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পরাক্রমে অদ্বিতীয় ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লঙ্কারাজ্য ইঁহাদেরই কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য, এ বিষয়ে তদানীন্তন ব্রহ্মা এবং বিশ্বকর্মার নিকট হইতে ইঁহারা যে সাহায্য পাইয়াছিলেন (৫।উঃ।রামায়ণ), সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহারা বেশী দিন তথায় রাজত্ব করিতে পারেন নাই। কেন-না, ক্ষমতা-মদে প্রমত্ত হইয়া জনসমাজের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করায়, অল্পদিন মধ্যেই ইঁহারা বিষ্ণুর নেতৃত্বে দেবগণ কর্তৃক উৎখাত হইয়া পাতালপুরীতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন; এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত লঙ্কারাজ্য আদিকুবের বৈশ্রবণ তখন অধিকার করিয়া লন।

"যারা আন্তরিক ধ্যান জপ কোরেছে তাদের এখানে আসতেই হবে"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

উপরে যে উক্তিটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেটি পরমহংসদেব মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। তাঁহার যে সকল উক্তি সর্ব্বসাধারণ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সে সকলের মধ্যে "যত মত তত পথ" এই উক্তিটিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের শিরোলিখিত মহামূল্য, গম্ভীর অর্থ-সম্ভৃত এবং ঈশ্বরানুরাগের বাস্তবিক আন্তরিকতার নিষ্কর্ষস্বরূপ উক্তিটির তাৎপর্য্য ও ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে সেরূপ বিশদ আলোচনা হইয়াছে

বলিয়া আমার মনে হয় না। অতএব এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না। এটা একটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধান্ত মতন দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে ঠাকুরের প্রায় প্রত্যেকটি কথাই অত্যন্ত প্রাণদ ও অন্ধকার জীবনপথে আকাশপ্রদীপ সদৃশ।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই একটি মুখবন্ধ প্রয়োজন। পরমহংসদেব নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তিগুলি যথা-সম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল। তাহাদের মধ্যে কোনোরূপ দ্ব্যর্থক কুটিলতা আছে বলিয়া আমার প্রতীতি হয় না। তিনি যাহা উপলব্ধি করিতেন, তাহাই সরল ভাবে বলিয়া যাইতেন—যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়, তাহা অত্যন্ত গভীর হইলেও অত্যন্ত সহজ ও বিশদ হয়। কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি নহে, সেইখানেই উক্তিগুলি কুটিল মস্তিষ্কের জটিলতাবহুল পন্থা অনুসরণ করিয়া সহজকে কঠিন ও সুগমকে দুর্গম করিয়া তোলে। ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ-সঞ্জাত জ্ঞান বর্ণিত স্থানের বিবরণ আর প্রত্যক্ষদ্রষ্টার বিবরণে যে প্রভেদ, তথাকথিত দার্শনিক ও তার্কিকের তত্ত্ববর্ণনা আর পরমহংসদেবের বর্ণনাতে সেই প্রভেদ। পরমহংসদেবের মন কৈলাসের অদূরবর্ত্তী মানসসরোবর তীর্থের জলের মতন নির্ম্মল ছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই যেন মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলে যাইয়া প্রবেশ করে। সাধারণ সরল লোকেরও তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না—কারণ তাঁহার কথাগুলি হৃদয়ের কথা। যাঁহারা হৃদয়টাকে জঞ্জালের পর জঞ্জাল দিয়া গুদামঘরের মত করিয়া ফেলে নাই, হৃদয়ের মন্দিরটির চতুর্দ্দিকস্থ দরজা জানালাগুলি খোলা রাখিয়াছে, যাহাতে উন্মুক্ত বাতাসের মত, তাহার ভিতর দিয়া সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মা নির্ব্বিবাদে চলাচল করিয়া হৃদয়টিকে মধুসিক্ত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে পরমহংসদেবের কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা তত আয়াস-সাধ্য নহে। বেশী টিকা টিপ্পনী করিলে সরল কথাটি আরো ঘোরালো হইয়া উঠে।

এই যে পরমহংসদেব বলিয়াছেন "যারা আন্তরিক ধ্যান জপ কোরেছে তাদের এখানে আসতেই হবে," ইহার মধ্যে আন্তরিক শব্দের মানে লইয়াই হয়তো নানাতর্ক—বিতর্ক উঠিতে পারে। কোন বিষয়ে আন্তরিকতার কথা বলিয়াছেন, কতটা তার পরিমাণ হওয়া আবশ্যক, আন্তরিকতার কি কি লক্ষণ, ইত্যাদি এক একটি বিষয়ে এক একটা সমস্যা তুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হয়তো এক একটি নীতি-সন্দর্ভ লেখা যাইতে পারে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আন্তরিকতা অর্থ "অন্তরের সহিত"। আমাদের দেশে একটি সাদা প্রবচন বাক্য চলিত আছে "মনের অগোচর পাপ নাই।" কথাট খুব সত্যি যদিও নানাবিধ রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যানৈতিক প্রভৃতি দুষ্পাচ্য শাস্ত্রের স্ব-কপোলকল্পিত উদ্ভট যুক্তিদ্বারা এই কথাটির সরল তাৎপর্য্যকে বিকৃত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়া থাকে। আমাদের মনই আমাদের প্রধান মাপকাঠি। আমার যতদূর মনে হয় আমি এক জায়গায় পড়িয়াছি "সেন্ট্ বার্ণাডো" মনকে জিজ্ঞাসা করিতেন, মন, কোনদিকে (যেতে চাও)? যাঁহারা মনের সঙ্গে নিভৃতে বোঝা পড়া করিয়াছেন, বহির্ম্মুখ মনকে টানিয়া আনিয়া কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই দ্বন্দ্বে পরাস্ত হইয়া নৈরাশ্যে-সাগরে হাবুডুবু খাইয়াছেন অথবা জয়লাভ করিয়া পশ্চাদবর্ত্তী অতীন্দ্রিয়শক্তির অস্তিত্ব জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কথাটির অর্থ বুঝাইতে হইবে না। তবে একদল লোক আছেন যাঁহারা পৃথিবীতে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়া থাকিয়া পৃথিবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সর্ব্ববিধ সুখ দ্বিধাভাব রহিত হইয়া ভোগ

করাকেই জীবনের পরমার্থ মনে করেন। ইঁহাদিগকে গীতায় আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে সমাজে বড় বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকেন, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চাতে অপরিসীম নৈপুণ্যলাভ করিয়া সমাজের শিরোমণিত্ব লাভ করেন এবং অতুল বিভবের অধিকারী হইয়া (আনন্দে কি দুঃখে বলিতে পারিব না) সমাজের মস্তকে বাস করেন এবং লাটসাহেবের সঙ্গে খানা খাইয়া আপনাকে কৃতার্থমন্য বোধ করেন। এই যে দ্বিধাভাব পরিশূন্য স্বকীয় পার্থিব অভ্যুদয়ের অনুচেষ্টা, ইহা একটি "আন্তরিকতার" অভাবের ফল। বিবেক যাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই, সে মনুষ্যত্ব হিসাবে, একটি সামান্য নগণ্য বিবেকী পুরুষের অনেক নিম্নে। এবংবিধ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে আন্তরিকতা আশা করা কিম্বা আন্তরিকতার কথা বলিতে যাওয়া শুধু হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র। পরমহংসদেব বলিতেন এদের "কুমীরের চামড়া।"

এখন কোন্ বিষয়ে আন্তরিকতা, এই সম্বন্ধে একটু প্রশ্ন উঠিতে পারে। ধ্যান জপ বলিতে আমরা ঈশ্বরের ধ্যান জপই বুঝি। তবে গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের ধ্যান জপ, না এমনি আপনা হইতেই ধ্যান জপ, এ বিষয়ে একটা কথাও উঠিতে পারে। আমার মনে হয় এখানে ধ্যান জপ কথাটির একটু ব্যাপক অর্থ করিলে দোষ হইবে না। অনেক সৎলোক আমি দেখিয়াছি যাঁহারা নিয়মিতভাবে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভগবানের চিন্তা করেন এবং সাধু ভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁহারা যে মনে মনে ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা ও বিচার করেন, তাহাকে ধ্যান জপের সামিল ধরা যাইতে পারে। এখন কেহ আন্তরিক ধ্যান জপ করেন কিনা সেটা বুঝিব কি প্রকারে? ধ্যান জপ তো হাজার হাজার লোক করে, "এমন কি—পর্য্যন্ত" ঠাকুরের একটি অসামাজিক কথা। এ সম্বন্ধে সংস্কৃতে, বাঙ্গালায় এমন কি ইংরাজীতেও গুটিকতক খুব সহজ অথচ অত্যন্ত সারগর্ভ কথা আছে। যে কেহ নিজে আন্তরিক ভাবে ভক্ত ও সাধুর অনুসন্ধানে রত হইয়াছেন, তিনিই এই সোনার মানুষ-ধরার কষ্টি-পাথর স্বরূপ মহার্ঘ্য কথাগুলির সারবত্তা বলিবা মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যাঁহারা নিজেরা মেকী এবং মেকীর মধ্যে বাস করেন, মাথা খুঁড়িলেও তাঁহারা এই সব সোজা মন্ত্রের চাবী খুলিতে পারিবেন না। এই প্রসঙ্গে আমার বিখ্যাত দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের একটা ভারী দামী কথা মনে পড়িয়া গেল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে সাধারণের ধারণা এই যে যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহারাই মিথ্যাবাদী কর্ত্তৃক সহজে প্রতারিত হন, এবং যাহারা মিথ্যাবাদী তাহারা সহজে ঠকে না। কিন্তু ঘটনা ইহার ঠিক বিপরীত। যে সত্যবাদী সেই চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিতে পারে কে সত্য কথা কহে আর কেই বা মিথ্যা কহে, কিন্তু যে নিজে মিথ্যা কহে সেই মিথ্যাবাদীকে সহজেই বিশ্বাস করিয়া বসে এবং ঠকে। কথাটি খাঁটি সত্য। কে খাঁটি আর কে মেকী ধরিতে হইলে নিজেকে অনেকটা খাঁটী হইতে হয়।

যা বলিতেছিলাম, জবালা-পুত্র সত্যকামের কাহিনী অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন, "নৈতদ্ অব্রাহ্মণো বক্তুমর্হতি" গুরু তাঁহার এক কথা শুনিয়াই বলিলেন "ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন কথা বলিতে পারে না।" একটি কথাতেই গুরু একেবারে নিঃসংশয়। হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার উকীল, সাক্ষী কিছুরই প্রয়োজন নাই, সত্যকামের সারল্য-সমুদ্ভাসিত বদনমণ্ডলে গুরু তাঁহার অন্তস্তল প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইলেন এবং গুরুনির্ঘোষে বলিলেন, এ বালক নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। অপর এক স্থানে গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন, হে সৌম্য, তোমাকে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া মনে হইতেছে। শুধু

আকৃতি দর্শন মাত্র এই সিদ্ধান্ত। আরো একটি কথা বর্ণিত আছে, দুইজন শিষ্য ব্রহ্মবিদ্যা শিখিয়া আসিলেন—একজন নানাবিধ শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন, আর একজন মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। যিনি বাক্‌বিলাসী তিনি জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইলেন না, কিন্তু যিনি অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাক রহিলেন তিনিই বরেণ্য জ্ঞানী বলিয়া আদৃত হইলেন। এখানে শঙ্করাচার্য্য-রচিত দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্র স্মৃত হইতে পারে। শিষ্যগণ বৃদ্ধ, গুরু যুবা। আর গুরুর মৌন মাত্রই ব্যাখ্যা; আর শিষ্যদিগের সংশয় সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবগম্য, বর্ণনার বিষয় নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞের আননে এমন একটা বিরাট আনন্দের ছবি ফুটিয়া উঠে, যে কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হয় না যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধ্যবিষয় কি ?

হিন্দু জাতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা শুধু সাধুত্বের দার্শনিক বিচারেই সন্তুষ্ট হয় না; সাধুর যে সকল গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয় সেগুলি ব্যক্তিবিশেষে প্রতিফলিত না দেখিলে তাহাদের মন তৃপ্ত হয় না। তাই গীতাতে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ কি, শ্রীকৃষ্ণ তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। শুধু কথায় তো চিঁড়ে ভিজে না। যে আদর্শ প্রত্যক্ষীভূত না হয় এমন ধোঁয়াটে আদর্শ লইয়া আমরণকাল কথার খেলা চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণও ঠাণ্ডা হয় না আর নিজের জীবনও গঠিত হয় না। তারপর যাহা বলিতেছিলাম, আমাদের বাংলা গানেও আছে "মনের মানুষ হয় যে জনা, তার নয়নেতে যায় গো চেনা; ও সে দুই এক জনা।" "জহুরী জহর চেনে।" কে ঠিক জপ ধ্যান করে, তার চোখ মুখ দেখিলেই টের পাওয়া যায়—সে দুই একজনা—যেখানে সেখানে ঘাটে পথে মিলে না।

অতঃপর একটি পাশ্চাত্য ভাবুকের কথা বলিব। বোধ হয় আমেরিকার বিখ্যাত প্রবন্ধ-লেখক রাল্‌ফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সনের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁর একটি আশ্চর্য্য প্রবন্ধ আছে তার নাম "ওভারসোল্" অর্থাৎ পরমাত্মা। আমি সকলকেই এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি—ইহার ভিতর এত গভীর ও মূল্যবান কথা আছে যে পৃথিবীর উচ্চ-সাহিত্যে তাহাদের তুলনা বিরল। আমার মনে হয় গীতাদি গ্রন্থ পাঠের ফলেই তিনি ঐ সকল রত্নরাজী সংগ্রহ করিতে এবং অমন করিয়া সাজাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার একটি কথা আমার মনে পড়ে, তাহার ভাবার্থ এই--কেহই নিজের স্বরূপ লুকাইয়া রাখিতে পারে না; একটি কথাতে, একটি ইঙ্গিতে, একটি ভাবের ভঙ্গীতে, মানুষের ভিতরটা ধরা পড়িয়া যায়; সেই পরমাত্মা মানবের পশ্চাতে থাকিয়া তাহার স্বরূপ আবরণ করিবার শত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন; কৃত্রিমতার খোলসটি মানবের অজ্ঞাতসারে সরাইয়া ফেলিয়া তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটি লোকের সাম্‌নে খুলিয়া দেখান। এমনি যাদুকর, এমনি মায়াবী সেই পরমাত্মা। যিনি ভাললোক তিনি তাঁহার সততা লুকাইতে পারেন না আর যে প্রবঞ্চক সে-ও তাহার প্রকৃতি ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

এই কথাগুলি বোধ হয় এমার্সনের জীবনের নিপুণ সমীক্ষা ও পরীক্ষার উৎকৃষ্ট ফল। যদি কথাগুলি সত্যই হয়; তাহা হইলে মানুষ চলা-ফেরা করে কি করিয়া এই একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, কারণ দেখা যায় যে অনেক মানুষের অন্তরের ভিতর সাপ ব্যাং কিলি বিলি করিতেছে, আবার শিখী ও পারাবতও পাখা মেলিয়া নৃত্য করিতেছে। আমার বোধ হয় লর্ড বেকন্ এক জায়গায় বলিয়াছেন যে মানুষের হৃদয়ে এত সব কুৎসিত ভাব বর্ত্তমান আছে যে বাহিরে যে সেগুলির মূর্ত্তি প্রকটিত হয় না তাই রক্ষা, নচেৎ চলা-ফেরা-মুস্কিল হইত।

একথাটা আংশিকরূপে সত্য হইলেও, এমার্সনের উক্তিটিই অধিকতর সমাদরণীয়। কারণ জগতে দেখা যায় যে যাহারা নির্লজ্জ ও নৃশংস তাহারা অনায়াসে নির্লজ্জ ও নৃশংস আচরণ করিয়া চলে, গুটিকতক ভাল লোক কি মনে করে কি না মনে করে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তবে যে সমাজে ভাল লোকের প্রভাব অধিক সে সমাজে কতকটা ভয়ে (ভক্তিতে নহে) তাহারা তাহাদিগের প্রবৃত্তি-গুলিকে চাপা দিয়া চলে; কিন্তু যে সমাজের অবস্থা উহার বিপরীত অর্থাৎ যেখানে মন্দ ও মূর্খের সংখ্যা বেশী সে সমাজে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কুৎসিত আচরণ করিতে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হয় না। অধিকন্তু সৎ ও সাধু ব্যক্তিদিগকে নির্যাতন ও বিদ্রূপ করে। কিন্তু এই যে বে-দলের লোক বলিয়া অপদস্থ করিবার চেষ্টা, ইহার ভিতরেও সতের উপর অসতের একটা শ্রদ্ধার ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সতের উপর শ্রদ্ধাটাই অসতের ভিতর বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধার মুখোস পরিয়া দেখা দেয়।

যা হউক, একটা কথা প্রমাণ করিতে যাইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার প্রস্তাবিত বিষয়টি আবার অনুসরণ করা যাউক। কথাটা এই যে সহস্র সহস্র জাপক মনুষ্যের মধ্যে গুটিকতক লোক যথার্থ সত্যলাভ করিবার জন্ত এবং সত্যের পরমাশ্রয় পরমাত্মার সংস্পর্শ পাইবার জন্ত ধ্যান জপ করে। এরূপ লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং একটু সূক্ষ্ম ও সরলভাবে চেষ্টা করিলেই তাহাদিগের অস্তিত্ব টের পাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। আমার বোধ হয় উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে আন্তরিক ধ্যান জপ এই কথা কয়টির তাৎপর্য্যের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া গেল।

অতঃপর বিচার্য্য বিষয় হইতেছে "এখানে" এই কথাটার মানে কি? যদিও কথাটি ছোট্ট এবং পরমহংসদেব বোধ হয় সোজাসুজী মনে করিয়াছিলেন "এখানে" মানে তাঁহার নিকট, তথাপি যখন তিনি মরজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তখন 'এখানে' বলিতে কি বুঝিব? অথবা তিনি বাঁচিয়া থাকিতেও যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে তেমন কিছু জানিতেন না কিন্তু তাঁহার দেহান্তরের উত্তর কালে তাঁহার মহিমা অবগত হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়াছেন, কিম্বা যাঁহাদের শ্রদ্ধা সত্বেও সশরীরে তাঁহাকে আসিয়া দর্শন করিবার সুবিধা হয় নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে "এখানে" কথাটার কি মানে হইতে পারে এটা একটা নিশ্চয়ই ভাবিবার কথা।

পরমহংসদেব নিজে ঠিক কি ভাবিয়া এই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা এখন বলা দুঃসাধ্য। তবে এ কথা বলিলে বোধ হয় বিশেষ অন্যায় হইবে না যে তিনি হয়তো জীবৎকালে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনের কথাই বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অনেকের জানা আছে, পরমহংসদেব নিজের সম্পর্কে উত্তমপুরুষ বাচক "আমি" সর্ব্বনামটি উচ্চারণ করিতেন না। প্রথম পুরুষ বাচক ইনি ব্যবহার করিতেন। তাই "আমার কাছে" না বলিয়া "এখানে" এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে কথাটির অর্থ যদি একটু ব্যাপক ভাবে করি তাহা হইলে সত্যচ্যুতি দোষ ঘটিবে না। আমি যাহা স্বল্প বিস্তর বুঝিয়াছি তাহাতে একটু টানিয়া মানে করিলে "এখানে" কথাটির অর্থ "এখানকার" (অর্থাৎ পরমহংসদেবের) শিক্ষার প্রভাবে ইহাই দাঁড়াইতে পারে। আরো নানাবিধ অর্থ আরো পাঁচজনে করিতে পারেন কিন্তু বেশী টানা হেঁচড়া করিলে সময়ে সময়ে সদর্থের পরিবর্ত্তে অনর্থ বা কদর্থ বাহির হইয়া মূল অর্থটিই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সে জন্য এ বিষয়ে আর অধিক গবেষণা হইতে বিরত হওয়াই সঙ্গত। অন্ততঃ আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য আমি আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিষয় অবতারণা করিবার প্রয়োজন বোধ করি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সমস্ত জগতের কি সমস্ত এসিয়ার কি সমগ্র ভারতের আন্তরিক ভক্তকেই কি পরমহংসদেবের নিকট আসিতে হইবে? তদুত্তরে আমি বলিব যে অত বিশাল পরিধি লইয়া আমি আমার মাথা ঘামাইতে নারাজ। আমি আমার বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য আপাততঃ ধরিয়া লইব যেন এই উক্তিটি শুধু বাঙালীর উপরই প্রযোজ্য। (বাস্তবিক যে তাহা নহে তাহা দেশ-দেশান্তবাসী ভক্ত মণ্ডলীর অস্তিত্ব দ্বারাই উদ্ঘোষিত হইতেছে)।

এখানে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ঈশ্বরধ্যান সম্বন্ধে আন্তরিকতার মোটামুটি লক্ষণ পরমহংসদেবের উক্তি হইতে আমরা কি সংগ্রহ করিতে পারি, এ সম্পর্কে একটু আলোচনা করিলে বোধ হয় বক্তব্য বিষয়টি একটু পরিপুষ্টি লাভ করিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের বহু শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে অসংখ্য উপদেশ আছে। সে সকলের শুধু সংখ্যাপাত করিলেই বোধ হয় হাজার পৃষ্ঠার গ্রন্থ ভরিয়া যাইবে আর আমাদের তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। পরমহংসদেব এক জায়গায় বলিয়াছেন যে কলিকালে অন্নগত প্রাণ—এখন দশমূলী পাচন দিতে দিতে রোগীর এদিকে হোয়ে যায়, তাই এখন ফিবার মিক্‌চার। এই ছোটো একটুখানি কথার ভিতর কতখানি কাজের বুদ্ধি ও মহানুভবতা বর্ত্তমান, তাহা সুধী মাত্রই বুঝিবেন। আমাদের দেশে সাধন সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের মধ্যে পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এইখানি পড়িলেই মনে হয় যেন এটি একটি বিজ্ঞান-শাস্ত্র অর্থাৎ যে শাস্ত্র হাতে কলমে আয়ত্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পড়িলেই মনে হয় যেন গ্রন্থকার নিজ জীবনে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে তাহাই সাজাইয়া লিখিয়া বলিয়া গিয়াছেন। শত-সহস্র সম্ভব ও অসম্ভব সাধনের মালা এখানে গাঁথা হয় নাই। যোগ সমাধি লাভ করিতে হইলে পরপর যাহা করিতে হইবে সোপান আরোহণ—ন্যায়ে তাহারই ক্রমন্যাস করিয়া গিয়াছেন। বুঝিতে কোন কষ্ট নাই, কষ্ট কেবল করিতে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন সমাধি যোগের আটটি অঙ্গ, "যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি।" ইহার অনুবাদের প্রয়োজন বোধ হয় নাই। এই আটটির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত "যম" নামক অঙ্গটি সিঁড়ির প্রথম সোপান হইলেও বোধ হয় সাধন হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়াই ঋষি এই অঙ্গটাই সকলের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম। এই যে পাঁচটি অত্যন্ত কঠিন সাধন, ইহাদিগকেও বহিরঙ্গ সাধন বলা হইয়াছে এবং ধারণা ধ্যান ও সমাধিকে অন্তরঙ্গ সাধন বলা হইয়াছে (সপ্তম সূত্র বিভূতিপাদ)। ইহা ছাড়া মৃদু মধ্য ও অধিমাত্রা হিসাবে সাধনের ভেদ রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে "তীব্র-বেগানাসন্নঃ"। এখন আমরা দেখি পরমহংসদেব কি বলিতেন। তিনি বোধ হয় (বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই) জানিতেন বর্ত্তমানে সাধারণ মানুষের কি মনের কি শরীরের এত তেজ বা শক্তি নাই যাহাতে সে যোগ-কথিত উপায়গুলি সহজে অবলম্বন ও আয়ত্ত করিতে পারে। সেই জন্য উহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া দুই একটার উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। পঞ্চ যমের ভিতর তিনি "সত্যের" উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, বলিয়াছেন "সত্যই কলির তপস্যা" তিনি আরো বলিয়াছেন যে মাকে সব দিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যকে দিতে

পাবেন নাই। সত্যই ব্রহ্মের আয়তন—যদি সত্যই না রহিল তবে সে ধর্ম্ম কিসে? সত্যহীন ব্যক্তি মহারাজাধিরাজ পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম তাহার নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থিত। পরমহংসদেব নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন যে দেশে সত্যের সমাদর নাই—স্বল্পকারণেই লোকে অম্লান-বদনে মিথ্যা কহিয়া বসে অথচ হয়তো শুচি-নিষ্ঠা কিম্বা মালা-জপ ইত্যাদি প্রভূত পরিমাণে আছে। তাই তিনি ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম এবং শেষ সাধন দিয়াছেন "সত্য।"

তারপর তিনি আর দুই বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন—তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র অনুরাগ; শুধু তীব্র বৈরাগ্য নহে, তীব্র অনুরাগও চাই—অনবরত ঈশ্বরের স্মরণ মনন চাই। ইহা ব্যতীত বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। বহিরঙ্গ সাধন সত্যনিষ্ঠারূপ দৃঢ়-ভিত্তির উপর তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র অনুরাগের অন্তরঙ্গ সাধন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শুধু ভাবুকতার উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দির তাসের ঘরের মতন এক পল্‌কা বাতাসের ঝাপ্‌টায় ধসিয়া পড়িবে। পরমহংসদেব আর দুইটি গুণের কথা খুব বলিতেন, "উদারতা ও সরলতা।" কুটিল লোকের ধর্ম্ম হয় না। শুনিয়াছি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যাঁহারা নির্ম্মৎসর তাঁহারাই শ্রীভগবানের উপাসনার অধিকারী। এই কথাটির সহিত পরমহংসদেবের নির্দ্দিষ্ট উদারতা ও সরলতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, প্রায় এক বলিলেই হয়। বস্তুতঃ অনুদার ও অসরল লোক যেন হৃদয়ের দ্বারটিকে অর্গল দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। পূর্ণমুক্ত স্বভাব ভগবান যিনি বিশাল, বিরাট ও খোলা প্রাণ ভাল বাসেন, তিনি সংকুচিত, বদ্ধহৃদয়ে প্রবেশ করিবেন কি করিয়া?

পরমহংসদেব সাধকের আরও অনেক লক্ষণ বলিয়াছেন—একসঙ্গে অত সব বলিতে গেলে প্রবন্ধ ভারী হইয়া পড়ে, অতএব আপাততঃ উক্ত পাঁচটি লক্ষণকেই আন্তরিকতা নিরূপণের পক্ষে পরমহংসদেব নির্দ্দিষ্ট মুখ্য বাচক লিঙ্গ বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। অতঃপর আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই শ্রেণীর লোক কেমন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া তাঁহার উচ্চারিত "যারা আন্তরিক ধ্যান জপ কোরেছে তাদের এখানে আসতেই হবে," এই দৃঢ় অবশ্যম্ভা-বিত্ব-সূচক মর্ম্মোন্মাদিনী বাণীটির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আশা করি পরিচিত ও অপরিচিত কতিপয় মহানুভব সাধকের উপর পরমহংসদেবের নিয়ামক প্রভাব শ্রবণে তাঁহার অনুরক্ত রসিক ও উদার ব্যক্তি মাত্রই উল্লসিত হইবেন—অবশ্য যদি আমি লেখনীতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মনোজ্ঞ করিয়া দিতে পারি।

"অন্নদাত্রী আজি অন্ন মাগে"

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ রায়

যুগান্তের পুঞ্জীভূত পাপ জীবনের জমানো কালিমা,
গ্লানি-ক্লেদ মন্মের গ্লানিমা—
আপন শিয়রে তুলে মরণেরে করেছে বরণ,
ভুখার শ্মশানবুকে বেঁচে বহে ধ্বংসের বাহন
সর্বহারা ভিখারী ভারত,
ব্যাকুলিত ব্যগ্রভাবে ল'য়ে খোঁজে কোথা' বাঁচিবার পথ!
অনাহারে অনিদ্রায় তা'র,
নিরাশার নিবিড়তা-মাঝে জমে আসে ব্যর্থ হাহাকার।

বুভুক্ষুরে করিয়া বঞ্চিত কণ্ঠে গাহে যৌবনের গান,
এ পৃথিবী নির্মম পাষাণ;
মদনের মহোল্লাসে মত্ত সে যে বীরের গরবে,
সুরা ও সাকীর মোহে দৃষ্টি তা'র হারা'য়েছে ক'বে—
এ দশা সে দেখিবে কেমনে,
দ্বারে তা'র বুভুক্ষু ভারত মাগিতেছে সজল নয়নে
দু-মুঠি ক্ষুধার অন্ন ?... হায়!
ক্ষুধাতুর ধূলায় লুটায় মত্তা ধরা ফিরে নাহি চায়!!

কিবা তা'র নাহি ছিলো ওরে, জীবনের সহায়-সম্পদ,
প্রেম-শান্তি বিপুল বিশদ;
বিশ্বেরে বিলায়ে দেছে আপনারে আপনার ক'রে,
যোগায়ে আসিছে অন্ন যুগে যুগে সস্নেহ-আদরে,
অন্নদাত্রী আজি' অন্ন মাগে—
তারি' মুখে ওরে বিশ্ব, অন্ন দাও, ওরে প্রাণ দাও আগে;
কণ্ঠে দাও আনন্দের গান,
স্বপ্ন ছাড়ি' চেয়ে দেখ শুধু, মা যে কাঁদে রাত্রি-দিনমান!!

সাহিত্যে বিবেকানন্দ

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য, বি-এ

বিশ্বের ইতিহাসে যে সকল মহামানব নিখিল মানবসম্প্রদায়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়া আপনার মনুষ্য জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা স্বয়ং সর্ব্বত্যাগী হইয়াও সমগ্র জগৎকে আত্মজ্ঞানের মহাজাগৃতিতে উদ্বোধিত করিয়া এক অপার্থিব পরমরত্ন অকাতরে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন—স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁহাদের অন্যতম তাহা বোধ হয় অধুনাতন সভ্যসমাজের নিকট পুনরুক্তি মাত্র। কিন্তু জগতের ইতিহাসে প্রায়শঃই যেমন দেখা যায় যে কোন একটা ধর্ম্মবিপ্লবকে উপলক্ষ করিয়া একটা বিরাট্ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তদীয় সার্ব্বজনীন প্রেম ও ত্যাগধর্ম্মের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের লেখনী বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

মার্টিন লুথার যেদিন বাইবেলের অনুবাদ করিয়া তদানীন্তন পুরোহিত-প্রধান পোপের আধিপত্য চূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইলেন সেদিন পাশ্চাত্য সাহিত্যের শুভ জন্মদিন। সেদিনও এই বঙ্গে ও বঙ্গের উপকণ্ঠে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখপাত্ররূপে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সুললিত কণ্ঠরব বৈষ্ণবপদ-লহরী গাহিয়া গাহিয়া এক অভিনব বৈষ্ণব সাহিত্যের সূচনা করিয়া গিয়াছে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ব্রহ্ম উপাসনার আবির্ভাবে রামমোহন রায় ও তদানীন্তন হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম বিতর্কে যে এক নূতনতর সাহিত্য গড়িয়া উঠিল তাহা বস্তুতঃ বঙ্গভাষার ভিত্তিস্বরূপ; কিন্তু এই সংস্কৃত ও পারসী ভাষার অনুবাদ-সম্ভূত বঙ্গভাষা মাতৃকার প্রতিমা পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের তুলিকা পরিচালন-কৌশলে অনুকরণ সাহিত্যে ও ক্রমে সৃষ্টি-সাহিত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর যুগের শেষভাগ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের প্রথম ভাগে যে সাহিত্য রচিত হয় তাহা পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই অনুকরণ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ লাভ করি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভোদ্ভাসিত 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তির মোহত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন সৃষ্টির ব্রতে আপনাকে ব্রতী করিলেন—সে সময়ে তাঁহার এদেশীয় ভাব ও আদর্শে রচিত 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম' সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়-আকর্ষণে কৃতোদ্যম সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের মনীষা মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নূতনতর ভাবধারার প্রবর্ত্তন করে। যে মৌলিকত্ব আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পরিণত প্রসবের মধ্যে দেখিতে পাই বিবেকানন্দ তাহারই পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য-স্রষ্টারূপে সেই রচনা-পদ্ধতির সম্যক্ অনুসরণ করিয়া তাহারই পরিপোষণে এক গম্ভীর সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-উৎস হইতে যে ভাব-প্রস্রবণ কলকলনাদে সমগ্র দিগন্ত মুখরিত ও সমুদ্বুদ্ধ করিয়া পামীর উপত্যকা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত জীবনরস বিতরণ করিয়া আসিয়াছে তাহারই বাহনরূপে যে সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে তাহা বঙ্গভাষার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে—ইহা অবিসংবাদী।

বিবেকানন্দের রচনা বাস্তবিকই গম্ভীরপদবাচ্য। কাব্য বলিতে আমরা বঙ্গভাষায় সচরাচর যাহা বুঝি বিবেকানন্দের রচনার মধ্যে সে প্রকার হৃদয়োন্মাদক তরল সাহিত্যের স্থান নাই। কারণ কাব্য-রচনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল না তিনি বিবুধগোষ্ঠীর অবসর যাপনের আহার্য্য সঙ্কলনে আপনাকে সমর্পণ করেন নাই। তাঁহার কাছে মানবজীবনের একটা গূঢ়তর উদ্দেশ্য ছিল। নিপীড়িত, পতিত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট আর্য্যসন্তানের তথা সমগ্র মানবজাতির আত্মবোধের নিমিত্ত তিনি পাঞ্চজন্য নিনাদ স্বয়ং সমুত্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আহ্বান সত্যসন্ধানের সেই প্রাণের আকুল আবেগ —যেখানে ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—যেখানে ছন্দে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই খানেই তাঁহার কাব্য সৃজন। তাই কবি শব্দের যে পারিভাষিক অর্থ আছে তদনুসারে তিনি একজন মহান্ কবি। তাঁহার কবিজনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি—তাঁহার এই কবি-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। যে মানস দৃষ্টির বলে "বর্ত্তমান ভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ভারতের দশান্তরিত মাতৃমূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন ও যাহার বলে পুনরায় ভারতের ভবিষ্য জীবনেতিহাস হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আপনার উদার কল্পনার সাহায্যে এক বৃহত্তর ও মহত্তর ভারতের ছবি আঁকিয়াছিলেন সে অন্তর্দৃষ্টি সে মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাস্তবিক কবিত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার কল্পনাশক্তি কখনও জড় ও মূকের চিন্তা করে নাই—উহা চিরদিন প্রাণের সন্ধানে ফিরিয়াছে—সুপ্তকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, মৃতকে তিনি সঞ্জীবিত করিয়াছেন।

বিবেকানন্দের রচনাবিশ্লেষণান্তে মনে হয় উহা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সে ধর্ম্মভাব কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মতত্ত্ব নহে—উহা চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাধা ছিন্ন করিয়া বাহিরের উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইয়া তিনি সকল ধর্ম্মের সারমন্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই যে সত্যশিব সুন্দরের উপাসনায় তাঁহার জীবন নিয়োজিত হইয়াছিল তাহারই উপাসনা মন্ত্র তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া প্রতি প্রাণে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে—তাই তাঁহার রচনায় ভাষার মেঘমন্দ্রধ্বনি নাই—কিন্তু সকল ক্ষেত্রব্যাপী স্নিগ্ধ সলিল বর্ষণ আছে। কারণ ভাবের যেখানে জটিলতা—ভাষা সেখানে দুর্ব্বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিবেকানন্দের বৈশিষ্ট্য এই-খানে যে তিনি কঠোর সাধনতত্ত্বকেও দ্রবীভূত করিয়া অতি সরল ভাষায় অসাধারণ জনসঙ্ঘের সম্মুখে উহা সমুপনীত করিয়াছিলেন।

ভাষার ঋজুতা ও ভাবের গভীরতার এই একত্র মধুর সমাবেশের কারণ তাঁহার হৃদয়ের আবেগ। যে বিষয়ের উপরেই তিনি লিখিবার প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তিনি হৃদয়ের একটা উত্তাল আবেগের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন। সে আবেগ বাস্তবিক পুত্রের হিতসাধনে পিতার আকুলতার সহিতই তুলনীয়। ইউরোপের সুদূর সৈকতভূমিতে দাঁড়াইয়া এদেশের যুবককে তিনি যে পত্রাবলী লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে তাই আমরা আজিও একটা তেজস্বিতা অনুভব করি—আজিও তাহা যেন পিতার অনতিক্রমনীয় আদেশ বলিয়া প্রতিভাত হয়। যে অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু অধঃপতিত মানব মণ্ডলীর জন্য তাঁহার মর্ম্মকোণে কি এক বেদনা চির-জাগরূক ছিল—যাহাদের অসহায় অবস্থায় মধুর ভ্রাতৃসম্বোধনে আপনার বিশাল বক্ষঃস্থলে তিনি স্থান দিয়াছিলেন—তাহাদের অজ্ঞান তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া জ্ঞানবর্ত্তিকা হস্তে তাহাদেরই নৈতিক জীবনে আলোক সম্পাতে তৎপর ছিলেন, তাই তাঁহার ধর্ম্মালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি সেই অন্তর্নিহিত রুদ্ধ হৃদয়বেদনার গাঢ়তম ভাবনিস্যন্দ বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্ম্মযোগ' সম্বন্ধে অনুশীলন সেরূপ লোকশিক্ষার উচ্চতম • আদর্শ

দ্বারা অনুপ্রেরিত না হইলে ওরূপ সুগম ভাষায় বোধ হয় লেখা হইত না। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান হয়ত জগতে বিরল নহে—হয়ত এরূপ মেধাশক্তি ইহলোকে দুর্লভ নহে, কিন্তু উভয়ের সহিত হৃদয়ের এই আকুলতা—দীন অজ্ঞের জন্য এরূপ অনুভূতি জগতে অনন্যসাধারণ।

বিবেকানন্দের এই বিবেকবাণীর ছন্দে ছন্দে যে গীত ধ্বনি হইয়াছে তাহা ভারতীয় সমাজ-সংগঠনের তীক্ষ্ণ আহ্বান। সামাজিক ও নৈতিক জীবনে পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধকুহকে মোহপ্রাপ্ত ভারতের সমাজ-শরীরে প্রাণবায়ুর ফুৎকার করিয়া গিয়াছেন সর্ব্বপ্রথম এই বিবেকানন্দ :—

'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পর-মুখাপেক্ষা—এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা—এই ঘৃণিত ...স্বাধীনতা লাভ করিবে?—ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর।'

তাঁহার এই সৃষ্টিকারিণী প্রতিভা (constructive genius) জগতের মহাশ্মশানে ভারতীয় নরনারীর দেহ-অস্থির স্তূপীকৃত ভস্মরাশিতে পুনরায় সঞ্জীবন মন্ত্রপূত গঙ্গোদক সেচনে এই অদ্ভুত প্রয়াস—ভারতকে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিক্ষা দিয়াছে। শিক্ষা দিয়াছে—আপনার মোক্ষলাভে প্রণোদিত হইয়া স্বার্থপরতার বশে সংসারবন্ধন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি-জীবন কাম্য নহে। অজ্ঞতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া—দৈন্যের পথে সংগ্রাম করিয়া ভারতের পুনরুজ্জীবন সাধনই প্রকৃত সাধনা—আর সংসার-গৃহই সেই সাধনা ক্ষেত্র, অরণ্য নহে। তাই ত্যাগধর্ম্মের সঙ্গে সেবাধর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলন তিনি সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন।

এই সেবাধর্ম্মের দুরূহ ভার তিনি ন্যস্ত করিয়াছিলেন ভারতের যুবক সম্প্রদায়ের উপর। তাই কাব্যের ভিতর দিয়া তাঁহার আহ্বানের ভেরী-নিনাদ ভারতীয় যুবকের কর্ণপটহে আঘাত করিয়া—তাহাদের সেবাধর্ম্মে অনুবোধিত করিয়াছে। তাই তিনি রামকৃষ্ণের উক্তি আলোচনা প্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন :—

'বোঝার প্রমাণ কার্য্যে।' মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে। কার্য্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক। (শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি—ভাববার কথা পৃঃ ৫২)

বিবেকানন্দের এই উদ্বোধন বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এই মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনি তুলিয়া যে তরুণশক্তির আহ্বান করিয়াছে সে শক্তি আজিও ভারতের তথা জগতের দিগ্‌দিগন্তে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রতিজন-পদে সেবাসঙ্ঘরূপে বিরাজ করিতেছে।

এই জনসেবার অনুপদে আসিয়াছে ভারতের চিরলুপ্ত দেশাত্মবোধ—এই জনসেবার দীক্ষাগ্রহে ভারতবাসী পরস্পরকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। ইহারই সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসি-জাগরণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বোধ হয় এই অভিনব ত্যাগী সেবকমণ্ডলীর যুগপৎ অভ্যুত্থানের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে নিতান্ত ভ্রমযুক্ত হইবে না। কিন্তু তাঁহার এই দেশাত্মবোধের উন্মেষ যদিও আমরা অধুনাতন রাষ্ট্রীয় বন্ধনমোচনের প্রয়াসের সূচনাপাত বলিয়া নিঃশঙ্কে নির্দ্ধারিত করিতে পারি তথাপি ভারতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সংগঠনে তাঁহার দান মুখ্যতম। যে মুক্তির বার্ত্তা লইয়া ভারতীয় সমাজের প্রতি স্তরে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন—তাহা অজ্ঞান হইতে—দুর্ব্বলতা হইতে—অমনুষ্যত্ব হইতে নিত্যসত্য ও নিত্যবুদ্ধ আত্মার মুক্তি :—

'Strike off thy fetters! Bonds that
bind thee down,
Of shining gold or darker, baser ore;
Love, hate—good, bad—and all the
dual thorn;

Know slave is slave, caressed or
whipped, not free,
For fetters, though of gold, are less
strong to bind,
Then, off with them, Sanyasin bold!
say, "Om tat sat Om"!

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবী, স্বামী বিবেকানন্দ সে ধরণের সাহিত্যিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃজন জীবনের ব্রত—কাব্য-রূপিণী 'মানস সুন্দরীর' প্রতিমা গড়িয়া তাহারই পূজায় তাঁহারা মন্ত্র দীক্ষিত, কিন্তু বিবেকানন্দের কাব্যসৃজন জীবনের একটা আনুষঙ্গিক ফল—লোকশিক্ষাকে উদ্দেশ্য করিয়া সাহিত্যকে তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। যে আত্মবোধের মহদুদ্দেশ্য লইয়া তিনি জীবন পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন—যাহার পরিপূরণে তিনি ত্যাগ ও সেবা-ধর্ম্মের আদর্শ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক, তাহার মধ্যে কাব্য সৃজনের অবসর নাই। তথাপি ভাষা যখন ভাবের বাহন—ভাষা যখন ভাবকে রূপ দিয়াছে তখন তাঁহার আদর্শ অনুপ্রাণিত তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে আমরা কবিত্বের রস আস্বাদনে সমর্থ হই। বস্তুতঃ তিনি কাব্য সৃজন করেন নাই—কিন্তু তাঁহার জীবন ছিল কাব্যময়—কাব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান নহে—কিন্তু তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা কবি।

স্বর্গতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

শব্দ নিরাকার। নিরাকার আকাশ ও বায়ুর মত নিরাকার শব্দেরও একটি কল্পিত রূপ আছে। অবশ্য শব্দের ঐরূপ আমাদের মানসপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য, কেননা শব্দের এমন একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে অবস্তুবাচক শব্দও উচ্চারিত বা শ্রুত হইলে উচ্চারক বা শ্রোতার মনে উচ্চারণ ও শ্রবণ সমকালে একটী ভাবময় পদার্থের স্ফূর্ত্তি ঘটে। দর্শনশাস্ত্রে এই তত্ত্বটীকে নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—বস্তুগত্যাবস্তুটী একেবারে না থাকিলেও শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র উহা-দ্বারা একটী জ্ঞান জন্মে। বিখ্যাত মহাকাব্য রঘুবংশের ১।২৭ শ্লোকে ইহার একটী চমৎকার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। মহারাজ দিলীপের সুশাসন-প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন,—ইঁহার রাজ্যে চৌর্য্য এই শব্দটী কেবল শোনা যাইতনা অর্থাৎ কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইত না। 'শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা।' বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ বুঝাইয়াছেন, "কেবল শব্দে স্ফূর্ত্তি পাইত, শ্রবণ গোচর হইত, কিন্তু স্বরূপতঃ ছিল না," অর্থাৎ না বলিয়া পরের দ্রব্য লইতে কাহাকেও দেখা যাইত না। এই তত্ত্বটী সুবিখ্যাত বৈদান্তিক প্রকরণ গ্রন্থ পঞ্চদশীর ২য় অঃ ৬৩ সংখ্যক প্রমাণের সাহায্যে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ঐ প্রমাণে বুঝান হইয়াছে, "মায়া শক্তি আকাশের কল্পনা (সৃষ্টি) করিয়া থাকে," "যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ ব্যোম।" ইহাতে বুঝা গেল যে অনর্থক শব্দেরও এমন একটী শক্তি আছে, যে উহা উচ্চারণ করিলেই কাণে একটী বস্তুর ভাবময় ছবি ভাসিয়া উঠে। এই নিয়মে কেহ স্বর্গশব্দ বলিলে বা শুনিলে সাধারণতঃ সুদীর্ঘকালের সংস্কারের বলে মনে একটী বস্তুর সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে। ঐ ছাপটীর ভাব নিরবচ্ছিন্ন সুখময় ধাম বা পরমানন্দঘন অবস্থা। এমতে স্বর্গ স্থায়ী স্বারাজ্য বা চিরস্থায়ী সুখের

সাম্রাজ্য। ইহার সমস্ত বৃক্ষ পারিজাত। সকল বন নন্দন কানন। সমস্ত ফল ত্বগস্থিহীন রসময়। সমস্ত নদী মন্দাকিনী। সমস্ত মানব অমর। সমস্ত মানবী অপ্সরা। মুসলমানের ধারণায়, উহা সতত স্বচ্ছ শীতল সলিলবিধৌত, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সুপরিপক্ক সুমিষ্ট দ্রাক্ষাফল পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্র পরিবেষ্টিত পর্য্যাপ্ত চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় ভোজ্য ভোগ্য পরিপূর্ণ এবং রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী হইতেও রূপসী রমণী সকল বিরাজিত। ফলতঃ সেই স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের অপরিবর্ত্তিত বা অত্যল্পপরিবর্ত্তিত মনের চেহারার মত সুখধাম কিংবা সুরধাম স্বর্গের প্রাচীন আকারের উল্লেখযোগ্য কোনও প্রকারান্তর ঘটে নাই। প্রাচীন বেদসংহিতানিচয় হিন্দুর স্বর্গসংক্রান্ত এইরূপ ধারণার মূল। কারণ ঐ গুলি যাগযজ্ঞবহুল কর্ম্মকাণ্ডে ভরপুর এবং ঐ সকল বৈদিক কর্ম্মের ফলরূপে স্বর্গই সর্ব্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। "স্বর্গকামো যজেত" এই কথাটাই যেন সমগ্র বেদসংহিতার মূল কথা। ঐ কালে স্বর্গের ঐরূপ ধারণা এত প্রবল ছিল যে কালিদাসের ন্যায় মহাকবি তাঁহার মহাকাব্য কুমারসম্ভবের ২য় সর্গের ১২শ শ্লোকে ব্রহ্মস্তুতিপ্রসঙ্গে সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্মযজ্ঞ এবং যজ্ঞের ফল স্বর্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সুধীপ্রবর মল্লিনাথ ঐ শ্লোকস্থিত কর্ম্ম ও স্বর্গপদে উপলক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্ম ও মুক্তি পর্য্যন্ত অর্থ টানিয়াছেন। এরূপ কষ্টকল্পনা "গরজ বড় বালাই" এর বড় ভাই। কারণ শব্দশাস্ত্রে সমর্থ পক্ষে যৌগিক অর্থ ছাড়িয়া লক্ষণার লেজুড় ধরাকে জঘন্যই বলা হইয়াছে। ঐ যুগে আনন্দ ধাম স্বর্গের জনপ্রিয়তা এতই চরমে উঠিয়াছিল যে, বহুল প্রচারিত প্রাচীন কঠোপনিষদের ১ম অঃ ২য় বল্লীতে ঋষিবালক নচিকেতা "হে মৃত্যো, আপনি এই প্রকার গুণবিশিষ্ট স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ অগ্নিবিষয়ক অনুষ্ঠান জানেন, সুতরাং আমাকে বলুন" বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে যমরাজ জিজ্ঞাসু বালককে অগ্নিপ্রধান যজ্ঞ ও উহার ফল, স্বর্গের তত্ত্ব সবিস্তরে বুঝাইয়া পরে উহার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়াছেন। বস্তুতঃ বেদান্তাভিধেয় শ্রুতিশীর্ষ উপনিষদেও সুখময় স্বর্গের চিত্র অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। আলোচ্য স্বর্গ দেশকাল অবচ্ছিন্ন স্থান কিংবা সাধনার পরিপাকে লব্ধ জীবের উত্তম অবস্থাবিশেষ? এই প্রশ্নের প্রথম পক্ষের সমর্থক উত্তরবাদীর দল বেশ পুরু বলিয়া মনে হয়। কারণ স্বর্গ নামক আনন্দরাজ্যের নাম শুনিলে কেবল হিন্দু নহেন, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকগণের জিহ্বাগ্রে লালাস্রাবের উপক্রম হয়। এমন কি এই মরজগতেও কোন সমধিক সুখময় স্থান থাকিলে উহাকেও স্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়, যেমন "ভূস্বর্গ কাশ্মীর", "শিশুর স্বর্গ জাপান"। কিন্তু দীন লেখকের সান্তর বিশ্বাস স্বর্গ বলিয়া কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দেশ নাই। কেননা, স্বর্গশব্দে যে মহান্‌ভাবের উপলব্ধি হয়, ঐটী দেশকাল সীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলে অনিত্য ঘটপটাদির ন্যায় জন্য ও নশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ আদি সম্মত, হিন্দু মুসলমানাদি সর্ব্বজাতি প্রিয় ও বাঞ্ছনীয় স্বর্গপদার্থটী আর যাহাই হউক, ঐরূপ ঠুনকো জিনিষ কথনই নহে। এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখিবার আছে।

প্রথমতঃ যুক্তি-প্রমাণে দেখিলে বুঝা যায়, স্বর্গ যদি দেশপরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে মূর্ত্তদ্রব্যের আশ্রিত, অবয়বযুক্ত (সখণ্ড), অনিত্য (জন্য ও ধ্বংসশীল) এবং কৃত্রিম অর্থাৎ কুলালাদির কৃতিসাধ্য ঘটকলসাদির ন্যায় হইয়া পড়ে। অতএব স্বর্গ দেশপরিচ্ছিন্ন না হওয়ায় উহা গতির দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। এইরূপ দার্শনিক বিচার ছাড়া সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বাক্য শাস্ত্রশিরোমণি গীতার বহুস্থলে বহুভাবে অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্য জ্ঞেয় স্বর্গের তত্ত্বটী বিচারমুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমি সংক্ষিপ্ত ও

সারগর্ভ বোধে এ স্থলে মাত্র দুইটী প্রমাণের উল্লেখ করিলাম—১মটী ৮ম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক। বোধ-সৌকর্য্য ও প্রামাণ্যের জন্য দার্শনিক শিরোমণি স্বর্গীয় শশধর তর্কচূড়ামণির কৃত অনুবাদ উদ্ধৃত হইল—"হে অর্জ্জুন, সমস্ত স্বর্গের উপরিস্থিত ব্রহ্ম-লোক অবধি সমস্ত ভোগ-লোকই অনিত্য এবং পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল। অতএব মরণান্তর ইহার যে কোনও লোকে গমন করিলে তাহার পতন হইয়া পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে (পরমাত্মাকে) লাভ করে, অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়, হে কৌন্তেয়, তাহাদের আর পুনর্জন্ম নাই।" ব্রহ্মলোক অবধি সমস্ত ভোগ স্বর্গকে যে অনিত্য বলিলাম তাহার কারণ এই যে উহা এক একরূপ সীমাবদ্ধ কাল স্থায়ী। "আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ" ইত্যাদি ৮।১৬। ২য়টী ১৩অঃ ২০শ শ্লোক—"যে সকল ত্রিবেদবিৎ পণ্ডিত কামনাবশগ হইয়া যজ্ঞশেষ সোমপানপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহান পবিত্র দেবলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে নানাপ্রকার দিব্য দেবভোগ উপভোগ করেন।" উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকে ভোগ লোক স্বর্গের নশ্বরত্ব এবং দ্বিতীয়টীতে তথাকথিত স্বর্গের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এখন যাঁহারা স্বর্গকে আদর্শ সুখের স্থান বা আধিভৌতিক দেশ বলেন, তাঁহাদের স্বীকৃত ঐরূপ স্বর্গের উৎকর্ষ কতখানি, তাহার কিছু প্রমাণ দিতেছি। সন্দর্ভের প্রারম্ভে স্বর্গকে কল্পিত বস্তু বলা হইয়াছে। উহা প্রকৃতপক্ষে কল্পিত হইলে উহার এতটুকু মূল্য নাই। কেননা, পূজ্যাতিপূজ্য শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক-চূড়ামণিতে ৪৬৩ সংখ্যক প্রমাণে বুঝাইয়াছেন, 'কল্পিত বস্তুর সত্তা নাই এবং উহার উৎপত্তিও হইতে পারে না।' তাৎপর্য্য—অন্ধকারে নিপতিত রজ্জু-খণ্ডে কল্পিত সর্প, কিংবা রৌদ্রালোকে দীপ্ত শুক্তিতে প্রতীয়মান রজতের প্রকৃত জন্ম নাই, উহা নিছক প্রতিভাস (appearance) মাত্র। তারপর আদিম দর্শন সাংখ্যের বিখ্যাত মনোমদ ও অতি প্রামাণিক সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে "দৃষ্টানুশ্রবিকঃ সহ্য বিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ" ইত্যাদি ২য় কারিকায় যাগাদিতে পশু বধাদি জন্য পাপ হয়, সুতরাং দুঃখসংস্রব আছে। যাগাদির ফল স্বর্গাদি বিনশ্বর। সুতরাং কিছুকাল পরে পুনরায় দুঃখে পতিত হয়। স্বর্গাদি সুখে তারতম্য আছে, অতএব অধিক সুখ দেখিয়া অল্পসুখীর দুঃখ জন্মে, ইত্যাকার বিচারমুখী ব্যাখ্যায় ভোগ-লোক স্বর্গকে বিশেষ ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ পঞ্চদশীর ৪র্থ অঃ ৫৩ শ্লোকে ঐ উক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে পুনরুক্ত হইয়া ঐরূপ স্বর্গকে একান্ত হেয় বলা হইয়াছে। "ক্ষযাতিশয় দোষেণ স্বর্গো হেয়ঃ।" মহারাজ অজের বাণপ্রস্থমূলক ধর্ম্মজীবন বর্ণনপ্রসঙ্গে কবিসত্তম কালিদাস লিখিয়াছেন, "পরিণত বয়সে মহারাজ অজ স্বর্গলোকে উপভোগ্য বিনাশশীল রূপরসাদি বিষয়েও নিস্পৃহ হইয়াছিলেন।" "বিষয়েষু বিনাশ ধর্ম্মিষু" ইত্যাদি রঘু ৮।১০। উক্ত কবিপ্রবর স্বকৃত কুমারসম্ভবের ১৬শ ও ৪৮শ সংখ্যক কবিতায় স্বর্গের বীভৎস ভাবটী কেমন সরস মধুর ব্যঙ্গের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বুঝিয়া দেখুন, "শ্রেষ্ঠ অস্ত্রে পারদর্শী, দুইজন রথী পরস্পর যুদ্ধে সম্মুখরণে গতপ্রাণ হওয়ায় স্বর্গলাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা স্বর্গে গিয়াও একটী পরমাসুন্দরী সুরাঙ্গনার জন্য ঘোরতর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। "অন্যোন্যং রথিনং কৌচিৎ" ইত্যাদি। এযে "ঢেঁকির স্বর্গে গিয়াও ধান ভানা" প্রবাদের অতি বড় দৃষ্টান্ত। স্বর্গের ক্ষয়শীলত্ব ও নশ্বরত্ব সম্পর্কে শ্রুতির ন্যায় স্মৃতিও মুখর। স্মার্ত্তপ্রমাণে দেখিতে পাই, "ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।" "পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য পিতামে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ" ইত্যাদি। বলিতে কি স্বর্গের এই নিকৃষ্ট ধারণাটী কালক্রমে এত বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আদি

কবি বাল্মীকির রচিত বলিয়া পরিচিত আমাদের নিত্য প্রাতঃপাঠ্য মনোহর গঙ্গাস্তবটীতে যখন 'গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্" বাক্যাংশটী আবৃত্তি করি, তখন গঙ্গাস্নানের ভাবী পুণ্যের ফলে স্বর্গগামী পারলৌকিক আত্মার ঐরূপ ভোগলালসার ঘৃণ্য কামনাটী ঋষি কবির রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তিতে কুলায় না। সুখের বিষয়, স্তবাদির পাঠকালে প্রায়ই আমরা এত ভক্তিনিষ্ঠ ও প্রগাঢ় মনোযোগী থাকি যে লেখকের মত অনেকেরই হয়ত অর্থবোধের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। যাহা হউক, আলোচ্য স্বর্গ যে আদর্শ সুখধাম নহে বা হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র ধারণা ও স্বল্পজ্ঞানে সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায় বলিলাম। এখন ২য় পক্ষে অর্থাৎ শাস্ত্রবর্ণিত আধ্যাত্মিক স্বর্গটী যে সাধনার পরিপাকে লব্ধ আনন্দঘন অবস্থা বিশেষ, এ বিষয়ে আমার শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি, প্রমাণ ও বিশ্বাসমতে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি। প্রথমতঃ আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ ১৯শ অঃ, ৪২ সংখ্যক শ্লোকের ৪র্থ পাদটী সিদ্ধান্তরূপে উল্লেখ করিতেছি। "স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ" অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের নাম স্বর্গ। পাণ্ডিত্য ও সাধনার মূর্ত্তবিগ্রহ পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন, "নতু ইন্দ্রলোকাদিঃ," সাধারণের সুবিদিত ইন্দ্রলোকাদি প্রকৃত স্বর্গপদবাচ্য নহে। হেতুবাদটী পূর্ব্বেই যথাযথ প্রদত্ত হইয়াছে। এখন স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যাত স্বর্গের লক্ষণটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি বলিয়াছি, পরমানন্দঘন অবস্থা বিশেষই স্বর্গ। এই অবস্থা শব্দের যৌগিক অর্থ—গতি নিবৃত্তিমূলক কোনওরূপে স্থিতি বা থাকা। আমরা সাধারণতঃ কোনও দেশে কালে ও ভাবে অবস্থান করি। দেশ ও কালের ন্যায় ভাবও অনন্ত। কিন্তু অনন্ত দেশকে যেমন আমরা ঋগ্বেদের পদ্ধতি মতে "দ্যাবা পৃথিবী" স্বর্গ ও পৃথিবী রূপে, অনন্ত কালকে প্রধানতঃ দিবা ও রাত্রি মাত্র দুইটী ভাবে গ্রহণ করি, তেমনি অনন্ত ভাবকেও আমরা দুঃখ ও সুখ এই দুইটী প্রধানভাবে গ্রহণ করিতে পারি। বলিতে কি, মানবের অবস্থা বলিতে লোকতঃ ও ব্যবহারতঃ এই দুইটীই মোটামুটি বুঝাইয়া থাকে। কেননা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। সুতরাং প্রকৃতির কার্য্য জগৎ ত্রিগুণের বিকার; ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র মহৎ প্রত্যেক বস্তুটী ত্রিগুণারজ্জুর মত সুখদুঃখমোহাত্মক তিনটী ভাবে সর্ব্বদা বিজড়িত। এই জগতে বলীয়সী প্রকৃতির প্রভাবে কেহ কখনও সুখী, কেহ বা দুঃখী, আর কেহ বা মুগ্ধ অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন। সহজ কথায়, হয় কখনও আমরা হাসি, কখনও কাঁদি, আর কখনও বা জড় বা স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করি। এই হাসি, কান্না ও মোহ, সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের কার্য্য। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান জগতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের কার্য্য প্রকৃত সুখের অগ্রদূত শুক্তিশুভ্র হাস্যের অবস্থাটী একরূপ নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। যাহা আছে, তাহা কেবল কাষ্ঠ বা দেঁতো হাসির নকলমাত্র। "হাসি সুখের রমণী। সুখের মরণে হাসির সহমরণ।" আদিম নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর এই মন্তব্য আজকাল বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যাক্, আমি বেদান্তসূত্রপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সুখের কথা ব্যাখ্যা করিতেছি। সুতরাং একথা বলা ভাল যে আমার ব্যাখ্যা যথাজ্ঞানে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত হওয়াই সঙ্গত। উক্ত মহাগ্রন্থে ঐ ১১শ স্কন্ধেই সুখের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে,—'বৈষয়িক সুখদুঃখ অতীত অবস্থায় সাধকের মনে যে ব্রহ্মানন্দ ভাগবতানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়, উহারই নাম যথার্থ সুখ।" আমার মতে এই প্রকার সুখই প্রকৃত স্বর্গসুখ। সত্ত্বগুণের উদয় বা আবির্ভাবের অবস্থাটীর নাম স্বর্গ। তাৎপর্য্যার্থে, সূর্য্য চন্দ্রের উদয় যেমন নিত্য। তবে যখন যে

দেশের লোকের দৃষ্টিপথে উহাদের দর্শন ও অদর্শন ঘটে, তখন যেমন সেদেশে (যেমন ভারতবর্ষে ও আমেরিকায়) উহাদের উদয়াস্ত ব্যবহার হয়, তেমনি পরমানন্দঘন স্বর্গসুখ জীবহৃদয়ে নিত্যকাল অবস্থিত। রজস্তমের যবনিকায় সমাচ্ছন্ন থাকাতেই উহার উপলব্ধি হয় না। ঐ আবরণী কুয়াশা কাটিয়া গেলেই সত্ত্ব-সূর্য্যের উদয়ে সাধকের হৃদয়াকাশে এই স্বর্গীয় সুখের পূর্ণ শারদেন্দু স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে। এই প্রকার স্বর্গ কখনও নামরূপময় বৈষয়িক জগতের মত আধিভৌতিক, অনিত্য ও তুচ্ছ হইতে পারে না। ইহা নামরূপাতীত অথবা সকল নামরূপের কেন্দ্র ভাবঘন, অখণ্ড, রসময়ী, সুখানুভূতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর। আমার মনে হয়, ধর্ম্মজগতে প্রথম প্রবিষ্ট মানবের সুখময় আধিভৌতিক স্বর্গের আদিম ধারণাটী শিশুর শৈশবসুলভ ধূলিখেলার মত বয়োবৃদ্ধি সহকৃত জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত রূপান্তরিত হইয়া পরিণামে সচ্চিদানন্দময় আধ্যাত্মিক স্বর্গে উপনীত হইয়াছে। এজন্য প্রাচ্যদেশের প্রবাদে প্রচলিত সপ্তম বা অক্ষয় স্বর্গের অনুরূপ প্রতীচ্যদেশেও "Be in the seventh heaven" কথাটী সুপ্রচলিত। ফলতঃ স্বর্গ আমাদের অন্তরে, উহা বাহিরের বস্তু নহে। যে জন্য স্বর্গ আমাদের একান্ত কাম্য, সেই সুখ ও সুখের আশ্রয় যত বড়, স্থায়ী ও নিত্য, স্বর্গও তদনুপাতে তত বড়, স্থায়ী ও নিত্য। এ মতে নামরূপময়, পরিণাম ধর্ম্মী ও বিনাশী জাগতিক সুখ সত্যজ্ঞানানন্দময়, অনাগমাপায়ী, সুখ হইতে যে অতি হেয় ও তুচ্ছ, ইহা একটা অতীব দুর্ব্বোধ তথ্য নহে। ব্যাখ্যাত প্রকার স্বর্গ সম্বন্ধে আমার স্বর্গীয় আচার্য্য, ভারতবিখ্যাত পাথোয়াজী মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক কেশরী শ্রীরামশিরোমণির নিকট যে সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, এবং যাহা হইতে সেই সুদূরবর্ত্তী অধ্যয়ন জীবনে স্বর্গতত্ত্ব সম্বন্ধে বুঝিবার ও আলোচনা করিবার বেগবতী প্রেরণা পাইয়াছিলাম, যাহার ফলে এই জটিল, দুর্ব্বোধ ও গভীর বিষয়ে আলোচনায় দুঃসাহসী হইয়াছি, সেটী নিবেদন করিতেছি। মুক্তাবলী পাঠকালে আচার্য্যদেব স্বর্গতত্ত্ব বুঝাইতে তাঁহার নিজস্ব সংজ্ঞাটী বলিয়াছিলেন। "দুঃখানবচ্ছেদকীভূত শরীরাবচ্ছিন্ন সুখং স্বর্গঃ।" সুখই স্বর্গ—এইটী স্বর্গের স্বরূপ লক্ষণ (অসাধারণ ধর্ম্ম)। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশটী স্বর্গের তটস্থ লক্ষণ বা পরিচায়ক বিশেষণ। বাক্যটীর নির্গলিতার্থ এইরূপ—'যে শরীরে দুঃখলেশের সংস্পর্শ হয় নাই এবং হইতে কখনও পারে না, এরূপ শরীরে অনুক্ষণ অনুভূয়মান সুখের নাম স্বর্গ।' সত্য বলিতে কি, দেখি আর নাই দেখি, বুঝি আর নাই বুঝি, পাই আর নাই পাই, আস্তিকের বিশ্বাস দৃষ্টিতে, শাস্ত্রনিবন্ধবাক্যিতে, লোকব্যবহারে তথা প্রবাদে ও রূপকথায় পর্য্যন্ত যে স্বর্গ সকল ধর্ম্মে বিশেষ করিয়া বয়োবৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় ওতপ্রোত, তাহার আদর্শ এইরূপ উদার ও ব্যাপক হওয়াই সর্ব্ববাদিসম্মত। খৃষ্টধর্ম্ম শাস্ত্র বাইবেলও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে—"The kingdom of Heaven is within you" এ দেশের দেহতত্ত্ব গীতেও এই কথাই শুনি,—

"আপনাতে আপনি থেকো যেও না মন
কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ
অন্তঃপুরে॥"

এখন এতকালের ধারণায় যে স্বর্গকে সুখময় ভৌমপ্রদেশরূপে শুনিয়া, জানিয়া ও চিনিয়া রাখিয়াছি হঠাৎ তাহাকে অগ্রাহ্য করি কেমন করিয়া, এরূপ সংশয় ও অবিশ্বাস লেখকের ন্যায় অনেকের হৃদয়ে উঁকি মারিতেছে, উহার নিরসনের উপায় কি? উহার জন্য মানবের জন্ম-সহচর

সন্দেহের নিরাকরণ-প্রয়াসী সমন্বয়প্রিয় মীমাংসকাচার্য্যের স্বর্গবিষয়িণী সুন্দর মীমাংসাটী এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। মীমাংসা দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ পরিভাষা গ্রন্থ "অর্থ সংগ্রহে" অধিকারবিধি নির্ণয় প্রস্তাবে "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্য কামো যজেত" এই বিধিবাক্যটীর ব্যাখ্যামুখে এ যুগের বাচস্পতিকল্প টীকাকার মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় "স্বারাজ্যং স্বর্গরাজ্যং অত্র স্বঃ পদং নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভবজনকস্থানপরং, নতু" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া, নিম্নে মীমাংসাসম্মত স্বর্গের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

ইহার পরে "ইত্যুক্ত সুখবিশেষ পরম্। রাজত্বাস্বয়ানুপপত্তেঃ" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তলভ্য ফলিতার্থে বুঝা যায়, স্বর্গ এমন একটী স্থান যেস্থানে নিরন্তর অবিমিশ্র সুখের অনুভব হয়। ইঁহারা বলেন, শুদ্ধ সুখকে স্বর্গ বলিলে প্রদর্শিত বিধির কো স্বং স্বর্গীয় সুখ ধরিলে রাজ্য পদটী বিফল হইয়া যায়। বৈদিক পদের ঐরূপ ন্যূনতা স্বীকার সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। অতএব উদ্ধৃত প্রাচীন ও প্রামাণিক কারিকায়স্থিত "স্বঃ পদাস্পদম্" শব্দে স্বং স্বর্গরূপ বস্তুর আস্পদ স্থান এইরূপ স্পষ্টার্থে সুখের স্থান বুঝাইয়া থাকে। এইটী অবশ্য মীমাংসকের মতই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার মনে হয় পূর্ব্বপ্রদর্শিত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত মতে যে অপূর্ব্ব শরীরে স্বর্গসুখ অনুভূত হয়, ঐরূপ শরীরের যেটী আবাসভূমি অর্থাৎ আধার, সেটীও অপূর্ব্ব, বৈষ্ণবদর্শনসম্মত অপ্রাকৃত বা চিন্ময় স্বীকার করিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। কারণ শরীরের নাম ভোগায়তন। শরীরেই সুখের ভোগ হইতে পারে। সুতরাং আলোচ্য স্বর্গসুখ আধ্যাত্মিক হইলে উহার ভোগায়তন দেহও যে আধ্যাত্মিক হইবে ইহা তো স্বাভাবিক। শাস্ত্রে স্বর্গভোগ্য পদার্থগুলিকে সঙ্কল্পমূলক ও স্বর্গীয় শরীরকে মনোময় বলা হইয়াছে। "মনোময়ানি স্বর্গলোকে শরীরাণি, সঙ্কল্পমূলকাস্তত্র ভোগাঃ।" পক্ষান্তরে যাঁহারা প্রতি পদক্ষেপেও প্রতি পলকে পরলোকের সত্তা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদের নিকট অনিত্য আধিভৌতিক স্বর্গের যতখানি মূল্য, নিত্য আধ্যাত্মিক স্বর্গের মূল্যও ততোধিক নহে। বিচার বিতণ্ডা কেবল তোমার আমার মত রামাশ্যামার জন্য। তবে ব্যবহারিক জগতে আস্তিকের বিশ্বাসের মত নাস্তিকের যুক্তি বিচারেও একটা উপযুক্ত মূল্য আছে। তত্ত্বতঃ আস্তিক ও নাস্তিক, বিশ্বাস ও বিচার যেমন কথার কথা, স্বর্গ ও নরক ঠিক তেমনই কথার কথা মাত্র। আসল কথা বস্তু। কেন না মতামতগুলি মানব সৃষ্ট, বস্তু বা সত্য ভাগবদ্‌সৃষ্ট। সত্যদ্রষ্টা মাত্রেরই অভিজ্ঞতা—"Theories are human, facts are divine" রস নিরাকার, আসল বস্তু। কিন্তু উহার ফলের খোসার রূপগুণ লইয়া বিচারে যেমন পণ্ডশ্রমই সার, তেমনি জগতের একমাত্র আসল বস্তু আনন্দ বা সুখ বাদ দিয়া স্বর্গ লইয়া নাড়াচাড়া শিব বাদ দিয়া শবের সেবার বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। প্রাচীন প্রায় সকল ধর্ম্মমতের গোড়ার দিকে যখন প্রকৃতিপূজা পিতৃপূজা প্রভৃতির সমারোহ ছিল, তখন ধর্ম্মসাধনার মধ্যযুগে বা কতকটা উচ্চ স্তরে মানুষ মাত্রেরই কাম্য সুখের আদর্শ স্বর্গ সম্বন্ধে যে ঐরূপ দ্বৈমত্য থাকিবে তাহাতে বিস্ময় নাই। আমি প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মেও ঠিক ঐরূপ স্বর্গের দুইটী ভাব দেখিতে পাই। বাইবেল (NewTestament) হইতে ঐ দুইটীর প্রকরণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মর্ম্মানুবাদ দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এই দুইটী অনুশাসনে স্বর্গকে ঈশ্বরের বাসস্থান এবং পূতাত্মাগণ তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, বলা হইয়াছে। "The condition of those souls who

share the life of Christ" "আমাদিগকে উর্দ্ধে লইয়া গিয়া স্বর্গলোকে যিশুখৃষ্টের পার্শ্বে বসাইয়া দেন।" "স্বর্গে আমাদের আলাপ হইয়া থাকে, এবং তথা হইতে আমরা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশুখৃষ্টকে দেখিয়া থাকি।" এ স্থলে স্মরণ করা ভাল যে সংস্কৃত, স্বর্গশব্দে সুখময় স্থান ও আনন্দময় ঈশ্বরের মত ইংরাজী Heaven কথায় স্বর্গ ও স্বর্গের দেবতা দুইই বুঝাইয়া থাকে। *

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের ২১শ অধিবেশনে কৃষ্ণনগরে দর্শনশাখায় পঠিত।

সন্ন্যাসী

উদয়ন

হে দুর্মদ, সীমার সকল বাঁধ নিঃশেষে টুটিতে
লয়েছ কি ব্রত ?
অনন্ত আকাশ পরে, মুক্তদেহে চলেছ উড়িতে
বিহঙ্গের মত ?

কিসের আঘাতে তুমি, মর্ম্মে আজ এত ব্যথা পেয়ে
হয়েছ কঠিন—
খেলা নাহি হলো শেষ, জীবনের অর্দ্ধ-অভিনয়ে
সাজিলে প্রাচীন ?

জননী-পৃথিবী-বুকে, দিকে দিকে, যত স্নেহ প্রেম
কিছু দেখিলেনা—
গাহিতে গাহিতে, থেমে গেলে আচম্বিতে, হে নির্ম্মম
ভাঙ্গি দিলে বীণা !

অগণিত স্মৃতি কত, দিন দিন গাঁথিলে আবেগে
ছিল তব কাছে
কিছু সাথে নাহি নিলে, ছুটিয়াছ উদ্ধত বিরাগে
সবে বাধি পিছে।

* * * * * *

সবারে করিলে হেলা, কোন্ বীর্য্য লভি, হে দাম্ভিক
এত অনায়াসে ?
অগ্নিদৃষ্টি হানি, বজ্রদৃঢ়মুখ চলেছ নির্ভীক
উন্মাদের বেশে।

দূরে কোন্ স্বপ্নলোক, আজি তোমা দূর দূরান্তরে
করে আকর্ষণ
কোন্ আশা অহরহ, বক্ষে তব গুমরিয়া মরে
কী সে প্রয়োজন ?

দেশ ছাপি কাল ছাপি, বাক্য মন পারে কিছু বুঝি
করিল আহ্বান—
তাহার পরশ মাঝে, গূঢ় গাঢ় অমৃতের আজি
পাইলে সন্ধান ?

একের মাঝারে বহু, অল্প ত্যজি, হয়েছ কি তাই
ভূমার পিয়াসী ?
যেই জ্ঞানে, সবারে মিলিবে পূর্ণরূপে, তাহা চাহি
চলেছ সন্ন্যাসী।

জীব-শিব

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতের সর্ব্বত্র শিবপূজার ধুম। আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতের আকাশ বাতাস 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনিতে মুখরিত। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে "হর হর শ্রীমহাদেব শম্ভো! কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা" এই সঙ্গীত উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে স্নানাদি সমাপন করিয়া "ওঁ পার্ব্বতীপতয়ে হর হর, নমঃ শিবায়" বলিয়া পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্ শিবকে ভক্তিভরে অর্পণ করতঃ ধন্য হয়। ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর মহানিশায় শিব-পূজার মাহাত্ম্য এতই অধিক যে,—

'এক শিব রাতে ব্যাধ অজ্ঞানেতে
মহাদেবে তোষে ছিল।
সেই পুণ্যবলে, কৈলাস অচলে,
চির শান্তি সে লভিল॥'

ভীষণ পাপাচারী ব্যাধের পরম সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াই শিবভক্ত হিন্দুজাতি প্রতি বৎসর সযত্নে শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। সত্য শিব সুন্দরের উপাসনা হিন্দুজাতি অতীব শ্রদ্ধা সহকারে আবহমান কাল ধরিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহা তাঁহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই শিব সম্বন্ধে অনুধ্যান করিলে প্রত্যেক জীবই যে শিব তাহা ধারণায় বদ্ধমূল হয়। আচার্য্যপাদ শঙ্কর গভীর হুঙ্কারে 'নির্ব্বাণষট্‌কম্'এ ঘোষণা করিয়াছেন,—

"অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চা সঙ্গতং নৈব মুক্তির্নমেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

আমি কল্পনা দেহাদি দৃষ্টরূপ, সীমা, ব্যাপ্তি, কাল ইত্যাদির অতীত, বিশ্বের আদি কারণরূপে আমিই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সত্তারূপে, চৈতন্যরূপে এবং আনন্দরূপে আমি শিবই নিত্য অবস্থিত আছি। বিশ্ব চরাচর যা কিছু সব শিবময়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন,—'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ'। এই সচ্চিদানন্দ বা সত্য শিব সুন্দর অখণ্ড ভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত। এঁর সত্তা কোথাও খণ্ডিত নহে, সর্ব্বত্র চির অখণ্ডিতভাবে দেদীপ্যমান। পরমহংস দেবের ভাষায় 'মায়াবদ্ধ জীব এবং মায়ামুক্ত শিব', 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। যথার্থ জীবন্মুক্ত অবস্থাটিই শিবত্ব। নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব যে শিব বা ব্রহ্ম, তিনিই মায়ার দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ হইয়া জীবরূপে বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন। জীব যে শুভমুহূর্ত্তে এই বিড়ম্বনার হাত হইতে মুক্ত হইয়া নিজ বিরাট সত্তার অনুভূতিতে মহীয়ান্ হইয়া উঠে, অমনই তাঁহার ভিতর শিবের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণে এই বিরাট শিবত্ব মহিমা নিত্য প্রকটিত থাকিলেও একদা বিশেষ করিয়া ভক্তগণ সমক্ষে যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা হইতেছে। পরমহংস দেব সিমলা কাঁসারিপাড়ায় কোনও ভক্তের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনার্থী নরনারীতে ভক্তের গৃহ পরিপূর্ণ। জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত তখনকার দিনে উচ্চ মূল্যে মেছুয়াবাজার হইতে অর্ডার দিয়া অতীব সুন্দর ও বৃহৎ গ'ড়ে মালা আনিয়া ভক্তিভরে ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন। ঠাকুর অচিরাৎ লাফ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক

অনির্ব্বচনীয় মহাভাবে বিভোর হইয়া প্রসারিত বাম হস্ত মুখের সম্মুখে ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে গুরু গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন :—

"তোরা কি আর সাজাবি আমায় দিয়ে ফুলহার ?
নিত্য যাঁর শোভিছে গলে জগচ্চন্দ্র হার।
—ঐ জগচ্চন্দ্র হার ॥"

এই বলিতে বলিতে হাত ঘুরাইয়া যেন বুঝাইতে লাগিলেন—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সব হার হইয়া গলায় শোভা পাইতেছে, সামান্য কথা কয়টি বলিবার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গি ? নাদব্রহ্ম যেন প্রত্যেক শব্দোচ্চারণে ফুটিয়া উঠিতেছে। নিরীহ জীবভাব একেবারে বিলুপ্ত, তার স্থলে বিরাট শিবত্ব স্পষ্টতম ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত। উপস্থিত সকলে সব ভুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। মহান্ সত্তার পবন-পরশে সবাই তখন ভূমানন্দে বিভোর। যুক্তি তর্ক কথোপকথন সব সঙ্কুচিত, কেবল বিরাট মহীয়ানের অনুভূতি সকলের ভিতর জাগিতেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সকলেই নিজ নিজ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হইল।

হীনত্ব ক্ষুদ্রত্ব দাসত্ব ইত্যাদি জীবের ধর্ম্ম, আর মহত্ত্ব বিরাটত্ব সার্ব্বভৌমত্ব শিবের ধর্ম্ম।

হরিদ্বার কঙ্খলস্থিত পরমহংস মথুরা দাস বা ন্যাঙ্গা বাবার জপমন্ত্র ছিল "সচ্চিদানন্দকো সম্ঝো, আউর সব কুছ্ ঝুটা হায়।" মুক্ত পুরুষ কে ?—এই প্রশ্ন একদা তাঁহাকে করায়, তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিয়াছিলেন,—"সমাজবন্ধন, বেদবন্ধন এবং গুরুবন্ধন ছিন্ন করিয়া আত্মনির্ভরশীলতার মুক্তি-পীঠে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যে দাঁড়াইতে সমর্থ সেই যথার্থ মুক্তপুরুষ।" ন্যাঙ্গাবাবা বর্ণিত বন্ধনত্রয় যে-সে কথা নয়। সমাজবন্ধন অর্থাৎ সামাজিক আচার পদ্ধতিকে মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা অতীব দুঃসাধ্য। বহু আয়াসে এ যদিও বা সম্ভব হয় তৎপর বেদবন্ধন অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করা এক মহা দুরূহ ব্যাপার, তদুপরি গুরুতর গুরুবন্ধন অর্থাৎ যাঁহার নিকট হইতে সব শিক্ষা দীক্ষা তাঁহাকে শুদ্ধ ত্যাগ। এক কথায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে শব না হইতে পারিলে শিবত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। জগতের অর্থাৎ মায়া রাজ্যের যা কিছু সবই প্রতি-বন্ধক সবই বন্ধনের হেতু। যদি শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত শিব হইতে হয় তবে আপাতমধুর সকল সংস্কারের মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া উৎকট বিস্বাদময় হলাহল পানে মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে ; মরা হইতে রামকে বা শব হইতে শিবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর গভীর হুঙ্কারে গাহিয়া গিয়াছেন,—

'ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥'

আমি অমর, আমি অভী, আমাতে জাতিভেদ নাই, আমার পিতা বা মাতা কেউ নাই। আমি অজ ; বন্ধু, আত্মীয়, গুরু কি শিষ্য এসব কিছুই নাই, আমি আত্মানন্দে বিভোর সত্য সুন্দর শিব ভিন্ন অন্য কিছু নই।

কঠোর সাধন সহায়ে জীবদেহে শিবের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সে শিবের পূজায় বেশী কিছু আয়োজন আবশ্যক হয় না। এ শুধু—

"বেল পাতা নেয় মাথা পেতে
গাল বাজালে হয় খুশী।
মান অপমান সমান যে তাঁর
তাঁর কাছে নেই কেউ দোষী ॥"

সমালোচনা

রূপান্তর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

রূপান্তর একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস। উপন্যাস বলতে সাধারণ বাঙালী পাঠকগণ নায়ক নায়িকার প্রেমের কথাই বুঝে থাকেন। রূপান্তরের গ্রন্থকারও নায়ক নায়িকার প্রেমের কথাই বলেছেন, কিন্তু এই প্রেমকে তিনি ভাগবত জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন তাঁর পুস্তকে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল হয়েছে।

তপকুমার—ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির, কুণ্ডা, দেওঘর। ৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা।

পুস্তকে মহিষাসুর গণেশ ও দেবসেনাপতি কার্তিকের ইতিবৃত্ত দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া চণ্ডীর চারটি স্তবের বাংলা অনুবাদ, শান্তিপাঠ মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হয়েছে।

হিন্দুর পারিবারিক জীবন সমাজজীবন সমস্তই আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবের সংঘাতে পড়ে এ ভাবের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরিক মনোভাবের কথা ভগবান যা বলেছেন, বর্তমান কালে সারা পৃথিবীর সমাজজীবনে তার প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে।

আদর্শকে কর্মজীবনে রূপ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন জিনিস আর খুব অল্পলোকেই তা করতে পারে, এ কথা সত্য। কিন্তু তবুও আদর্শ কি তা জানতে হবে আর আদর্শের অভিমুখে জীবন পরিচালিত করবার চেষ্টাও করতে হবে। হিন্দুর দাম্পত্য জীবনের আদর্শ উমা-মহেশ্বর। গ্রন্থকার উমা-মহেশ্বরের আদর্শ ও কার্তিক গণেশের পুণ্যকথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এ পুস্তকখানা পাঠে প্রত্যেক হিন্দু নরনারী উপকৃত হবেন, সন্দেহ নেই।

প্রত্যেক হিন্দুর ঘরেই চণ্ডীপাঠ হয়। সংস্কৃত ভাষা না জানার জন্য চণ্ডীর কথাগুলো অনেকেই বোঝেন না। চণ্ডীর চারটি স্তবের বাংলা অনুবাদ পাঠ করে অনেকেই আনন্দিত ও উপকৃত হবেন।

গ্রন্থকার পুস্তকখানাকে যথাসাধ্য প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করেছেন।

শশাংকশেখর দাস

সাঙ্গীতিকী—দিলীপকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ২৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্যের উল্লেখ নাই।

এখানি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ। সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইউরোপে সঙ্গীত শ্রোতাকে সঙ্গীতের রসভোগ এবং রচনাবিচারে সাহায্য করিবার জন্য একশ্রেণীর বই আছে। এই বইখানিও সেই শ্রেণীর। আমাদের মনে হয় আমাদের দেশে, বিশেষত বাংলা ভাষায় এই ধরণের বই দিলীপ বাবুই প্রথম লিখিলেন। এই জন্য তিনি বাঙ্গালীর কাছে ধন্যবাদার্হ। সঙ্গীতের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বস্তুই, শুধু রচনা বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারার দরুণ অনেকে উপভোগ করিতে পারেন না। এই কারণে এমনকি শিক্ষিত সমাজে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতও অনেক সময়েই সঙ্গীত নামের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয় না। বস্তুতঃ বিনা শিক্ষায় যেমন ঠিক ঠিক আর্টিষ্ট হওয়া যায় না, সেই রকম শিক্ষাকে বাদ দিয়া আর্টের রসিক হওয়াও

অসম্ভব। শ্রোতাকে রসজ্ঞ করিয়া তুলিতে এই বই কতক পরিমাণে সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে দিলীপ বাবু স্থানে স্থানে অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তার মধ্যে বিশেষত সঙ্গীত রত্নাকরের অনেক কথাও স্থান পাইয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হইল গ্রন্থকার রত্নাকরের অনেক কথা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি বই খানির দ্বিতীয়বার সংস্করণের পূর্ব্বে তিনি রত্নাকর নিয়া একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

আর একটি কথা না বলিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হইবে। সঙ্গীতের আলোচনার দিকটা অনেকের কাছেই নীরস। দিলীপ বাবু তাকে যে শুধু সরস করিয়াছেন তাহাই নয়, সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়াও এই বইখানির সহিত অপর কোন বাংলা সঙ্গীত গ্রন্থের তুলনা চলে কিনা সন্দেহ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্

পিউ পিয়া—শিবদাস প্রণীত। ২০৪, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীগুরুলাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ আনা।

এই পুস্তক খানিতে লেখক অতি সহজ সুন্দর ও সরল ভাষায় দুইটি পক্ষীর একটি কৌতূহলপ্রদ গল্পের ভিতর দিয়া প্রাণিজগতের অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা পশুপক্ষী দেখিলে এবং তাহাদের স্বর শুনিলে আনন্দ প্রকাশ করে, লেখক ইহা লক্ষ্য করিয়া গল্পসহায়ে শিশুদিগকে নিত্যদৃষ্ট পশুপক্ষীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পশুপক্ষীর বিশেষ বিশেষ স্বভাব এরূপ মনোজ্ঞভাবে গল্পের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে যে, ইহা কেবল বালক-বালিকা কেন বয়স্কদিগেরও রুচিকর হইবে। বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। এই পুস্তকখানার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই, এ জন্য ইহা শিশুদের অতিসহজবোধ্য হইয়াছে। সতর খানা সুন্দর ছবি বর্ণিত গল্পটিকে যেমন রূপায়িত করিয়াছে তেমন ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। এই সুললিত ও সুদৃশ্য গ্রন্থখানি যে শিশু-চিত্ত জয় করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার ছাপা কাগজ ও প্রচ্ছদ-পট সুন্দর হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন, রেঙ্গুন—রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন দাঙ্গার ফলে বিপন্ন বর্ম্মী ও ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। এই বিষয়ে মিশনের কাজ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা, (২) বিপদপূর্ণ অঞ্চল হইতে উভয় সম্প্রদায়ের নিরাশ্রয় পরিবারসমূহের উদ্ধারসাধন এবং (৩) দরিদ্র শ্রমজীবীদিগকে খাদ্য বিতরণ।

মিশনের কর্ম্মিগণ আহত ব্যক্তিকে রাস্তা হইতে উঠাইয়া হাসপাতালে পাঠাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে বর্ম্মী ও ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের গুরুতর আহত অনেক লোকের চিকিৎসা করা হইয়াছে। কর্ম্মিগণ মোটরযোগে দিবারাত্রি বিপন্ন পরিবারসমূহকে উদ্ধার সাধন এবং কতিপয় সহৃদয় গুজরাটী ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে কয়েকটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে খাদ্যদ্রব্য দান করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তিন হাজারের অধিক লোককে সাহায্য করা হইয়াছে। অনেকে দাঙ্গায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। মিশন এই বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন সেবাশ্রম, তমলুক—১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সনে ১৪৩ জন অসহায় দুঃস্থ রোগীকে সেবাশ্রমের হাসপাতালে রাখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির দ্বারা সেবা ও শুশ্রূষা করা হইয়াছে এবং দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ হইতে ১০৮০৮ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া ২২৬ জন কলেরা রোগীকে ঔষধ ও পথ্যদ্বারা চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা এবং সুতাহাটার দুর্ভিক্ষে ৩০১টি দুঃস্থ পরিবারকে আহার্য্য প্রদান করা হইয়াছে। ৯১ জন ছাত্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে আর্থিক ও অন্যান্য সাময়িক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। আশ্রমের অবৈতনিক বিদ্যামন্দিরে ১২০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। সহর ও মফঃস্বলের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আশ্রমের লাইব্রেরী হইতে ৮৭১৬ খানি পুস্তক পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণের দ্বারা মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচ্য বর্ষে ৫টি ধর্ম্মসভা ও ৩১টি বক্তৃতা (আলোকচিত্র সাহায্যে) এবং আশ্রমগৃহে ৫২৮টি ও মফঃস্বলে ১৭টি ধর্ম্মালোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী" উপলক্ষে তমলুক মহকুমায় ধর্ম্মসভা, উৎসব, উপদেশ পাঠ, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। আশ্রমের কাজে এই বর্ষদ্বয়ে মোট আয় ১০২১১৻১০ এবং ৮০৪৩৷৴০ ব্যয় হইয়াছে।

রেডিও বক্তৃতা—অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বেলুড় মঠ হইতে স্বামী প্রেমঘনানন্দ গত ৮ই সেপ্টেম্বর 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে বেতারে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া—গত ৭ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৬৷০ ঘটিকায় আশ্রমে বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সভাস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দ কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী লাহা মহাশয় বঙ্কিমের রচিত "আমার দুর্গোৎসব" আবৃত্তি করেন এবং শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে তাঁহার রচনাগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। আশ্রমের শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ও সমবেত সুধী মণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ-বিদ্যালয়, কলিকাতা—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদ-বিদ্যালয়ের ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী প্রদত্ত হইতেছে। ১৯৩৭ সালের শেষভাগে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৭। প্রায় প্রতি বৎসরই ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ৫ জন এম্-এ এবং ২ জন বি-এ উপাধিধারী ছাত্র বেদবিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বহু কলেজের ছাত্র তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেদ-বিদ্যালয়েও পড়িতেছেন। প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বিদ্যালয়ের এক বা ততোধিক ছাত্র বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

বেদ-বিদ্যালয়ে একটি পুস্তকালয় আছে। ইহাতে বহু দুর্ল্লভ গ্রন্থের সংগ্রহ আছে। এই পুস্তকালয় দ্বারা বিদ্যার্থিগণের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। কয়েকটি দরিদ্র ছাত্র যাহাতে আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আছে।

১৯৩৭ সালে মোট ১৪ জন ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্মৃতি আদ্য ও বেদান্ত আদ্য পরীক্ষায় ২ জন ছাত্র বৃত্তিলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪২৯৮৶৫ পাই-সহ ১৯৩৭ সালের মোট আয় ২৪১৮৴১১ পাই এবং ব্যয় ২১৫১৶০ আনা।

রামকৃষ্ণ মিশন, সোনারগাঁ, (ঢাকা)—সোনারগাঁ রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সনের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) প্রচার বিভাগ—বিভিন্ন গ্রাম সমূহে ছায়াচিত্রযোগে মোট ২২টি বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। আশ্রম-প্রাঙ্গণে ও বাহিরে ১৫৩টি ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে নয় দিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে প্রদর্শনী, সর্ব্বধর্ম্ম-সম্মেলন, পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

(২) শিক্ষা—আশ্রমে একটি ফ্রি পুস্তকালয় আছে। ইহার পুস্তক সংখ্যা ৫০০। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে মোট ৫৪৫ খানা পুস্তক গৃহে পাঠ করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৬ সনে ৩ জন এবং ১৯৩৭ সনে ২ জন গরীব ছাত্রকে মিশনে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থ মোট ৫৷০ দান করা হইয়াছে।

(৩) সেবা—উক্ত দুই বৎসরে মিশন হইতে মোট ৬২৩১ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া বহু বিপন্ন পরিবারকে আহার বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে ম্যালেরিয়া এপিডেমিক নিবারণ কল্পে মিশন হইতে দুইটি কেন্দ্র খুলিয়া রোগীদিগকে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৫ সনের উদ্বৃত্ত সহ এই দুই বৎসরের মোট আয় ১২১৭৷৶৫ এবং মোট ব্যয় ১১৪২৷৴১০৭

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বাঁকিপুর, পাটনা—পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৩৭ সনের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে :—

প্রতি সপ্তাহে আশ্রম, হরিসভা, কদমকুঁয়া, মিঠাপুর, আর্ ব্লক, গর্দ্দানিবাগ প্রভৃতি স্থানে যথারীতি উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে জনসভায় ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতাদি প্রদান করা হইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য আশ্রম হইতে একটি ফ্রি প্রাইমারি বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৩৮। কংকরবাগ নামক গ্রামে অন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রম কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা মোট ৩৫।

আশ্রমে একটি বিদ্যার্থিভবন আছে। একটি বাঙ্গালী ও একটি বিহারী ছাত্র সেখানে অবস্থান করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৭২৲১১ পাই সহ এই বৎসরের মোট আয় ২৩৭২।৯ পাই এবং মোট ব্যয় ১৭৩৪৸৶৬ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, কালাডি (মালাবার)—আমরা এই আশ্রমের ১৯৩৭—৩৮ সনের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। কেরল প্রদেশে আচার্য্য শঙ্করের জন্মস্থানে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত। আশ্রম-পরিচালিত ব্রহ্মানন্দ সংস্কৃত উচ্চ বিদ্যালয়ে ১১ জন ছাত্রী ও ৯২ জন ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। ৮ জন শিক্ষক দ্বারা এই বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। আশ্রমের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে ৫ জন ছাত্র আছে। ইহা ছাড়া আশ্রমের গুরুকুলে ৪ জন বিদ্যার্থীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অধ্যক্ষ স্বামী আগমানন্দ গ্রীষ্মের ছুটিতে ব্রহ্মসূত্র ও রাজযোগ সম্বন্ধে আশ্রমে এবং গীতা সম্বন্ধে আর্ণাকুলম্, আলেপ্পী, ত্রিবেন্দ্রম্ প্রভৃতি স্থানে নিয়মিত ক্লাস করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার, কোচিন, কুর্গ ও মহিশূরের বিভিন্ন স্থানে আলোচ্য বর্ষে ১৪৪টি জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। আশ্রমে বুদ্ধ, মহম্মদ, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ৫৪৭৫।৶৩ পাই এবং মোট ব্যয় ৫৪৬২।৶৪ পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৩৭ সনের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

আশ্রমে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এবং মঙ্গলঘাট ষ্টেশনের নিকট ইহার একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই উভয় কেন্দ্র হইতে আলোচ্য বর্ষে মোট ২২৩৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবান হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসের ছাত্রসংখ্যা তিন।

নিম্নশ্রেণীর বালকগণের শিক্ষার জন্য আশ্রম কর্ত্তৃক একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বর্ত্তমান ২১। আশ্রমে একটি ফ্রি পুস্তকালয় আছে। ইহার পুস্তক সংখ্যা ৯৫১। আলোচ্য বর্ষে মোট ১৫০১ জন পাঠককে পুস্তক বাড়ীতে লইয়া পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। পাঠাগারে প্রতি মাসে দুইটি করিয়া আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছে। আশ্রমের কর্ম্মিগণ সময় সময় শহরে ও মফঃস্বলের নানাস্থানে ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতাদি করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরণে সহায়তা করিয়াছেন।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪৭২৲১০ সহ এই বৎসরের মোট আয় ২৯৪৬৶১৫ এবং মোট ব্যয় ২৪৪৯।৶১৫ আনা।

ভ্রম-সংশোধন—গত মাসের উদ্বোধনের ৪০০ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিত লক্ষ্মণ স্থলে "শঙ্কর" হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা-সেবাকার্য্য

বিগত ৬ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মিশনের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শিলনা ও নিজরা কেন্দ্র হইতে ৪৯ খানি গ্রামের ৩০১১ জন অধিবাসীর মধ্যে ১১০ মণ ১৪ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত ১ মণ লবণ, ২১৩ খানি নূতন বস্ত্র ও ৪২২ খানি পুরাতন বস্ত্র সাময়িকভাবে বিতরিত হইয়াছে।

গত ৯ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে মিশনের মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পরেশনাথপুর, কেদারচাঁদপুর, ও সর্ব্বাঙ্গপুর কেন্দ্র হইতে ২১ মণ ২৩ সের চাউল ১৫ খানি গ্রামের ৪২৪ জন অধিবাসীর মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। গ্রাম পরিদর্শন ও সাহায্য প্রার্থিগণকে তালিকাভুক্ত করার কাজ এখনও সমভাবেই চলিতেছে। সেবাকার্য্য আরও ৫।৬ সপ্তাহ চালাইতে হইবে।

শীঘ্রই প্রতি সপ্তাহে উভয় কেন্দ্রের জন্য আমাদের ৭।৮ শত টাকার প্রয়োজন হইবে। এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত পরিবারগণের জন্য কয়েক সহস্র বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

যে কোন প্রকারের সাহায্য নিম্নলিখিত স্থানে সাদরে গৃহীত হইবে ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে :—

১। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া।

২। ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

৩। ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

১০।১০।৩৮

শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ

জন্ম—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ

মহাসমাধি—২৩শে অক্টোবর ১৯৩৮

মহাসমাধি

গত ২৩শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা ৪০ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি রক্তের চাপ রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ১৮ই অক্টোবর হইতে তাঁহার খুব জ্বর হয় এবং পরে হিক্কা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা দেখা দেয়। শনিবার শেষ রাত্রি হইতে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বহু সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ পরিবৃত অবস্থায় পরদিন সকাল বেলা তিনি মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁহার পূত-দেহ পুষ্প চন্দনাদিতে সজ্জিত করিয়া বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণের সমাধি স্থানের পার্শ্বে চিতানলে আহুতি প্রদান করা হয়।

স্বামী শুদ্ধানন্দ কলিকাতার একটি অভিজাত বংশে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং পিতার নাম আশুতোষ চক্রবর্ত্তী। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসিতেন ও সর্ব্বদাই সাধু সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়াইতেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি দুইবার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। একবার পদব্রজে দেওঘর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। পঠদ্দশায় তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরাহনগর মঠে ও কাঁকুড়গাছিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের সহিত পরিচিত হন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। তখন তিনি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তিনি স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামীজীর সহিত তিনি উত্তর-

ভারত এবং রাজপুতানাদি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মানসসরোবর তীর্থেও গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ, কর্ম্মকুশলতা ও প্রতিভায় স্বামীজী মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনে স্বামী শুদ্ধানন্দ সময় সময় অদ্ভুত প্রেরণা লাভ করিতেন এবং তিনি মনে করিতেন গুরুর আশীর্ব্বাদই উক্ত প্রেরণার মূল কারণ।

স্বামীজীর নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি প্রথমে স্বামীজীর ইংরাজী রাজযোগ গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাহাতে তাঁহার অনুবাদ-ক্ষমতা বিশেষ প্রকাশ পায়। আজকাল আমরা স্বামীজীর যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই তাহার অধিকাংশই স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ। তাঁহার অনুবাদ যেমন সরল তেমনি মূলের মতই তেজোবন্ত ও চিত্তাকর্ষক। শব্দবিন্যাসের অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার ছিল। স্বামীজীর রচিত ইংরাজী 'Songs of the Sannyasin' কবিতাটির পদ্যে অনুবাদ করিতে তিনি যে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে কখনও কেহ এইরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর প্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি উহার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। পরে তিনি উদ্বোধনের সম্পাদক হন এবং ১০ বৎসর পর্য্যন্ত উহার সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং পরে রামকৃষ্ণ মিশনের যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সভাপতি পদে বৃত হন।

তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ। যে কার্য্যে তিনি আত্ম-নিয়োগ করিতেন সেই কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা শাখাও তাঁহার পরিশ্রমের ফলে স্থাপিত হয়। বেদান্ত এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধুদিগের মধ্যে এই সকলের অধ্যয়ন এবং আলোচনা প্রচলিত থাকে, উহা তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল। অনেক সময় তিনি নিজেই অধ্যাপনা করিতেন। উপনিষদ পাঠে মঠের সাধুদিগের অনুরাগ জন্মাইবার জন্য তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যানটি সংস্কৃতে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধুদিগের দ্বারা উহার অভিনয় করান। তিনি নিজেও অভিনয়ে কয়েকবার যোগদান করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে সাধুদিগের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যে চতুষ্পাঠী আছে স্বামী প্রেমানন্দ উহার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও স্বামী শুদ্ধানন্দের ঐকান্তিক উৎসাহই উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রধান কারণ।

অমায়িক স্বভাব এবং নিরহঙ্কারিতার জন্য তিনি সকলের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে কেহ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলের সহিতই তিনি সমান ভাবে মিশিতেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত, লেখক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। 'উদ্বোধনে' তাঁহার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়

সমানভাবে কার্য্য করিত। অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার অধ্যয়ন ক্ষমতাও ছিল অদ্ভুত। অসুস্থাবস্থায়ও তিনি পাঠে বিরত থাকিতেন না। ১৯২৬ খৃঃর এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্মেলনের অধিবেশন স্বামী শুদ্ধানন্দের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

গত কয়েকমাস যাবৎ তিনি সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক আলোচনা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণে রত থাকিতেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করাইয়া শ্রবণ করেন, রাত্রিতে চিকিৎসকগণকে বলেন, "আর ঔষধাদি সেবন করিবার প্রয়োজন নাই, এখন শুধু ভগবানের নাম শোনান।" স্বামী শুদ্ধানন্দের বহুগুণপূর্ণ জীবনচরিতের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। ভবিষ্যতে আশা করি তাঁহার যথাযথ আলোচনা করিয়া আমরা উপকৃত হইতে পারিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ প্রায় সকলেই একে একে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিগণের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দই প্রথম অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করেন। দেহত্যাগের সময় তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবার নহে।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!!!

আধুনিক সভ্যতার অধঃপতন

সম্পাদক

আধুনিক সভ্যতা প্রধানতঃ প্রতীচ্য জাতির সমুন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান। মানুষকে উন্নত শিক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ করার দিক দিয়া এই সভ্যতা অতুলনীয়। মধ্যযুগের অবসানে সমগ্র ইউরোপে যুগপৎ এই যান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভব হয় এবং অন্তর্নিহিত অমিত শক্তিবলে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্বেগে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। মানব জাতির উন্নতি সাধনে এই মনোমুগ্ধকর সভ্যতার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া সকল দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পঞ্চমুখে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধে এই বহু প্রশংসিত সভ্যতার বীভৎস রূপ পৃথিবীর সকল মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করে। মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় ধর্ম্মনীতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবিনাশী কমিউনিষ্ট দলের অভ্যুদয়, ইটালীতে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বেচ্ছাতন্ত্রমূলক ফ্যাসিষ্ট শক্তির আবির্ভাব, মুসোলিনীর আবিসিনিয়া বিজয়, জার্ম্মানীতে গণতন্ত্রবিরোধী পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু স্বৈরাচারী নাজি-শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার, হিট্‌লারের অষ্ট্রীয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কতকাংশ গ্রাস, স্পেনে সাধারণতন্ত্রবিরোধী প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব, শক্তিহীন চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের নৃশংস

অভিযান, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-আরবীর দ্বন্দ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর ৮০ কোটি মানুষকে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ রাখিবার জন্য ৪ কোটি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের অনন্যসাধারণ উদ্যম, জগতের সুসভ্য জাতিসমূহের উৎকট সাম্রাজ্যলিপ্সা এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ ও বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অভাবনীয় ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া আধুনিক জড়সভ্যতার জঘন্যরূপ পূর্ণাকারে প্রকটিত হইয়াছে। ইহার ফলে পৃথিবীর চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই এই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যোগদৃষ্টি সহায়ে এই জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার ভবিষ্যৎ পরিণতি দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।" বর্ত্তমানে সভ্যতাগর্ব্বিত জাতিসমূহের কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া এই বাক্যের সত্যতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচলিত ধর্ম্ম নীতি ও অন্যান্য বিষয়ে সার্ব্বজনীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিমত ব্যক্ত করিলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি—এমন কি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। ঠিক তেমন ভাবে সভ্য নামে অভিহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কতিপয় দেশে ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বাধীন চিন্তার জন্য অধুনা অসংখ্য নরনারীকে উৎপীড়ন—এমন কি নির্ব্বাসন ও প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে! তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মধ্যযুগে ধর্ম্মরক্ষকগণের পক্ষ হইতে দণ্ড দেওয়া হইত, আর এখন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে দণ্ড দেওয়া হয়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাথলিক্ জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ তৃতীয় আলেকজেণ্ডার প্রচলিত ধর্ম্মের সন্দেহবাদীদিগকে সন্ধান করিয়া শাস্তি দিবার জন্য ইউরোপের গোঁড়া খৃষ্টান রাজন্যবৃন্দকে অনুরোধ করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে চলিত ধর্ম্মের অবিশ্বাসীদিগের বিচার করিবার জন্য পোপের অধীনে বিখ্যাত 'ভেরোনা কাউন্সিল' গঠিত হয়। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী প্রচলিত ধর্ম্মের অবিশ্বাসিগণ ও তাহাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সন্ধান করিয়া দণ্ড দেওয়ার ভার বিশপগণ—বিশেষ করিয়া ডমিনিকান সম্প্রদায়ের সাধুদের উপর অর্পণ করেন। এ জন্য স্থানে স্থানে বিচারালয় স্থাপিত হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পাষণ্ড দলনার্থ স্থাপিত এই বিচারালয় সমূহের মধ্যে একমাত্র স্পেনের একটী বিচারালয় হইতেই প্রায় লক্ষাধিক অবিশ্বাসী দণ্ডিত হইয়াছিল! ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থ আছে সন্দেহ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্যালাম্যান্কা নগরে ছয় হাজার পুস্তকযুক্ত একটী গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করা হয়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, মধ্যযুগে ইউরোপে স্বাধীন মত প্রকাশ করা কিরূপ বিপজ্জনক ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে টাইকোব্রাহি, কেপ্লার ও গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইতে পাশ্চাত্যে যুক্তিবাদের যুগ সূচনা হয়। এই সময় বেকনের নৈসর্গিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, গিলবার্টের তাড়িত ও হার্ভের রক্ত-সঞ্চালন আবিষ্কার দ্বারা প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। ল্যাপ্লেস, লালণ্ড, ডিলেম্বার প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ প্রতীচ্যে চলিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। দার্শনিক এরিষ্টটল, ডেকার্ট, হাক্সলি ও লকির যুক্তি, স্পিনোজার নাস্তিকবাদ, হিউমের অজ্ঞেয়বাদ এবং হেগেল্ ও কাণ্টের নির্ব্বিশেষ (Absolute) ঈশ্বর ধারণার দ্বারা প্রচলিত মতবাদের মূলভিত্তি বিধ্বস্ত হয়। এই যুক্তিবাদ বা স্বাধীন চিন্তার যুগপ্রবর্ত্তকের মধ্যে টাইকোব্রাহি, গ্যালিলিও, ডেকার্ট,

কোপারনিকাস, ব্রাম্নু, সেন্ট জন্ বেনিয়ান্, সার্ টমাস্ বেকেট্ প্রমুখ মনীষিগণ নানাভাবে দণ্ডিত হন। পরবর্ত্তী কালে ইউরোপে ব্যাপক জনশিক্ষা বিস্তারের ফলে চলিত মতবিরোধী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তিবাদ ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ প্রতীচ্য জাতিসমূহের মধ্যে ক্রমেই স্বাধীন চিন্তাব বিকাশ হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রিজন্ (reason) অর্থাৎ যুক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিযা রোম অর্থাৎ চলিত খৃষ্টধর্ম্ম সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। এই সময় ষ্টীম্ ইঞ্জিনেব আবিষ্কাব এবং ইহাব ফলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য হইতে প্রকৃত পক্ষে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা জন্মলাভ করে। এইরূপে ইউরোপ মধ্যযুগ অতিক্রম করিয়া রেনেসাঁর যুগে পদার্পণ করে। আধুনিক সভ্যতার মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্য জাতিব বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস দর্শন কলাবিদ্যা রাজনীতি মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা এবং নিত্য নূতন আবিষ্কার। যদি সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করিবার অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ পর্য্যন্তও আধুনিক-. তার যুগে উপনীত হইতে পারিত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাহার ফলে বর্ত্তমান সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে, গত মহাযুদ্ধের পর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক সভ্য জাতি জনসাধারণের সেই স্বাধীন চিন্তা ও নাগরিক স্বাধীনতাব পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

কার্ল মার্কস্ প্রবর্ত্তিত বলসেভিক্ তন্ত্রের নায়ক লেনিন্ রাশিয়ায় ধর্ম্ম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। তথাকার বহু বিজ্ঞাপিত প্রোলেটেরিয়েট্ বা কৃষক ও শ্রমিকদের শাসনের নামে অধুনা বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার চলিতেছে। সংবাদপত্রে দেখা যায়, বর্ত্তমান রাশিয়ার রাষ্ট্র-নেতা ষ্টেলিন্ ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার জন্য তথাকার অধিবাসিগণকে দলে দলে গুলি করিয়া মারিবার আদেশ দিতেছেন! সুসভ্য জার্ম্মান জাতির রাষ্ট্রনায়ক হিট্লারের নাজি-দল ইহুদী ও ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জার্ম্মানী হইতে ইহুদীগণকে নির্ম্মম-ভাবে বিতাড়িত করা হইতেছে। কিছুদিন হইল হিট্লারপন্থী নাৎসীদেব আদেশে গির্জ্জার ঘণ্টা বাজাইবার সময় পরিবর্ত্তন না করায় বার্লিনের কয়েকজন পাদরীকে সং সাজাইয়া সহরময় ঘুরান হইয়াছে এবং ববাবের ডাণ্ডা দিয়া তাঁহাদিগকে রাজপথে ঠেঙ্গান হইয়াছে। জার্ম্মানীর নব্য নাৎসীরা পাদরী ও গির্জ্জার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার করিতেছেন। এই কারণে হিট্লার ইটালীতে পদার্পণ করিলে ক্যাথলিক্ ধর্ম্মগুরু পোপ তাঁহার অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নাই। শুধু ধর্ম্ম নয়, অন্যান্য বিষয়েও জার্ম্মানীতে ব্যক্তিস্বাধীনতা বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে বলিলেই চলে। স্বাধীন ভাবে অভিমত ব্যক্ত করার জন্য আপেক্ষিকবাদের বিখ্যাত আবিষ্কারক আইনষ্টাইন্ ও খ্যাতনামা মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড্‌কে জার্ম্মানী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং শত শত ব্যক্তি কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। অষ্ট্রিয়া দেশের "রোম হইতে দূর থাক" (Away from Rome) আন্দোলন তথাকার অধিবাসীদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া গ্রাসের ফলে তত্রত্য ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল রোম সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনী সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিষ্ট দল গঠন করিয়া ইউরোপে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া-ছেন। ফ্যাসিষ্টদের অত্যাচারে ইটালীতে এখন আর কাহারও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ বা কাজ

করিবার অধিকার নাই। পৃথিবীর ২৫ কোটি ক্যাথলিকের ধর্ম্মগুরু পোপ আজ মুসোলিনীর সাম্রাজ্যবাদের যন্ত্রস্বরূপ। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ (League of Nations) অগ্রাহ্য করিয়া হাবসী জাতিকে আধুনিক সভ্যতায় সমৃদ্ধ করিবার অজুহাতে মুসোলিনী ছলে বলে কৌশলে আবিসিনিয়া গ্রাস করিলেন। শক্তিমান সভ্যজাতিসমূহ 'অসভ্য' হাবসীদের উপর সুসভ্য ইটালীর নির্ম্মম অত্যাচার নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় দেখিলেন। কেবল রাশিয়া জার্ম্মানী ও ইটালী নয়, এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য দেশমাত্রই বর্ত্তমানে আপাদমস্তক প্রলয়ঙ্কর রণসাজে সজ্জিত। অধুনা পাশ্চাত্য দেশসমূহ রাষ্ট্রের আদেশে এক একটী যুযুৎসু সৈন্যনিবাসে পরিণত। সভ্য দেশে যুদ্ধ আর এখন সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, সামরিক আইন অনুসারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেশশুদ্ধ সকলে কোন না কোন আকারে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য। ইদানীং সুসভ্য জাতির যুদ্ধের বীভৎসতা ভয়ানক হিংস্রজন্তুর জিঘাংসাকেও পরাজয় করিয়াছে। এখন আকাশযান হইতে বিষাক্ত গ্যাস ও বোমা ছড়াইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় সহরশুদ্ধ এক একটী বিস্তীর্ণ জনপদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয় এবং সমুদ্রে বহুদূর হইতে টরপেডো নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধেনির্লিপ্ত বাণিজ্য ও যাত্রিজাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হয়। সে দিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম, জাপানীরা বোমা ফেলিয়া বিরাট ক্যাণ্টন সহরের হাসপাতাল, গির্জ্জা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ভগ্নস্তূপে পরিণত করিয়াছে। চীনাদিগকে নির্জীব করিয়া রাখিবার জন্য জাপানীরা তাহাদের মধ্যে আফিম বিতরণ করিতেছে! একটী সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, জাপসৈনিকদের অগ্রগতি বন্ধ করিবার জন্য পরাজিত চীনাসৈন্যদল চীনের হুণ্টং প্রদেশের অন্তর্গত হোয়াংহো নদীর বাঁধ স্থানে স্থানে কাটিয়া দেয়; ইহার ফলে এক লক্ষ গ্রামের বিশ লক্ষ লোক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যুদ্ধের নামে এইরূপ নৃশংস ঘটনা বেশী শোনা যাইত না কিন্তু আধুনিক যুগে এইরূপ ব্যাপার অত্যন্ত সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এক দেশের লোক অপর দেশে অনেকটা সহজে ও স্বাধীনভাবে যাতায়াত করিতে পারিত এবং এক দেশের পণ্যদ্রব্য অপর দেশে আমদানী ও রপ্তানি করিত কিন্তু এখন ভ্রমণ বা বাণিজ্য উপলক্ষে কোন সভ্য দেশের সীমান্ত অতিক্রম করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে অত্যল্প সংখ্যক নিতান্ত বেয়াড়া ব্যক্তিগণ গোপনে হিংসা সমর্থন করিতেন বটে কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাঁহাদিগের প্রতি কখনও সহানুভূতি দেখায় নাই এবং আইনতঃও ইহা দণ্ডনীয় ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদী সভ্য জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাংঘাতিক হিংসামূলক কার্য্য করিবার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে প্রকাশ্যভাবে উত্তেজিত করিতেছেন এবং দেশশুদ্ধ লোক স্বদেশ-ভক্তির নামে ইহা কার্য্যতঃ সমর্থন করিতেছে। এখন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির বিরুদ্ধে হিংসায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই প্রত্যেক সভ্য জাতির পরম ধর্ম্ম। এক একটী বিরাট কারখানার মালিক হাজার হাজার শ্রমিককে অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে রাখিয়া বিশ্বময় একচেটিয়া ব্যবসার ফন্দি আঁটিতেছেন এবং শ্রমিকগণও স্থানে স্থানে সংঘবদ্ধ হইয়া বিজয়ী সৈন্যদলের পররাজ্য অধিকার করার ন্যায় গায়ের জোরে অপরের কারখানা দখল করিতে চেষ্টা করিতেছে। কোন সভ্য জাতিই এখন ধর্ম্ম নীতি যুক্তি আইন প্রভৃতির উপযোগিতায় কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। অধুনা পাশবিক শক্তিপ্রকাশ সভ্য জাতি মাত্রেরই স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায়রূপে গৃহীত। শোনা যায়, যে ব্যাঘ্র একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পায়, সে কখনও ইহা ত্যাগ করিতে পারে

না। আধুনিক সভ্যজাতিদের অবস্থাও ঠিক্ এই নববক্তলুলুপ ব্যাঘ্রের মত। হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে তাহারা মানুষের রক্তের আস্বাদ পাইয়া এখন আর উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। খৃষ্টপ্রচারিত মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি এখন খৃষ্টানদেশগুলি হইতে বিলুপ্ত হইয়া ইহার স্থলে বিরোধ বিদ্বেষ হিংসা পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া এইচ-জি ওয়েলস, বাট্রাণ্ড রাসেল্ প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আধুনিক সভ্যতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি পাশ্চাত্য জাতিকে যেমন বিবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে, ইহার অপব্যবহার তেমন মধ্যযুগের তথা নিতান্ত অসভ্য জাতির বর্ব্বরতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এ জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দায়ী নয়, ইহার অপব্যবহারকারিগণের দুর্ব্বুদ্ধিই এ জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। এখন প্রশ্ন এই—সুসভ্য জাতিসমূহের এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল কেন? সভ্য দেশগুলির এমন অধঃপতন হইল কেন? বিশ্বময় সুশিক্ষিত মানুষের আদর্শ এমন নিরয়গামী হইল কেন?

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে—বিশেষ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বাস্তব বিজ্ঞানের আশ্রয়ে মানব সমাজ গঠন করিতে যাইয়াই এই অবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোম্‌ত সমাজবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আধুনিক আমেরিকার উইল্‌নার্, লোই, গোল্ডেনওয়াইজার প্রমুখ ব্যক্তিগণ এদিকে বেশী অগ্রসর। বৈজ্ঞানিকযুগের প্রারম্ভ হইতেই এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ জড়বিজ্ঞানের বাস্তবতার বাহিরে যাহা কিছু তাহাকেই নিছক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে আরম্ভ করেন। বিজ্ঞানের অসাধারণ সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সমাজ গড়িয়া বিজ্ঞানের ফরমুলায় ইহা পরিচালন করিবার সংকল্প করেন। এই অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ মনে করিয়াছিলেন যে, কল্পিত ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ ত্যাগ করিয়া বাস্তব বিজ্ঞানের আশ্রয়ে মনুষ্য সমাজ গড়িয়া তুলিলেই ইহা প্রাচীন সংস্কারমুক্ত হইয়া প্রগতিপন্থী সভ্য সমাজে পরিণত হইবে। ইঁহারা বলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব সমাজের অতীত ইতিহাস অত্যাচার উৎপীড়ন ও কুসংস্কারপূর্ণ, কাজেই বিজ্ঞানের যুক্তিবিচার ও বাস্তবতাই এই সকল দোষ দূর করিয়া আদর্শ সমাজ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম। স্বনামপ্রসিদ্ধ রেনন্, বার্থেলট্ প্রমুখ চিন্তানায়কগণ প্রচার করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান মানুষের সকল সুবিধা বিধান করিতে পারে এবং বিজ্ঞান সহায়ে এমন আইন প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে যে, কোন মানুষ ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই ভাবে ভাবান্বিত ব্যক্তিগণ বিশ্বমানবের সকল বিভাগ বৈজ্ঞানিক আদর্শে পরিচালন করিবার সংকল্প করেন। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে সভ্য দেশসমূহে এই শ্রেণীর একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্য এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশ্ব-রাষ্ট্র সংঘ (League of Nations) এবং নানা প্রকার আইন ও প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি সুসভ্য দেশের রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিণতি দেখিয়া অধুনা সকলেই এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভ্রম বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছে। আধুনিক সভ্যজাতিসমূহের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের অপেক্ষাও একটী

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী জাতির স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ এই যুদ্ধ নিবারণের কারণ না হইয়া বরং ইহার সহায়ক হইবে।

দুর্ব্বলের বিনাশ ও শক্তিমানের উদ্বর্ত্তনবাদী নিট্‌জে বলিয়াছেন যে, মানবসমাজে শাসকের শক্তি ও শাসিতের বশ্যতা নামক দুইটি নীতি আছে। তাঁহার মতে শাসিতকে বশে রাখিবার জন্য শাসকের শক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা আছে। অধুনা খৃষ্টান জাতি সমূহ প্রেমাবতার খৃষ্টের উপদেশ ত্যাগ করিয়া সভ্যতার আবরণে নিট্‌জের উপদেশই পালন করিতেছে! নিছক জড়বিজ্ঞানের আশ্রয়ে মানুষের জীবন পরিচালন করিবার উদ্দেশ্যে জড়বাদিগণ প্রচার করিলেন যে, মানুষ একটী স্বয়ংসচল যন্ত্র মাত্র! চেতনা প্রাণ মন প্রভৃতি পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ ও বিয়োগজনিত গতিমাত্র! ফ্রয়েড, য়্যাড্‌লার্, ম্যাক্‌ডুগাল প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মানুষ তাহার নির্জ্ঞান সংস্কারের দাস এবং এই সংস্কার প্রধানতঃ কামমূলক। মানুষের প্রীতি প্রেম দয়া প্রভৃতি কামের অভিব্যক্তি। জগতের সভ্য জাতিমাত্রেরই পরিচালকগণ তাঁহাদের স্বদেশবাসীদিগকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ভোগে সমর্থ করিয়া তুলিবার জন্য এই সকল মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম "মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি" আখ্যায় নিন্দিত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে ইন্ধন পাইয়া মানুষের ভোগের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সভ্যজাতি ভোগের পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিল এবং জগতের সকলকে বঞ্চিত করিয়া ব্যক্তি তথা দেশগত ভোগের চরম উৎকর্ষ সাধনই সকলের একমাত্র লক্ষ্য হইল। এইরূপে ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আজ তাহারা বারুদের স্তূপের উপর উপবিষ্ট! যে কোন সময় একটু অগ্নি সংযোগ হইলেই তাহাদের জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতার জতুগৃহ যে ধ্বংস হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইহাতে স্পষ্ট যে, ভোগের আতিশয্য বা ভোগকে মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার অসমর্থতাই আধুনিক সভ্যতার অধঃপতনের মূল কারণ। বিজ্ঞানের যুক্তি অথবা কোন রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক মতবাদ মানুষের ভোগকে মহদাদর্শে পরিচালিত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যে পর্য্যন্ত ব্যক্তি বা জাতির বিশ্বগ্রাসী ভোগের প্রবৃত্তি প্রশমিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সকল যুক্তি ও মতবাদের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া মানুষ তাহার স্বার্থ চরিতার্থ করিবেই। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান মানুষের ভোগকে "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম, একমাত্র প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাই মানুষের বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয়—"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্", 'ত্যাগবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ভোগ কর, কাহারও ধনে আশা করিও না।' এইভাবে ভোগ করার জন্যই চীন ও ভারতের সভ্যতা আজও জীবিত এবং ইহার অন্যথাচরণের জন্যই গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাও ধ্বংসোন্মুখ। গত সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের এক সভায় বিখ্যাত দার্শনিক স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রতীচ্য সভ্যতার অধোগতির কারণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম সংযম অহিংসা সহিষ্ণুতা ত্যাগ প্রভৃতির অনুশীলনের মধ্যে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ সামর্থ্য নিহিত আছে। যে মানুষ বা জাতি এই সার্ব্বজনীন গুণসমূহকে অবহেলা করে, সে মানুষ বা জাতি দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে না। কেবল অর্থনীতিক উন্নতি, রাষ্ট্রনীতিক দক্ষতা ও ভোগের প্রাচুর্য্য দ্বারা কোন

জাতির মহত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। এ গুলি মানুষের দৈহিক অভাব কতকটা দূর করিতে পারে বটে কিন্তু মনের ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। পক্ষান্তরে এগুলি যদি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার ও পরস্বাপহরণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহারা যে মানুষকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য মানুষ ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্ম সংযম অহিংসা ত্যাগ সাধুতা মৈত্রী করুণা প্রেম পরার্থপরতা প্রভৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই আধুনিক সভ্যতা তাহার অধঃপতন আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ধর্ম্ম মাত্রই এই মহৎগুণসমূহের সম্যক্ বিকাশ করিয়া মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব পরিব্যক্ত করিতে উপদেশ দিতেছে। বেদান্ত বলে—যাহা মানুষের আভ্যন্তরীণ দেবত্ব বা ব্রহ্মভাব পরিব্যক্ত করার সহায়ক তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা ইহার পরপন্থী তাহাই অধর্ম্ম। এই যুক্তিপূর্ণ দর্শন মতে আত্ম-হিসাবে সকল মানুষ এক ও অভেদ; সুতরাং অপরকে হিংসা করা বা অপরের অনিষ্ট সাধন করা আর আপনি আপনাকে হিংসা করা বা আপনি আপনার অনিষ্ট বিধান করা একই কথা। সর্ব্বধর্ম্মসার বেদান্তের এই লোককল্যাণকর মহান্ আদর্শে বিজ্ঞান তথা আধুনিক সভ্যতা নিয়ন্ত্রিত হইলে ইহা সকল দোষমুক্ত হইয়া মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। পৃথিবীর শিক্ষিত নরনারীর জীবনের দার্শনিকতাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অদৃশ্য ভিত্তি। জড়বিজ্ঞানের নির্দ্দেশে বিশ্বময় শিক্ষিত মানুষের জীবনের দার্শনিকতা বা আদর্শ ভোগসর্ব্বস্ব হইয়াই আধুনিক সভ্যতা শত সমস্যা বিড়ম্বিত এবং মানব জাতির অকল্যাণের আকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সভ্য দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, যদি জড়বিজ্ঞানের নির্দ্দেশিত দার্শনিকতার স্থলে বেদান্তবেদ্য একত্ব অভেদত্ব ও অদ্বৈতের দার্শনিকতা মানুষের জীবনের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে আধুনিক সভ্যতা সকল সমস্যা সমাধান করিয়া মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারে। প্রতীচ্য জড়সভ্যতার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ভারত হইতে সমানীত আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের মুক্তি নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত।" যুগ চিন্তানায়ক স্বামীজির এই ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতিধ্বনিরূপে জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইদানীং বলিতেছেন যে, অতিশীঘ্র বিশ্বব্যাপী একটী প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে আধুনিক জড়বাদসর্ব্বস্ব সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং ইহার স্তূপের উপর বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের সামঞ্জস্যে এক সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সভ্যতার বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিবে। জগতের সভ্য জাতিসমূহের বর্ত্তমান বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থা এই অভিমতই সমর্থন করে।

অভেদদৃষ্টি

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর উদ্ধবের নিকট গুণ ও দোষের লক্ষণ বর্ণনা করিতে করিতে অবশেষে বলিলেন—

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশি দোষো গুণ স্তূভয়বর্জ্জিতঃ॥

হে উদ্ধব, গুণ ও দোষের লক্ষণ আর বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা কি? তোমাকে এক কথায় গুণদোষতত্ত্ব উপদেশ করিতেছি, শোন। গুণ ও দোষের ভেদদৃষ্টিই বস্তুতঃ দোষ এবং গুণ দোষের ভেদ অতিক্রম পূর্ব্বক অভেদ ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভই যথার্থ গুণ। বৈষম্যদর্শনই দোষ, সমদর্শনই গুণ। বৈষম্যদৃষ্টি হইতেই যাবতীয় দোষের উৎপত্তি, সমদৃষ্টিই সকল গুণের উৎস। ভগবান্ উদ্ধবকে সর্ব্বপ্রকার ভেদদৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক সমদর্শী হইতে উপদেশ দিলেন। সমদর্শিত্বে প্রতিষ্ঠালাভই ব্রাহ্মীস্থিতি, ইহাই নির্দ্দোষ জীবন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও এই উপদেশই প্রদান করিয়াছেন।

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

সাম্যে যাঁহাদের মন স্থিতিলাভ করে, তাঁহারা এই দেহে এই জগতে অবস্থান করিয়াও সৃষ্টিকে জয় করেন। সৃষ্টির ঊর্দ্ধে নিত্য সত্য নির্দ্দোষ আনন্দময় রাজ্যে বিহার করেন। ব্রহ্মই বস্তুতঃ সমস্বরূপ, এবং সমস্বরূপ ব্রহ্মই দোষগন্ধবিহীন। ব্রহ্মভাবই সাম্য—ব্রহ্মভাবের মধ্যে গুণদোষের, ভালমন্দের, উচ্চনীচের হেয় উপাদেয়ের কোন ভেদবুদ্ধি নাই। এই সমদৃষ্টির ভূমিতে যাঁহারা স্থিতি লাভ করেন তাঁহারা বস্তুতঃ ব্রহ্মেই স্থিতি লাভ করেন, তাঁহারা সাংসারিকী স্থিতি অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রাহ্মীস্থিতিতেই প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা বাহ্যতঃ এই বৈচিত্র্যময় জগতে বাস করিয়াও অন্তরে অন্তরে অদ্বৈত সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মেই বিহার করেন, তাঁহারা ব্রহ্মদৃষ্টিতে সব দর্শন করেন। ব্রহ্মশ্রুতিতে সব শ্রবণ করেন, সর্ব্ববিষয়ের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করেন।

উদ্ধবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভেদদৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া গুণদোষের বিচার না করিয়া জীবন সম্ভব হয় কিরূপে! মানবজীবনের যত প্রকার ব্যবহার, ভেদদৃষ্টিই ত তাহার ভিত্তি। মিথ্যা বর্জ্জন পূর্ব্বক সত্যের অনুসন্ধান, অমঙ্গল পরিহার পূর্ব্বক মঙ্গললাভের প্রচেষ্টা, কুৎসিত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যাস্বাদনের আগ্রহ, দুঃখ নিরাকরণ পূর্ব্বক আনন্দ সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা, পাপ নিরসন পূর্ব্বক পবিত্রতাময় জীবন প্রাপ্তির ইচ্ছা, ইহাই ত মানবজীবনের মানবীয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের নিয়ামক। মানুষ যদি কোন ক্ষেত্রে দোষ দর্শন এবং কোন ক্ষেত্রে গুণ দর্শন না করে, তাহার বিচারে যদি কোন বস্তু নিন্দনীয় ও কোন বস্তু প্রশংসনীয় না থাকে তবে তাহার বর্জ্জনীয়ও কিছু থাকে না, আকাঙ্ক্ষণীয় ও কিছু থাকে না। তাহার পক্ষে নিষিদ্ধও কিছু থাকে না, বিহিতও কিছু থাকে না; অর্থাৎ তাহার পুরুষকার প্রয়োগেরই কোন ক্ষেত্র থাকে না। কিন্তু একথা ত সর্ব্ববাদিসম্মত যে, পুরুষকারই মানুষের মনুষ্যত্ব। পুরুষকারবিহীন জীবন মানব জীবন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। গুণ দোষের ভেদদৃষ্টি ছাড়িয়া দিলে মানুষের বিচার বুদ্ধিকেই ছাড়িয়া দিতে হয়। এবং মানবেতর প্রাণীর ন্যায় প্রকৃতির হাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক

নির্ব্বিচারে নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বাহ্য জগতের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মভোগ-প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে হয়। এরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীন, আদর্শ-বিহীন, বিধিনিষেধবিহীন জীবন কি মনুষ্যোচিত জীবন? বেদাদি সব শাস্ত্রই ত ইহাতে নিরর্থক হইয়া পড়ে। গুরুশিষ্যাদি সম্বন্ধ ও অর্থবিহীন হয়, সমাজে শাস্তি পুরস্কারাদিরও কোন হেতু থাকে না, ভক্তি শ্রদ্ধা মান মর্য্যাদারও কোন ক্ষেত্র থাকে না। মানবীয় সাধনার সকল বিভাগই ভেদদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভেদদৃষ্টি মিথ্যা হইলে মানবীয় সাধনাই মিথ্যা, সকল উপদেশই মিথ্যা। সুতরাং ভগবানের এই উপদেশের অর্থ কি?

বস্তুতঃ ভেদদৃষ্টি দ্বারাই এই সংসার নির্ম্মিত,— ভেদ দর্শনই সংসার, ভেদদর্শিত্বই সংসারিত্ব। মানুষের সাধন জীবন এই সংসারেরই অন্তর্ভুক্ত। ভেদদৃষ্টি ব্যতীত যে মানুষের কোন সাধনাই সম্ভব নয়, মনুষ্যোচিত জীবনধারণই সম্ভব নয়, ইহা খুবই ঠিক। গুণ ও দোষের সুষ্ঠু বিচার করিয়া, দোষ-দুষ্ট পথ পরিহার পূর্ব্বক গুণগরিমাময় পথে মানুষের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ভোগ-শক্তিকে পরিচালিত করাই মনুষ্যোচিত জীবন। কিন্তু এই পথের শেষ কোথায়? কোথায় পৌঁছিলে চলার বিরাম হয়, মনুষ্যজীবনের সম্যক্ কৃতার্থতা হয়, তাহার কর্ম্মশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ভোগশক্তি পরিপূর্ণ চরিতার্থতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়? মানবজীবনের চরম আদর্শ কি?

যতদিন মানবীয় অনুভূতির ক্ষেত্রে গুণ ও দোষ উভয়ই বিদ্যমান, ততদিনই তাহার হেয় ও উপাদেয় আছে, বর্জ্জনীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় আছে, অপ্রিয় ও ও প্রিয় আছে, অকরণীয় ও করণীয় আছে; ততদিনই তাহার জীবনে অশান্তি ও দুঃখ আছে, অভাব ও অপূর্ণতা আছে, কর্ম্মশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ভোগশক্তির তাড়না আছে, 'আরো চাই' 'আরো চাই' আছে; ততদিনই তাহার পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, আদর্শের প্রেরণা আছে, পথ-চলার আবশ্যকতা আছে; ততদিনই মানুষ সংসারী, সংসার-পথে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান। অভাব অপূর্ণতা দুঃখ তাপ অশান্তি যখন সংসারিত্বের নিত্য সহচর, তখন সংসারিত্বকেই দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আবার, গুণ ও দোষের ভেদদর্শনই যখন সংসার, তখন এই ভেদদর্শনকেই দোষ বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

সকল অভাব অভিযোগ হইতে, সকল দুঃখ-তাপের জ্বালা হইতে, সকল অপূর্ণতা অতৃপ্তি ও অস্বস্তির অনুভূতি হইতে, জীবনকে মুক্ত করিতে হইবে, সুতরাং গুণদোষের ভেদদৃষ্টি অতিক্রম পূর্ব্বক অভেদ দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে। ভেদ-দৃষ্টি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এই ভেদদৃষ্টি লইয়াই মানুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই ভেদদৃষ্টি অবলম্বনেই মানুষের যাবতীয় কর্ম্ম জ্ঞান ও ভোগের সাধনা। কিন্তু এই ভেদদৃষ্টি অতিক্রম করা সম্ভব না হইলে, চিরকাল অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-তাপ, অপূর্ণতা অতৃপ্তি ও অশান্তি লইয়া জীবন যাপন করাই তাহার অখণ্ডনীয় ললাটলিপি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষ চিরকাল শান্তির অন্বেষণই করিবে, কিন্তু শান্তিলাভ তাহার ভাগ্যে নাই, চিরজীবন তাহাকে পথেই চলিতে হইবে, কিন্তু গন্তব্যধামে উপনীত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ অপূর্ণতা অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে চলিতে থাকাই যাহারা মানুষের পক্ষে অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়তি বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা নিয়তিবাদী (fatalist) ও দুঃখবাদী (pessimist)। কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা কোনক্রমেই ইহা স্বীকার করিতে রাজী নয়। ইহা স্বীকার করিলে পুরুষকারের প্রেরণারই অভাব হইয়া পড়ে, সাধনার উৎসই রুদ্ধ হইয়া যায়, পথে চলার উৎসাহই নষ্ট হইয়া যায়, জীবন বিষাদময় হইয়া পড়ে। মানুষের অন্তরাত্মা ঘোষণা করে যে, পরি-

পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি, ও পরাশক্তি তাহার সাংসারিক জীবনের চরম আদর্শ, এই আদর্শ জীবনে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার লইয়া সে এই সংসারে আবির্ভূত হইয়াছে, পুরুষকার দ্বারা তাহার জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও ভোগশক্তিকে সম্যক্ কৃতার্থতামণ্ডিত করিবার সামর্থ্য তাহার ভিতরে বিদ্যমান। এই সহজ প্রত্যয় আছে বলিয়াই মানুষের সাধনা আছে, মানুষ উৎসাহের সহিত পথে চলিতে পারে।

স্বয়ং ভগবান্ গুরু ও শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকট করিয়া মানুষের নিকট ঘোষণা করিতেছেন যে, সত্য সত্যই মানুষের চলার বিরাম আছে, তাহার পুরুষকারের সম্যক্ কৃতার্থতা আছে, সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের অনুভূতি হইতে তাহার আত্যন্তিক বিমুক্তিলাভ আছে, সুনিয়ত সাধনার ফলে তাহার নিত্যসত্য পরমানন্দ পদে চিরপ্রতিষ্ঠা আছে, শান্তিবিহীন সাংসারিকী গতির ভিতর দিয়া পূর্ণশান্তিময়ী ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে তাহার জন্মগত অধিকার আছে, জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও ভোগশক্তির সমুচিত ব্যবহার দ্বারা পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপে, পরিপূর্ণ মঙ্গলস্বরূপে, পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সামর্থ্য তাহার অন্তরাত্মার ভিতরে নিহিত আছে। ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া মানুষকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহার অন্তর্জ্জীবনের নিত্য আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ কল্পিত নয়, ইহা সত্য, নিঃসন্দিগ্ধরূপে সত্য, ইহাই তত্ত্বতঃ পরম সত্য। তত্ত্বতঃ যাহা সত্য, তাহাই মানুষের সংসারিক জীবনের সম্মুখে উজ্জ্বলতম আদর্শ, এবং সেই সত্য মায়া দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে বিচিত্র রূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে, তাহাই তাহার অবিদ্যা-কলুষিত জ্ঞানের নিকটে বাস্তব তথ্য। এই বাস্তব তথ্যসমূহের ভিতর দিয়া তাহাদের অন্তরালস্থিত যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টাই মানুষের সাংসারিক জীবনের সাধনা। এই সাধনার ক্ষেত্রে গুণ ও দোষের ভেদ আছে, হেয় ও উপাদেয়ের ভেদ আছে, বিধি ও নিষেধের ভেদ আছে, পুণ্য ও পাপের ভেদ আছে, সুখ ও দুঃখের ভেদ আছে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের ভেদ আছে। কিন্তু এই ভেদ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যেই সাধনা, ভেদবর্জ্জিত দৃষ্টির প্রতিষ্ঠাকেই সাধনার সিদ্ধি, তাহাতেই সাংসারিকী গতি হইতে বিমুক্তি, তাহাতেই পরিপূর্ণ শান্তিও আনন্দ আছে।

এই আপাতভেদ বহুল জগতে অভেদ দৃষ্টি লাভ করিবার উপায় জ্ঞান কর্ম্ম ও ভোগকে যোগে পরিণত করা। মানুষের জ্ঞানশক্তি যখন এক অদ্বিতীয় সুমহান্ স্বপ্রকাশ সত্যকে কেন্দ্র করিয়া, সেই সত্যেরই বিচিত্র প্রকাশরূপে বিশ্বের যাবতীয় স্থাবরজঙ্গম স্থূলসূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে দর্শন করে, মানুষ যখন আপনাকে ও আপনার জ্ঞান-বিষয়ীভূত প্রত্যেক ব্যক্তি বস্তু ও ব্যাপারকে একই সত্তায় সত্তাযুক্ত, একই চৈতন্যে প্রকাশিত, একই আনন্দরসে সঞ্জীবিত বলিয়া অনুভব করে, তখনই তাহার জ্ঞান যোগে পরিণত হয়। বিযুক্ত জ্ঞানেই বহুর খণ্ড দর্শন হয়, ইন্দ্রিয়গোচর বিচিত্র বিষয়ের পরস্পর সম্পর্কে বিবিধ ভেদসমূহ তাহাদের আভ্যন্তরীণ সত্তাগত তাত্ত্বিক অভেদকে আচ্ছাদিত করিয়া জ্ঞানশক্তিকে বিভ্রান্ত করে। যোগযুক্ত জ্ঞানে সেই আবরণ উন্মোচিত হয়, সকল আপাত ভেদের মধ্যেই তাত্ত্বিক অভেদ আত্মপ্রকাশ করে, বিচিত্র বহু এক অখণ্ড সত্তারই লীলাবিলাসরূপে পরিদৃষ্ট হয়, 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে' তাহাতেই এক সচ্চিদানন্দময় তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। আপাত বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগতের আদিতে মধ্যে ও অন্তে বস্তুতঃ এই একই তত্ত্ব বিদ্যমান। ইহাই পরম সত্য। স্বভাবতঃ ভেদদর্শী মানুষের পক্ষে এই সত্য জীবন সাধনার আদর্শরূপে গ্রহণীয়। গুরু, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের নিকট হইতে এই পরম সত্যের পরিচয় লাভ করিয়া, নিজের বহুমুখী

জ্ঞানবৃত্তি সমূহকে এই সত্যজ্ঞানের অনুগত করিতে হইবে, সকল জ্ঞানের মধ্যে এই পরম জ্ঞানকে অনুস্যূত করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক জ্ঞানকে এই তত্ত্বজ্ঞানের জীবন্ত আদর্শ দ্বারা এক সূত্রে গ্রথিত করিতে হইবে, এবং সকল প্রকার বৈষয়িক জ্ঞানের মধ্যে এই তত্ত্বজ্ঞানকে এই পরম সত্যের অনুভূতিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার অনুশীলনই জ্ঞানযোগের সাধনা এবং ইহার সিদ্ধিতেই অভেদ দৃষ্টি ও ব্রাহ্মীস্থিতি।

মানুষের ব্যবহারিক জীবন শুধু তাহার জ্ঞান-শক্তির মধ্যে নয়, কর্ম্মপ্রবণতা তাহার জীবনের অনেকখানি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং সাধনজীবনে কর্ম্মকে যোগে পরিণত করিতে না পারিলে, তত্ত্বদৃষ্টি স্থায়ীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। মানুষের কর্ম্মশক্তি মঙ্গল চায়, বুদ্ধি যাহা মঙ্গল বলিয়া ধারণা করে, কর্ম্মশক্তি সেইদিকেই ধাবিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান আবৃত থাকায়, মানবীয় বুদ্ধি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বস্তুকে মঙ্গল বলিয়া ধারণা করে এবং কর্ম্মশক্তিও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত হয়। মানুষের জানা আবশ্যক যে তাহার বাসনা কামনা ও কর্ম্মশক্তি আপাততঃ বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইলেও বস্তুতঃ তাহার পরম আকাঙ্ক্ষণীয় এক, এক পরম মঙ্গলের লাভেই তাহার সকল বাসনা কামনার পরিপূর্ণতা ও কর্ম্মশক্তির সার্থকতা, তাহার বর্ত্তমানে অনুভূয়-মান বাসনা কামনার বিষয়গুলি সেই এক অখণ্ড অনন্ত পরমানন্দময় মঙ্গলস্বরূপেরই খণ্ড খণ্ড সান্ত পরিমিত দুঃখ তাপাবচ্ছিন্ন বিচিত্র রূপ মাত্র। সেই মঙ্গল স্বরূপই তত্ততঃ সত্য, নিত্য ও স্বপ্রকাশ, এবং বিচ্ছিন্নবাসনা কলুষিত আপেক্ষিক দৃষ্টিতে যাহা কিছু হেয় বা উপাদেয় বলিয়া গণ্য, সে সকলেরই অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান। সুতরাং সেই পরম মঙ্গলস্বরূপকে পাওয়ার জন্য যত্ন করা আবশ্যক হয় না; তাঁহাকে সর্ব্বত্র সকল অবস্থার ভিতরে উপলব্ধি করা ও সেবা করার মধ্যেই মানবের কর্ম্মশক্তির সার্থকতা।

সেই মঙ্গল স্বরূপ যে কোন ব্যবহারিক মূর্ত্তিতে উপস্থিত হন না কেন, দৈন্য বা ঐশ্বর্য্যরূপে, ব্যাধি বা স্বাস্থ্যরূপে, মৃত্যু বা অমৃতরূপে, বিরহ বা মিলনরূপে, যে কোন রূপেই তিনি আবির্ভূত হন না কেন, সেইসব রূপের মধ্যেই তাঁহার স্বরূপটী চিনিয়া লইতে হইবে, তাহার মধ্যেই প্রেমের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, তাঁহার রুদ্ররূপের মধ্যেও তাঁহার দক্ষিণা মূর্ত্তির পরিচয় লাভ করিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহার নিত্যযোগ উপলব্ধি করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, সকল মানুষের মধ্যে, সকল প্রাণীর মধ্যে, পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে, সেই একই মঙ্গল স্বরূপের বিচিত্ররূপ দর্শন করিয়া, নিজের সামর্থ্যানুসারে ও ক্ষেত্রানুযায়ী প্রয়োজনানু-সারে তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কর্ম্ম শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। শিব বুদ্ধিতে সকল অবস্থাবিপর্য্যয়কে গ্রহণ এবং শিব সেবাবুদ্ধিতে সকল জীবের সেবা, ইহাই কর্ম্মযোগের আদর্শ। এ ক্ষেত্রেও গুরু, শাস্ত্র ও মহাজনদের নিকট হইতে আদর্শটী ও জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিবার কৌশলটী শিখিয়া লইতে হয়। ইহার অনুশীলনে সকল কর্ম্ম এক কেন্দ্রানুগত হয়, কর্ম্মের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এক পরম বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সকলের সেবার মধ্যে একের সেবা হয়, ফলাফলের ভেদ তিরোহিত হয়, বিভিন্ন কর্ম্মের আপেক্ষিক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমপর্য্যায় ভুক্ত হইয়া এক মহতী সিদ্ধিতে পরিণত হয়, ব্যবহারিক পরসেবা ও আত্মোৎসর্গ পারমার্থিক আত্মসেবা ও আত্মলাভের বাহ্যিক প্রকাশরূপে অনুভূত হয়। মানবজীবনে তখন ক্ষতি বলিয়া কিছু থাকে না, সবই লাভরূপে সম্ভোগ্য হয়, সমগ্র জীবন লাভময় মঙ্গলময় আস্বাদনময় হইয়া যায়।

এই প্রকার জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভোগও যোগে পরিণত হয়। মানুষের ভেদদৃষ্টি হেতুই এক ব্যক্তির ভোগের সহিত অপরের ভোগের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সংসার ক্ষেত্রে একের ঐশ্বর্য্য অপরের দৈন্যের হেতু হয়। একের প্রাবল্য অপরের দৌর্ব্বল্যের নিমিত্ত হয়, একের প্রভুত্ব অপরের দাসত্বের কারণ হয়, একের সুখ অপরের দুঃখপ্রদ হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র এক বিজ্ঞানের অনুশীলন হইলে, জগতের সকল ব্যক্তি বস্তু ব্যাপার ও অবস্থা এক সচ্চিৎশিবানন্দস্বরূপ ভগবানের লীলাবিলাসরূপে অনুভূত হইলে, সকল কর্ম্মের ভিতরে সেই এক ভগবানেরই সেবাবুদ্ধি জাগ্রত থাকিলে, ভোগের ক্ষেত্রে কোন সংঘর্ষও থাকে না, কোন অভাব-অভিযোগেরও ক্লেশকর অনুভব থাকে না, ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগ জনিত দুঃখের জ্বালাও থাকে না। বস্তুতঃ বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র সকল ব্যাপারে এক অদ্বিতীয় স্রষ্টা নিয়ন্তা ও সম্ভোক্তার নিয়ত আত্মাস্বাদন চলিতেছে। তাঁহার হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়টি মিশাইয়া দিতে শিখিলে, তাঁহার আনন্দেই নিজের হৃদয়ে আনন্দ সম্ভোগ করিতে অভ্যাস করিলে, বিশ্বের সবই আনন্দপ্রদ হয়। একের সম্ভোগেই সকলের সম্ভোগ এবং সকলের সকল ভোগের ভিতর দিয়া একেরই নিত্য সম্ভোগের প্রকাশ,—এই দৃষ্টি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল প্রকার ভোগই নিরাবিল সম্ভোগে পরিণত হয়। এক ভগবানের সম্ভোগ লক্ষ্য করিয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত হইলে সমগ্র জীবনই সম্ভোগময় হইয়া যায়।

আনন্দ সম্ভোগের যথার্থ করণ প্রেম বা ভালবাসা। যাহা ভালবাসা যায়, তাহার প্রাপ্তিতেই আনন্দ সম্ভোগ হয়। সাধারণ জীবন প্রবাহের মধ্যে প্রেম খণ্ডিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, এবং এই সব খণ্ডিত প্রেমের আবরক ও অবচ্ছেদকরূপে হিংসা ঘৃণা ভয় প্রভৃতি জড়াইয়া থাকে। সেই হেতুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও বিষয়ের সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আনন্দের আস্বাদন হয়, এবং হিংসা ঘৃণা ভয়াদির বিষয় সমূহের সংযোগে দুঃখের উৎপত্তি হয়। এই প্রেম যখন অখণ্ডভাবে সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বাধিবাস সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বময় ভগবানে অর্পিত হয়, তখন প্রেমের কোন আবরণ ও অবচ্ছেদ থাকে না, হিংসা ঘৃণা ভয়াদির স্থল থাকে না, সেই একের লীলাবিগ্রহরূপ সকলের প্রতিই ভালবাসা হয়। এই প্রেমযোগে সকল সংযোগবিয়োগের মধ্যেই সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও আনন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে। তখন হেয় কিছু নাই, ঘৃণ্য কিছু নাই, ভীষণ কিছু নাই; তখন সবই মধুর, সবই সুন্দর, সবই এক সর্ব্বসৌন্দর্য্যনিলয় সর্ব্বমাধুর্য্যমণ্ডিত পরমপ্রেমাস্পদের বিচিত্র লীলাবিগ্রহরূপে আস্বাদ্য ও সম্ভোগ্য।

মানুষের জ্ঞান কর্ম্ম ভোগ ও প্রেম যখন সমুচিত অনুশীলন দ্বারা যোগারূঢ় হয়, যখন মানুষের অন্তরে বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যের ভিতরে একের অনুভূতি, একের সেবা, একের সম্ভোগ ও একের প্রতি প্রেম সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন দৃষ্টির সম্মুখে বৈচিত্র্য জাজ্বল্যমান থাকিলেও 'গুণ দোষদৃষ্টি' তিরোহিত হয়, বৈচিত্র্যময় সংসারের মধ্যেই ঐক্যময়ী ব্রাহ্মীস্থিতি নিশ্চলা হয়।

বরিশালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্ সি

বৃহস্পতিবার, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৫

শ্রী—খুব সকালে এসেছিলেন। তিনি খুব বেশী কথা বলেন এবং অনেকে তাঁকে পাগলাটে মনে করেন। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খুব আনন্দ করেছেন, একবার কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'ভগবান পাগল ও বালকের মধ্য দিয়েই কথা বলেন।'

একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর কেহ তাঁর দর্শন লাভ করেছেন কিনা?" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ কেহ কেহ দেখেছেন।"

বিজ্ঞান মহারাজ একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ কি?" যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি চুপ করে ভাবছেন, এমন সময় অধ্যাপক শ্রী—সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে উপমা দিয়ে বললেন, "এই খেলা যদি সকলেরই জানা থাকতো যে একশত রান্ করতে পারবে, সে জিতবে তবে খেলাতে আর কোন আনন্দ থাকত না।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "কি করে বল্‌বো? আমিত আর ভগবান নই। আমি তাঁর চাকর, এক ধাপ নীচে আছি, আমি কি করে বল্‌বো।"

স্থানীয় ডাক্তার শ্রী—ধর্ম্মপিপাসুর পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিজ্ঞান মহারাজের মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "হ্যাঁ প্রয়োজন আছে।" ডাক্তার বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "দীক্ষা নিয়ে যদি ঠিক্ ভাবে কাজ না করে?" উত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "একজন জিনিষটী নিল কিন্তু ব্যবহার করে না, ইচ্ছা হলেই করতে পাবে। অপর জন ইচ্ছা হলেও জিনিষ নেই বলে ব্যবহার কব্‌তে পাববে না।"

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মূর্ত্তি পূজাকে Idol-worship বলা চলে কি না?" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "Idol-worship করবেন না, তা খারাপ, খুব খারাপ।" পরে বললেন, "মূর্ত্তি ভেবে পূজা করলে কোন লাভ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পূজা কব্‌ছি, মূর্ত্তির ভিতরে তিনি আছেন, এই ভেবে পূজা করতে হয়, মূর্ত্তি ঈশ্বর নন, তবে তিনি মূর্ত্তিতে আছেন।"

বৈকাল ৫ ঘটিকা

কলেজের আট জন অধ্যাপক এবং অন্যান্য ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ আজ স্বামীজীর সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। স্বামীজীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনাদি ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে উল্লেখ কব্‌লেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন "আমি স্বামীজীর কাছে বেশী যেতাম না। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে স্বামীজী আমাকে ডেকেছিলেন। আমি বললাম, ধ্যান করতে যাবো। তখন তিনি বললেন, 'কেমন ধ্যান করবি রে, জল কম পড়বে না ত!' "

আমরা শেষোক্ত কথাগুলি না বুঝতে পেরে বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তখন স্বামীজীর ধ্যান করার গল্পটি বললেন, "একজন লোক নূতন দীক্ষাদি নিয়েছে। তা'র গুরু তাকে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ধ্যান করতে বলেছেন। সে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে একটু ব'সে বেরিয়ে

আস্‌তেই গুরু বল্‌লেন, 'সে কিরে! এত শীঘ্র হয়ে গেল কি! অন্ততঃ এক ঘণ্টা থাক্‌তে হয়।' তখন সে আবাব ঠাকুর ঘরে ফিরে গেল, কিন্তু কিছুতেই সেখানে বসে থাকতে পারলে না। ঘরেই ব'সে, দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে লাগ্‌লো। বাইরে আস্‌বার উপায় ছিল না, কারণ গুরু বাইরেব দিক থেকে দরজা বন্ধ করে কোথায় বেড়াতে চলে গিয়েছেন। যাবার আগে বলে গিয়েছেন, এক ঘণ্টা পরে দোর খুলে দেবো। সময় আর কাটে না। লোকটি মাটীতেই খানিকটা শুয়ে কাটালো। তার পর হঠাৎ তার হাগা পেয়ে গেল, তখন অগত্যা ঐ ঘরেই কাজটি সারতে হলো। কোশায় জল ছিল কম, সুতরাং জলের অভাব অনুভব কর্‌লে। একঘণ্টা পরে গুরু এসে দোর খুলে দিতেই সে বেরিয়ে এল। তখন গুরু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কি রে, কেমন ধ্যান করলি?' লোকটি তার নিজের কথাই ভাব্‌ছিলো, বল্‌লে, "জল কম হয়েছিল!"

আমরা গল্পটি শুনে কাকে দোষী বল্‌বো ভাব্‌ছি এমন সময় বিজ্ঞান মহারাজ বল্‌লেন, "আমরা অনেকেই এই রকম ধ্যান করি।"

আমার এই কথাগুলি খুব মনে লাগ্‌লো। গল্পটি ভুলে গিয়ে মহারাজের শেষোক্ত কথাগুলি ভাবতে লাগ্‌লাম।

একটু পরে বিজ্ঞান মহারাজ বল্‌লেন, "একদিন বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় স্বামীজী আমায় ডেকে নিলেন। তার পর গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে একটা মন্দির হবে সেই কথা খুব জোর করে বল্‌লেন। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বল?" আমি বল্‌লাম, "আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন নিশ্চয় হবে।" মন্দিরের কথা বল্‌তে বল্‌তে স্বামীজীর মুখচোখ অন্য রকম হয়ে গেলো, মনে হ'চ্ছিল যেন তিনি মন্দিরটি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তার পর কিছুক্ষণ ধরে মন্দিরটির কোথায় কি রকম হ'বে তাই বল্‌তে লাগলেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করে আমাকে একটা প্ল্যান্ তৈরী করতে বললেন। স্বামীজী আবার বল্‌লেন, এ দেহটা (নিজ শরীর দেখাইয়া) ততদিন থাকবে না তবে আমি উপর থেকে দেখ্‌বো।" আমি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময় বলেছিলাম, 'স্বামীজী, আপনি উপর থেকে দেখ্‌বেন বলে'ছিলেন, তা' এবার দেখুন, আমরা কাজ আরম্ভ কর্‌ছি।' তা উনি দেখেছেন।"

শেষ কথা ক'টি শুনে' আমাদের—মহারাজ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মহারাজ, আপনি কি তখন স্বামীজীকে দেখ্‌লেন?"

বিজ্ঞান মহারাজ বল্‌লেন, "না, তা' নয়, উনি যখন বলেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই দেখেছেন।"

একটু পরে আবার বল্‌লেন, "স্বামীজী একবার ৫০ বৎসর পরে আবার আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, হয়ত আসবেন!"

এর পর বিজ্ঞান মহারাজ ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে ৺অশ্বিনী বাবুর একখানি চিত্র তাঁকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি চিত্রখানা মস্তকে স্পর্শ করেন। স্থানীয় গায়ক শ্রী—র গান শুনে খুব খুসী হয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, "স্বামীজীর গলা আরও অনেক মধুর ও দরাজ ছিল।"

শুক্রবার, ২৯শে নভেম্বর, সকাল ৮ ঘটিকা

ভক্তগণ অনেকে বসে আছেন। প্রথম শুনলাম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নানারূপ দর্শনাদির প্রসঙ্গ চলেছে। অনেকে দর্শনাদি আধ্যাত্মিক জীবনে খুব উচ্চ অবস্থার পরিচায়ক নয় বলে মত প্রকাশ করায় বিজ্ঞান মহারাজ গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন, "দর্শন figment (কেবল কাল্পনিক)ও হ'তে পারে।"

শ্রী—কিছুদিন যাবৎ 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত' ও 'গুপ্ত-প্রেশ পঞ্জিকা'র মধ্যে কোনটিতে নির্ভুল গণনা আছে তা নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি নিজে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত'র পক্ষপাতী। স্থানীয় মিশনে এবং রামকৃষ্ণ-

মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রাদিতে কেন উহার প্রাধান্য স্বীকার করা হয় না তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। বিজ্ঞান মহারাজ "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছেন সুতরাং তাঁর মতামত জান্‌বার আগ্রহে—বাবু তাঁকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বিজ্ঞান মহারাজ বল্লেন, "অনেক দিন আগে বইটা লিখেছিলাম। আমার এখন ও বিষয়ের আলোচনা নাই। আমি নিজে 'গুপ্তপ্রেশ' মেনে চলি। পঞ্জিকা সম্বন্ধে আমাদেব অধিকাংশ লোক কোনটা মেনে চলেন তা-ও দেখে চলা ভাল।" বলা বাহুল্য প্রশ্নকর্ত্তা এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নাই।

আবার একটু পরেই বিশ্বাস ও অনুরাগের কথা উঠলো। একজন ভক্ত হতাশভাবে বললেন, "অনুরাগ কই?" বিজ্ঞান মহারাজ একটু রহস্য করে বল্লেন, "তা একটু না থাক্‌লে কি আর এখানে এই সময় আস্‌তেন। তিনি যে খুব 'আপনার', তাঁকে ডাক্‌বেন, জোর করবেন, আমাদের যে হক্ রয়েছে।" সকলেই তাঁর কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুন্‌ছিলেন।

গত রাত্রিতে আমার একটি প্রশ্ন খুব মনে হয়েছিলো কিন্তু উহা বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে কেমন সঙ্কোচ হ'চ্ছিল। আজ সকালেই যে আমার জিজ্ঞাসার এমন সুন্দর সুযোগ আস্‌বে, তা' তখন ভাবি নাই। আমি সুযোগ নষ্ট হ'তে না দিয়ে জিজ্ঞাস করলাম, "ঠাকুরকে আপন ভেবে যে অহঙ্কার হয় তা কি ভাল?" প্রশ্ন শেষ না হ'তেই তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন; "আপন ভাব্‌তে গিয়ে মনে করা বুঝি ঠাকুরই হয়ে গেছি!" তাঁর হাসি দেখে সকলেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি মনে করে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌লাম। একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ গম্ভীর হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন; "তা' ও তো সাত্ত্বিক অহঙ্কার, ও ভাল", আবার হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "তিনি ত' সর্ব্বত্রই রয়েছেন, তবে হৃদয়ে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত র'য়েছেন, মস্তকেও তিনি বুদ্ধিরূপে রয়েছেন (ভ্রূমধ্যে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এর উপরে সকলের ভগবান্ এক—এর নীচে প্রত্যেকের ঠাকুর আলাদা আলাদা।" কথাগুলি শেষ ক'রেই আমার দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে বল্লেন, "অন্তর পবিত্র হ'লে,বাসনা কামনা গেলেই তিনি প্রকাশিত হবেন।" জানিনা উপস্থিত অন্যান্য সকলে এই শেষোক্ত কথাগুলি কি ভাবে গ্রহণ করলেন; আমি কিন্তু উহাকে ব্যক্তিগতই মনে করলাম, কেননা উহাতে আমার একটি সন্দেহ চলে গেল। তা'ছাড়া মহারাজের চোখের চাহনিতে আমার হৃদয়ে খুব আনন্দ অনুভব করলাম এবং সেইজন্য তাঁর সবগুলি কথা যেন অনুভব করলাম।

এরপর হঠাৎ একজন ভক্ত বল্লেন, "আপনি বলেছেন, বিশ্বাস ভিন্ন হ'বে না, কিন্তু কৈ! বিশ্বাস কৈ! বিশ্বাস ত নাই।" এই কথা শুনেই বিজ্ঞান মহারাজ গম্ভীর হয়ে দৃঢ়ভাবে বল্লেন, "ওকথা বল্‌বেন না, নাই নাই বল্লে কিছুই হয় না; আছে বিশ্বাস করা মাত্র দেখ্‌বেন সবই রয়েছে।" মহারাজের গম্ভীর ভাব দেখে ও কথাগুলি শুনে সকলে যেন কিছু সময়ের জন্য চুপ হয়ে গেলন।

—বাবু বিজ্ঞান মহারাজের একখানা ফটো তোল্‌বার অনুমতি চাইলেন। তিনি তা'তে সম্মত হ'লেন না; বল্লেন, আপনাদের জন্য আমি এক কপি পাঠিয়ে দেব।" আমাদের—বাবু বল্লেন, "এক কপিতে কি হ্‌বে? তার উচ্চারণে 'কপি' শুনাইয়াছিল। বিজ্ঞান মহারাজ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "কেন, একটা 'কপি' থেকে ত' একক্ষেত 'কপি' হয়।"

আজ সকালটা সকলেরই খুব আনন্দে কেটেছে।

বৈকাল ৫ ঘটিকা

আমরা কলেজ হইতে ফিরিয়া মহারাজের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করতেছিলাম। পাশের ঘরে

অনেক মেয়েরা তাঁকে প্রণাম কর্তে এসেছিলেন। এ' ঘর থেকে অনেক কথা শুনা যাচ্ছিল। আমাকে একজন ভক্ত বল্লেন যে জজ[১] সাহেবের স্ত্রী নাকি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মনের চঞ্চলতা কি করে যাবে?" বিজ্ঞান মহারাজ উত্তরে বলেছিলেন, "কেন, চাবুক নিয়ে শাসন করবেন।" উত্তরে নাকি জজ্ সাহেবের স্ত্রী (বাবুরাম মহারাজের ভাইঝি শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী) বলেছিলেন, "তা' মহারাজ, চাবুক ত' হাতে, মন অনেক দূরে পালিয়ে গেছে, চাবুক মারবো কাকে?" উত্তর শুনে মহারাজ খুব হেসেছিলেন। অনেকক্ষণ বসে' থাকার পর বিজ্ঞান মহারাজ নিজের ঘরে এলেন, দেখ্লাম বড় গম্ভীর।

—বাবু বল্লেন, "মহারাজ আজকে বড় ক্লান্ত।" তিনি বল্লেন, "হাঁ, দেখ্তেই ত' পাচ্ছেন। তা' আপনারা সকলে আসেন তা' কি…"(আমাদের কষ্ট হ'বে ব'লে বোধ হয় আর কিছু বল্লেন না)।

আমি নিবেদন করলাম, "মহারাজ, আপনার এখানে এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।" তিনি বল্লেন, "আমার ও ত' আপনাদের দেখ্লে আনন্দ হয়। তিনি ত' আপনাদের ভিতরেও আছেন।" আমি বললাম, "আমরা ত' বুঝ্তে পারছিনা?" তিনি কিছু বল্লেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ দুটি ঢুলুঢুলু হ'লো, হাত জোড় করে বল্লেন, "একটু দয়াটয়া রাখ্বেন,—আপনাদের দয়ার উপরই নির্ভর করি।" সঙ্গে সঙ্গে—বাবু বলে উঠ্লেন, "মহারাজ, মহাপুরুষদের বাক্য কিন্তু মিথ্যা হয় না, মনে রাখ্বেন, কিন্তু —।"

ধীরে ধীরে বিজ্ঞান মহারাজের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্ল। তিনি তখন বল্লেন, "আমি এখন একটু নির্জ্জনে বস্বো।" আমিই তখন প্রথম উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে বল্লাম, "মহারাজই ত' আমাদের মনের কথা বলে দিয়েছেন!" আমার কথা শুনে' তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটে' উঠ্ল, তিনি বল্লেন "আপনারা আনন্দে থাকুন।" তাঁর কথা শুনে' প্রণাম করতে করতে বল্লাম, "মহারাজ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাই পারি।" এই কথা শুনে' তিনি বল্লেন, "আনন্দ মানে এ' নয় যে দুঃখ আস্বেনা। দুঃখ এবং সুখে বিচলিত না হয়ে' থাকা।"

—মহারাজ বলেছেন, আজ রাত্রে বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর ৺শ্রীশ্রীজগন্মাতার দিব্য দর্শনের কথা বলেছিলেন এবং তিনি যে কাঞ্চন ত্যাগ করতে আদেশ করেন তাও বলেন। ইহার পরেই বিজ্ঞান মহারাজ ডিষ্ট্রীক্ট ইনজিনিয়ারের কাজে ইস্তাফা দিয়ে বেলুড়ে চলে আসেন। মহারাজ নাকি বলেছেন যে পূর্ব্বে তাঁর খুব ক্রোধ ছিল। ঠাকুরের ইচ্ছায় সেটা চলে গেছে; এখন বরং মনে হয় যে রাগ করলে নিজেরই কষ্ট।

শনিবার—৩০শে নভেম্বর—সকাল ৮টা।

আজ আমি এবং পাশের বাসার—বাবু এক সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি খুব হাসিমুখে গল্প করছিলেন। আমরা প্রণাম করে' বস্তেই তিনি বল্লেন, "রাত্রিতে ঘুমটুম হলো? হজম টজম?" বিজ্ঞান মহারাজের কথা শুনে আমি চমকে উঠ্লাম, কারণ তিনি এ' পর্য্যন্ত একদিনও এ'রকম প্রশ্ন করেন নাই। আরও বিশেষ কারণ এই যে গত রাত্রিতে আমি একটু ধ্যান ভজন করব মনে করে' খুব কম খেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, মধ্য রাত্রিতে উঠে' বস্ব কিন্তু আমার আর ঘুম ভাঙ্গে নাই এবং খুব বিলম্বে উঠেছিলাম।—বাবু প্রসাদাদি খুব বেশী খেয়ে' গত রাত্রিতে হজম হ'বে না মনে করেছিলেন; কিন্তু পেট খারাপ হয় নাই, অধিকন্তু তিনি রাত্রিতে উঠে' কিছু ধ্যান জপও করেছেন। আমি—বাবুর বিষয় পরে জানতে পেরেছি, সুতরাং বিজ্ঞান মহারাজের কথা শুনে' আমি মনে করেছিলাম, "ইনি ত কম 'dangerous

[১] বরিশালের তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ শ্রীযুক্ত বি, কে, বসু, আই, সি, এস্।

man' নন! উনি আমার মনের কথা কি করে' বুঝ্‌লেন।"

একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য ভিতরের বারাণ্ডায় গেলেন, কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরেই চারদিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বল্‌লেন, "আপনাদের যা' প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করুন।" অল্প সময় সকলকেই নিরুত্তর দেখে হেসে বললেন, "তবে আর কি, কারুর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই।"

ইহার পরই শ্রী—গীতায় যোগীর যে সব লক্ষণের কথা আছে তার সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। —বাবুর গীতাশাস্ত্রে কতটা শ্রদ্ধা আছে, তা দেখবার জন্যই যেন বিজ্ঞান মহারাজ একে 'interpolation' (প্রক্ষিপ্ত) বলে' নির্দ্দেশ করলেন। তখন—বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী হ'তে একটি ঘটনা বল্‌লেন, "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মাদ্রাজ অঞ্চলে একটি লোককে দেখেছিলেন। তাঁর গীতা মুখস্থ বল্‌তে বল্‌তে চোখ দিয়ে ধারা পড়ছিল। সে লোকটি সংস্কৃত জানতো না, কিন্তু অর্থ না বুঝেই কাঁদ্‌ছে কেন জিজ্ঞাসা করাতে সে লোকটি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে বল্‌লেন, "এই যে আমি ৺ঠাকুরকে সারথিরূপে উপবিষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তিনি গীতা উপদেশ দিচ্ছেন অর্জ্জুনকে।" তাঁর কথা শুনে' মহাপ্রভু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ও ঠিক বল্‌ছে।"

—বাবুর গল্প শুনে বিজ্ঞান মহারাজ বল্‌লেন, "তা' আপনার বিশ্বাস আমি ভাঙতে চাই না। বেশত, গীতায় যা' আছে তাই কর্‌বেন।" একটু পরেই আবার বল্‌লেন, "তা' গীতায় ত' সব রকমই আছে",—ব'লে' হাস্‌তে লাগলেন, তারপর বল্‌লেন: "ভ্রূমধ্যে জোর করে মনকে একাগ্র কর্‌তে গেলে অনেক বাধা উপস্থিত হয়; অনেকের মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। মস্তিষ্কের তিনটা স্তর আছে—নিম্ন, মধ্যম ও সর্ব্বোচ্চ। সাধারণ চিন্তাদি নিম্ন স্তরের—ধ্যান ধারণার ফলে মধ্যম স্তরে উঠে—উচ্চ স্তরে উঠান খুবই শক্ত। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই রয়েছেন, মস্তিষ্কে বুদ্ধিরূপে বিশেষভাবে প্রকাশিত রয়েছেন।" সকলেই নীরবে শুনছিলেন। একটু পরেই তিনি আবার বল্‌লেন, "তবে বিশ্বাস ভক্তি চাই—ভক্তি বিশ্বাস হ'লে সব easy হ'য়ে যায়। তখন আর জোর করে কিছু কর্‌তে হয় না।"

কিছু সময় চুপ করে থাকার পর বিজ্ঞান মহারাজ—বাবুর ভাই—বাবুর দিকে তাকায়ে বল্‌লেন, "এই যে আপনিও এসেছেন!" সে ভদ্রলোক তাঁর ব্যক্তিগত অশান্তির কথা এবং সকল ধর্ম্মের প্রতি—বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক বাজে কথা বলতে লাগলেন। বিজ্ঞান মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। আমরা অনেকেই বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে উঠে আস্‌লাম।—মহারাজের কাছে শুন্‌লাম,—বাবু বিজ্ঞান মহারাজকে একা পেয়ে তাঁর শ্রীচরণযুগল মস্তকে স্থাপন করে গুরু স্তবাদি করেছিলেন এবং পরদিন তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

শনিবার—৩০শে নভেম্বর—বেকাল ৪ ঘটিকা।

আমরা অনেকটা সময় বসে' থাকার পর বিজ্ঞান মহারাজ মেয়েদের সঙ্গে কথা ব'লে তাঁর নিজের ঘরে এ'লেন। অন্য দিনের মত আজও কিছুটা সময় গম্ভীর হ'য়েছিলেন।—বাবু এরপর বল্‌লেন, "মহারাজ, ঠাকুরের কথা আপনার কাছে আমরা শুন্‌তে চাই।" তিনি বল্‌লেন, "আমি আর বেশী কিছুত' জানি না, তবে আমার নিজে শুনা কথাই ত' এদের (আমাদের দেখাইয়া) বলেছি।"

কিছু সময় চুপ করিয়া থাকার পর আবার বলতে লাগলেন, "আমি যে দিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম (কলেজ

১৬-১৭), একা হেঁটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বাইরের গেটের দারোয়ানদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তারা কিছুই বল্‌তে পারলে না, বল্‌লে ভিতরে গিয়ে খোঁজ কর। ভিতরের দারোয়ানদের কাছে জিজ্ঞাসা করাতে একজন বুড়ো দারোয়ান তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলে। উত্তর দিকের দরজার কাছে গিয়ে দেখি ঘরের দুয়ার বন্ধ। সাহস ক'রে গিয়ে 'নক্' কর্‌লাম; তৃতীয়বার 'নক্' কর্‌তেই দুয়ার খুলে গেল।"—ব'লেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্‌লেন, "Knock and it will be opened."

আবার একটু পরেই বল্‌তে লাগলেন: 'এমনিত' লিখ্‌তে পড়্‌তে জান্‌তেন না, কিন্তু শিষ্টাচার কতটা ছিল! আমাকে বস্‌তে দিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, অতটা হেঁটে গিয়েছি তেষ্টা পেয়েছিল, জল খাওয়ালেন। তারপর ছোট তক্ত-পোষটিতে বসে' বল্‌লেন, "কিছু সন্দেহ থাক্‌লে জিজ্ঞাসা কর।"

"আমি তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম: ১ম—'ভগবান্ কি আছেন?' তা' তিনি বল্‌লেন—'হ্যাঁ, আছেন, তিনি সর্ব্বত্রই রয়েছেন।' 'সর্ব্বত্রই আছেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে উনি যে তক্ত-পোষটিতে ব'সেছিলেন তার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো; কাজেই ২য় প্রশ্ন কর্‌লাম, "তা'হলে কি এই তক্তপোষটিও ভগবান্?" তিনি তথনই ব'লে উঠ্‌লেন: 'হ্যাঁ এই তক্তপোষ ভগবান্, এই ঘটি ভগবান্ এই বাটি, এই ইট ভগবান্ ছাদ ভগবান্—যা' দেখ্‌তে পাচ্ছো সবই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই।"

"আমি ঐ রকম শুনে' মনে কর্‌লাম, 'তা হবে।' শেষ প্রশ্নটি হ'লো, 'ভগবান্ সাকার না নিরাকার?' তিনি বল্‌লেন, "তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে, আবার সাকার নিরাকারেরও পারে, মুখে বলা যায় না; আমি ত' সাকার সম্বন্ধে ধারণা কর্‌লাম এবং এক রকম বুঝ্‌লাম। নিরাকারও আকাশ বাতাসের মত মনে করে' খানিকটা বুঝ্‌লাম। তার পারে যে কি তা' আর তখন বুঝা গেল না। কিন্তু মশাই, তাঁর কথা শুনে আর মুখ চোখ দেখে' আর ফিরে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হ'লো না।"

কিছুটা সময় চুপচাপ থাকার পর একটু হেসে বল্‌লেন, "এবার ত' আপনাদের সবই বলে' দিলাম; আপনারা সবই জেনে' ফেল্‌লেন,—আর কি, তা' হ'লে আমার ছুটি।"

আজ এখন ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেবের (Mr. B K. Bose I C S.) বাড়ীতে যাওয়ার কথা ছিল, কাজেই আমরা সব উঠে পড়্‌লাম।

রবিবার, ১লা ডিসেম্বর—

সকাল প্রায় আটটার সময় মিশনের গেটে আমরা কয়েকজন তাঁকে প্রণাম কর্‌লাম। বিজ্ঞান মহারাজ খুব গম্ভীর ছিলেন, কিছুই বল্‌লেন না। বীর দর্পে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের ছবি খানি হাতে করে' এনে নূতন হল ঘরে বসিয়ে দিলেন। আমরা শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজিয়ে ধন্য হ'লাম। নাম্‌বার সময় তাঁর চটি জোড়া যথাস্থানে এগিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লাম। পরে মহারাজ দীক্ষাদি দিতে গেলেন।

আজ বৈকালে মিশন প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা হয়। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রী—খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন, অনেকে আশা করেছিলেন, বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন, কিন্তু তিনি—বাবুর প্রশংসা করে, তাঁর কথাগুলি মনে রাখ্‌তে অনুরোধ করে' সভার কাজ শেষ কর্‌লেন। বিজ্ঞান মহারাজ আজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রিতে মিটিং হ'য়ে যাবার অনেক পরেও তাঁকে প্রণাম কর্‌বার অনুমতি পেলাম না।

সোমবার—২রা ডিসেম্বর, সকাল ৮ ঘটিকা

উপস্থিত সকলেই মহারাজের কাছে কিছু শোনবার জন্য চুপচাপ বসে আছি। বরিশালের

ঘোড়ার গাড়ী সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লো, তারপর এক্কা গাড়ীর, থেকে থেকে লাগে বিষম ধাক্কা এবং তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শুনে আমার মনে নৈরাশ্যের একটা বিষম ধাক্কা লেগে ছিল; কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজ যখন বল্‌লেন, "এক্কা উল্‌টেও যায়", তখন আবার উৎসুক হয়ে শুন্‌তে আরম্ভ করলাম্।

বিজ্ঞান মহারাজ বল্‌লেন, "আমি একবার ৺কাশী-ধামে ৺বিশ্বনাথকে দেখেছিলাম। সেখানে সেবা-শ্রমে কি একটা Opening Ceremony ছিল। আমি এলাহাবাদ থেকে কাশী Cantonment Stationএ নেমে খানিকটা যেতেই একটা মোড়ে ত এক্কা উল্‌টে গেল। আমার পা চাকার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। পা'টাকে টেনে বের করে নিলাম, কিন্তু বেশ ব্যথা লাগল। রাত্রিতে ভীষণ জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা। আমি বিশ্বনাথকে বল্‌লাম, "আপনার জায়গায় আস্‌তেই ত আমার পায়ে চোট লাগলো অথচ যে কাজটার জন্য এসেছি, তা ও ত মন্দ নয়, এ কেমন হলো।"

"ঘুমিয়ে আছি রাত্রিতে দেখি বিশ্বনাথ এসে উপস্থিত; জটাজুট রয়েছে, গলায় সাপ জড়ান। একেবারে শুভ্র। আমাকে দেখে একটু হাস্‌লেন, আর আলিঙ্গন করবার জন্য এগিয়ে আস্‌তে লাগলেন। আমি বল্‌লাম, "না আলিঙ্গনে আর কাজ নাই; এক ত আমার পায়ে চোট লাগলো, জ্বর হ'লো আবার আলিঙ্গন! আমার এখনও বাঁচবার ইচ্ছা আছে। আপনার সঙ্গে আলিঙ্গন দিয়ে কাশী প্রাপ্ত হই আর কি!" তা তিনি শুন্‌লেন না। আস্তে আস্তে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর গা কি ঠাণ্ডা যেন বরফের মত, তা জেগে উঠে দেখি পায়ের ব্যথা ফ্যথা কিছু নাই, জ্বরও সেরে গেছে।"

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লেন, "বিশ্বনাথকে দেখেছিলাম বিরাট পুরুষ, কিন্তু জটাজুট ও সাপ জড়ান দেখেছিলাম।" আমি প্রশ্ন করলাম, "মহাদেবের কি দাড়ি গোঁফ ছিল, না ছবির মত।"

তিনি বল্‌লেন, "তা বোধ হয়, দাড়ি গোঁফ ছিল। ঐ ছবিই ত আমার মনে ছিল, তাই অমন স্বপ্ন দেখলাম। মনেরই খেয়াল বোধ হয়।"

—বাবু বল্‌লেন, "তা জ্বর ছেড়ে যাওয়াটা ত আর খেয়াল নয়।" তিনি বল্‌লেন, "তা হয়ত জ্বরটা ছেড়ে যাওয়াতেই ঠাণ্ডা লেগেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্বপ্ন দেখেছিলাম।" এর পরেই মহারাজ উঠে গেলেন।

আজ বৈকাল প্রায় ৪ ঘটিকার সময় বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের কলেজে গিয়েছিলেন। সেখানে টেনিস্ লনের একধারে তাঁকে বস্‌তে দেওয়া হয়ে ছিল। অধ্যাপকবৃন্দ অর্দ্ধবৃত্তাকারে তাঁর সাম্‌নে বসেছিলেন। কলেজ আগেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশী ছাত্র ছিল না। হোষ্টেলের ছাত্র কয়েকজন এসে তাঁর কাছে কিছু শুনতে চাইলো। তিনি তাদের সংক্ষেপে শরীর সুস্থ রাখতে, পবিত্রতা রক্ষা করতে এবং কথায় ও কাজে যথাসম্ভব সত্য পালন করতে উপদেশ দিলেন। অধ্যাপকরা কিছু বল্‌বার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি বল্‌লেন, "শ্রীশ্রীপরমহংসদেব খুব খাঁটি লোক ছিলেন, তিনি ভগবানের নাম করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন। একবার সমাধির সময় একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লার টুকরা শরীরে ঢুকে গিয়েছিলো, কিন্তু উনি তখন তা টের পান নি; পরে উহা সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বার করতে হয়।"

কলেজের ডাক্তার শ্রী—উপস্থিত ছিলেন।

—বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বল্‌লেন, "আমরা ক্রমশঃ ভালর দিকেই যাচ্ছি, যুবকরা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে ভাল হবে।"

বিজ্ঞান মহারাজকে ফল মিষ্টাদি যা খেতে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সামান্য কিছু মুখে

দিলেন। একটু পরেই উপস্থিত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেড়াতে গেলেন।

বিজ্ঞান মহারাজ, "তাঁর নাম কর, আত্মার শান্তি পাবে।" পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "What is the definition of soul?" কেহই উত্তর দিল না বলে নিজেই বল্লেন, 'Soul is immaterial Soul is beyond birth and death Soul is eternal Individual soul is subservient to the supreme Soul (পরমাত্মা)"

প্রশ্নোত্তরে বল্লেন, "প্রাণায়াম বেশী করা ভাল নয়; ৪।১৬।৮ অথবা ৮।৩২।১৬ এই পর্য্যন্ত করবে। বায়ুস্থির করে একটা ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থির হয়ে থাক্‌তাম, পরে দেখতাম মাথা খুব গরম হয়ে যায়। প্রাণায়াম দুই প্রকার—নির্বীজ ও সবীজ, সবীজ প্রণায়াম বড় শক্ত।"

"ধ্যান ধারণা যা সয় তাই করা ভাল, জোর করে বেশী করতে গেলেই মাথা গরম হয়ে যায়।"

"সব রকমই করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের উপরই নির্ভর করে পড়ে আছি। এই মনে হচ্ছে যেন তাঁদের নাম করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।" বীজমন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি বল্লেন, "হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তি সত্যি আছে। রামায়ণে যে সব বাণের কথা আছে সে সবও সত্যি।"

এর পর বিজ্ঞান মহারাজকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একদিন বেশী থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি রাজী হলেন না। তাঁর যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনিই দুইটি গল্প বল্লেন:—

"গঙ্গাধর মহারাজকে একবার রাখাল মহারাজ নৌকা করে যেতে দিলেন; কিন্তু মাঝিকে টিপে দিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ অনেক পরে ঘুমিয়ে উঠে দেখেন যে নৌকা বেলুড়ের ঘাটেই আছে। আর রাখাল মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন।"

আমি একবার বেলুড় থেকে এলাহাবাদ যাবো; কিছুতেই যেতে দেয় না দেখে হেঁটে হাওড়া গিয়ে টিকেট করে গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। পরে পরিচিত একজন লোককে দিয়ে নিজের মালপত্র আনিয়ে নিলাম।" একজন ভক্ত বল্লেন, "এখান থেকে চলে গিয়েও হয়ত বেলুড় হতে বেরুতে পাবরেন না।" তিনি বললেন, "তা ওরা আমাকে খুব চিনে, ওরা ওরকম করবে না।"

মঙ্গলবার—৩রা ডিসেম্বর—সকাল ৮ ঘটিকা

আজ মহারাজ খুব হাসিখুসিভাবে ছিলেন। আমরা সকলে প্রণাম করে বস্‌তেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন: "সারনাথে পাথরের খোদাই করা দুটী সাপ জড়িয়ে রয়েছে দেখেছিলাম। পরে স্বপ্ন দেখছি যে সমস্ত ঘরে সাপ ঘুরছে; আমি তাদের সঙ্গে কথা বলছি, তোমরা এখানে কেন? তোমাদের দূরে থাকাই ভাল, তোমরা লোকদের অযথা কামড় দেও। সাপগুলি যেন বলছে, "তা সব সময় অকারণে কেন কামড়াবো, তা ছাড়া আমরা লোকের মঙ্গলও করি।"

আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য বিজ্ঞান মহারাজ বৃন্দাবনে একজন সাধুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন: "বৃন্দাবনে খুব সাপ; আমাদের আশ্রমের একজন সাধুই সাপ দেখলে লেজে ধ'রে ঘুরিয়ে মেরে ফেলতো। তা ওরাও সুযোগ খুঁজছিল! একদিন সন্ধ্যার একটু আগে সাধুটী শৌচে বসছে, একটা খুব বড় সাপ হঠাৎ এসে মাথায় ঘাড়ে আরো কয়েকটা জায়গায় কামড় দিল। সাধুটী ঐ অবস্থাতেই সাপটাকে ধরেছিল, কিন্তু রাখতে পারলে না। খানিক বাদেই সে সাধুটী মারা গেল।"

একটু সময় চুপ করে থেকে বিজ্ঞান মহারাজ আবার বল্‌তে লাগলেন, "বেলুড়েও প্রথম যখন

কয়েকটি বাড়ী হচ্ছিল, খুব সাপ ছিল; আমাদের একজন Contractor একদিন আমাকে বল্লেন, "আসুন একটা তামাসা দেখে যান", পরে একটী আমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "ঐ দেখুন, জলে একটা গোখুরা ও একটা কেউটে জড়িয়ে রয়েছে; খুব সাবধানে দেখবেন। ওরা দেখতে পেলে কিন্তু খুব রেগে যায়; আর যেমন করেই হ'ক কামড়ে দেয়। তা সাপগুলোর খুব বড় ফণা ছিল। আমি ত ঐটী দেখে গিয়ে রাখাল মহারাজকে ঐ কথা বললাম; উনি শুনে খুব মন্দ বল্লেন। বল্লেন, কেবল সাপ যে দেখতে পেলে কামড়ায় তা নয় ওতে আধ্যাত্মিক ক্ষতিও হয়। আমি তবু তাঁকে বল্লাম, "আপনি কি দেখবেন! তা উনি বল্লেন, না, আমি আর দেখ্‌বো না। আমি বৃন্দাবনে ওরকম দেখেছি। তুমি আর দেখনা, ওতে ক্ষতি হয়।"

বৈকাল ৪।০ ঘটিকা

আমরা কয়েকজন মহারাজকে গিয়ে প্রণাম করে বস্‌তেই বললেন:

"আসুন মহাপ্রভুরা!"

—বাবু বল্‌লেন, "কই মহারাজ! আমরা ত বুঝতে পারছি না।"

তিনি হেসে বললেন, "তা মহাপ্রভুরা নিজেরা বুঝতে পারেন না।"

মহারাজ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাবার জন্য ব্যস্ততা দেখাতে লাগলেন। ষ্টীমার ছাড়বার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে ৪—৪৫ মিনিটের সময় ষ্টেশনে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা অনেকে ষ্টীমারে তাঁকে আর একবার প্রণাম করতে গেলাম। আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক সময় সামনের ডেকে বসে উপস্থিত সকলকে আনন্দে ভরপুর করে রাখলেন।

বিন্ধ্য-বাসিনী

শ্রীসাহাজী

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যৌ উৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী॥

১১। চণ্ডী—

টীকা:—শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যৌ = অন্যৌ অন্য-দেহ-প্রাপ্তৌ শুম্ভ-নিশুম্ভৌ কংস-কেশি-নামানৌ ইতি যাবৎ। তৌ নাশয়িষ্যামি = তয়োর্নাশস্য কারণং ভবিষ্যামি ইত্যর্থঃ। ১

নন্দ। বসুদেব! প্রিয় বন্ধু! বড়ো সুসংবাদ,
নিহত দুরন্ত কংস, ঘুচিলো বিষাদ।
জয়-ধ্বনি ওই শুনো, উঠিছে কুক্কুর;
শুনেছো কি, মৃত্যু হোলো কেমনে কংসের?

বসুদেব। (দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া)
বন্ধু! সখা! বন্ধু বলি না ডাকিও আর,
নহি বন্ধু, শত্রু তব আমি দুরাচার।
মনে পড়ে, একদিন অষ্টমী-নিশীথে,
শিশু-ক্রোড়ে গিয়াছিনু বৃন্দাবনে তব।
কিন্তু, কী করিনু গিয়া, পারো কি ভাবিতে,
ওগো বন্ধু? নহি বন্ধু, শত্রু আমি তব।
ভাবিলে সে-কথা, অহো ফেটে যায় বুক!
সখা! সখা! হাসি-মাখা সেই কচি মুখ
শয়নে স্বপনে জাগে নিত্য অনুক্ষণ!
ভেবেছিনু, মাতৃভক্ত, হোলেও নিঠুর,
লইবে না বালিকার ক্ষীণ সে জীবন।

১ পৌরাণিক আখ্যানগুলি আমরা মিথ্যা মনে করি, কিন্তু ঐগুলি যে ঐতিহাসিক সত্য, সে-কথা মনোযোগপূর্বক পুরাণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

নইতো না, যগুপি না বুঝাতো চানুর,—
নিহত নিশুম্ভ, শুম্ভ চণ্ডিকার ছলে ;
কন্যা হোতে নাহি ভয়, মূর্খ সে, যে বলে।
সখা ! সখা ! মহামায়া জানিও নিশ্চয়,
এসেছিলো ছলিবারে, হেন মনে লয়।
নহিলে, আমি তো তারে পাবো বলি সেথা,
ভাবিনি কো কভু। তবু—কী ক'বো সে ব্যথা ?
বন্ধু ! সে-ই বধিয়াছে কংসেরে, জানিও,
নিজপ্রাণ করি দান। সামান্য বালক
কৃষ্ণের সে কর্ম বলি' কভু না ভাবিও।
সখা ! বন্ধু ! জানো না কি, প্রচ্ছন্ন পাবক
এসেছিলো সে বালিকা জগৎ-পালিকা
রক্ষা-হেতু জগতের। জানিও সুস্থির,
কাত্যায়নী কল্যাণী সে অভয়া অম্বিকা !
স্বহস্তে করিবো পূজা ঢালি অশ্রুনীর,
মনোময়ী মূর্তি গড়ি নিত্য আমি তাঁর।
বিন্ধ্যাচল রাজ্যে মোর, জানিও এবার,
করিবো প্রতিষ্ঠা মোর বিন্ধ্যবাসিনীর।

(দেবর্ষি নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতির প্রবেশ)

নারদ। বসুদেব ! ধন্য তুমি, লহ নমস্কার।
কৃষ্ণ-লীলা-পথ করিলো যে পরিষ্কার
করি দান নিজপ্রাণ, কৃষ্ণের পূজন,
তারে না পূজিয়া অগ্রে, করিবে যেজন,
সত্য কহি, মিথ্যা হবে সে পূজা তাহার।
ইন্দ্র। তাঁর প্রতিষ্ঠার,—ভদ্র, আমি ল'বো ভার।২
বসুদেব। (প্রণাম করিয়া)
কৃতার্থ এ দাস আজি প্রসাদে সবার।
হে দেবর্ষি ! সেই পাপ কাহিনী আমার
কেহ নাহি জানে, শুধু তুমি জানো, প্রভু।
তোমারে তো কোনো কথা লুকাই নি কভু।

নারদ। মৃত্যু-হত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট লক্ষ কোটি প্রাণ,
আঘাতে আঘাতে তার, নব চেতনায়
উঠিবে জাগিয়া পুনঃ ; লভিবে সন্ধান
পুনঃ নব জীবনের। তাহারি আশায়,
কপট প্রবন্ধ করি কহিনু তাহারে,—
বাড়িছে তোমার অরি গোকুল মাঝারে !

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ধৈর্য্য ধরো, স্নেহাতুর জনক আমার !
আমি ল'বো শিরে তব পাতকের ভার ;
আততায়ি-অস্ত্র-মুখে ডালি দিয়া প্রাণ,
মৃত্যু-মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবো বিধান।

(নত জানু হইয়া)

অয়ি বৎসে ! প্রাণ-দাত্রী ভগিনী আমার !
অশ্রু-নীরে করি আজি তর্পণ তোমার।
কহো, বালা ! তব রক্তে জাগিবে কি ধরা,—
দুঃস্থ দুঃখে দয়াময়ী সর্ব্বগ্লানি-হরা ?
প্রাণাধিকে ! বৃথা জন্ম কে বলে তোমার ?
তব শুভ্র বক্ষে রাঙা সেদিন ধরণী
ধরিলো মুক্তির বীজ গরভে আপনি !
কীর্তি তব চিরদিন করিবে প্রচার,—
নিষ্পাপের পূত রক্ত বিনা অবদান,
মুক্তি-দেবী মুখ তুলি ফিরিয়া না চান।
অয়ি পুণ্যে ! পূজারিণী মুক্তি-দেবতার !
তোমার এ অগ্র পূজা, পূত আত্ম-দান
হে বালিকে, চিরদিন রহিবে অম্লান !
কৃষ্ণ-ভগিনীর ব্যথা বহিবে সংসার !
নন্দ। নাহি দুঃখ তার লাগি, দেখিনি যাহারে !
ধন্য সে বালিকা নিজপ্রাণ করি দান,
রাখিলো যে এ জাতির মুক্তি বিধাতারে।
এই মুক্তি, জানি আমি, তাঁরি অবদান !
কৃষ্ণ। ঢালিয়া সবার অগ্রে নিজ রক্ত-নীর,
করিলো যে অভিষেক মুক্তি-জননীর !
নারদ। মরিয়া অমর হয় মর্ত্ত্যের দেবতা,
পুণ্যকর্মে স্বেচ্ছায় যে করে আত্ম-দান !

২ খিল হরিবংশে। ২। বিষ্ণু॥ আছে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে গিরিশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলে শাশ্বত স্থান দান করিয়াছিলেন।

কী সৌভাগ্য, অজ্ঞান বালিকা, সে সম্মান
অনায়াসে করিল অর্জন!

কৃষ্ণ। মিথ্যা কথা।
স্বেচ্ছায় কে কবে কহো, করে কোন্ কাজ?
যার কাজ, করায় সে নিজে হাতে ধোরে'।
মারিলো যে বালিকারে, সে রাখিলো মোরে,
তারি হাতে পুন কংস মরিয়াছে আজ!
কৃতিত্ব কি কমে ইথে কহো, বালিকার?
কহো মুনি! কহো, শুনি, করিয়া বিচার,
কংস-বধে যদি থাকে কৃতিত্ব আমার?

নারদ। জয় কৃষ্ণ-ভগিনীর!

সকলে। (নত জানু হইয়া) জয় জননীর!
জয় কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রাণা বিন্ধ্য-বাসিনীর!

স্বামী শুদ্ধানন্দজী

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে—একজন তরুণ ধর্ম্মপ্রাণ যুবক আলমবাজার মঠে যাতায়াত করিতেন। তিনি তখন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নহেন কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ত্যাগোন্মুখী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত। তাঁহার সঙ্গে থাকিত সমব্রতী যুবকদল—শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সঙ্গপ্রয়াসী সাধুচরিত্র সত্যান্বেষী ও বৈরাগ্যবান। একদিন অপরাহ্ণে পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভুতানন্দের সঙ্গে ইঁহাদের আশ্রমে যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেখানে গিয়া দেখি সন্ধ্যাকালে তাঁহারা সমবেতভাবে কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করিয়া শ্রীঅদ্ভুতানন্দকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী শুনিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার আদেশে শুদ্ধানন্দজী (তখন শ্রীযুত সুধীর চক্রবর্ত্তী) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বাল্য-কালের সেই স্মৃতি এখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া—বিশেষভাবে না বুঝিলেও তখন আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত দেখা হইত—কখনও আলমবাজার মঠে, কখনও কলিকাতা গঙ্গাতীরের সন্নিকট শুদামবাড়ীতে—যেখানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কিছুদিন ছিলেন, আবার কখনও শ্রীবলরাম মন্দিরে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দ মার্কিন হইতে প্রত্যাগত হইলে শ্রীসুধীর প্রমুখ সেই তরুণের দল একে একে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক অধি-বেশনে স্বামীজীর সভাপতিত্বে একদিন শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তা কর" সম্বন্ধে দাঁড়াইয়া একটী নাতিদীর্ঘ মনোরম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলেই একাগ্র মনে তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় অভিভাষণ শুনিয়াছিলেন এবং সকলেই এই যুবক ব্রহ্মচারীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মিশনের তখন সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বলরাম মন্দিরের দ্বিতল বহির্বাটীতে প্রশস্ত হলঘরে বা তাহার সম্মুখস্থ দক্ষিণের বারাণ্ডায়। এই ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী শুদ্ধানন্দ স্বামীজী বা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্ব্বজনবিদিত শ্রীসুধীর মহারাজ নামে পরিচিত হইলেন। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই ইঁহার সৌজন্য, অমায়িকতা, সরলতা এবং সুমিষ্ট ব্যবহার ও

যুক্তিযুক্ত আলাপ আলোচনায় মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। স্বামীজী ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি মঠ ও মিশনের কার্য্যে একান্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ স্মৃতি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের সহকারী ছিল।

স্বামীজীর প্রেরণায় ও সহায়তায় যখন পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজী 'উদ্বোধন' পত্র পাক্ষিক-রূপে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেনে তখন উদ্বোধন প্রেস ও অফিস ছিল। তখন শুদ্ধানন্দজী কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখন ভুলিতে পারিবেন না। ইঁহার অসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য অধ্যবসায় এবং একান্ত আত্মনিয়োগের ফলে যে "উদ্বোধন" পাক্ষিক হইতে মাসিক পত্রে দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। একদিকে প্রবন্ধ রচনা এবং প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করা, প্রুফ দেখা, প্রেসের তত্ত্বাবধান করা অন্যদিকে প্রচারের চেষ্টা, সকল কার্য্যেই ইনি ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজীকে বিশেষ সহায়তা করিতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ সহকারী সম্পাদক হইতে ক্রমে সম্পাদক হইয়া সুদক্ষ ভাবে ইহার পরিচালনা করিতেন।

মঠেও তাঁহার অনেক কার্য্যের ভার ছিল। মঠ ও মিশনের নিয়মাবলী স্বামীজীর নিকট হইতে নির্ভীকভাবে তাগিদ করিয়া তিনিই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি মঠে আচার্য্য পদে বৃত হন এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সহিত মিশিয়া উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। কোন কাজই তিনি আধাআধিভাবে করিতে পারিতেন না। তিনি একদিকে ঢাকাতে অস্পৃশ্য জাতিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যকে সুনিবদ্ধ করেন আবার কলিকাতার মুমূর্ষুপ্রাণ বিবেকানন্দ সমিতির সংস্কার সাধন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সমিতির পরিচালনার বন্দোবস্ত করেন। বিবেকানন্দ সমিতির কার্য্যের প্রসারতার জন্য তিনি শারীরিক অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। সমিতিতে লাইব্রেরী স্থাপন ও তাহার গ্রন্থ সংগ্রহ ও পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, সদস্য নির্ব্বাচন, ঘর ভাড়া ও মাসিক চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা প্রভৃতি সকল কার্য্যেই তিনি অনলসভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত করিয়াছিলেন। আবার যখন তিনি যে কাজে হাত দিতেন সে কাজের প্রতি তাঁহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃষ্টি থাকিত, কখনও কার্য্য-ক্ষেত্রে কোন দায়িত্ব লইয়া উদাসীন থাকিতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগীর আদর্শ। কার্য্যকে তিনি ব্রহ্ম-সাধনার একাঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন এবং শুধু তাহাই নহে জন-হিতকর অনুষ্ঠানগুলিকে তিনি আধ্যাত্মিক ভাবেও সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করিতেন। কোন কাজকেই তিনি সামান্য বা হীন বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। তাই তিনি যখন যে কাজে হাত দিতেন তখন তাহাকে সফল করিতে প্রয়াস পাইতেন। যখন যে কাজে তিনি হাত দিতেন তখন তাহাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইত।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান অতুল্য। বাংলা ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের বিশেষ অভাব। স্বামীজীর ইংরাজী বক্তৃতাবলী গ্রন্থাদি ও পত্রগুলির এরূপ সুন্দর অনুবাদ তিনি করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া অনেকে সেগুলি স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এইরূপ স্বামীজীর ভাব ও ভাষাগত অনুবাদ দুর্লভ। স্বামীজীর প্রেরণা যেন অনুবাদের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সমগ্রদেশে

স্বামীজীর ভাব প্রচারে এই অনুবাদ-সাহিত্য বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারীকে এই অনুবাদ-সাহিত্যই স্বামীজীর অপূর্ব ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই অনুবাদ-সাহিত্যই বাংলার নবযুগ প্রবর্তনে সহায়তা করিয়াছে। এই অনুবাদ-সাহিত্যই সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন গঠনে উপদেষ্টার কাজ করিয়াছে। উত্তর কালে ইহা নবযুগের অত্যুজ্জ্বল আলোক সম্পাত করিবে। ইহার জন্য শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর নিকট বাঙ্গালী চিরকাল ঋণী থাকিবে।

শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর মত নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা সংসারে অতি বিরল। তিনি কোন কথা রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানিতেন না। কোন বিষয় ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম না করিলে সহজে তিনি সায় দিতেন না। এই বিষয়ে তিনি কাহাকেও খাতির করিতেন না।

বালকের মত তাঁহার হৃদয় ছিল সরল ও উদার। কোন বিষয়ই তাঁহার গোপন ছিল না। নিজের ভ্রম বা দোষ ত্রুটী স্বীকার করিতে তিনি দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার বিরাট হৃদয়ে সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। নিজে সাদা সিধা ভাবে চলিতেন। কোন ভাল জিনিষ কেহ তাঁহাকে দিলে অভাবগ্রস্তকে তাহা বিলাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুমণ্ডলীতে তিনি পুরাতন ও নবীনকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। কাহারও নিকট তিনি সম্মানের দাবী করিতেন না। কিন্তু তাঁহার ভালবাসায় সকলেরই মস্তক তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইত। কি ভক্ত কি সাধু বা ব্রহ্মচারী তাঁহাকে পরম স্নেহপূর্ণ বলিয়া, আপনার জন জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া সব বলিতেন। তাঁহার উপদেশ সকলেই শিরোধার্য্য করিতেন, পবিত্রতা ও সাধুত্বের তিনি পরিপূর্ণ আদর্শ ছিলেন। নিরভিমানতা ও নিরহঙ্কারিতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংগঠনে ও কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা মঠ ও মিশনের কল্যাণে ও উন্নতির জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। মঠ ও মিশনের দীর্ঘকাল তিনি সহসম্পাদক ও সম্পাদক ছিলেন, সর্ব্বশেষে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। শ্রীগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। বিবেকানন্দের বাণীই ছিল তাঁহার জীবনের বিশেষ প্রেরণা—বিবেকানন্দের ভাব প্রচারই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ, বিবেকানন্দের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। শ্রীবিবেকানন্দগত প্রাণ শুদ্ধানন্দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার। কারণ বিবেকানন্দের সর্ব্বস্ব ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

বৎসরাধিক পূর্ব্বে বেলুড় মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শুদ্ধানন্দ মহারাজের নিকট শুনিয়াছিলাম, "ব্রহ্মসূত্রের একটা ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করছি। খানিকটা লেখা হয়েছে। দেখছি রামানুজ ও শঙ্করে যে মতভেদ রয়েছে তার মূল হচ্চে মূল শ্লোকের পাঠান্তর। এই পাঠান্তরকে ভিত্তি করেই শ্রীরামানুজ শঙ্করকে প্রতিবাদ করেছেন। এইগুলো সব মেলাচ্ছি।"*

আজ কতদিনের কত স্মৃতিই না মনে উদিত হইতেছে। তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভে কে না কৃতার্থ বোধ করিয়াছে? শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি পদে যিনি মাত্র পাঁচ মাস পূর্ব্বে বৃত হইয়াছিলেন তিনি যে এত সহসা মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ করিবেন তাহা কে জানিত? তাঁহার মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে।

শুদ্ধানন্দের স্থূল জড় দেহ নাই কিন্তু তাঁহার জীবন ও কীর্ত্তি অবিনশ্বর ভাবিযুগে শত সহস্র নরনারীকে তাহা অনুপ্রাণিত করিবে। শ্রীগুরুর রচনার অনুবাদে শুদ্ধানন্দ অমর, মঠ ও মিশনের ইতিহাসে শুদ্ধানন্দ চিরস্মরণীয় থাকিবেন।

* দুঃখের বিষয় তিনি ঐ পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইবে। উঃ সঃ

সুফীধর্ম্ম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী

পারস্যদেশে এই নতুন উদার মতের আভাস ও প্রচার আমরা সমসাময়িক কাব্যেব ভিতর খুঁজিয়া পাই। কল্পনা, বিভ্রম, স্বপ্নবিলাস এই যুগের পারসী কবিতাকে মধুরতর কবিয়া তুলিয়াছে। আবু সৈয়দ মানুষের সহিত ভগবানেব, সৌন্দর্য্যেব সহিত মোহের সম্বন্ধের কাহিনী বলিয়াছেন। ফন্‌-ক্রোমার বলেন যে, এই যুগের কবিতার অন্তর কথা হইল পবিত্রতা, বদান্যতা, আত্মত্যাগ, আত্মসংযম। এবং তাহাই হইল চিরন্তন শান্তিলাভেব একমাত্র উপায়। তাঁহাদেব কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনের কথা; জগতের সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে ভগবানের বিকাশ। তাবপব সমস্ত সৃষ্টিই ভগবানে লয় হইবে। জালালুদ্দিন রূমী তাঁহার সুবিখ্যাত মসনবীতে গাহিয়াছেন :—

"আল্‌হাই একমাত্র সত্য (অল-হক্‌)। তিনি সমস্ত নাম ও গুণের অতীত। তিনি অজ। তিনিই সত্য, শিব, সুন্দর। সুন্দরেব ইচ্ছা হইল, তিনি প্রকাশিত হইবেন—তাই চিবসুন্দর চিবপ্রকাশ।" হাফিজ, সাদী. ওমর খৈয়ুম, সোহেলী, আনন্‌ প্রভৃতি মনীষিগণ প্রেমকে ভগবানের স্থানে আসন দিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা পার্থিব পদার্থেব আবরণে বিদেহ অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। ইরাণীয় সুফী কবিতার মধ্যে আত্মাব সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধের কথাই বেশী বলা হইয়াছে। সুফীদেব ধারণা মানব আত্মা পার্থিব পদার্থ নয়। আত্মার দৃষ্টি সর্ব্বসময়েই অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য সতত উন্মুখ। কিন্তু ইন্দ্রিয় জগৎ এই মিলনের পরিপন্থী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাধাব ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে মানবাত্মাকে সমাধিস্থ হইতে হইবে। এই সমাধিই পারসীয় সুফীদের কামনাব ধন।

ক্রমশঃ সুফীগণ পারস্যে আব এক নতুন তথ্যের সন্ধান পাইলেন "**গুরুবাদ**।" আবব হইল সেমিটীক, পারস্য হইল আর্য্য; সেমিটীক মতে ভগবান স্বশবীরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। কোন দূত প্রেরণ করেন, ভগবানেব বাণী প্রচার করিতে, যেমন আমবা পাই যীশু ও মহম্মদেব প্রচাবের মধ্যে। কিন্তু আর্য্য মতে ভগবান নিজে রূপ গ্রহণ করেন—এবং অবতাররূপে দৃশ্যজগতের সঙ্গে অদৃশ্য জগতেব সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এই আর্য্য অবতাববাদ পারস্য-দেশে ইসলামকে প্রবুদ্ধ কবিল। পারস্যেব সুফী সম্প্রদায়ের ভিতর "পীর-মুরিদ" (গুরু-শিষ্য) বাদ প্রতিষ্টিত হইল। পারস্যে শিয়াধর্ম্মের বিশেষ প্রচলনের অন্যতম প্রধান কারণ আর্য্য গুরুবাদের স্থিতি।

সর্ব্বেশ্বরবাদী ইবাণীয় প্রাণেব ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল পরমাত্মাব সহিত মানবাত্মার মিলন। ইরা-ণীয় মনের বিশ্বাস ছিল—এই মিলন করিয়া দিতে গুরুই একমাত্র সক্ষম। ভগবানের সান্নিধ্যলাভের সহজ পন্থা একমাত্র গুরুই জানেন, কেন না তিনি সেই সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন। এই গুরুবাদের প্রভাব আমরা হাফিজের কবিতার ভিতর পাই :—

"তোমাব প্রার্থনা মন্দির সুরায় ডুবাইয়া দেও —*যদি গুরু আদেশ দেন।*

গুরুই জানেন তোমার লক্ষ্য কি আর পথ কি ?” গুরুর আদেশে মুসলিম কোরাণের নির্দ্দেশিত নিতান্ত ঘৃণ্য সুরাও গ্রহণ করিতে পারে। এই বাণীর ভিতর দিয়া সুফী মতবাদের মধ্যে গুরুর বিরাট স্থান আমরা দেখিতে পাই। কোরাণের বাণীর ঊর্দ্ধে স্থান পাইল গুরুর বাণী। কালক্রমে ইরাণে আল্লাহে্র অর্চ্চনা পার্শ্বে গুরুর অর্চ্চনা স্থান পাইল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে যখন পারস্য ও ভারতের পরোক্ষ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল, তখন আমরা ইরাণীয় গুরুবাদের পূর্ণ পরিণতি দেখিতে পাই।

পারস্য ও ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়া ভারতের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ চলিয়াছিল। কতকটা বাণিজ্য ব্যপদেশে, কতকটা রাজনৈতিক কারণে। মহম্মদ বিনকাসিম কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয় ও পরবর্ত্তী চল্লিশ বৎসরের আরব শাসন রাষ্ট্রের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা না হইলেও সমাজ এবং কৃষ্টির দিক দিয়া বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বটে। সিন্ধুদেশে ভৌগোলিক অবস্থান বশতঃ একাধিক জাতি ও সভ্যতার মিলন স্থল ছিল। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ সিন্ধুদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মকে বিশেষ ভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ সিন্ধুবাসীর উপর অদ্বৈতবাদ খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আরব শাসন সিন্ধুদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও মুসলিমগণ আরবে ফিরিয়া যায় নাই। বহু আরবী সিন্ধুদেশে বাস করিতে লাগিল। মুসলিমগণ তাহাদের সহজবোধ্য নীতিবাদ দ্বারা সাধারণ সিন্ধুবাসীকে প্রভাবান্বিত করিল। ক্রমশঃ ইসলাম শঙ্করের অদ্বৈতবাদের স্থান অধিকার করিল। এই যুগের সিন্ধুদেশীয় মুসলিমগণের লেখার ভিতর দিয়া শঙ্করের বেদান্তবাদের বহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আভাস পাওয়া যায়। ফিরোজ, লাল শাহ, বাহ্‌লুল প্রভৃতির মুসলিমদের লেখা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারাও তদানীন্তন ভারতীয় ভাব ধারায় বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ বিনকাসিমের পর প্রায় ২০০ বৎসর ইসলাম ভারতের রাষ্ট্র আক্রমণ করে নাই। অন্যদিকে ভারতবর্ষই পারস্যের ভিতর দিয়া ইসলামের চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আব্বাসীয় যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া খলিফা মনসুর, হারুণ-অল-রসিদ প্রভৃতি মহামনা ব্যক্তিগণ ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে আরবীয় চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করিলেন। সংস্কৃত যোগশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া ইসলাম তৃপ্ত হইল। অল্‌বেরুণী এই প্রচেষ্টাকে তাঁহার সংস্কৃত চর্চ্চা দ্বারা বিশেষ করিয়া মুসলিম জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়াছিলেন। এই যুগের ইতিহাসের দিক বিচার করিলে দেখা যায় যে যখন ভারতের উন্নততর চিন্তাধারা আরবীয় ইসলামকে নতুন ভাবে প্রবুদ্ধ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই নাতিসভ্য তুর্কগণ ইসলাম জয় করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যএশিয়ার ইতরভাব প্রচার করিতেছিল। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভারতে অর্দ্ধ মুসলিম তুর্ক আফগান জাতি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। তাহাদের নিজস্ব কৃষ্টি ভারতের বিরাট কৃষ্টিকে প্রবুদ্ধ করিবার মতন মহান্ ছিল না। তাই মধ্যএশিয়ার তুর্ক আফগান মুসলিম বিজেতৃগণ হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব হইতে বহুদিন দূরে সরিয়া থাকিতে পারে নাই। আমির খসরু, মালিক মহম্মদ জায়সী, কবির, কামাল প্রভৃতি মুসলিম ভাবুকগণের লেখার মধ্যে হিন্দু-ভাবধারা বিশেষভাবে জড়াইয়া আছে। এই যুগের বহু দরবেশ, আউলিয়া এবং মুসলিম সাধুদের জীবনী আলোচনা করিলে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব বুঝা যায়। অপর দিক দিয়া মৈনুউদ্দিন চিস্তী, স্নেকোমুদ্দিন, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার স্থান ভারতের মধ্যযুগের কৃষ্টির ইতিহাসে খুব ক্ষুদ্র নহে।

এই সমস্ত সাধু মহাপুরুষগণ ক্রমশঃ তাঁহাদের চরিত্রগুণে ও ধর্ম্মজীবনের আকর্ষণে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যমন সাধারণতঃ ব্যাক্তত্বের পূজা করিয়া তৃপ্তি পায়। তার উপর শতাব্দী ব্যাপী একত্র বসবাসের ফলে হিন্দুর মুসলমানের প্রতি সহজ উষ্মা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। হিন্দুগণ মুসলিম সাধুদের সঙ্গলাভ করিতে লাগিল। উভয়েই পরস্পরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইল। এই যুগের হিন্দু-মহাপুরুষ রামানন্দ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির জীবনী আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে তাঁহাদের অনেকে মুসলমানের ভাবধারায় ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামের ভিতর একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। মুসলমানের বিশ্বাস ছিল যে মহম্মদের হাজার বৎসর পরে ইসলামকে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন অথবা সংস্কার করিতে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন। নাম হইবে অল্ মাহাদী। এই মাহাদী আন্দোলন বাদকস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছিল। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনটী উদার ভাবধারা তিন দিক হইতে সমভাবে ভারতীয় সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। সিন্ধুদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করিয়া একটী উদার পন্থা উত্তর-ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। সেই উদার পন্থার অগ্রদূত ছিলেন—লালশাহ, ফিরোজ, বাহ্লুল। দ্বিতীয় ধারা বাদকস্থান হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতে প্রচারিত হইতেছিল—বায়জিদ, সলিমশাহ প্রভৃতি মাহাদীয় ভাবে বিশেষভাবে অনুসিক্ত ছিলেন। তৃতীয় ধারা ভারতের নিজস্ব। কবির, কামাল, জায়সী, চৈতন্য, নানক, দাদু, একনাথ, রামদাস প্রভৃতি নতুন প্রেরণায় সমস্ত ভারতবর্ষকে অনুরঞ্জিত করিতেছিলেন* ষোড়শ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকে এই ত্রিধারা মধ্য-ভারতে আসিয়া মিলিত হইল—যাহার পরিণতি আমরা দেখিলাম—সম্রাট আকবরের প্রতিষ্ঠিত "দীন্-ইলাহি" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনে। আকবরের আবির্ভাব সিন্ধুর মরুভূমিতে, হিন্দুর গৃহে, তুর্কী পিতা, ইরাণী মাতা; তাঁহার জন্ম হিন্দুস্থানে, শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে পারস্যে, কৈশোর আফগানিস্থানে। সুতরাং বিভিন্ন প্রবাহের প্রভাব সম্রাট আকবরের জীবনে ন্যূনাধিক পরিমাণে পড়িয়াছিল। তাঁহার রাজদরবারে হিন্দু, মুসলমান জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, সুফী সম্মেলন দেখিতে পাই, তাঁহার ইবাদৎখানায় ষোড়শ শতাব্দীর সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ী কৃষ্টি-প্রবাহ নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছিল, যে প্রবাহের পুরোহিত ছিল মোবারক পুত্র সুফী ভ্রাতৃদ্বয় ধীমান্ আবুল ফজল ও ফৈজী। তাঁহাদের প্রভাবে উদ্বোধিত তত্ত্বান্বেষী সম্রাট আকবরের যুগই ভারতবর্ষে সুফী আন্দোলনের সুবর্ণ যুগ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আরবে ইমাম গজালীর চেষ্টায় প্রাচীনপন্থী গোঁড়া মুসলিমগণ "বিরাট পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া ধার্ম্মিক মণ্ডলী গঠন এবং ধর্ম্মালোচনা করাকে" ধর্ম্মগ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল। আরবের বাহিরে পারস্য ও বহ্লীক দেশ আর্য্য জাতির সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গুরুবাদ গ্রহণ করিল। পরিশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া প্রায় গুরুপূজা আরম্ভ করিল। ভারতবাসী বিশ্বাস করে যে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি গুরুর স্পর্শলাভে প্রস্ফুরিত হয়; এবং গুরুর কৃপা ও উপদেশ লাভ করিলে মানুষ ভগবানের সান্নিধ্য এবং কৃপা লাভ করিতে পারে।

* পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আর একটী বিশ্বব্যাপী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা ইউরোপে Renaissance, Reformation, ইসলামে মাহাদী আন্দোলন, চীনে বৌদ্ধ জাগরণ, ভারতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ী সর্ব্বেশ্বরবাদ।

স্বতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই গুরুকে কেন্দ্র করিয়া নতুন সম্প্রদায় গড়িতে লাগিল। যে মহান্ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানগণ তাহাদেব মণ্ডলী গঠন করিত তাঁহাকে "পীব" বলিয়া সম্বোধন করিত।

যেমন দুইজন মানুষ সর্ব্ববিষয়ে এক রকম হয় না, তেমনি দুইজন মানুষের অভিজ্ঞতা একরূপ হয় না। ব্যক্তিগত জীবনের চলাফেরা, আদান প্রদান, ভাব অনুভূতিও প্রতিমানবেব বিভিন্ন। ধর্ম্মজীবনে ও ব্যক্তিগত পবিকল্পনা এবং অভিব্যক্তি প্রতিমনের পৃথক। মহাপুরুষ তাঁহাদেব পারিপার্শ্বিক মণ্ডলীকে নিজেব ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বাবা অনুপ্রাণিত করেন। ক্রমশঃ প্রতি মণ্ডলী নিজেদের কেন্দ্রগত মহাপুরুষকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। মহাপুরুষ ও তাঁহাব ব্যক্তিত্ব দ্বাবা মণ্ডলীকে পবিপূর্ণভাবে আকৃষ্ট করেন। এই ব্যক্তিগত আকর্ষণই সম্প্রদায় গঠনেব মূল। এইভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদেব মধ্যে মুসলিম পীরকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে স্বফী সম্প্রদায় গঠিত হইল, যেমন—

চিস্তী
সব্‌হিন্দী
সাত্‌তারী
কাদিরী
নাকস্‌বন্দী
সার ওয়ারদি। ইত্যাদি

এই সম্প্রদায়গুলি আবার কালক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল; যথা কাদিরী সম্প্রদায় হইতে আসিল বেনওয়া শাখা; সার-ওয়ারদি হইতে আসিল চিলিওয়ান ও মালীয়া ফকির গোষ্ঠী। নাকসবন্দী হইতে আসিল স্থবরকসী ও রব্বানী।

ভারতবর্ষে স্বফীগুরুগণ হিন্দু-ভাবধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। স্বফী পীর হিন্দু-গুরুর মতন শিষ্যকে মন্ত্রদান করেন। অবশ্য পীরের মন্ত্রদান হিন্দুর মতন নানাপ্রকার নিয়মের মধ্য দিয়া হয় না। শিষ্য গুরুর হস্তে নিজের হস্ত ন্যস্ত করিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, "আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম।" তারপর পীব শিষ্যকে বলেন, "তুমি পথিক" (সালিক্)। "সালিক্" জীবনে শিষ্যকে সত্যের পথে (তাবিকৎ) চলিতে হইবে এবং জপ (জীক্‌র) অভ্যাস কবিতে হইবে। মুরিদকে (শিষ্যকে) তাহার লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিবাব পূর্ব্বে কয়েকটী স্তরে অথবা কোষ অতিক্রম করিতে হয়—নাস্থত্, মালাকুত্ জব্‌রুত্, লাহুত। হিন্দু গুরু ও তাঁহাব শিষ্যকে অন্নময়কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, আনন্দময় কোষ দ্বারা জীবনের বার্ত্তা জানাইয়া দেন। কোন কোন স্বফী-গুরু স্তর-গুলিব অন্য নাম বলেন—শরিয়ত্, তারিকত্, মা-বফত্—হকিকত্ যেমন। হিন্দুবা বলেন কর্ম্ম-কাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং সমাধি। শরিয়ত্ অবস্থায় শিষ্যকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় এবং এই সময়ে তাহার জীবন কর্ম্মপ্রধান। দ্বিতীয় স্তবে শিষ্য নিয়ম ও কর্ম্মের অন্তঃস্তলে প্রবেশ কবে এবং মননে আত্মনিবেশ করে। তৃতীয় স্তরে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ চেতনা লাভ করে। চতুর্থ স্তরে শিষ্য হকিকত অর্থাৎ সত্য লাভ করে—ভগবানের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন লাভ করে—সমাধি লাভ করে। বাহলুল্ তাঁহার এমনি অবস্থায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

মন্ খোদা এম্
মন্ খোদা এম্
মন্ খোদা এম্—

আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর, আমি ঈশ্বর।

জপ ও ধ্যান ভারতের স্পর্শে ইসলামে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহারা এই জপকে

সমাধির সোপান বলিয়া গ্রহণ করিল। ভারতীয় প্রথায়—সুফীরা "জিক্‌র-ই-জালী" জপ আরম্ভ করিলেন। এই জপের নিয়ম অনুসারে সুফী এমন উচ্চস্বরে আল্‌লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করেন যে অন্যান্য জাগতিক ধ্বনি জপের ভিতর ডুবিয়া যায়। কোন কোন সুফী জপ করিবার জন্য বনে অথবা পর্ব্বতে চলিয়া যান এবং ব্যাঘ্রের মতন বসিয়া খুব তারস্বরে আল্‌লাহর নাম করেন। "জিকর-ই খাফি" প্রথায় জপ করিবার সময় তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় প্রাণায়াম অভ্যাস করেন। মুদ্রিতচক্ষু, বদ্ধহস্ত, নাসাগ্র নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন করেন। এক নাক বন্ধ করিয়া নিশ্বাস লইবার সময় উচ্চারণ করেন "লা-ইল্‌লাহ্‌"। নিশ্বাস ছাড়িবার সময় উচ্চারণ করেন "ইল্‌-লাহ্‌" কেহ বা "ইয়া-হু" "ইয়া-হাদি" নাম লইয়া ভগবানের জপ করেন,—যেমন বৈষ্ণব সম্প্রদায় "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" করিয়া ভগবানের আরাধনা করেন।

হিন্দু যেমন গুরু ধ্যান, গুরু পূজাকে ভগবানের ধ্যান ও পূজা বলিয়া স্বীকার করেন সুফীরা তেমনি গুরুকে প্রায় ভগবানের আসনে বসাইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন।

"তসাওয়ার" অবস্থায় সুফী নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের সহিত বিলীন করিয়া দেন। "তসাওয়ার-ই-ফিজ্‌জাত্‌" অবস্থায় সুফী নিজের সত্তা ভুলিয়া যান—সর্ব্বময় ঈশ্বর দেখেন। "তাসাওয়ার-ই-সাফ্‌আং" অবস্থায় সুফী আত্মসত্তা ভগবানে বিলীন করিয়া দেয়।

ইসলামে আত্মনিগ্রহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় সুফীগণ হিন্দুর ন্যায় শারীরিক নিগ্রহ করিতেন—সূর্য্যের দিকে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেন, জলে নিমজ্জিত হইয়া আল্‌লাহর নাম করিতেন; ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অথবা কণ্টক শয্যার শয়ন দ্বারা শরীরকে সংযত করিতেন। হটযোগী হিন্দুর মতন জল, অগ্নি, সূর্য্য, অনিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা সংযম অভ্যাস করিতেন। সংসার ত্যাগ মুসলিমের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। ভারতের সন্ন্যাসীর মতন মুসলিম সুফীগণ সংসারত্যাগী পরিব্রাজক বেশে ভ্রমণ করেন। সুফী মনসুর ভারতে আসিয়া জনৈক হিন্দু বৈদান্তিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত করেন। আল্‌লাহ্‌কে তিনি বর্ণবিহীন আলো রূপে ভজন করেন। এবং তাঁহার মতে জ্ঞান আল্‌লাহ্‌র আলোরই রূপান্তর। ভক্তাসী নামক সুফী সম্প্রদায়ের ধারণা যে আত্মা মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া মানুষ অথবা পশুর দেহ আশ্রয় করিতে পারে। এই জান্তববাদের ধারণা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরুদ্ধ। কিন্তু সুফী বিশ্বাস করেন যে "তনসুক্‌" অথবা পুনর্জ্জন্ম আছে। সুফী "নফ্‌স" আর হিন্দু "শ্বাসের" মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সুফীগণ বৈদান্তিকের মায়াবাদকে নিজেদের দর্শনের ভিতরে "আয়াম-ই-মমুল" বলিয়া বিশেষ স্থান দিয়াছেন। এইরূপে আরও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে ভারতে মুসলিমগণ বহু ধ্যান ধারণা ও উপাসনার রীতি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন; উহার ফলে তাঁহাদের ধর্ম্মমূল ও পরোক্ষ আহত হইয়াছে। ইস্‌তেলেহাত-ই-সুফিয়া নামক ঔরংজেবের সময় লিখিত পুস্তক আছে, তাহাতে আমরা ভারত বৈদান্তিক শব্দের ও ভাবের পরিভাষা দেখিতে পাই। "বাবা লালের সহিত আলোচনা" নামক গ্রন্থে দারা শুকো বহু ভারতীয় তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। সম্রাট আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোঘল রাজান্তঃপুরে আমরা সুফী মতবাদের পূর্ণ প্রভাব দেখিতে পাই। সলিমা বেগম, জাহানারা, রোশেনারা, জেবউন্নিসার জীবনী আলোচনা করিলে সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব স্পষ্ট ধারণা করা যায়। আকবরের যুগে বহু সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পারসী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় হিন্দু-ভাবধারা সুফী-সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এই হিন্দুভাব-প্রবাহ দারা শুকোর সময় পর্য্যন্ত নিরন্তর চলিয়া-

ছিল। দারা শুকোর জীবনী ভারতীয় চিন্তাশীল মাত্রেরই উপাদেয় পাঠ্যগ্রন্থ। তাঁহার রচিত "উপনিষদ্ সার" পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে হিন্দু ভাবধারায় ভারতীয় সুফীগণ পরিপূর্ণভাবে আপ্লুত হইয়াছিলেন। ঔরংজেব ভারতের সম্রাট না হইলে ভারতের চিন্তার ইতিহাস অন্যরূপ হইত। পরিশেষে বলিতে হইবে যে, কোন লেখকই ধর্ম্ম-বিশেষে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না লইয়া, অথবা সেই ধর্ম্ম আচরণ ও অনুসরণ না করিয়া কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ব্যাখ্যান করিতে পারেন না। জ্ঞানের দিক দিয়া হয়ত সেই ধর্ম্মের বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ অথবা পূর্ণ রূপ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই কথা বিশেষ করিয়া "সুফী মতবাদ" সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ধর্ম্মের অভিধানে "সুফী" শব্দ অপেক্ষা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত এবং অসতর্কভাবে প্রযুক্ত অন্য কোন শব্দ আছে কি না সন্দেহ। খৃষ্টান গ্রীক, মুসলিম আরব, সেমিটিক মিসর, আর্য্য পারস্য, বৌদ্ধ চীন, হিন্দু ভারতবর্ষ—প্রত্যেক দেশেই এই শব্দটী প্রচলিত। ভাষান্তরে ইহার অর্থ বিভিন্ন; মতান্তরে ইহার চিন্তা-প্রণালী পৃথক। কোথাও সুফীশব্দ চিন্তাধারাকে বুঝাইয়াছে; কোথাও ধর্ম্মমতকে বুঝাইয়াছে; কোথাও আচরিত ধর্ম্মবিশেষকে বুঝাইয়াছে। অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রতি মানব-মনের দৃষ্টি, যোগ-প্রণালী এবং ভগবৎ প্রেমকেও বুঝাইয়াছে। এই শব্দ দ্বারা বিশ্বাসবাদী মহম্মদকে বুঝাইয়াছে। আবার জ্ঞানবাদী মুতা-জ্জালকেও বুঝায়। প্রেমী রহিম, এবং কর্ম্মী-নানককেও বুঝায়। ইসলামের বাহিরেও এই শব্দ ব্যাপকভাবে এবং বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

হাজার হাজার পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষা বর্তমান আকারে উপস্থিত হয়েছে, আবার পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সে তার ভবিষ্যৎ যাত্রাপথে অগ্রসর হবে। ইহাই কালের নিয়ম। এ নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না।

সাহিত্যসম্পদে ও ব্যাপকতায় বাংলা ভাষা ভারতের অপর সকল প্রচলিত ভাষার চাইতে বড়। তবুও তার এমন কোন অবস্থা হয় নি, যেখানে আমরা বলতে পারি, যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আর দরকার নেই। উন্নতির কোন একটা বিশেষ অবস্থা নিয়ে মানবজাতি কখনও সন্তুষ্ট হয় নি, হতে পারে না। তাই উন্নতির পথে চলেছে নিত্য নতুন বিজয়-অভিযান সর্বকালে সর্বদেশে।

যত বড় গোঁড়াই হোন না কেন, বাংলা মায়ের এমন কোন সন্তান আছেন কি, যিনি মনে করেন, আমি ছেলে বয়সে যা শিখেছি, আমি যে চিন্তাধারায় ও অভ্যাসে অভ্যস্ত সেটিই অক্ষয় হয়ে বাংলা সাহিত্যে চিরকাল বিরাজ করুক, রূপে শক্তিতে সম্পদে আর উন্নতির দরকার নেই, পরিবর্তনের আবশ্যকতা নেই? পরিবর্তন চান আর না চান, উন্নতি কামনা করেন সকলেই। কিন্তু একটু পরিবর্তন বা সংস্কার না করে কোন রকম উন্নতি সম্ভব কি?

প্রত্যেক সংস্কারের মূলে দৃঢ় জ্ঞান থাকা চাই, সংস্কারের বস্তু ও আদর্শ। ভবিষ্যতে বাংলা ভাষাকে যে উজ্জ্বল শক্তিশালী মূর্তিতে আমরা

দেখতে চাই, সেটিই আমাদের কাছে বাংলা ভাষার আদর্শ। আদর্শের একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের থাকা চাই। আর থাকা চাই বাংলা ভাষার অতীত ও বর্তমানের জ্ঞান। অতীতকে অবলম্বন করেই বর্তমান আসে, আবার অতীত ও বর্তমানের উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

সংস্কার মানে ধ্বংসও নয়, অতীতে ফিরে যাওয়াও নয়, আবার বর্তমানকে আঁকড়ে পড়ে থাকাও নয়। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশ কাল ও অবস্থা অনুযায়ী আবশ্যক পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নেওয়াই প্রকৃত সংস্কার।

বাংলার সাহিত্য-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে বহু অবাঙালী আজকাল বাংলা শিখতে চাইছেন। গুজরাটবাসী এক বন্ধুর মুখে শুনেছি সেখানে বাংলা ভাষার খুবই আদর। বহু বাংলা বই গুজরাটিতে অনুবাদ হয়েছে। আজকাল শরৎ বাবুর বইএর খুব আদর হচ্ছে সেদেশে। অনুবাদে মৌলিক বইএর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা বড় শক্ত, এ কথা সকলেই জানে। অনুবাদ পড়েই যখন মানুষ খুব আনন্দ পায়, তখন মূল বইগুলো পড়ে দেখবার আগ্রহ হওয়া তাদের স্বাভাবিক। বন্ধুটি একজন গুজরাটী মহিলার কথা বললেন। শুধু বাংলা শেখবার জন্যই নাকি তিনি ছোটদের কাগজ মৌচাক কিনে পড়ছেন।

এরূপ ঘটনা শুধু গুজরাটে নয় ভারতের আরো অনেক দেশেই হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পর দেশে ও বিদেশে বাংলার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের বই পড়বার জন্যই অনেকে বাংলা শিখতে চাইছেন। রামকৃষ্ণ কথামৃত বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের সহজ সরল কথাগুলো অতি অদ্ভুত ভাবে ছোট বড় সবার অন্তরই স্পর্শ করে। নানা দেশের অসংখ্য নরনারী আজকাল রামকৃষ্ণদেবের মৌলিক উপদেশগুলো পড়বার জন্যও বাংলা শিখতে চাইছেন।

হিন্দী বা হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টা হচ্ছে। হিন্দী-সেবকগণ হিন্দী প্রচারের জন্য এবং উর্দু সেবকগণ উর্দু প্রচারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করছেন। বাংলা প্রচারের জন্য আজ পর্যন্ত সেরূপ কিছুই হয় নি। তবুও বাংলার প্রতি প্রতিবেশীদের ও বাহিরের লোকের আকর্ষণ দেখে আশ্চর্য হতে হয়।[১]

ছেলে বয়সে বাংলা আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত পালিত হবার জন্য বাঙালীদের কাছে বাংলা শেখা তত কষ্টের বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু অবাঙালীর পক্ষে বাংলা শেখা তত সহজ নয়। বাংলা শিখতে গিয়ে শুধু বাংলার সাধু ভাষাটা শিখলেই চলে না। সাধু ভাষায় বাঙালীর সঙ্গে কথা বলা যায় না, বক্তৃতা হয় না। শিশুসাহিত্য চলতি ভাষায়, আবার কথাসাহিত্যেও চলতি ভাষা অপরিহার্য। তাই কথ্য ভাষাও শিখতে হয়। আবার শুধু কথ্য ভাষাটা শিখলেও চলে না, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একটা মোটা অংশই সাধু ভাষায়। তাই বাংলা শিখতে হলে সাধু চলতি দুটো ভাষাই শিখতে হয়। প্রকৃত পক্ষে বলা যায়, ভাল করে বাংলা শিখতে হলে দুটো পৃথক ভাষা শেখবার পরিশ্রমই করতে হয়। শুধু তাই নয়, সাধু ও চলতি বাংলা পৃথক হলেও পাশাপাশি চলে।

১ ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা বাংলা। সরকারী দপ্তরের সমস্ত কাজই সেখানে বাংলাতে হয়। আসামের সমুদয় পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে বাংলা শেখবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। আবার যারাই কষ্ট করে কোন রকম একটু বাংলা শিখতে পেরেছে, সহজে তারা খ্রীষ্টান হতে চায় না। আগে বাংলা অক্ষরই ছিল খাসিয়া ভাষার অক্ষর, এখন পাদরিদের কৃপায় রোমান হরফ শোভা পাচ্ছে। আসামী ও মণিপুরী ভাষার অক্ষর বাংলা। আসামী ভাষা ও বাংলা ভাষা খুবই কাছাকাছি। আসামীদের মধ্যেও বাংলা শেখবার আগ্রহ বেশ দেখা যায়।

অবাঙালীর পক্ষে দুটোতে গুলিয়ে ফেলা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই বাংলা শিখতে হলে দুটো পৃথক ভাষা শেখবার পরিশ্রমের চাইতে বেশী সতর্কতার দরকার হয়।

প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলার উৎপত্তি। সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের সাথেই বাংলার উচ্চারণরীতির সাদৃশ্য বেশী। প্রাকৃতের সঙ্গে এদেশবাসীর নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গি যুক্ত হয়েই বর্তমান বাংলা উচ্চারণ দাঁড়িয়েছে। হাতে লেখা পুথি থেকে বাংলা যেদিন ছাপার হরফে উন্নতি লাভ করেছিল সেদিনই তার বানানে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম সম্ভব হয়েছিল। আর বাংলা বানানের ঐ পাকা বনিয়াদ গড়েছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিতরা। তাই বাংলা বানান অনেকটা সংস্কৃত অনুযায়ী রূপ নিতে পেরেছিল। ছাপাখানার কলের সাহায্যে বাংলা বানান সংস্কৃত অনুযায়ী করা সম্ভব হলেও বাংলা উচ্চারণ বদলান সম্ভব হল না। বাংলা বানান ধ্বনিগত নয়। বাংলা লেখা হয় সংস্কৃত অনুযায়ী আর উচ্চারণ করা হয় প্রাকৃত অনুযায়ী।[২]

নিজের শক্তিতে যে এগিয়ে যাচ্ছে বাইরের সাহায্যের তার দরকার হয় না। যার শক্তি কম, পদে পদে যে পেছিয়ে পড়ছে তার জন্যই সাহায্যের বেশী দরকার। এ সাধারণ নীতিটিও বিধাতা মানেন না। তিনি চলেন তাঁর খেয়ালে।

বিশ্বের দরবারে আমাদের আসন আজ অনেক পেছনে। অন্তরের দিক থেকে আমরা যেমন দুর্বল বাইরের সাহায্য পেতেও আমাদের তেমনি প্রবল বাধা। পশ্চিমের একটা অতি সাধারণ দেশেও লেখাপড়া নাজানা লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচের বেশী নয়। আর আমাদের দেশে কোন রকম নিজের নামটা লিখতে পারে এ রকম লোককেও শিক্ষিত বলে ধরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শ-এ পাঁচ। কাজেই পশ্চিমের চেয়ে এদেশে লেখাপড়া শেখা সহজ হওয়া উচিত, লেখাপড়া শেখার বেশী সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু ঠিক উলটো। যে সময়ে ওদেশের ছেলে বর্ণ-পরিচয় শেষ করে ছবি সিনেমা গান-বাজনা খেলাধূলোর ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয়ে মন দেয়, সে সময়ে আমাদের ছেলে তার প্রাণপণ শক্তিতে হ্রস্ব ঊর্দ্ধ আকাঙ্ক্ষা কড়া-কিয়া কাঠাকিয়া ও নামতার পাকে পড়ে ডিগবাজি খেতে থাকে। খবরের কাগজ ছাপতে ওদের যা সময় ও পরিশ্রম লাগে আমাদের লাগে তার চেয়ে প্রায় ছ গুণ বেশী। ওদের খুব বেশী হলে এক শ টাইপ, আমাদের ছ শ-র উপর। টাইপরাইটার প্রভৃতিতে ওদের কত সুবিধে, আমাদের কল তৈরী হলেও বর্ণমালার চাপে পড়ে তা আর চলে না। ওরা নিজের ভাষায়ই শেখে, আমরা শিখি পরের ভাষায়। ওরা যা লিখে তাই বলতে পারে, আমরা যা লিখি তা বলতে পারি না, যা পড়ি তা লিখতে পারি না। ওরা নিজেদের আবশ্যক মত ব্যবস্থা করে নিতে পারে, আমরা তখনই বিধানকে সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করি, যখন রাজশক্তি জোর করে তা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়।

শেখবার পক্ষে বাংলা যত সহজ হবে ততই তার বেশী প্রচার হবে। বিস্তারের জন্য ভাষার দুটি জিনিসের দরকার—ভাবসম্পদ ও সহজ-গম্যতা। বাংলার সাহিত্যসম্পদ উন্নতি করেছে, আরো উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে, আর চেষ্টা করতে হবে যাতে অবাঙালীরাও সহজে বাংলা শিখতে পারে। বাঙালী শিশুরাও যেন অল্প পরিশ্রমে তাদের মাতৃভাষা শিখতে পারে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই জানেন ছেলেদের বাংলা প্রথমভাগ দ্বিতীয়-ভাগ শেখান কত কষ্টকর। শিক্ষামন্দিরের দুয়ারেই যে কষ্টটা নিরীহ বাঙালী বালকদের ভোগ করতে

২ বাংলাতে ণ ন, শ ষ স, ব জ সমান উচ্চারণ, আত্মা তস্মাৎ বিম্ব বাক্য প্রভৃতির আঁত্তা তস্সাৎ বিম্ব বাক্ক প্রভৃতি উচ্চারণ প্রাকৃত থেকে এসেছে।

হয়, সারা জীবনেও সে ক্ষতিপূরণ তাদের হয় না। আরম্ভের বিভীষিকা থেকে যেটুকু শক্তিই বাঁচান যাবে, সেটুকুই তাদের বৃহত্তর জ্ঞান লাভের জন্য ব্যয়ীত হতে পারবে। বাংলা ভাষার বিস্তারে বাহ্যিক পরিচয়ের বা সম্মানের লাভটাই বড় নয়, মানবতার দিক থেকে বৃহত্তর বাংলার দিক থেকেও তা মহালাভের মহাগৌরবের।

স্বাধীনতা ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু উন্নতি করতে পারে না। হাজার বছরের পরাধীনতা আমাদের দিয়েছে পৃথিবীর মত নির্বিকার সহনশীলতা আর হরণ করে নিয়েছে মনুষ্যত্ববাচক যা কিছু সব। আজ যখন দেখি, আমাদের সমাজরূপী বৃদ্ধ বনস্পতি লোহার বেড়ার যেখানেই একটু ফাঁক পেয়েছে সেখানেই অনন্ত নীল আকাশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ফুলে ফলে সবুজ পাতায় প্রাণের স্পন্দন প্রকাশ করছে, তখন সত্যি আনন্দ হয়। সমাজশরীরে আজ শক্তি জেগেছে তাই তার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে চিন্তাধারায়। শিক্ষা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিস্তারের কথা, আরও দশটা জাতির মত উন্নতি করবার কথা আজকাল দেশে আলোচনা হচ্ছে। ভাবুকতা ছেড়ে কর্মতৎপরতার দিকে, অনাবশ্যক জটিলতা ছেড়ে সরলতার দিকে চলবার একটা ঝোঁক আজকাল সর্বত্র দেখা যায়।

সর্বপ্রকার উন্নতির মূলসূত্র শিক্ষা। শিক্ষাবিস্তারে প্রেস টাইপরাইটার সর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি বর্তমান যুগে একেবারেই অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের বর্ণমালার জটিলতায় এগুলো অন্য দেশের মত কার্যকরী হচ্ছে না। এজন্য কেউ কেউ রোমান অক্ষর চালাবার কথা বলছেন। এ প্রস্তাবে দেশের সম্মতি হচ্ছে না। কিন্তু ভাবুকতার চেয়ে প্রয়োজনের তাগিদ বেশী। যদি আমরা আমাদের অবস্থাকে সময়োপযোগী করে না নিতে পারি, তা হলে পারিপার্শ্বিকের চাপে হয়তো বাধ্য হয়েই একদিন রোমান অক্ষরকে আশ্রয় করতে হবে।

একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলার ক্ষমতা প্রত্যেক প্রাণবন্তের মধ্যেই দেখা যায়। যার এ ক্ষমতা নেই তাকে ধীরে ধীরে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রত্যেক উন্নত দেশেই দেখতে পাচ্ছি, খবরের কাগজের খুবই প্রচার। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাখ লাখ কাগজ ছাপা হয়ে প্রচার হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের দামও ভয়ানক বেড়ে যাচ্ছে। এখন এতে বেশী সময় দেবার আর উপায় নেই। এমন দিন খুব বেশী দূর নয় যখন এদেশেও খবরের কাগজের এরূপ চাহিদা হবে। তখন আমাদের বর্ণমালা-ঐরাবতকে ঘষে মেজে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কল-কারখানার উপযোগী করে নিতে হবে। নইলে ঐরাবতের উপযোগী সমান ফলপ্রদ কল আবিষ্কার করতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তা হলে পারিপার্শ্বিকের চাপে বাধ্য হয়ে ঐরাবতকে পরিত্যাগ করে বিদেশী বৈজ্ঞানিক যানের আশ্রয় নিতে হবেই। ভাবুকতার দিকে চেয়ে দেখবার সময় আমরা তখন পাব না।

প্রায় তিন বৎসর যাবত আনন্দ বাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষরা লাইনোটাইপের কলকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। আমাদের ছ শ অক্ষরকে অনেক চেষ্টায় তাঁরা দেড় শ-তে এনেছেন। ভাল কাজ পেতে গেলে অক্ষর আরও কমাতে হবে। বাংলাতে টাইপকরা কল তৈরী হয়েছে কিন্তু কাজে লাগছে না। অক্ষর সংখ্যা বেশী বলে কল চালাবার নিয়ম জটিল হয়েছে, তাড়াতাড়ি না হয়ে তাতে সময় লাগছে অনেক বেশী। যেদিনই বাংলা ভাষা এদেশের অফিস আদালতে ইংলিশের আসন দখল করবে সেদিনই কাজের উপযোগী টাইপকরা কলের দরকার হবে।

আমাদের চোখে রু রূ শু হু প্রভৃতি অক্ষর বিসদৃশ ঠেকে কিন্তু বু বূ শূ হূ অক্ষরগুলো একটুও বিসদৃশ মনে হয় না। পনের কুড়ি বৎসর পর বাঙালী বালকেরা রু বু, শু শূ, হু হূ তে সৌন্দর্যের কিছুমাত্র তফাৎ আবিষ্কার করতে পারবে না।

একটা কথা এখানে বলা মন্দ হবে না। বাংলা প্রেসে া ে ৈ খ গ ণ থ প শ প্রভৃতি অক্ষর দুরকমের—মাত্রাযুক্ত ও মাত্রাহীন। এ কথা প্রেসের লোক ও প্রুফরিডার ছাড়া খুব বেশী লোকে জানে না। যাঁরা বই ছাপান বা প্রুফ দেখেন তাঁরাও বোধ হয় সকলে জানেন না। কারণ, অধিকাংশ বইএর মধ্যেই এ দুরকম টাইপের কিছু কিছু গোলমাল দেখতে পাই। এ বিষয় পাঠকদের কোন অসুবিধে হয় কিনা পরীক্ষা করবার জন্য উদ্বোধনে কয়েকটি প্রবন্ধ শুধু মাত্রাযুক্ত অক্ষর দিয়ে ছাপা হয়েছে।[৩] এ প্রবন্ধটিও সেভাবেই ছাপা হচ্ছে। এতে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন কত অনাবশ্যক ভাবে আমরা অক্ষরের বোঝা বইছি। ইংলিশে নানান ছাঁদের অক্ষর আছে, বাংলাতে নেই। বাংলা অক্ষরের অত্যধিক বাহুল্যের জন্যই এসব হতে পারছে না।

এবার বাংলা বানানের কথা। বাংলা বানানকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান কমিটি যে কাজ করছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। বানানকে যথাসম্ভব সহজ সরল করবার দিকে তাঁদেরও একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। অনাবশ্যক জটিলতা ও বিকল্প যত কম থাকে ততই শেখবার পক্ষে তা সহজ হয়। সংস্কৃত তদ্ভব দেশী ও বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় আছে। দেশী ও বিদেশী শব্দের তো কথাই নেই, সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দের বানানেও লেখকদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়।

৩। উদ্বোধন—বর্ষ ৩৯, পৃ ৬৮৯, ৭৪৭। বর্ষ ৪০, পৃ ৮৩, ৩৫৮, ৩৬৩।

সংস্কৃত শব্দ। মন যশ বক্ষ বিপদ উপনিষদ সম্রাট শ্রেয় সন্ত শ্রীমান ভগবান ক্রমশ প্রভৃতি কেউ কেউ লেখেন, আবার কেউ কেউ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে মনঃ যশঃ বক্ষঃ বিপৎ উপনিষৎ সম্রাট্ শ্রেয়ঃ সত্তঃ শ্রীমান্ ভগবান্ ক্রমশঃ প্রভৃতি লেখেন। শেষের লেখকদের প্রায় সবাই লেখেন—মনের যশকে শ্রীমানই ভগবানও ক্রমশই। তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানেন না। আবার কোন কোন লেখক ভগবান বলবান শব্দে হসন্ত দেন শ্রীমান বুদ্ধিমান প্রভৃতিতে দেন না। সংস্কৃত ব্যাকরণে দিক পৃথক প্রভৃতি শব্দে হসন্ত আছে দেখে অসংস্কৃত ঠিক শব্দেও হসন্ত বসান। সংস্কৃতয় হসন্ত না দিলে হসন্ত-উচ্চারণ হয় না, কিন্তু বাংলার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই শেষের অকারান্ত বর্ণ হসন্ত উচ্চারণ হয়।

তদ্ভব শব্দ। বাংলাতে ঈ ঊ ণ য ব (অন্তস্থ) ষ এই ছটি বর্ণের উচ্চারণ হয় না। এজন্য অধিকাংশ লেখকই আজকাল কান সোনা বামুন গিন্নী প্রভৃতি লিখেন। আবার এমন লেখকও আছেন যিনি কাণ সোণা প্রভৃতি লেখেন। সোনা শব্দ সংস্কৃত স্বর্ণ শব্দ থেকে এসেছে। কাঞ্চন কনক শব্দে (দন্ত্য) ন, স্বর্ণ-তে র আছে বলেই (মূর্ধন্য) ণ। সোনা শব্দে ব-এর গন্ধও নেই, তবুও স্বর্ণ শব্দের সন্তান বলেই তাতে ণ ব্যবহার করবার দাবি। নাতনি যেহেতু দিদিমার নাতনি, শুধু সেজন্যই তাকে তার দিদিমার বুড়ো বয়সের ফাঁদি নথখানা ব্যবহার করতেই হবে।

এমন একজনও নৈষ্ঠিক লেখকের লেখা আমার চোখে পড়ে না, যিনি বাংলার সমস্ত সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করছেন।

দেশী ও বিদেশী শব্দ। বিভিন্ন লেখকদের লেখায় বাংলার দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে অনিয়ম বেশী দেখা যায়। একটি নমুনা দিচ্ছি।

চলতি বাংলার ক্রিয়াপদে যেরকম বানান আজ কাল কাগজে পুস্তকে দেখা যায়, সেই অনুসারে কর ধাতুর উত্তম পুরুষ ভবিষ্যৎ কালে বত্রিশ রকম বানান হয়।

করব ক'রব কর'ব কর্‌ব ক'রব কর্'ব করবো ক'রবো কর'বো কর্‌বো ক'র্‌বো কর্'বো কোরবো কো'রবো কোর'বো কো'র্‌বো কোর্'বো কোর্‌বো কোরব কো'রব কোর'ব কোর্‌ব কো'র্‌ব কোর্'ব কর্ব্ব ক'র্ব্ব কর্ব্বো কোর্ব্ব কো'র্ব্বো ক'র্ব্বো কো'র্ব্ব কো'র্ব্বো।

কি ভয়ানক ব্যাপার! রেফ-যুক্ত বর্ণ অনেকেই আজকাল দ্বিত্ব করেন না। সে ভাবে ধরলে করব শব্দের বানান বত্রিশ থেকে চল্লিশে গিয়ে দাঁড়াবে। বাংলা বানান কমিটি এগুলোর একটা সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করছেন।

জগতে দুটি শক্তি কাজ করছে, আর এই শক্তি দুটোর সংঘাতে ও সামঞ্জস্যেই জগৎ চলছে প্রতি-মুহূর্তে পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। একটি চাইছে যা আছে তাকে রক্ষা করতে, আর অপরটি চাইছে ধ্বংস ও নতুন সৃষ্টি। এই শক্তি দুটোর সাহায্যেই মহাকাল তাঁর জগৎ-তরণী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোঁড়া বা রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রথম শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, দ্বিতীয়টি প্রকাশ পায় সংস্কারপন্থীদের মধ্যে।

গোঁড়াদের দ্বারা কোন পরিবর্তন হওয়া দূরে থাক, পরিবর্তনের নামও তাঁরা সহ্য করতে পারেন না। অথচ তাঁরা ভুলে যান, যে জিনিসটি তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন, শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সেটি তাঁদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আজ যাকে তাঁরা প্রাচীনত্বের গৌরব দিচ্ছেন, চিরকালই সে প্রাচীন ছিল না। একদিন নবীনের বেশেই তাকে ধরায় আসতে হয়েছিল। তখনকার প্রাচীনেরা তাকে যা বলে তিরস্কার করেছিলেন আর আজকালকার নবীনদের আধুনিক প্রাচীনেরা যা যা বলে অভিহিত করেন, সে সবের ঢং ও ভাষা পৃথক হলেও মানে একই। যেতে নাহি দিব—বলে যতই চেষ্টা তাঁরা করুন না কেন, মহাকালের অব্যর্থ প্রভাবে পরিবর্তন তাতে একদিন আসবেই। কারো সাধ্য নেই ঠেকিয়ে রাখে। প্রাচীনপন্থী বা গোঁড়ারা প্রত্যেক সংস্কারের মধ্যেই উচ্ছৃঙ্খলতা অনাচার সর্বনাশ ধ্বংস প্রভৃতির বিভীষিকা দেখেন।

সংস্কারপন্থীরাও ভুল করেন। তাঁরা ভুলে যান, প্রত্যেক সংস্কার প্রত্যেক পরিবর্তন অতীতকে অবলম্বন করেই হয়। অতীতকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কার হতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়েই নতুনের প্রতিষ্ঠা। আবার নতুন চিরকালই নতুন থাকবে না। আজ যেমন শক্তির পরীক্ষা দিয়ে তাকে সিংহাসন লাভ করতে হচ্ছে, কাজ শেষ হলেই অনাগত নতুনের কাছে তেমনি আবার তা ছেড়ে দিয়ে অতীতের কোলে তাকে স্থান লাভ করতে হবে।

একটা নিয়ম প্রচলন করবার চেষ্টা করলেই যে তা চলবে তার কোন কথা নেই। জনমতের বিরুদ্ধে নিয়ম চালাতে পারত একমাত্র রাজশক্তি। কিন্তু আজকাল যেভাবে দেশে দেশে জনশক্তি প্রবুদ্ধ হয়ে উঠছে তাতে জনমতের বিরুদ্ধে রাজশক্তিরও কিছু প্রবর্তন করবার শক্তি নেই। নিয়ম চলে তার নিজের শক্তিতে। যে নিয়মের মধ্যে উপ-যোগিতা নেই তা প্রবর্ত্তন করবার শত চেষ্টা করলেও সফলকাম হওয়া যায় না। আজ যে সব নতুন নতুন নিয়ম বাংলা বানানে ও সাহিত্যে প্রবর্তন করবার চেষ্টা হচ্ছে, যদি সেগুলোর মধ্যে সত্যিকার উপযোগিতা না থাকে কালের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় সেগুলো কোথায় উড়ে যাবে। বানান কমিটির ছাড়পত্র পেয়ে আজ ধর্ম কথাটা সাহিত্যের আসরে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। অশুদ্ধ বলে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এখন হবে ধর্ম্ম ও ধর্মে লড়াই, যার শক্তি বেশী সেটিই জিতবে। যদি ধর্ম কথাটা গায়ে খানিকটা সরল

হয়েও ধর্ম্ম শব্দের সকল তথ্য প্রকাশ করতে পারে, আর লিখতে পড়তে আমাদের কিছু আরাম দেয়, তাহলে অভ্যাসের অহংকারের যত দোহাইই আমরা দিই না কেন, ধর্ম শব্দটাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারব না।

একেবারে ভাল জিনিস দুনিয়ায় কিছু নেই, মন্দও নেই। সেরূপ একেবারে অপ্রয়োজনীয় বস্তু বলেও বোধ হয় কিছু নেই। যে জিনিসে বৃহত্তর প্রয়োজনে বাধা দেয় তাকেই মানুষ মন্দ বলে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। হয়তো তার দ্বারা একটি ছোট খাট প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবুও তার দুর্নাম ঘোচে না। বাইরের অধীনতা থেকে মনের অধীনতা বেশী অনিষ্টকারী। মানসিক দাসত্বের বোঝা বয়ে যারা বেড়ায় তাদের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, স্বশ্রেণীর, লোকের কারো সামান্য মাত্র স্বাধীনতা তারা সহ্য করতে পারে না। তাই নতুন কোন প্রস্তাব শুনলেই আমরা বিরক্ত হই, আর ভয় পাই—অভ্যাসের যে বাঁকা পথে আমরা বহুকাল চোখ বুঁজে চলে আসছি, তাতে কি জানি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাত পড়ে।

কোন সংস্কারেই সর্বসাধারণ একমত হয় না। বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কারও সকলে একমত হবেন এমন আশা করা যায় না। আমি আমার নিজের কোন মতামত কারো মাথায় চাপিয়ে দিতে চাই নে, আর সে ক্ষমতাও আমার নেই, বোধ হয় কারোই নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, যে কারণে আজ বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষা সাধুভাষাকে হঠিয়ে দিচ্ছে, ঠিক সেই কারণেই বাংলা বানানও ক্রমশ সরলতার দিকে এগিয়ে যাবে। কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না। গণদেবতার গতিই আজকাল সরলতার দিকে সুন্দরের দিকে শক্তির দিকে, আর প্রত্যেক লেখকেরই প্রাণের ইচ্ছা—তাঁর সাহিত্যসাধনা গণদেবতার কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে।

ধর্ম্মাচার্য্য জগদীশচন্দ্র

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বরিশালের ধর্ম্মগুরু জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বাংলার সর্ব্বত্র সুবিদিত। যে সকল মহাপুরুষ তরুণ বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বরিশালের কর্ম্মবীর অশ্বিনীকুমার ও সেবাব্রত কালীশচন্দ্রের ন্যায় তিনিও বাংলায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জগদীশ এমন নীরব, আড়ম্বরহীন ও সহজ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বা শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিগণও তাঁহার সুমহান জীবনের নিগূঢ় পরিচয় পান নাই। তাই তাঁহার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে প্রকাশিত তিনখানি[১] পুস্তকেও তাঁহার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অথচ বাংলার নানা-

১ (ক) আচার্য্য জগদীশ-প্রসঙ্গ—শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত।

(খ) জগদীশ সঙ্গে ত্রিশ বৎসর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

(গ) Saint Jagadis Mukerjee — By Nibaran Ch Dasgupta.

স্থানে—এমন কি রেঙ্গুন, বোম্বাই, নাগপুর ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী জগদীশের সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য এই সামান্য প্রবন্ধ লিখিত হইল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপকরণ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ঋষি জগদীশ ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহার বরিশালস্থ আশ্রমে প্রায় ৭১ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি বরিশালে তাঁহার ষষ্ঠ স্মৃতি উৎসব শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও তিনি খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট মহকুমার অধীন একটী গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার জীবনের শেষ ৪৬ বৎসর অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র কর্ম্মজীবন বরিশালেই অতিবাহিত হয়। জগদীশের সহযোগে অশ্বিনীকুমার বরিশালবাসীকে সত্য-প্রেম-পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পিতার নামে *ব্রজমোহন কলেজ*[২] ও *স্কুল স্থাপন*, *বিখ্যাত গ্রন্থ* 'ভক্তিযোগ' প্রণয়ন এবং অন্যান্য দেশসেবার দ্বারা অশ্বিনীকুমার অমর হইয়াছেন। আর জগদীশ প্রায় দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর নীরবে শিক্ষাদান এবং ধর্ম্ম-সাধন ও প্রচার করিয়া গেলেন। তাই বরিশাল তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তিনি যে ধর্ম্মানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আর্ত্ত ও রুগ্নের সপ্রেম সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা কালীশচন্দ্র তরুণদের অনুপ্রাণিত করিয়া "Little Brothers of the Poor" নামক যে সেবাসংঘ স্থাপন করেন তাহার কথা Encyclopædia Britannicaতে স্থান পাইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার ও কালীশচন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজননীর অনেক সুসন্তান বরিশালে জন্মগ্রহণ করিয়া উহাকে নানাভাবে বিখ্যাত করিয়াছেন। দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন ও হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং (রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের) স্বামী নিত্যানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী কল্যাণানন্দ বরিশালেরই লোক।

আচার্য্য জগদীশ বৈদিক যুগের ঋষির মত ছিলেন। তাঁহাকে গৃহস্থ বলা যায় না—কারণ তিনি চিরকুমার ছিলেন—আর তিনি আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নাই। বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দের ন্যায় মহাপুরুষ জগদীশকে ঋষি আখ্যা দিয়াছিলেন। বরিশালের সিদ্ধসাধক সোনা ঠাকুর (কালীভক্ত ৺সনাতন চক্রবর্ত্তী) জগদীশকে এত অধিক ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে একদিন না দেখিলে অস্থির হইতেন। আদর করিয়া সোনাঠাকুর জগদীশকে "রসগোল্লা" বলিয়া ডাকিতেন। অশ্বিনীকুমার যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিতে যান তখন জগদীশ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে দেখিয়াই অশ্বিনীকুমারকে নাকি বলিয়াছিলেন 'অরুণোদয়ের পূর্ব্বে তোলা এই মাখনটুকু কোথা থেকে আনলে?' তিনি জগদীশকে কাঁচা সোনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বরিশাল জেলার জনসাধারণ তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন যে, লোকে তাঁহাকে 'বাখরগঞ্জের শিব' বলিত। সত্যই তিনি ছিলেন বরিশালের সৌম্য, শান্ত, সুসমাহিত, তপোজ্জ্বল, দিব্যকান্তি শিবঠাকুর। ঋষি জগদীশের দেহখানি এত গৌরবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল যে, তাঁহাকে শ্বেতমর্ম্মরে খোদিত দেবমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বভাবতঃ মাখনের ন্যায় কোমল ছিল। তাঁহার করতল ও পদতলের রক্তিম আভা শাস্ত্রবর্ণিত করকমল ও পাদপদ্মের স্মৃতি জাগ্রত করিত।

শিশুকাল হইতেই ঋষি জগদীশের অসাধারণ মাতৃভক্তি ছিল। ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ লইয়াই

২ মফঃস্বল কলেজগুলির মধ্যে ব্রজমোহন কলেজ বৃহত্তম। উহাতে বর্ত্তমানে প্রায় ১৪০০ শত ছাত্র। উহা ১৮৮৯ সালে স্থাপিত হয়।

যেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সম্ভ্রান্ত, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান ও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যখন শিবপূজা করিতেন শিশুপুত্র জগদীশ নিবিষ্টমনে সেই পূজা দর্শন করিতেন। পূজাকালে পিতৃদেবোচ্চারিত স্তব স্তুতি বালকের কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। সেকালের কণ্ঠস্থ গঙ্গাস্তোত্র তিনি শেষ জীবনেও সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা কাশী-বাসিনী হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় জীবন-পাত করেন। তিনি এত স্নেহময়ী ছিলেন যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই 'খোকা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মাতৃভক্ত জগদীশ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীধামে জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাতা তাঁহাকে বরিশালস্থ শত শত নরনারীকে ধর্ম্মদান কার্য্য হইতে বিরত হইতে নিষেধ করেন। মাতা পুত্রবৎসলা কিন্তু নিঃস্বার্থ ছিলেন, তাই পুত্রকে স্বীয় সকাশে যাইতে দিলেন না। আবার পুত্রের অনুরোধে কাশী ত্যাগ করিয়া পুত্রের কর্ম্মস্থল ও সাধনক্ষেত্রে আসিতেও অস্বীকার করিলেন না। প্রসব বেদনায় কোন মহিলাকে নিদারুণ কষ্ট পাইতে দেখিয়া জগদীশ চিরকুমার থাকিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। পুত্রের সৎসংকল্পে ধর্ম্মপরায়ণা জননী কোনও প্রকার আপত্তি করিলেন না। একবার একটী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট অনেক কান্নাকাটি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—যদি এতদিনের মধ্যে আপনার মেয়ের বিবাহ না হয় তবে আমি বিবাহ করিতে পারি, কিন্তু মেয়ের ভরণ পোষণ আপনারই করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় উক্ত সময়ের মধ্যেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ হয়। ছেলেবেলা হইতেই জগদীশের বিবাহে বীতস্পৃহা ছিল। একদিন প্রতিবেশীর গৃহে পুত্রবধূ ও শাশুড়ীর মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হইতে ছিল, যুবক জগদীশ মাতাকে একান্তে ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মা, বিবাহের এই ফল।" জগদীশকে বুঝিতে হইলে তাঁহার মাতার জীবনী জানা আবশ্যক। মাতার আদেশ তিনি জীবনে কখনও লঙ্ঘন করেন নাই এবং মাতার আদর্শেই তাঁহার জীবন যেন গঠিত হইয়াছিল। মাতা 'ওঁ' এর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শারীরিক বেদনার সময় উহু না বলিয়া "ওঁ" বলিয়া কোঁকাইতেন। তিনি ঋষিতুল্য পুত্রের সঙ্গে প্রণব জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী যখন বরিশাল গমন করেন তখন জগদীশ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি বরাবর যেমন পরেন, একখানা দেশী কাপড় পরিয়াই মহাত্মার নিকট গিয়াছিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর খদ্দরব্রতী মহাত্মা তাঁহার পরিধানে দেশী কাপড় দেখিয়া বলিলেন, তুমি ওখানা কি কাপড় পরিয়াছ? তিনি বলিলেন, এই কাপড়খানা মাতৃদত্ত উপহার। মহাত্মা বলিলেন "তোমার মা যদি তোমাকে বিষ দেন, খাবে?" মাতৃভক্ত জগদীশ উত্তর করিলেন—"কেন খাব না? মা বিষ দিলে নিশ্চয়ই খাব।" দুইজনেই হাসিলেন।

যশোহর জেলা স্কুল হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করত জগদীশ কলিকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজে এফ, এ এবং সংস্কৃতে অনার্স সহ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এফ, এ পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৪৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি যখন যশোহর হাইস্কুলে পড়েন তখন অশ্বিনীকুমার সেই স্কুল দেখিতে যান। "একটী জিনিষ দেখিবেন?" এই বলিয়া হেড্ মাষ্টার মহাশয় অনিন্দ্য সুন্দর ননীর পুতুল জগদীশকে দেখান। অশ্বিনীকুমার জগদীশকে একটী শ্লোক লিখিতে দেন। জগদীশ মাত্র একবার সেই শ্লোকটী লিখিয়া তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলেন। অশ্বিনীকুমার তাহাতে অতিশয় মুগ্ধ হন

এবং ভবিষ্যত জীবনসঙ্গী জগদীশের প্রতি আকৃষ্ট হন। অশ্বিনীকুমারের পিতা তখন যশোহরে সব-জজ্ ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্নেহের জগদীশকে তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন এবং পরে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়া ১৯২১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জগদীশচন্দ্র কার্য্য করেন। জগদীশ ব্রজমোহন কলেজের এফ, এ ক্লাশে লজিক এবং বি, এ ক্লাশে এ্যাষ্ট্রনমি পড়াইতেন। তিনি বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি এম, এ পাশ বা উচ্চপদ লাভ করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। নৈতিক আদর্শে মানুষ তৈরী করা ছিল তাঁহার জীবনব্রত, তাই তিনি আজীবন শিক্ষকতা কার্য্যই বরণ করিয়া ছিলেন। জগদীশ শ্রুতিধর ছিলেন। একবার শুনিলেই তিনি শ্লোক মুখস্থ ও পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। শেষে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে যেন নূতন শ্লোকই বলিতে পারিতেন না। শ্লোক রচনায়ও তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। যে কোন বিষয়ে শ্লোক লিখিয়া দিতে বলিলে তিনি কঠিন কঠিন ছন্দে সুললিত শ্লোক লিখিয়া দিতেন। তাঁহার অশেষ জ্ঞান-তৃষ্ণা ছিল। স্বীয় সাধন বলে তিনি উদ্ভিদবিদ্যায়ও পারদর্শী হইয়া ছিলেন। কখনও কখনও দিনরাত জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত হইত। জটিল অঙ্ক লইয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। আদৌ নিদ্রা হইত না। এক একটী সমস্যার সমাধানে তিনি একমাস বা ততোধিক সময় কাটাইতেন কিন্তু নিজে উহার সমাধান না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। এরূপ অবস্থায় স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ আসিয়া সমাধান বলিয়া দিয়াছেন, এইরূপ অভিজ্ঞতা তাঁহার একাধিকবার হইয়াছে। কোন যুবক এম, এ পাশ করিয়া Imperial service examination এর জন্য Higher Mathematicsএর Astronomical Survey নামক একটী কঠিন বিষয় পড়িবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসেন। বিষয় অনধীত হইলেও Wrangler Course এর এই বিষয়টী মাত্র দেড়মাসে তিনি অধ্যয়ন করিয়া যুবকটীকে পড়ান।

ঋষি জগদীশ অশেষ গুণের আকর ছিলেন। তিনি অজাতশত্রু, স্যায়নিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। পরনিন্দা তাঁহার মুখে কেহ শোনে নাই। জগতে তিনি মিথ্যাকে অত্যধিক ঘৃণা করিতেন। অশ্বিনী কুমার জগদীশ সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, "শুধু এদেশে নয়, সারা দুনিয়ায় এরূপ খাঁটি লোক কটা পাবি ? Character এবং abilityর এরূপ দুর্লভ সমাবেশ খুব কম দেখা যায়।"

অন্য প্রসঙ্গক্রমে অশ্বিনীকুমার আর একবার বলিয়াছিলেন—"দ্যাখ্, জগদীশকে আমিই প্রথমে ভাগবত পড়াই, এখন আমিই তার শাস্ত্র পাঠ শুনতে আসি।" যদিও জগদীশ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন তথাপি অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। অশ্বিনীকুমারের সুপ্রসিদ্ধ 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন কামভাব অত্যন্ত প্রবল হইলে তাঁহার (অশ্বিনীকুমারের) দৃষ্টি জগদীশের রৌদ্রে দেওয়া কাপড়ের দিকে পড়িতেই উত্তেজনা আপনিই থামিয়া গেল। জগদীশ যোগীদের ন্যায় ভূমিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া ধীর-পদবিক্ষেপে চলিতেন; বামে, দক্ষিণে বা সম্মুখে কোনদিকেই লক্ষ্য করিতেন না। ভীষণ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা চিকিৎসক মণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। মৃত্যুর প্রাক্কালেও তাঁহার মুখমণ্ডল নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত ও শান্ত ছিল। ছয় হস্তপদযুক্ত একটা কিম্ভূত-কিমাকার পতঙ্গ হঠাৎ তাঁহার কানে ঢুকিয়া দীর্ঘ দুই সপ্তাহকাল ছিল। কর্ণকুহরের সেই অসহ্য তীব্র যাতনাও তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি মলিন করিতে পারে নাই। আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত কোন কথা

তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। একবার দুইজনে তাঁহার সম্মুখে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মহাতর্ক আরম্ভ করেন। পরে যখন এই বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়—তিনি বলেন যে, তিনি ইহার কিছুই শোনেন নাই। জগদীশের সাধক মন এত অন্তর্মুখীন ছিল যে, বাহ্যজগতের অনাবশ্যকীয় বিষয় তাহাতে স্থান পাইত না। তিনি অতিশয় নির্লোভ ছিলেন। কেহ তাঁহার জন্য রসগোল্লা বা কোন আহার্য্য রাখিয়া গেলে—তিনি তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অপরকে খাওয়াইতেন। রসগোল্লা বা সন্দেশ তাঁহাকে খাইতে দিলে তিনি একটী গ্রহণ করিয়া পাত্রটী হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং কেহ আসিলে উহার একটী তাহার মুখে দিয়া দিতেন; হাত ধুইবার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া হাতে দিতেন না। আশ্চর্য্য এই যে, বরিশালে তাঁহার কোন নিন্দা কেহ শোনে নাই। তিনি প্রশংসায় কখনও উৎফুল্ল হইতেন না। যেমন তিনি পরনিন্দা কখনও করেন নাই তেমনি নিরর্থক স্তোকবাক্য বা স্তুতিবাদ তাঁহাকে করিতে কেহ শোনে নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এ জীবনে তিনি পিতার পুত্র, শিষ্যের গুরু এবং গ্রন্থের লেখক হইবেন না। ঈশ্বর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাঁহার জীবন জয়যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যদের তিনি তাঁহার কোনও প্রকার স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বরিশালে যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতেন তথায় কয়েকটী স্কুল ও কলেজের ছাত্র থাকিত এবং এখনও থাকে। স্থানটী আশ্রমে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার নামানুসারে উহাকে 'জগদীশ আশ্রম' বলা হয়।

তিনি আশ্রমস্থ ছাত্রদিগের ও স্কুলের বালকদিগের নৈতিক জীবন গঠনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিতেন। একবার একটী ছাত্রকে আশ্রমে আনাইয়া নির্জ্জনে সৎপ্রসঙ্গান্তে তাহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, —'বাবা, এই হাত দুটী যেন চিরকাল ঈশ্বরের দিকে থাকে'। তদবধি ছাত্রটীর মনে ধর্ম্ম লাভের আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা জাগিল। ছাত্রটী ভবিষ্যতে অবিবাহিত থাকিয়া সৎচিন্তায় ও সৎকর্ম্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে এমন গাম্ভীর্য্য ও দিব্যশক্তি ছিল যে, কেহ তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। তাঁহার আদেশে কঠোরতাশূন্য দৃঢ়তা এবং প্রশ্রয়হীন স্নেহ ছিল। ছাত্রগণ পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নৈতিক ও দৈহিক অনুশীলন করে সেইরূপ উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজে সেতার বা এসরাজ বাজাইতেন। তাঁহার দেখাদেখি ছাত্রগণও সঙ্গীতচর্চ্চায় উৎসুক হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে তিনিই চিরতরে সঙ্গীতচর্চ্চা ত্যাগ করেন। ছাত্রগণ পাছে তাঁহাকে অনর্থক অনুকরণ করিয়া নিরামিষাশী হয় সেইজন্য তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিতও মৎস্য খাইতেন। আশ্রিত ছাত্রদিগের মঙ্গল কামনায় তিনি আজীবন এইরূপ কত ত্যাগ যে স্বীকার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার কুটীর গৃহে বা তাঁহার সম্মুখে কাহারো মিথ্যা বলিতে ইচ্ছা হইত না। মিথ্যা কথা বলিতে গেলেও সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িত। একবার একটী ছেলে পায়খানার পথে মলত্যাগ করিয়াছিল, অপরাধী ছেলেটী তাঁহার ঘরের মধ্যে বসা ছিল। আশ্রমের ম্যানেজার এই সংবাদ জগদীশকে দিলেন। ছেলেটী তখন বলিয়া উঠিল "বাহে করিয়াছি ত আমি, কিন্তু স্বীকার পাইব না কিছুতেই।"

ঋষি জগদীশকে তাঁহার (স্কুলের ও কলেজের) ছাত্রগণ 'স্যার' (Sir) বলিয়া ডাকিতেন। তাই যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ; বৃদ্ধা সকলেই তাঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিতেন। বরিশালের সর্ব্বত্রই তিনি এই নামেই পরিচিত। উত্তম স্বাস্থ্যের অভাবে তিনি

সাক্ষাৎভাবে কর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন নাই কিন্তু তিনি প্রকৃত সমাজ সেবক, স্বদেশ ভক্ত ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন। একবার তিনি বরিশালের প্রতিনিধি হইয়া কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গমন করেন। সমাজ সংস্কারেও তিনি খুব অগ্রণী ছিলেন। একটী বাল বিধবার পুনর্বিবাহের চেষ্টা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রয়োজন হইলে আমি এই বিবাহে পুরোহিতের কার্য্য করিব।' বরিশালের প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ উকিল রায় বাহাদুর গণেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়ের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ কর্ত্তা ছিলেন চিরকুমার ব্রহ্মচারী জগদীশ। শুদ্ধি সংগঠন অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অভিমত বরিশাল জিলার হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিরূপে প্রদত্ত অভিভাষণে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯২৬ খৃঃ কলিকাতায় 'পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরের' ভিত্তি প্রস্তর তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছুৎমার্গ মানিতেন না কিন্তু শুচিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠাবান হিন্দু-ব্রাহ্মণের মত ছিল অথচ তিনি অনুরুদ্ধ হইয়া বা আবশ্যক হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্বারা প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

জগদীশের কোন লৌকিক গুরু ছিল না। দীক্ষা ও গুরুকরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মহাপুরুষ যেমন গুরু হইতে পারেন, তদ্রূপ নিজের আত্মাও গুরু হইতে পারে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন 'বাসনামুক্ত শুদ্ধ মনই শেষে সাধকের গুরু হয়'। মহাত্মা ৺সোনা ঠাকুর তাঁহাকে একটী মন্ত্র জপের উপদেশ দিয়াছিলেন। তবে তিনি (জগদীশ) তাহা অল্প দিনই জপ করিয়া ছিলেন। শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট তিনি স্বপ্নে মন্ত্র বা সাধন পথের নির্দ্দেশ পাইয়াছেন এইরূপ কেহ কেহ বলিতেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহা অস্বীকার করেন। আবার তিনি কাহাকেও মন্ত্র দীক্ষা দেন নাই। দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি গায়ত্রী জপ করিতে উপদেশ দিতেন। শোনা যায় তিনি কোন কোন অনুরাগী ভক্তকে গায়ত্রী দীক্ষা দিয়াছেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন না। তিনি অদ্বৈতবাদী বেদান্তী ছিলেন। তাঁহার আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি উপাস্যরূপে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের একটী পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি যাহাতে লোকে তাঁহার আশ্রমে দেখিতে পায় সেইজন্য তাঁহার ভজনালয়টী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিতে শোভিত। ভগবৎ নাম সাধনার প্রতীক 'নাম ব্রহ্ম'ও তথায় সজ্জিত আছে। তিনি অতি উদার মতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন ও ধর্ম্ম সমন্বয়ে অচল বিশ্বাস করিতেন। একবার জনৈক উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্ম উভয়েরই যে সমন্বয়মুখী বিশেষ সংস্কার আবশ্যক তাহা কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের তুলনা দ্বারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—"In truth Christianity has to be rechristianisd and Vaishnavism has to be revaishnavised" তাঁহার সকল উপদেশের ভিত্তি ছিল 'গীতা' ও 'ভাগবত'। প্রতি রবিবার প্রাতে তাঁহার আশ্রমে নাম সংকীর্ত্তনান্তে তিনি শত শত নরনারীর নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন. শেষ বয়সে তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী কর্ত্তৃক শাস্ত্র ব্যাখ্যা করাইতেন।

তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন যে, আমার ঘরে যদি আগুন লাগে এবং এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, একটী মাত্র জিনিষ লইয়া বাহির হইতে পারি তবে আমি গীতাখানি লইয়া বাহির হইব এবং মনে

করিব যে, আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রক্ষিত হইল। আর যদি দুইটী জিনিষ লইয়া বাহির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে গীতা ও ভাগবত এই দুইটী সম্পত্তি লইয়া আত্মরক্ষা করিব। গীতা যে একাধারে রসাল সাহিত্য, সুযুক্তিপূর্ণ দর্শন ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মশাস্ত্র আচার্য্য জগদীশের ব্যাখ্যার ভিতর তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। গীতার শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। গীতা যে, সকল শাস্ত্রের সার এবং মানবজাতির ধর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় গ্রন্থ তাহা তিনি বুঝাইতেন। অবনত হিন্দুজাতির বাঁচিবার উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমারা এখন বাঁশির (বৃন্দাবনের) কৃষ্ণ ছেড়ে দাও, (কুরুক্ষেত্রের) পার্থ-সারথির উপাসনা কর।" জীবন-মরণের এই সন্ধিসঙ্কটে বাংলার হিন্দুগণ এই ঋষির আদেশ শিরোধার্য্য করিবে কি ? হিন্দু-জাতির মর্ম্ম বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিত। বাংলায় যদি হিন্দুগণ বাঁচিতে ও বাস করিতে চায় তবে জাতি-সম্বিতে উদ্বুদ্ধ হউক। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন জগদীশের হৃদয়-দেবতা এবং তাঁহার 'মুখপদ্মাৎ বিনিস্থত' গীতার ধর্ম্মই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। গীতাপাঠের সময় তিনি 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"এই জীবনই কুরুক্ষেত্র, 'কুরু', 'কুরু' 'কুরু'—কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর এই অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে।" তিনি জীবনে কর্ম্মকুণ্ঠতার প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করিতেন।

স্বাস্থ্যের অভাবে সেবাকার্য্য স্বয়ং না করিলেও সেবার আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। দেশ-কর্ম্মীদের অত্যাচারের বেদনা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। দেশের দুঃখ কষ্ট শ্রবণে অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইত। আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবক, বালক বা যুবক তাঁহার নিকটে আসিলে তাহাকে অতি কাছে বসাইয়া স্বহস্তে বাতাস করিতেন, কখনও বা এইরূপ লোককে নিজহস্তে কিছু খাওয়াইতেন। সেবাব্রতের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তজ্জন্যই বিশেষভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি এ যুগের আদর্শ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। শেষ জীবনের সুদীর্ঘ ১৯ বৎসর তিনি বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। তাঁহার সেবা-পরায়ণতা বাল্যকালেই অতিথিসৎকারপ্রিয়তারূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার গৃহে নিত্য অতিথি-সেবা হইত। একদিন অতিথিদিগকে খাওয়াইবার সময় ঘরে বেশী চিনি না থাকায় তাহাদের গুড় দেওয়া হয়। অতিথিরা উঠিয়া গেলে জগদীশ তাহাদিগকে চিনি না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, তিনি চিনি ভালবাসেন এবং ঘরে চিনি বেশী না থাকায় অতিথিদের গুড় দেওয়া হইয়াছে। তিনি ঘর হইতে চিনির পাত্র লইয়া এটোঁ পাত্র ফেলিবার স্থানে "খা, জগা, চিনি খা," বলিয়া সমস্ত চিনি ঢালিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি তিনি খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁহাদের 'চাপরাস্' আছে অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিবার প্রকৃত অধিকার আছে বলিতেন। বেলুড়মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সহিত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে একবার বরিশালে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'সমুদ্র ইব গম্ভীর' মহাপুরুষও হাততালি দিতে লাগিলেন। জগদীশ উন্নত সাধক ছিলেন। সাধারণ লৌকিক ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া সমস্ত শক্তি তত্ত্বোপলব্ধি ও ভগবৎ ভজনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে যোগস্থ মনে হইত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় এই দুইটী জগতের মাঝখানে স্থিত হইয়া তিনি যেন সমস্ত কর্ম্ম করিতেন। প্রায়শঃই তাঁহার মুখে শোনা যাইত "তপ, তপ, তপ, নহিলে

পত, পত, পত," অর্থাৎ সর্ব্বদা তপস্যা কর নচেৎ পতন অনিবার্য্য। শাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে প্রশ্নকর্ত্তা হয়ত নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে (যেন স্বীয় কল্যাণের জন্যই) তত্ত্বব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ। তিনি এইরূপ নিরভিমানী অনাসক্ত কর্ম্মযোগী সাধক ছিলেন। তিনি গুপ্তযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। একবার প্রাণায়াম বর্ণনা করিবার সময় একজনের হাত নিজের পেটের উপর রাখিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার নাভিমূলের নীচ হইতে শ্বাস উঠানামা করিতেছে কিন্তু নাভির উপরিভাগে কোন শ্বাস-ক্রিয়া নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের প্রার্থনাটী তিনি বড় ভালবাসিতেন। প্রহ্লাদ ভগবান নৃসিংহদেবকে বলিতেছেন :—"হে পরমাত্মন্, দুস্তর ভববৈতরণী পার হওয়ার জন্য আমি উদ্বিগ্ন নই। যাহাদের চিত্ত তোমার প্রেমাস্বাদনে বিমুখ এবং ইন্দ্রিয়-সুখ-রূপ মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে। সেইসব মূঢ়দের জন্যই আমার কষ্ট। আমি এই সব দীন ভাইসকলকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্ত হইতে অনিচ্ছুক।" আচার্য্য জগদীশের মুক্তির আদর্শ ছিল এই প্রকার। নিম্নলিখিত স্তোত্রটী তাঁহার অতি প্রিয় ছিল এবং তিনি স্বীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিত্য উহা আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিতেন। স্তোত্রটী এই :—

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাম্।
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া॥
চেতস্তু ভদ্রং ভজতামধোক্ষজে।
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥

অনুবাদ :—"বিশ্ববাসীর মঙ্গল হউক, খলব্যক্তি প্রসন্নভাব ধারণ করুক। প্রাণিগণ পরস্পরের প্রতি মনে মনে মঙ্গল চিন্তা করুক, আমাদের ভদ্রচিত্ত অধোক্ষজ হরির ভজনা করুক এবং আমাদের মধ্যে অহৈতুকী মতি প্রবেশ করুক।" আচার্য্যদেবের কয়েকটী উপদেশ পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব :—"মনঃসংযমই প্রধান সাধন॥ বাসনাই পুনর্জন্মের বীজ॥ সরলতা ধর্ম্ম জীবনের প্রথম ও শেষ সোপান॥ জীবন প্রার্থনা পূর্ণ কর, শান্তি পাইবে॥ মানুষের কাছে কোন আশা করিও না। স্বর্গ নরক এই দেহ, এই দেহেই স্বর্গ নরক ভোগ হইয়া যায়। মানব যখন ভগবৎ প্রেমে বা বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হয় তখনই স্বর্গ। আর শরীরে রোগ কষ্ট এবং মনে হিংসা, দ্বেষ, অপবিত্রতা থাকিলেই নরক॥ হাসি কান্না গাঢ় হইলে গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয়। গম্ভীর মানব হাসি কান্নার উপরে॥ যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসে নাম জপ হয় তাহাই করিতে হয়। আসন প্রাণায়াম না করিলে অভ্যাস দৃঢ় ও স্থায়ী হয় না॥ অন্তকোষ তৈলাধার, বীর্য্যই তৈলস্বরূপ, সূক্ষ্ম শিরারূপ শলিতা দ্বারা ঐ তৈল আকর্ষিত হইয়া সহস্রারে উঠিলেই দিব্য আলো দেখা যায়। সে আলোর তুলনা নাই, অতি স্নিগ্ধ, অতি নির্ম্মল। সহস্রারে যে সূর্য্য উদয় তন্মধ্যে নিজ ইষ্টমূর্ত্তি দেখা যায়॥"

ঋষি জগদীশের আদর্শ জীবন হিন্দু মাত্রকেই অনুধ্যান করিতে অনুরোধ করি। তিনি ছিলেন স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক। বাংলার স্কুল কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ তাঁহার জীবন সম্মুখে রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে বাংলায় নবযুগ আসিবে। অন্ততঃ তাঁহার কর্ম্মস্থল বরিশাল জেলায় যে, প্রায় একশত হাই স্কুল আছে এইসব স্কুলে তাঁহার ছবি স্থাপন করিয়া তাঁহার জীবনী ও বাণী আলোচনা হউক।' তাহাতে বালকগণ নবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে।

গান

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, এম্-এ (বিশ্ব-ভারতী)

ঐ যে যারা সবার নীচে
সবাই যাদের করে ঘৃণা,
আমি যে ভাই, তাদের দলে
তাদের দলের একজনা।
যারা হাড়ি মেথর মুচি
তাদের কাজে তারাই শুচি
বাঁচা যে ভাই, কঠিন হ'ত
তাদের নীরব সেবা বিনা।

সবাই মিলে আজকে যাদের
করছে এমন অপমান
আছেন যে ভাই, তাদের মাঝে
আমার প্রাণের ভগবান।
আছেন তিনি তাদের মাঝে
আছেন অতি গোপন-সাজে
তিনিই যে ভাই, নীরব-মুখে
বহেন তাদের লাঞ্ছনা।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদ নাই।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা সদ্বস্তুর ভেদ মানিতে হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয়, তাহা অসৎই হইবে এবং তাহা অসৎ বলিয়া তাহার প্রতিযোগী হওয়া অসম্ভব; সেই হেতু সেই অসদ্রূপপ্রতিযোগিবিশিষ্ট ভেদ বা অন্যোন্যাভাব সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই—ভেদ বলিতে বুঝিতে হইবে অন্যোন্যাভাব বা পরস্পরাভাব, যেমন ঘট পট নহে, পট ঘট নহে বা ঘটে পটত্বে অভাব এবং পটে ঘটত্বের অভাব। যাহাতে অন্যের অভাব তাহাকে অভাবের অনুযোগী বলে অর্থাৎ যাহা অভাবের আশ্রয়; আর যাহার অভাব অন্যে, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহা সেই অভাবের নিরূপক। অনুযোগিপ্রতিযোগীর জ্ঞান ভিন্ন অভাবের জ্ঞান হয় না। এই হেতু সেই অভাবের জ্ঞান অনুযোগিপ্রতিযোগীর অধীন। আর সেই অনুযোগী ও প্রতিযোগীকে সদ্রূপ হইতেই হইবে; অসদ্রূপ হইলে তাহারা অনুযোগী বা প্রতিযোগী হইবে না। এই স্থলে ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু অনুযোগী এবং সেই সদ্বস্তুতে অবস্থিত বিজাতীয়রূপ ভেদের অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীকে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহা অবশ্যই বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদিরূপ একান্ত অসৎ—শূন্য বা নিঃস্বরূপ হইবে। তাহা যখন নিজেই নাই তখন কি প্রকারে প্রতিযোগী হইবে? সেই হেতু একান্ত অসৎ প্রতিযোগী লইয়া সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদ কল্পনা হইতেই পারে না। এই কথাই বলিতেছেন :—

বিজাতীয়মসৎ তত্তু ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা
কুতঃ? ২৫ ॥

অন্বয়ঃ। (সতঃ) বিজাতীয়ম্ অসৎ, তৎ তু "অস্তি" ইতি ন খলু গম্যতে। অতঃ অস্য প্রতিযোগিত্বম্ ন, বিজাতীয়াৎ ভিদা কুতঃ স্যাৎ?

অনুবাদ—যাহা সদ্‌বস্তুর বিজাতীয় অর্থাৎ বিপরীত, তাহা অসৎই হইবে; তাহা কিন্তু কোন প্রকারেই, "আছে" এইরূপে বুদ্ধিগম্য হয় না, এই হেতু সেই 'অসৎ' প্রতিযোগী হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিজাতীয় হইতে সদ্বস্তুর ভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না।

টীকা—অনুবাদেই টীকার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; তবে 'অসৎ' শব্দের অর্থ লইয়া কিছু সন্দেহ উঠিতে পারে। সেই হেতু তাহার নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। যাহা 'সৎ' এর বিপরীত তাহা অসৎ। এই অসৎ দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা একেবারে নিঃস্বরূপ, যেমন আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি—যাহাদের প্রতীতি কোন কালেই হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যাহার স্বরূপ ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ জাগ্রৎ কালের স্থূল প্রপঞ্চ বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—উভয়ই মায়া বা মায়ার কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইয়া তিরোহিত হয়। প্রথম প্রকারের 'অসৎ' বস্তু, ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না—হংসডিম্বে অশ্বডিম্ব হইতে ভেদ আছে, বলাও চলে না, বুঝাও যায় না—এই কথাই শ্লোকে বলা হইল; কিন্তু এইরূপ সন্দেহ ত' হইতে পারে যে, মায়া ও মায়ার কার্য্য অর্থাৎ জাগ্রৎ কালের স্থূল প্রপঞ্চ এবং স্বপ্ন-কালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা পদার্থ, কেন ব্রহ্মে ভেদের প্রতিযোগী হইবে না? ব্রহ্মে ত সেই সেই প্রপঞ্চ হইতে ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে—যেহেতু ব্রহ্মের পারমার্থিকতার ন্যায় তাহাদের পারমার্থিকতা নাই, সেই হেতু তাহারা ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের সহিত, গ্রীবার উপরে, অবস্থিত মুখকে লইয়া দুইটি গণনা করা হয় না। কোনও রাজা স্বকীয় বাহন হস্তীর সহিত স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীকে লইয়া আপনাকে দুইটি হস্তীর স্বামী মনে করেন না। যদি বল সুষুপ্তিতে বা প্রলয় কালে, জাগ্রৎ প্রপঞ্চের বা সৃষ্টি প্রপঞ্চের বীজভূত অবিদ্যা বা মায়া, আত্মা বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, মানিতে হইবে; কেননা তাহা হইতে জাগ্রৎ প্রপঞ্চ ও সৃষ্টি প্রপঞ্চ বিনির্গত হয় এবং সেই বীজ হইতে ভেদ, আত্মায় বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, সুতরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চও সৃষ্টি প্রপঞ্চ সেই ভেদের প্রতিযোগী হইবে। তদুত্তরে বলা যায় যে, সেই ভেদ আত্মায়, বা সমাধিকালে ব্রহ্মে প্রতীত হয় না, বা অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধও হয় না, বরং শব্দপ্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" আর ব্রহ্মরূপ পারমার্থিক বস্তু হইতে ব্যবহারিক জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তিও সিদ্ধ হয় না, সেই হেতু সেই প্রপঞ্চ দ্বারা সৎ বস্তুর বিজাতীয় ভেদ হইতেই পারে না।

নির্ণীত সিদ্ধান্ত কথন

এক্ষণে যে অর্থটি নির্ণীত হইল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।
বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥২৬॥

অন্বয়—একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ সৎ সিদ্ধম্। অত্র তু বিহ্বলাঃ কেচন অসৎ এব ইদম্ পুরা আসীৎ ইতি অবর্ণয়ন্।

অনুবাদ—এইরূপে সদ্বস্তুটি যে এক এবং অদ্বিতীয়, ইহা নির্ণীত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বিচলিত হইয়া উঠেন; তাঁহারা বলেন 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল;

(ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১২) এবং সৃষ্টির পরে অর্থাৎ প্রলয় কালে, এই জগৎ পূর্ব্বের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বা বিলক্ষণতারহিত, শূন্য হইয়াই থাকিয়া যাইবে; কেবল মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে, ভ্রান্তিবশতঃ নামরূপ লইয়া প্রতীত হইতেছে। এই ভ্রান্তি নিরাধার। যে বস্তু আদিতে এবং অন্তে নাই, সেই বস্তু (অসৎখ্যাতি-বাদিগণের প্রদর্শিত মতে) মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায়, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মধ্যেও অস্তিত্ববিহীন। এই হেতু শূন্যই পরমতত্ত্ব। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে, জগতের প্রতীতিরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, ইহারা 'মাধ্যমিক' নামে অভিহিত হন। ইঁহারা শূন্যবাদী বৌদ্ধ।

শূন্যবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ

টীকা। এক্ষণে সৎস্বরূপ বস্তুটিই যে একমাত্র বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে শিষ্যবুদ্ধিকে দৃঢ় করিবার জন্য, স্থূণানিখননন্যায়ে—পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উত্তর-পক্ষ করিতেছেন। যেমন লোকে ভূমিতে খুঁটি পুতিয়া তাহা দৃঢ় হইল কি অদৃঢ় রহিয়া গেল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে নাড়িয়া, হেলাইয়া দেখে এবং যদি অদৃঢ় থাকে, তবে তাহার মাথায় আঘাত করিয়া অথবা মূলে চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরাদির সমর্থনা দিয়া তাহাকে দৃঢ় করে, সেইরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া, সেই সন্দেহের সমাধানপূর্ব্বক ও প্রমাণান্তর দ্বারা সমর্থন করিয়া বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিতেছেন। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ, অদ্বৈততত্ত্বসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং বলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব ছিল। ২৬॥

তাঁহাদের সেই চিত্ত-ব্যাকুলতা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—

শূন্যবাদীর ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ

মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্যধীঃ।
অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা
বিভেত্যতঃ॥ ২৭॥

অন্বয়—অব্ধৌ মগ্নস্য অক্ষাণি যথা বিহ্বলানি (ভবন্তি) তথা অস্য ধীঃ অখণ্ডৈকরসম্ শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা (ভবতি), অতঃ বিভেতি।

অনুবাদ—যেমন সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া (শব্দগন্ধাদি) নিজ নিজ বিষয়কে অবলম্বনরূপে না পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ শূন্যবাদীর অন্তঃকরণ ত্রিবিধ-ভেদরহিত অখণ্ড একরস বস্তুর কথা শুনিয়া এবং সেই হেতু তাহাতে নিজ কার্য্যকরী শক্তির অভাব আশঙ্কা করিয়া, ভয়প্রাপ্ত হয়।

টীকা—সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের দৃষ্টান্ত দিয়া শূন্যবাদীর ও সাকারবাদীর বুদ্ধির অদ্বৈততত্ত্বশ্রবণে বিহ্বলতা বুঝাইতেছেন, শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয় দ্বারা। অবশিষ্ট শ্লোকাংশ দ্বারা দৃষ্টান্তটিকে সিদ্ধান্তে যোজনা করিতেছেন। "অস্য"—এই অধিষ্ঠানব্রহ্মের জ্ঞানহীন শূন্যবাদীর এবং সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিহীন বহির্মুখ সাকারবাদীর—ইহাদের সকলকেই বুঝিতে হইবে। এস্থলে 'অস্য' এই পদের একবচন, জাতিবাচক অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধের সহিত সাকারব্রহ্মবাদিগণকেও ধরিতে-ছেন, কেন না সকলেই অনুভব করিতে পারে, বুদ্ধি, ভাব ও অভাবরূপ সাকার বস্তুই গ্রহণ করিতে পারে। শূন্য বা অভাব, ভাবরূপ বস্তুমাত্র দ্বারা সীমা-বদ্ধ বলিয়া সাকার। নিরাকার ব্রহ্মের কথা শুনিলে বুদ্ধি বিচলিত হইয়া উঠে। শূন্যবাদী সেই বিচলিততা নিবারণের জন্য শূন্য কল্পনা করিয়া বসে; তখন দেখে না যে শূন্যও সাকার। "ধীঃ" শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ; "অখণ্ডৈকরসম্ শ্রুত্বা

নিষ্প্রচারা (ভবতি)" —অখণ্ড বা অনুযোগিপ্রতি-যোগিরহিত এবং একরস বা ত্রিবিধভেদশূন্য, অদ্বৈততত্ত্বের কথা শুনিয়া প্রবৃত্তিরহিত বা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ নিজের কার্য্যকরী শক্তি আদৌ থাকিবে না বুঝিয়া, "বিভেতি"—ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৭ ॥

এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐকমত্য দেখাইতে-ছেন :—

গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্যযোগিনাম্।
সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে ॥২৮॥

অন্বয়—গৌড়াচার্য্যাঃ (গৌড়পাদাচার্য্যাঃ) সাকার ব্রহ্মনিষ্ঠানাম্ অন্য যোগিনাম্ নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ অত্যন্তম্ ভয়ম্ উচিরে।

অনুবাদ—সাকার ধ্যাননিষ্ঠ অপর যোগিগণ যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অত্যন্ত ভয় পান, তাহা গৌড়-পাদাচার্য্য (মাণ্ডূক্যকারিকায়, ৩।৩৯) বর্ণন করিয়াছেন।

(অনুবাদকের) টীকা—"সাকারধ্যাননিষ্ঠ"—যাঁহারা শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তির, কিম্বা বিরাটের, কিম্বা কোনও কল্পিত বস্তুর, ধ্যানে আসক্ত। "অপরযোগী" শব্দে—যাঁহারা সাকার বস্তুতে চিত্ত-যোজনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। "নির্ব্বিকল্পসমাধি"—ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা ইত্যাদিরূপ ত্রিপুটীর কল্পনা যে সমাধিতে থাকে না, সেইরূপ সমাধি। (রামানন্দযতি-বিরচিত "যোগমণিপ্রভা"র অনুবাদে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। "মাণ্ডূক্যকারিকায়"—মাণ্ডূক্য উপনিষদের বার্ত্তিক অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের উক্তিসমূহের, তদপেক্ষিত অথচ অনুক্ত বিষয়ের, অথবা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত উক্তি সমূহের, শ্লোকনিবদ্ধ ব্যাখ্যা। তাহার "অদ্বৈত" নামক তৃতীয় প্রকরণে। এই ব্যাখ্যা গৌড়পাদা-চার্য্যের বিরচিত। গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু। লোকপ্রসিদ্ধি আছে —ইনি সাক্ষাৎ শুকদেবের শিষ্য। ২৮॥

কোন্ বাক্যদ্বারা এই ভয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, গৌড়পাদাচার্য্য বিরচিত বার্ত্তিক বা মাণ্ডূক্য-কারিকাবচন উদ্ধৃত করিতেছেন—

অস্পর্শযোগো নামৈষ দুর্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥২৯॥

অন্বয়—অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ সর্ব্বযোগিভিঃ দুর্দর্শঃ, হি (যতঃ) যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ (সন্তঃ) অস্মাৎ বিভ্যতি।

অনুবাদ—নির্ব্বিকল্প সমাধি উপনিষচ্ছাস্ত্রে অস্পর্শযোগ নামে খ্যাত। ইহা সাকারধ্যাননিষ্ঠ সকল যোগীরই দুর্লভ; কেননা নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ ভীতিশূন্য অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে, যেমন বালক নির্জ্জনে ভয় পায়, সেইরূপ। নির্ব্বিকল্প সমাধির নাম অস্পর্শ যোগ, কেন না কোনও প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ (স্পর্শ) ইহাতে থাকে না। আচার্য্য শঙ্করের এই মত। কিন্তু অপর কেহ বলেন, ইহাতে বর্ণাশ্রমা-দির ধর্ম্মের, পাপরূপ মলের এবং সকল প্রকার অনাত্ম বস্তুর (স্পর্শ) বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং জীবকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করায় বলিয়া, ইহাকে অস্পর্শযোগ বলা হয়; ইহা নির্গুণব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীরই সুলভ; অন্যের পক্ষে দুর্লভ।

টীকা—"অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ"—"অস্পর্শ-যোগ" নামক নির্ব্বিকল্প সমাধি; "সর্ব্বযোগিভিঃ দুর্দর্শঃ"— সাকারধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণদ্বারা কষ্টসাধ্য অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতে-ছেন—"হি যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ"—যেহেতু পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতদর্শী সাকার ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ এই সর্ব্বভীতিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া ভয় পান, নির্জ্জন দেশে বালকের ন্যায়। "অস্মাৎ"—এই অস্পর্শযোগ হইতে; ভয়ের হেতু বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি। ২৯॥

সমালোচনা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা—প্রথম খণ্ড —অনুবাদক শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ। প্রাপ্তিস্থান ২২ পেয়ারা বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

গ্রন্থে মূল শ্লোকের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, মধুসূদনী টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। শাস্ত্রের বিবিধ বিষয় বিদ্বদ্বর শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহা অন্যত্র দুর্লভ, দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি টীকার মধ্যে আলোচিত হওয়ায় উহা সহজগম্য হইয়াছে। টীকার বঙ্গানুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা কেবল টানা বাঙ্গলা নহে উহা এমন ভাবে সজ্জিত করিয়া লেখা হইয়াছে যাহাতে কঠিন শব্দ ও বাক্যগুলির অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

অনুবাদকের তাৎপর্য্যে" ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, প্রভৃতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বা আলোচ্য বিষয়গুলি যাহা প্রসঙ্গ ক্রমে মধুসূদনী টীকায় গীতার মূল শ্লোকের ব্যাখ্যার জন্য ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আলোচিত হওয়ায় তৎ তৎ শাস্ত্রে অল্প পরিচিত ব্যক্তি সহজে বস্তুগুলি ধরিতে পারিবেন।

সম্পাদকের "ভাবপ্রকাশ" টীকার আলোচ্য বিষয়টী প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল করিয়া দিয়াছে। ইহাতে জটিলতা নাই অথচ আলোচ্য বিষয়টী সাধারণের সহজগম্য হইয়াছে।

মুদ্রাকর প্রমাদ বর্জ্জন বিষয়ে সম্পাদকের চেষ্টা প্রশংসনীয়। আসল টীকাটীও যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের পরি সমাপ্তি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বামী বোধাত্মানন্দ

বাঙ্গালা ধ্রুপদ-মালা—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—আর বি দাস, ৮ সি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ×৮ আকার ১১২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা বার আনা।

বাংলার সংগীতজ্ঞ মহলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বিশেষ সুপরিচিত। বহুকাল যাবত তিনি সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা ও অন্যান্য মাসিক পত্রে সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ ও স্বরলিপি প্রকাশ করে আসছেন। বাংলা ভাষায় অনেকগুলো ধ্রুপদ রচনা করে স্বরলিপি সহ বর্তমান পুস্তকে তিনি বাংলা সংগীতরসজ্ঞ জনগণকে উপহার দিয়েছেন। পুস্তকের ভূমিকা লিখেছেন সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কতকগুলো ধারণা এদেশের অনেকের মাঝেই বদ্ধমূল দেখা যায়। যেমন, ইংলিশ না বললে ভাষায় জোর আসে না, চলতি ভাষায় উচ্চতত্ত্ব আলোচনা করা যায় না, হিন্দী ভাষায় না হলে হিন্দুস্থানী সংগীত হতে পারে না। এ সব মনোবৃত্তির প্রকৃত কারণ যাই হোক, আত্মবিশ্বাসহীনতা যে তার একটা প্রধান কারণ তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রত্যেক দেশ বা জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য তার সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে চিন্তাধারায় প্রকাশিত হয়। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে কীর্ত্তনে বাউলের গানে, বাংলার লোকসংগীতেও রামপ্রসাদের গানে। ধ্রুপদ সংগীত বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি কয়েক শতাব্দী থেকে তার চর্চা হচ্ছে পশ্চিমে। সে দেশের ভাষা হিন্দীই তাই সংগীতের বাণীর আসন দখল করেছে। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি না হবার কারণ নেই, ইউরোপীয় সংগীত পর্যন্তও আজকাল বাংলা ভাষায় হচ্ছে।

যাঁরা বলেন, বাংলায় হিন্দু সংগীত হতে পারে না, তাঁদের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়।

সংগীতের তিনটি অংশ, কথা, সুর ও ভাব বা দবদ। সংগীতজ্ঞ যদি কবি হন তা হলেই সংগীতের কথা বা বাণী সংগীতের উপযোগী হতে পারে। হিন্দুস্থানী সংগীত আমরা যা শুনতে পাই, তার অধিকাংশের কথা অংশ অতি নগণ্য। আমরা দেখে সুখী হয়েছি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ সংগীত রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সূচনায় যে সব কথা লিখেছেন তাহা উপাদেয় হয়েছে। স্বরলিপি বিশুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক হয়েছে, অথচ গ্রন্থকার স্বরলিপিকে যথাসম্ভব সহজ সরল করবার চেষ্টা করেছেন। এ পুস্তকখানা শুধু সংগীতশিক্ষার্থীদের কাছেই নয়, সংগীতজ্ঞদের কাছেও সমাদর লাভ করবে। পুস্তকের ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান— শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত। দি ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ৯"×৬১/৪" আকারে ২৩১৮ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মূল্য দুই খণ্ড একত্রে দশ টাকা।

এই অভিধানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালে। নানা বৈশিষ্ট্যের জন্য তখনই ইহার খুব নাম হয়েছিল। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকর্ষতা লাভ করেছে। ইহাতে প্রায় এক লক্ষ পনের হাজার শব্দ স্থান পেয়েছে।

বাংলা দেশে আজকাল বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রকারের বাংলা অভিধান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সব দিক থেকে বিবেচনা করলে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অভিধানখানাকেই সবার উপরে স্থান দিতে হয়।

অভিধানের ভূমিকায় জ্ঞানেন্দ্রবাবু একস্থলে লিখেছেন, বাঙ্গালা ভাষার রূপ দান করিতে সংস্কৃত বা প্রাকৃতের যতই প্রভাব বা কৃতিত্ব থাকুক না কেন, অথবা সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার ধাত্রী বা মাতৃস্থানীয়া অথবা বাঙ্গালা সংস্কৃতের দৌহিত্রীস্থানীয়া বিবেচিত ও স্পষ্ট প্রমাণিত হউক না কেন, বাঙ্গালা বা হিন্দি যে সংস্কৃত নহে তাহা স্বীকার্য * * *।

অতি সত্য কথা। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান লিখতে গিয়ে বাঙালী লেখকগণ বারবারই ভুল করেছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে গিয়ে তাঁরা লিখে বসলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ আর বাংলা অভিধানও তাঁদের হাতে অনেকটা সংস্কৃত অভিধানের রূপ নিলে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রবাবু যথার্থই একখানা বাংলা অভিধান লিখেছেন।

এ অভিধানখানা আধুনিক অভিধান-রচনাবিজ্ঞান প্রণালী অনুসারে লিখিত। ইহাতে অল্পস্থানের মধ্যে বহুজ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণও দেওয়া হয়েছে। বাংলা বানান ধ্বনিগত নয়। তা ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে উচ্চারণের বিভিন্নতা দেখা যায়। সেজন্য উচ্চারণ জ্ঞাপক একখানা অভিধানের সত্যই অভাব ছিল।

বাংলা সাহিত্য বর্তমানে উন্নতির দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পারিভাষিক শব্দ ছাড়াও নানা নতুন নতুন শব্দ সাহিত্যিকদের হাতে রূপ নিয়ে সাহিত্যের সম্পদ বাড়াচ্ছে। তাছাড়া বহু দেশজ শব্দ এতকাল অনাদৃত অবজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। আধুনিক শক্তিশালী লেখকদের রচনাচাতুর্যে সেগুলো সাহিত্যে আসন পেয়েছে। অভিধানকারগণ এই অপাংক্তেয় শব্দগুলোকে অভিধানে স্থান দেন নি বা দিতে সাহস করেন নি। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ই বোধহয় প্রথম তাঁর চলন্তিকা অভিধানে এ শব্দগুলোকে স্থান দেন।

দেখে সত্যিই আনন্দিত হয়েছি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু অতি আধুনিক শব্দকেও তাঁর অভিধানে স্থান দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, নানা প্রাদেশিক শব্দও তাঁর অভিধানে স্থান পেয়েছে। ইতিহাস, ব্যাকরণ ও অভিধান-লেখকের যে উদার নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টির আবশ্যক হয় জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মধ্যে সে সবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। অভিধানের ভূমিকাটি অতি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা সফল হয়েছে। অভিধানের বর্তমান সংস্করণ লোক-প্রিয়তা অর্জন করে বাংলা সাহিত্যে গৌরবের আসন লাভ করবে।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

সাধনা—২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ২৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য বোর্ড বাঁধাই দেড় টাকা, সাধারণ পাঁচ সিকা।

পুস্তকখানায় বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ থেকে সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা মন্ত্র, দেবদেবীর স্তোত্রাবলী ও দেবদেবী বিষয়ক সংগীত সংকলিত হয়েছে। স্তোত্রাদির সরল অনুবাদও প্রদত্ত হয়েছে, তাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ উপকার হবে।

পুস্তকখানায় সমস্ত বিষয়গুলিই সুনির্বাচিত হয়েছে। বাঙালী পাঠক পাঠিকাদের কাছে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করবে, সন্দেহ নেই। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট সবই চমৎকার।

অমিতাভ দত্ত

বাঙ্গালীর সার্কাস—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ), লেখক শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু। ডাবল ক্রাউন্ ১৬ পেজী, মোট পৃষ্ঠা ২৬০, এন্টিক কাগজে ছাপা। প্রকাশক, শ্রীসৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পাব্লিসিটি ষ্টুডিও, ৩৬৭ অপার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ভূমিকা। মূল্য ১৸৹।

এই পুস্তকে বাঙ্গালীর শক্তি-সাধনা এবং ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনের ইতিহাস এমন বিশদ-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে পাঠক মাত্রই ইহা পড়িয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন। বাঙ্গালীর সার্কাসের উৎপত্তি এবং প্রসার বিষয়ে অনেক তথ্য ইহাতেস ন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে হয়, ইহা পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস, শ্যামাকান্ত, ভীমভবানী প্রভৃতি ব্যায়ামবীরগণ বাঙ্গালীর গৌরব। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস ইউরোপ এবং আমেরিকায় হিংস্র পশুর সহিত ক্রীড়া দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্যামাকান্ত সর্ব্বপ্রথমে বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ভীমভবানীর কুস্তি, ব্যায়াম কৌশল এবং বুকের উপর হাতী রাখা, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে।

প্রোফেসার বোসের সার্কাসের স্মৃতি এখনও বাঙ্গালীর অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। কবি মনোমোহন বসুর পুত্র প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসু ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বোসের সার্কাসের পুরুষ এবং স্ত্রী খেলাড়ীগণ ছিলেন বাঙ্গালী, তাঁহারা প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর নিকটই ক্রীড়াকৌশল শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বোসের সার্কাসে যেরূপ অদ্ভুত খেলা এবং খেলাড়ীর সমাবেশ ছিল, সেরূপ তদানীন্তন দেশী কিংবা বিদেশী কোন সার্কাসে কমই দেখা যাইত। বাঙ্গালীর সার্কাস এক সময়ে শুধু বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষে নয় সুদূর, চীন, জাপান, মলয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে ক্রীড়া দেখাইয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালীর দিগ্বিজয় ইতিহাসের ইহাও এক অধ্যায়।

বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সকল কাহিনী এবং অতীত যুগের বাঙ্গালী ব্যায়ামবীরদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে এই জাতীয় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সজীব; সৎসাহিত্য হিসাবেও ইহা উপভোগ্য। ইহাতে ৩১ খানা হাফ্‌টোন্ চিত্র আছে। পুস্তকের ছাপা এবং বাঁধাই উত্তম।

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরম ভক্ত, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (ব্যাঙ বাবু), ২৬নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার নিজ ভবনে গত ৯ই নবেম্বর, অপরাহ্ণ ৪—২৮ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবু মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের আত্মীয় এবং সহকর্ম্মী ছিলেন। সহিত্যক্ষেত্রে গিরিশবাবুর নিকট হইতে তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন; গিরিশ বাবুও নাটক রচনায় নানাভাবে দেবেন্দ্র বাবুর নিকট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর অসমাপ্ত নাটক "গৃহলক্ষ্মী" দেবেন্দ্র বাবুই সমাপ্ত করেন।

'উদ্বোধনে' দেবেন্দ্র বাবুর অনেক প্রবন্ধ এবং গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রেও তাঁহার গল্প এবং প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পরমহংস দেব' পুস্তক তিনিই রচনা করিয়াছেন। গল্প রচনায় তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার লিখিত গল্পে সর্ব্বদাই একটা উচ্চ আদর্শ এবং শিক্ষণীয় বস্তু দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যে ইহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে তাঁহার অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে তাঁহার শেষ রচনা 'শ্রীকৃষ্ণ' বঙ্গ সাহিত্যে এক অমূল্য সামগ্রী। 'চঞ্চরীকা' এবং 'বেজায় আওয়াজ' পুস্তকে তিনি হাস্যরসপূর্ণ রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'গিরিশ বক্তৃতা'র সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র বাবু অতি ধার্ম্মিক এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল; তিনি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। তাঁহার গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত অনেক সন্ন্যাসী এবং সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত, তাঁহার সহিত ধর্ম্ম এবং সাহিত্যালোচনায় সকলেই তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন প্রতিভাশালী লেখকের অভাব হইল।

সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ—গত ২১শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার দিন এই মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পূজাগৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য স্থানীয় বহু ভক্তের সমক্ষে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পট্টবস্ত্রের চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত সুদৃশ্য মর্ম্মর বেদীর উপর আবলুস কাষ্ঠের ফ্রেমযুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পূর্ণ প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছে। নবনির্ম্মিত পূজাগৃহের প্রবেশোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, অভিষেক, হোম ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি মঠের স্বামীজিগণ কর্ত্তৃক যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিদ্যার্থি-ভবনের ছাত্রগণ সমবেতভাবে বেদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেন। মঠের দ্বিতলস্থিত পুরাতন পূজাকক্ষের ঠিক পশ্চাৎভাগে এই কক্ষটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পুরাতন পূজাগৃহ বর্ত্তমানে প্রার্থনা-গৃহে পরিণত করা হইয়াছে। অবসর প্রাপ্ত ইন্‌জিনিয়ার মিঃ পি, এস্, নরসিংহ আয়ার মহাশয় এই পূজাগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা—গত ৭ঠা নভেম্বর শুক্রবার রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর তিরোভাব উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে এক স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নে পূজার্চ্চনা, হোম, ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান এবং অপরাহ্নে এক স্মৃতি-সভায় শুদ্ধানন্দজীর কর্ম্মময় সাধুজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জপানন্দ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর দিব্যচরিত্রের বৈশিষ্ট্য-গুলি--বিশেষরূপে যুবক ভারতের নিকট বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদকের অপরিশোধনীয় ঋণের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় শুদ্ধানন্দজী-লিখিত "স্বামিজীর অস্ফুট-স্মৃতি" নামীয় প্রবন্ধ হইতে বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সাক্ষাৎকার এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে তাঁহার অনুপ্রেরণা লাভ বিষয়ক বৃত্তান্তদ্বয় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের জন্য ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী শুদ্ধানন্দজীর নিকট কতদূর ঋণী তৎসম্বন্ধে বলেন। সভা ভঙ্গের পর সমাগত নরনারী ফল ও মিষ্ট দ্রব্যাদি গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুল্লাগড়া, (ময়মনসিংহ)—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় ময়মনসিংহের সুসং হালুয়াঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৩৫০০০ হাজং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সুখ‍আনন্দ তখন দৈবাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং হাজং জাতির মধ্যে প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার ও স্থানীয় লোকের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে কুল্লাগড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

বর্ত্তমানে আশ্রম হইতে হাজং, হদি, গারো প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। আশ্রমে একটী বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ৫১। আশ্রম হইতে সময় সময় দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধও প্রদান করা হয়।

আশ্রমে প্রতিবৎসর যথারীতি শ্রীশ্রীদুর্গা,পূজা

ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে গারো হদি হাজং বাঙালী মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রায় আট হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী প্রেমঘনানন্দ, স্বামী স্বানুভবানন্দ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বনবিহারী 'গোস্বামী' এবং সুসং রাজপরিবারেব বহু ব্যক্তি উপস্থিত থাকায় উৎসব বিশেষ শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যা-সেবাকার্য্য

১৪শ সাপ্তাহিক কার্য্য-বিররণী

২৭শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমাব অন্তর্গত মিশনের শিল্না ও নিজবা কেন্দ্র হইতে ৫০ খানি গ্রামেব ৮০২ সংখ্যক পবিবারের ৩১১১ জন অধিবাসীর মধ্যে ১১৩ মণ ৩৭ সেব চাউল বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০৩৩ কাপড় ও জামা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

১লা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে মুর্শিদাবাদ জেলার সদব মহকুমার অন্তর্গত মিশনের সর্ব্বাঙ্গপুর, পরেশনাথপুব ও কেদারচাঁদপুব কেন্দ্র হইতে ২২ খানি গ্রামেব ৭৩১টী পরিবারের ১২১৪ জন নরনারীর মধ্যে ৬৩ মণ ১৪ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া সেবাকার্য্যও করা হইতেছে।

সেবাকার্য্য আরও প্রায় ১ মাস চালাইতে হইবে এবং উভয় স্থানে ঐ উদ্দেশ্যে আমাদের অন্যূন ২০০০৲ টাকার প্রয়োজন। অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ও দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত পরিবারদেব জন্য আরও ২০০০ হাজাব বস্ত্রেব একান্ত আবশ্যক। যে কোন প্রকারেব সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে ও তাহাব প্রাপ্তিস্বীকাব কবা হইবে :—

১। সেক্রেটাবী, বামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড মঠ, জিলা হাওড়া।

২। ম্যানেজাব, 'উদ্বোধন' কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

৩। ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম
৪নং ওয়েলিংটন্ লেন, কলিকাতা।

স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ
সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন
৫।১১।৩৮

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

(শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বচিত)

শ্রীকালিদাস বায়, কবিশেখব

তৃষাতুব জ্ঞানপথে চলেছিল মহাতীর্থে যাবা
মরুসম প্রান্তবেব মধ্য দিযা বসতৃপ্তি-হাবা,
তাদেব দুস্তর পথ আস্তীর্ণ কবিলে ফুলদলে
হে কেশব বীবভক্ত। ধূলি তার তব অশ্রুজলে
হলো সিক্ত, ছায়াচ্ছন্ন হলো তাহা তব সাধনায়,
মায়াচ্ছন্ন সংসারীও সেই পথে আমন্ত্রণ পায়।
তত্ত্বে তুমি দিলে ভক্ত   বৈষ্ণবের বসের প্রেরণা
ধর্ম্মে পবিণত হলো   বিজ্ঞদের ব্রহ্ম-গবেষণা
হে কেশব ব্রহ্মানন্দ। অবতীর্ণ পুনঃ ভগবান,
প্রথম চিনিলে তাঁরে   সমর্পিয়া সর্ব্ব মনঃপ্রাণ,
আনন্দ চিনিল যথা   তথাগতে, অদ্বৈত যেমন
চিনেছিল শ্রীচৈতন্যে। ঠাকুবেব সার মর্ম্মধন
দুই পথ হ'তে এসে দুইজনে, ভাগ ক'রে নিলে,
অর্দ্ধেক নরেন্দ্র নিল, বাকি অর্দ্ধ তুমিই লভিলে।

আভিজাত্য-বেদী তুমি চূর্ণ করি নামিলে ধূলায়,
হর্ম্ম্যচূড়া ত্যজি তুমি বিভুপদে বাঁধিলে কুলায়
অনন্তের বার্ত্তাবাহী হে কপোত। দেবী সরস্বতী
তোমার শ্রীকণ্ঠে বসি সিংহপৃষ্ঠে যেন ভগবতী
ডাকিল তাপিত আর্ত্তে "পাপী তাপী আয় ছুটে আয়
কে জুড়াবি তপ্ত-প্রাণ জননীর অঞ্চল ছায়ায়।"

ক্ষুদ্রেরে সম্মান দিলে ঘুচাইলে তার সর্ব্ববাধা।
জননীর জাতি বলি দিলে তুমি নারীরে মর্য্যাদা।
শূদ্রেরে দ্বিজত্ব-দীক্ষা দিলে তুমি হে গুরু কেশব,
গৃহজীবনেরে তুমি দিলে নব সন্ন্যাস-গৌরব।
জাতিগঠনের মূলে তব শক্তি আছে গুপ্ত হ'য়ে,
মূল যথা পুষ্টিদান করে ক্রমে নিজে গুপ্ত র'য়ে।

কবে যে সফল হবে হে কেশব, স্বপন তোমার
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ে বিশ্বমহাধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার
কেবা জানে? তাই ব'লে ব্যর্থ নয় তোমার সাধনা,
তোমার জীবন ব্রহ্মে নিবেদিত। তব আরাধনা
নয় তুচ্ছ দীপে ধূপে গন্ধপুষ্পে নৈবেদ্যে ব্যজনে,
প্রাণের সর্ব্বস্ব দিয়া কায়-মনো বাক্য-নিবেদনে
এ অর্চ্চনা ব্যর্থ নয়, সাম্যমৈত্রী-বাণীর প্রচার
ব্যর্থ নয়, সুপ্তবঙ্গে জাগরণী মন্ত্রের হুঙ্কার
প্রেরণা দিয়াছে নব আশাময় যুগ-প্রবর্ত্তনে,
সবি অঙ্গীভূত আজ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে।

বহুশত বর্ষ আয়ু নিয়ে আয়ুষ্মন্ এলে ধরাধামে
একশত হলো শেষ, আজি তব পুণ্যশ্লোক নামে
শিহরি জেগেছে বিশ্ব, জীবনের আজি সুপ্রভাত,
পাঠানু উদ্দেশে তব ছন্দে গাঁথা মোর প্রণিপাত।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র

সম্পাদক

বর্ত্তমান ভারতের প্রথম জাগ্রত মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের আরব্ধ কার্য্য পরিচালনের জন্য বঙ্গদেশে যে কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কারক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহার সমসাময়িক সকল শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোরাজ্যে এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি সমাজসংস্কারে, কি রাজনীতিক আন্দোলনে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি বিজ্ঞানের অনুশীলনে, কি সাহিত্যসাধনায় তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে যে সকল মনীষী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই মহাত্মার নিকট অল্পাধিক পরিমাণে ঋণী। নব্য বঙ্গের নায়ক আচার্য্য কেশবের মহিমময় জীবনের সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহার সময়ে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা আবশ্যক।* আমরা প্রথমতঃ অতি সংক্ষেপে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

ইংরাজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানোন্নত পাশ্চাত্য সভ্যতার অজেয় আক্রমণে ভারতের ধর্ম্মে ও সমাজে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহন রায় জাতিকে এই বিপ্লবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহক খৃষ্টধর্ম্মের গতিরোধের জন্য উপনিষদের নিরাকার সগুণ ব্রহ্মবাদ সহায়ে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। প্রবল বাধা সত্ত্বেও রামমোহনের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হয়। আজ যে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে সংস্কারপ্রচেষ্টা দেখিতে পাইতেছি, প্রতিভা ও সংগঠনী শক্তির মূর্ত্তপ্রতীক রাজা রামমোহন ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। সহমরণ নিবারণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি তাঁহার অমর কীর্ত্তি। এই লোকোত্তর মহাপুরুষের তিরোধানের পর পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজ পরিচালন করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের স্বনামধন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার প্রচার-কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং মহর্ষি নামে আখ্যাত হন। তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন। আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের চেষ্টা ও মূর্ত্তিপূজাবিরোধী সগুণ ব্রহ্মবাদপ্রচার ইহার বিশেষত্ব। এই সভার মুখপত্ররূপে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তক দয়ারসাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিখ্যাত লেখক ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষিগণ এই পত্রিকার লেখক ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদান্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মসমাজের একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। প্রতিবাদের চাপে পরবর্ত্তী কালে মত পরিবর্ত্তন করিয়া মহর্ষি বেদের অভ্রান্তত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার মূলে উপনিষদের নিরাকার

সগুণ ব্রহ্মবাদ অবলম্বনে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' মদ্যপান, বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক দোষগুলির বিপক্ষে এবং বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির পক্ষে জোরের সহিত প্রচার-কার্য্য চালাইতে থাকে। মহর্ষির নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' দ্বারা পরিচালিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজের সম্পাদক এবং সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি প্রচারক ছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ ইংরাজী ভাষায় "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি?" নামক একখানি সুচিন্তিত পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন। এই সময় তাঁহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর ছিল। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইকালে তপস্যা ও অধ্যয়নের জন্য হিমালয়ের নির্জ্জন শান্তিময় ক্রোড়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি দুই বৎসর পর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্বান ও বুদ্ধিমান কেশবকে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারকরূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কেশবের অকৃত্রিম ধর্ম্মভাব, জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও অনন্যসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া এই সময় দেশের শিক্ষিত যুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে থাকেন। বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি খৃষ্টান মিশনারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্যে তিনি সাফল্যলাভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতের রাজনীতিক ও সমাজনীতিক সংস্কার-বিধানের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত সাংবাদিক হরীশ-চন্দ্র মুখার্জ্জির সম্পাদকতায় "ইণ্ডিয়ান মিরর", কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদকতায় "হিন্দু পেট্রিয়ট" এবং নারীজাতির উন্নয়নের জন্য "বামা বোধিনী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি দেশের সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের জন্য বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কেশবের উদ্যোগে তথায় সাহায্য প্রেরণ করা হয়। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ব্রহ্মমন্দিরে আহূত এক সভায় তিনি "প্রাণ দানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি" প্রবচন অবলম্বনে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কেশব ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সমাজের 'আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। ইহার ফলে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ব্রাহ্ম-সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। রামমোহনপন্থী ও নব্যসংস্কারক ব্রাহ্মদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামক দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও কেশবের অধ্যক্ষতায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' পরিচালিত হইতে থাকে। আচার্য্য কেশব এই সময় হইতে জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির আশ্রয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মমত সমূহের গৌণ বিষয়গুলি পরিহার করিয়া উঁহাদের মুখ্য বিষয় অবলম্বনে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের মত ও পথ বিভিন্ন হইলেও এক ঈশ্বরই সকল ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ইহাই তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের ভিত্তি। এই উদার সার্ব্বভৌমিক সমন্বয় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তিনি জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণকে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব-প্রেমে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে এই সময় কেশব-চন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে' খোল-করতালসহ সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। ইহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমর্থন মনে করিয়া এক শ্রেণীর প্রগতিশীল সংস্কার-পন্থী তাঁহার উপর বিরক্ত হন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কেশব ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিকতা প্রচারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, মোক্ষমূলর, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। তাঁহার বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের অনেকে ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। কেশব বিলাত হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে মহা-সমারোহে অভিনন্দিত করা হয়। এই সময় সমাজের একটি সঙ্গতে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের তুলনা করিয়া তিনি বলেন,—

"পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায়, আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে হৃদয়গত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের কার্য্য করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। বিলাতে তাহা বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আমাদিগকে ভাল গুণগুলি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তথাকার সদগুণ সকল আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।" *

ইহাই যে ভারতের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে আনীত কয়েকটি উপহার লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের মধ্যে অনেক সদ্ভাবের কথা বার্ত্তা হয়। মহর্ষি বলেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ম্মপ্রণালী, সংকীর্ত্তন ও ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার সমর্থন ছিল না বটে কিন্তু এখন আর তাঁহার সে ভাব নাই; তবে সমাজ যে খৃষ্টের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখায় এবং খৃষ্টানী ভাব সমর্থন করে, ইহা তিনি পছন্দ করেন না। এই আলোচনার পর মহর্ষি-পরিচালিত 'আদি ব্রাহ্মসমাজে'র সহিত আচার্য্য কেশব-পরিচালিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজে'র মিলনের চেষ্টা হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কেশবের খৃষ্টপ্রীতি সমর্থন না করায় ইহা সফল হয় নাই। যজ্ঞোপবীত লইয়াও মহর্ষির সঙ্গে কেশবের মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহ বিধিবদ্ধ হইলে দেবেন্দ্রনাথ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন কেশবের বিপক্ষে আরও একটি শক্তিশালী দল ছিল। বাংলার রক্ষণশীল সমাজ স্যার রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রাজা রামমোহনের বিপক্ষে যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, উহা পরবর্ত্তী কালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিম-চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, নবীনচন্দ্র, গিরিশ-চন্দ্র প্রভৃতি এবং প্রচার-ক্ষেত্রে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতির ভিতর দিয়া আধারভেদে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে কেশবের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশব যখন পূর্ণোদ্যমে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত, তখন রামমোহনের সংস্কার ও রাধাকান্তের রক্ষণশীল ভাবধারার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আপনার মধ্যে বিকশিত করিয়া বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় আদর্শের মূর্ত্তপ্রতীকরূপে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে করিয়া জয়গোপাল সেনের প্রদত্ত বাগান বাটীতে যাইয়া আচার্য্য কেশবের সঙ্গে দেখা করেন। ঠাকুর কেশবকে দেখিয়াই বলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করে থাক। ঐ দর্শন কিরূপ আমার জানতে বাসনা, সেজন্য তোমাদের নিকট এসেছি।" ইহার উত্তরে তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। কিছুক্ষণ পর "কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দরশনে না পায় দরশন" গানটি গাহিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পর ঠাকুর অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্য বিবরণ, ৩য় অংশ, ৫৬৫ পৃঃ।

সকল এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিতে লাগিলেন। কেশবকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ল্যাজ খসেছে!" ইহার অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ঠাকুর বলিলেন, "ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠতে পারে না, কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে, তখন জলেও থাকতে পারে, ড্যাঙাতেও বিচরণ করতে পারে—এই রকম মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপে ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকতে পারে, ঐ ল্যাজ খসে পড়লে সংসার ও সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারে। কেশব, তোমার মন ঐরূপ হয়েছে, উহা সংসারেও থাকতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।" প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুর কেশবকে কিরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই বাক্য হইতে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট।

ইহার পর হইতে কেশব মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কখনও বা তাঁহার ঘরটিতে বসিয়া এবং কখনও বা নৌকাদি যোগে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার কথামৃত শ্রবণ করিতেন। কেশবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা না হইলে ঠাকুর বিশেষ অভাব অনুভব করিতেন। কেশব কয়েক দিন দক্ষিণেশ্বরে না আসিলে ঠাকুর তাঁহার বাড়ী যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। এই কালে ঠাকুর একদিন কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যা কর, নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম সাকার নিরাকার দুই-ই মানে, নানা ভাবে ঈশ্বরের পূজা করে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। যেমন রোসনচৌকিওয়ালা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে, কিন্তু আর একজন, তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগিণী বাজায়।" এই বাক্যে কেশবের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ঠাকুরের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে। ঠাকুর কেবল সমাজের প্রতি সহানুভূতি দেখান নাই, পরন্তু বিজয়-কৃষ্ণ, শিবনাথ প্রমুখ সমাজের অনেকের—বিশেষ করিয়া কেশবের আধ্যাত্মিকতার তিনি উচ্চপ্রশংসা করিতেন। ঠাকুর কেশবকে কিরূপ ভাল বাসিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে বেশ বোঝা যায়: কেশবের অসুখ হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনে-ছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো, মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব? তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম।" কেশবের দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐ সংবাদ শুনে আমি তিনদিন শয্যা ত্যাগ করতে পারি নাই, মনে হয়েছিল যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়ে গিয়েছে।"

কেশবও ঠাকুরের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসি-তেন এবং তাঁহার কলিকাতার 'কমলকুটির' নামক বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেন। প্রতি বৎসর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবের সময় তিনি ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া আনন্দ করিতেন। ঠাকুরের প্রতি তিনি এত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ দান কালে ঠাকুর অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে তিনি উপদেশ সমাপ্ত না করিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন। অনেক সময় বেদী হইতে শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঠাকুরের উপদেশ আবৃত্তি করিতেন। রাম-চন্দ্র, মনোমোহন প্রমুখ ভক্তগণকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য

নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, ইঁহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়; অযত্ন করিলে এঁর দেহ থাকবে না। যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিষ গ্লাসকেসে রাখতে হয়।" একদিন পরমহংসদেব কেশবকে বলিয়াছিলেন, "কেশব তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধকর, আমাকে কিছু বল।" কেশব সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন, "মশায়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচতে বসবো? আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দু'চারিটি কথা লোককে বলামাত্র তারা মুগ্ধ হয়।" ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান্ মিরর" পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় ব্রাহ্মসমাজ-পরিচালিত "সুলভ সমাচার," "থিষ্টিক্ কোয়াটার্লি রিভিউ" প্রভৃতি পত্রিকায়ও ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ইহার ফলে পরমহংসদেবের প্রতি দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় তৎকালীন একটি প্রভাবশীল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াচার্য্য পরমহংস দেবের এইরূপ প্রশংসা ঔদার্য্যের পরিচায়ক।

ব্রাহ্মসমাজের উপর কেশবের একচ্ছত্র প্রভাবের বিরুদ্ধে ১৮৭১—৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ ক্রমেই সংঘবদ্ধ হইতে থাকেন। এই সময় কেশব কোন কোন বিষয়ে পাশ্চাত্য ভাব ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ভাব সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলে পাশ্চাত্যপন্থী নব্যসংস্কারকগণের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই শ্রেণীর সকলে সমবেত হইয়া 'সমদর্শী' নামে একটি সংঘ গঠন করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা আনন্দমোহন বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠ-তাত দেবেন্দ্রমোহন দাশ, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীলেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কেশবের দল ও 'সমদর্শী' দলের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া সাধারণ-তন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজের কার্য্যপরিচালনের ব্যবস্থা করিলে এই বিরোধের অবসান হয়। কিন্তু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কেশব তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ব্রাহ্ম-সমাজের নির্দ্দেশিত বয়সের কিছু পূর্ব্বে কুচবিহারের মহারাজার সহিত বিবাহ দেওয়ায় এই দুই দলের মধ্যে আবার বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার একমাস পরই 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' দ্বিধা বিভক্ত হয়। বিজয়কৃষ্ণ ও শিবনাথের অধ্যক্ষতায় "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে সমর্থন করিয়া 'বাণী' পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কেশব "নববিধান" স্থাপন করেন। সাধারণ ও নববিধান সমাজের বিরোধের ফলে সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উভয় দলের লোকই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং ঠাকুর উভয় দলের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। একদিন কেশব ও বিজয় একই সময়ে নিজ নিজ ভক্তগণসহ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার উপদেশে উভয়ের মনোমালিন্য দূর হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাকার মূর্ত্তিতে বিশ্বাসী হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়াই বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মনে করিয়া এবং দক্ষিণেশ্বরে বেশী যাতায়াত করিলে সমাজের অস্তিত্ব থাকিবে না ভাবিয়া সাধারণ সমাজের আচার্য্য শিবনাথ শেষে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত বন্ধ করেন।

এই সময় কেশব-পরিচালিত 'নববিধানে' সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের মাহাত্ম্য প্রচারের ভিতর দিয়া আমরা পৌরাণিক ধর্ম্ম ও ভক্তিবাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য দেখিতে পাই। নববিধানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে একটি বক্তৃতায় আচার্য্য কেশব বলিয়াছিলেন,—

"বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, পৃথিবী, শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রহ্মসমাজ-গর্ভে ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসব-যন্ত্রণার পর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই শিশুর অন্তরে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে। শিশুর মুখের ভিতরে সরস্বতীর মুখ লুক্কায়িত রহিয়াছে। পূর্ণলক্ষ্মী পূর্ণাকারে তাঁহার হৃদয়ে অনুপবিষ্ট। • ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশ কোটি দেবতাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীর যত ভাবের যত অবতার হইয়াছেন, শিশু সকলকে আপনার ভিতর এক করিয়া লইয়াছেন।" ১

ইহা ছাড়া কেশব তাঁহার "আধ্যাত্মিক দুর্গা-পূজা", "মহাবিদ্যার পূজা", "লক্ষ্মীপূজা", "নিরাকার গণেশের পূজা", "জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজা" শীর্ষক বিখ্যাত বক্তৃতাগুলিতে হিন্দুদেবদেবী ও অবতারগণকে দার্শনিকতত্ত্বের দিক দিয়া নিরাকার রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দেবদেবী ও অবতারবিরোধী ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে ইহা নূতন ব্যাপার। একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক এবং শ্রীচৈতন্য সেই ধর্ম্মের সংস্কারক। ২ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে—বিশেষ করিয়া নববিধানে মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা এবং উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে ইহার অভিব্যক্তি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন। কেশব যে পূর্ব্বে শক্তিকে মানিতেন না, পরে মানিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার 'জীবনবেদ' গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,—

"মার পানে তাকাইব কেমন করিয়া জানিতাম না। কেবল পিতাকে ডাকিতাম, মার অন্তঃপুরের দ্বার তখন খোলা হয় নাই। কেহ বলিয়াও দেয় নাই কোন পথে মাকে দেখা যায়। জননী সমান পালন করেন' শুনিতাম কেবল রূপকজ্ঞানে। ভক্তির উচ্ছ্বাস হয় নাই. মা বলিবামাত্র তখন প্রাণ একেবারে মাতিয়া উঠিত না, অল্পই কাঁদিতাম। * * মা বলিতে শিখিলাম। মা-নামের মধ্যেও কতরূপ দেখিলাম। কত ভাবেই মাকে ডাকিলাম। কখনও শক্তিসহ আনন্দ-সংযুক্ত দেখিলাম, কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম। মার রূপ নানাভাবে মা দেখাইয়াছেন, আরও কত ভাবের রূপ সম্মুখে আসিতেছে। কেহ যেন না বলে মার সব রূপ দেখিয়াছি।"১

কেশব যে ঈশ্বরকে কেবল পিতৃ-মাতৃভাবেই উপাসনা করিতে ব্রাহ্মগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নহে, প্রচারকার্য্য উপলক্ষে বাণীগঞ্জ গমনের কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্ম-মন্দিরে ঈশ্বরকে সন্তান রূপে বাৎসল্য ভাবেও আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"যে ভাবে পিতামাতা আপনাদিগের শিশু-সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা হয় না সেইরূপ বাৎসল্য ভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি? প্রাণের মধ্যে রাখি? ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে? গোপাল আসেন পৃথিবীতে খেলা করিতে। আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে ভালবাসেন। * * বাৎসল্য ভাবে উপনিষদের ব্রহ্মকে পূজা করা পরিহাসের কথা নহে। আমি গোপালের শিশুভাব দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম।" ২

কেশবের এই পৌরাণিক ধর্ম্মপ্রীতি, মাতৃভাবে ও বাৎসল্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনার মধ্যে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বিদ্যমান তাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আচার্য্য কেশব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি কেবল ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ প্রচারক রূপেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নাই,

১ আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অন্ত্যবিবরণ, প্রথম অংশ, ৯৬ ও ৯৭ পৃষ্ঠা।

২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, ষষ্ঠ অংশ, ১০৯০ পৃষ্ঠা।

১ জীবন-বেদ, ৫৮ পৃষ্ঠা।

২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ, পঞ্চম অংশ, ১০৬৪ ও ১০৬৫ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান ভারতের সকল বিভাগের একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলিয়াও তিনি সর্ব্বজনসম্মানিত। রাজা রামমোহন জ্ঞান-বিচারের উপর ভিত্তি করিয়া যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন, আচার্য্য কেশব উহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহাপুরুষের দেশভক্তি ছিল অসাধারণ। ভারতে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। দেশের সর্ব্ববিধ গঠনমূলক কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জাতীয়তা বা স্বদেশসেবা ধর্ম্মবিরোধী ছিল না। ধর্ম্ম ছিল তাঁহার প্রাণ। তিনি সংসারে থাকিয়াও মহাবৈরাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য প্রচ্ছন্ন এবং অনাড়ম্বর ছিল। আপনার সুখ-সুবিধার দিকে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গোবরডাঙ্গার জমিদারের বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে কেশব তাঁহার একটি ছেঁড়া জামা ভদ্রাকার করিয়া লইবার জন্য ভক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের নিকট ছুঁচ সুতা চাহিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় হয় যে, দেশের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি আপনার বেশ-ভূষার প্রতি কিরূপ উদাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন যথার্থই ব্রহ্মজ্ঞানী। সংসারে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বিষয়ী ছিলেন না। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি সর্ব্ববিধ দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন,—

"আর বিষয়ীর মত চলিতে পারিব না। আর পশুভাব রাখিতে পারিব না। ** মা, আমার সহধর্ম্মিণী যিনি হইলেন, তিনি পবিত্রাত্মা হউন। তিনি ধর্ম্মের তেজে পূর্ণ হউন। মা, নববিধানে যুগল-সাধনের দৃষ্টান্ত এই হতভাগা হতভাগিনী দেখাক।" ১

সংসারী হইয়াও কেশবের এই কামগন্ধহীন জীবনের আদর্শ এই কামকলুষ যুগে তাঁহার দেশ-বাসীর অনুকরণীয়। তাঁহার নিকট ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, আর সকল অবস্তু ছিল। তিনি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন?" শীর্ষক বক্তৃতায় কেশব বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরেরই কার্য্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তিনি অপর একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার আমিত্ব তাঁহার ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে। তাঁহার 'আমার' বলিতে কিছুই নাই। কেশব মানুষকে ব্রহ্মের অভিব্যক্তিরূপে দর্শন করিতেন। তিনি বলিতেন যে, মানুষ কেবল মানুষ নয়, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। পিতার স্বরূপের সঙ্গে সন্তানের স্বরূপের কোন পার্থক্য নাই। "আমি মানুষের পশুত্ব দেখিব না; থাক না পশুত্ব, আমার কি? আমি মানুষের ব্রহ্মভাবই দেখি।" ২ নববিধান স্থাপনের চারি বৎসর পর এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। আমরা বর্ত্তমান ভারতের এই সর্ব্ব-জনমান্য সংস্কারাচার্য্যের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

(১) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অন্ত্যবিবরণ, তৃতীয় অংশ, ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

(২) আচার্য্য কেশবচন্দ্র, অন্ত্যবিবরণ, তৃতীয় অংশ, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর পত্র

ওঁ

Sree Ramkrishna Home
Brodies Road, Mylapore, Madras
22nd March, 1914

শ্রীমান্ শি—,

তোমার ৯ই ফেব্রুয়ারির বিস্তারিত পত্রপাঠে সমুদয় অবস্থা সবিশেষ অবগত হইলাম। ইতিমধ্যে ঠাকুরের উৎসবে এবং নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে ব্যাপৃত ছিলাম। কাঞ্চীপুরী, মাদুরা, রামেশ্বর, ধনুষ্কোটি, শ্রীরঙ্গম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম্ —দাক্ষিণাত্যের এই সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া গত পরশ্ব এখানে প্রত্যাগত হইয়াছি। এখনও বোধ হয় এখানে মাস দুই থাকিব—তার পর বাঙ্গালোরে গিয়া কিছুদিন থাকিবার সংকল্প।

তুমি যে সকল দুঃখের কথা লিখিয়াছ, তাহা বাস্তবিকই সত্য কথা। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, এসকল দুঃখ কি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লও নাই? অতএব এক্ষণে মন যতই অস্থির হউক, চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে যতদূর সম্ভব শান্তিতে থাকিতে পার, আর ভবিষ্যতে যেন আরও অধিক দুঃখমায়ায় জড়িত না হইয়া পড়। তোমার মন এখনও যে উচ্চসুরে বাঁধা আছে, ইহা জানিয়া পরম সুখী হইলাম—আমার কেবল বক্তব্য সুরটীকে ক্রমে এক এক গ্রাম আরও উচ্চে চড়াইয়া দেও। Environmentকে ignore করিতে বলি না, ignore করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সাধ্য কি তাহা কার্য্যে পরিণত কর? তবে সাধনার শেষাবস্থায় উহা সম্পূর্ণ নিঃশক্তি হয় বটে, কিন্তু সাধনা জিনিষটাই হচ্চে, মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে environmentএর struggle. উন্নতি করিবার সুতরাং দুটী মাত্র উপায় আছে। এক —বলপূর্ব্বক environment ছাড়াইয়া নূতন অনুকূল environmentএ আপনাকে অবস্থাপিত করা, অথবা ঐ environmentএর ভিতরে থাকিয়াই যথাসাধ্য উহার সহিত struggle করিয়া আভ্যন্তরিক বলবীর্য্য সংগ্রহ করা। নতুবা যদি environmentএ গা ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

আর এক কাজ করিবার চেষ্টা করিতে পার :— যখন তোমার ধর্ম্মচর্চ্চায় opportunities আছে, কিছুর সঙ্গে তোমার খাপ খায় না, তখন তোমার নিজের চতুর্দ্দিকে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী এমন একটা সঙ্গ গঠন করিয়া লইতে পার, যাহার দ্বারা তোমার উপকার হইবে এবং তাহারাও তোমার দ্বারা উপকার পাইবে। তোমার ভিতর অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে রহিয়াছে। এ বিশ্বাস কখন ভুলিও না।

তারপর আর এক কথা। যাহার ভিতরে উচ্চভাবের এতটুকু প্রেরণা আসিয়াছে, সে কেবল vegetating life lead করতে চায় না, তার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে থেকে কি ভাবে কার্য্য করতে হয়, তা শ্রীভগবান্ গীতায় সুন্দরভাবে বুঝিয়ে গেছেন। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' তুমি যা কর্ম্ম করবে, খুব উচ্চ উদ্দেশ্য থেকে করে যাবে—তার ফলাফলের দিকে দেখ্‌বে না। তুমি ছাত্রদের উপর যে সকল দোষারোপ করেছ, একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখ্‌লে বুঝ্‌বে—সে দোষ ছাত্রদের নহে—তোমাদের অর্থাৎ—শিক্ষকদের প্রধান দোষ।

স্বামীজি একবার শিক্ষা সম্বন্ধে এক বক্তৃতায়

বলেছিলেন, "Education is the unfolding of the divinity which is already in man." আর শিক্ষকদের উচিত ছাত্রদের ভিতর sleeping Brahmanকে কেন জাগরিত করতে পারছেন না, এই ভেবে বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করা। আর এমন কি শিষ্যদের ভিতরও originality encourage করা উচিত। ফলাফলের দিকে দেখো না। উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষ বা অভিভাবকদের অসন্তোষভাজন হবে, সে দিকে লক্ষ্য কোরো না। লক্ষ্য করিও একটা উচ্চ আদর্শের উপর। নিজেকে সেই আদর্শে গড়বার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর—সঙ্গে সঙ্গে যাদের সংস্পর্শে আসবে—তাদের ভিতরও সেই আদর্শ জাগাবার চেষ্টা কর। এই যদি কর, তবে ধর্ম্মও হবে, সঙ্গে সঙ্গে অর্থও হবে। জীবনে শান্তি পাবে। যীশুখ্রীষ্টও এইরূপ একটা কথা বলেছিলেন—"First seek ye the kingdom of heaven and its righteousness and all other things shall be added unto you."

এখান থেকে রামস্বামী আয়াঙ্গার নামক এক ব্যক্তি কি আমার নাম করে এই মঠ থেকে বেদান্তকেশরী নামে যে এক ইংরাজী মাসিক বার করবার কল্পনা হচ্ছে, তার জন্যে প্রবন্ধ চেয়ে তোমায় এক পত্র লিখেছিলেন? আমার ভালবাসা জানিবে। আশা করি, তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল।

ইতি তোমারই
শুদ্ধানন্দ

আমাদের মাতাঠাকুরাণী

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীসারদামণি দেবীই মাতাঠাকুরাণী বলিয়া পরিচিতা। তিনি মাত্র আঠার বৎসর পূর্ব্বে স্থূলদেহ সম্বরণ করিয়াছেন—গত ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তিনি এই উদ্বোধন বাড়ীতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। যতদিন তিনি স্থূলদেহে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের অনেকেই তাঁহার দর্শন কিংবা তাঁহার নিকট দীক্ষালাভে কৃতার্থ হইলেও তিনি অতি গোপনেই অবস্থান করিতেন। কারণ, তৎকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংখ্যা বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনায় অতি অল্পই ছিলেন এবং পূজনীয় স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি মাতাঠাকুরাণীর সেবকগণের বিশেষ চেষ্টায় এবং সম্ভবত নিজ ইচ্ছানুযায়ীই তিনি কথঞ্চিৎ লোক-লোচনের বাহিরেই ছিলেন। সেই সময়ে মানব সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অলৌকিকত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই এই দেবী-চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য মাত্র ধারণাও মানুষ করিতে পারিবে না, বরং অন্য প্রকার ধারণা করিয়া নিজ নিজ সঞ্চিত মলিনতাপূর্ণ সংস্কার ততোধিক মলিন করিতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবত মাতাঠাকুরাণীর জ্ঞাননিষ্ঠ সন্তানগণ তাঁহাকে লোকলোচনের বাহিরে রাখিতেন। এখন তিনি আর স্থূল জগতের নহেন তাই অবস্থা অন্য প্রকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ তাঁহাকে মা বলিয়া

ডাকিতেন, তাঁহার নিজ মন্ত্রশিষ্যগণ তাঁহাকে মা-ই বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের শিষ্যগণ তাঁহাকে মা ডাকেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছেন।

শাস্ত্র বলেন :—মান্যতে পূজ্যতে যা সা মাতা। স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষদাত্রী গুরুপ্রিয়া। অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা। সগর্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ। মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা। মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ। জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।

অর্থাৎ—যাঁহাকে মান্য করা হয় বা পূজা করা হয় তিনিই মাতা। বেদে মাতার ষোলটি পর্য্যায় বাচক শব্দ পাওয়া যায়। যিনি স্তন্য দান করেন, যিনি গর্ভধারিণী, অন্নদাত্রী, গুরুপত্নী, ইষ্টদেবপত্নী, বিমাতা, নিজকন্যা, সহোদরা ভগ্নী, পুত্রবধূ, শাশুড়ী, মাতামহী, পিতামহী, ভ্রাতৃবধূ, পিসিমা, মাসিমা, মাতুলানী ইঁহারা সকলই মা বলিয়া পরিচিতা।

আমাদের সামাজিক আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে শিশুকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা পর্য্যন্ত মাতৃ-সম্বোধনে পরমানন্দিতা হইয়া থাকেন, পরম গৌরবান্বিতা বোধ করেন, মানসিক সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ভুলিয়া অপত্যস্নেহে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এমন কি, যিনি চিরকাল মাতৃত্বের গৌরবে বঞ্চিতা তিনিও মাতৃত্বের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে জগন্মাতৃত্বের কণিকা লাভ করিয়া দেবী-ভাবাপন্না হইয়া উঠেন। যৌবন-হীনতার ভয়ে মাতৃআহ্বান প্রত্যাখ্যান করা চিরকালই হিন্দুর আদর্শ বিরুদ্ধ। তাই হিন্দুজাতির অসংখ্য গৌরবের জিনিস প্রত্যাখ্যান করিয়া যদি একটিমাত্র আদর্শকেই সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করা যায় তবে একমাত্র মাতৃত্বের আদর্শই হিন্দুর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। যে পুরুষের মনে নারীজাতির প্রতি মাতৃভাবের আদর্শ যত বেশী দৃঢ় হইয়াছে সেই পুরুষই সামাজিক জীবনে, নৈতিক জীবনে এবং ধর্ম্মজীবনে তত বেশী উন্নত, ইহাও দেখা যায়। আর যে নারীর ভিতর মাতৃভাবের বিকাশ যত বেশী হইয়াছে তিনিও সর্ব্বাবস্থায় তত বেশী শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর শাস্ত্র নারী-জাতির প্রত্যেক অবস্থায় বিশেষ আদর্শ রক্ষার উপদেশ দিলেও সকল প্রকার আদর্শের মধ্যেই মাতৃভাব নিহিত রহিয়াছে—মাতৃভাবই সকল ভাবের সূক্ষ্ম প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সমাজ জীবনে মা-শূন্য পরিবার কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় তরঙ্গাঘাতে বিধ্বস্ত; অর্থসচ্ছলতা বিলাসবিভব কিছুই শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল জীবনেও মানুষ নিজ জননীর নিকট কিংবা যাঁহার নিকট হইতে মাতৃস্নেহ পায় তাঁহার চরণতলে অশেষ শান্তি ও আনন্দ পায়। আবার নীতির বন্ধন হইতে মুক্ত নারী অপত্যস্নেহের নিকট চিরকাল বদ্ধ—হয়তো অনেক সময় মাতৃত্বের আকর্ষণই তাঁহাকে চিরদিনের জন্য সুপথে ফিরাইয়া আনে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি একই নিয়মে চলে, তাই সমাজে মায়ের স্থান সকলের উচ্চে।

আমাদের মাতাঠাকুরাণী যে মাতৃত্বের চরম আদর্শ এই যুগের জন্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য। সাধারণত আমরা শুনিতে পাই প্রকৃত পক্ষে সন্তানের জননী না হইলে মাতৃস্নেহের ধারা পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয় না। আমাদের মাতাঠাকুরাণী কোন সন্তানের জননী না হইয়াও কিভাবে অসংখ্য সন্তানের মা হইলেন, তাহা যে শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব এবং সেই আদর্শের জন্যই যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবর্ত্ত-মানেও দীর্ঘকাল এই জগতে কাটাইয়া গেলেন তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে।

ইহা দেখা যায় যে, কোন কোন মহিলা নিজ সন্তান ছাড়া পাড়াপ্রতিবেশীকে সন্তানতুল্য ব্যবহার করেন, কেহ বা সমস্ত গ্রামবাসীকেই সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহার আদর যত্নে সকলই তৃপ্তি লাভ করেন। সংসার-জীবনের অন্যান্য ভাবরাশির সঙ্গে এই মাতৃভাব তাঁহাদিগকে আংশিক দেবী-

ভাবাপন্না করিতে সমর্থ হয়। আর স্বভাবতই যাঁহার ভিতর মাতৃভাবের বিশেষ বিকাশ রহিয়াছে নিজ ভাবের অনুকূল সাধনভজন দ্বারা অন্তর্নিহিত পূর্ণাবয়ব মাতৃত্বের বাহ্যবিকাশ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। একই ভাবের আতিশয্যে অন্যান্য ভাবরাশি হয়তো চিরদিনের জন্য সুপ্তই থাকিতে পারে এবং সেই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে আদর্শ জননী হওয়াও অসম্ভব নহে। আমাদের মাতাঠাকুরাণী মাতৃভাবের চরম আদর্শ ছিলেন এবং ইহা যে অযৌক্তিকও নহে তাহাই বলা যাইতেছে। করুণাময়ী জননীর সংস্পর্শে মাত্র একদিনের জন্য আসিবার যাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব দেবীভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও তিনি চিরদিনের জন্য মাতাঠাকুরাণীর সন্তানত্বের গৌরব করিতেছেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার আপনার জন বলিয়া মনে করিয়া শান্তি পাইতেছেন, সততই এই প্রকার দেখা যাইতেছে।

মাতৃস্নেহের বিশেষত্ব ত্যাগের উপরই নিহিত। যে ভালবাসা প্রতিদানের উপর অবস্থিত—মন বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রকার প্রতিদানের প্রার্থী তাহা মাতৃস্নেহ হইতে অনেক দূরে। শ্রীভগবানের অহেতুক ভালবাসার অনতিনিম্নেই মাতৃস্নেহের স্থান। অসংখ্য পথে শ্রীভগবানের উপাসনা বিধেয় হইলেও এইযুগে ঈশ্বরীয় প্রেমের কল্পনা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় মাতৃস্নেহ। সম্ভবত অন্য যে কোন তথাকথিত ভালবাসাই অল্পবিস্তর স্বার্থবুদ্ধি হইতে উদ্ভূত—আদান প্রদানের উপরই নির্ভর করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মাতৃস্নেহ খুব ভাল জিনিস এবং মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে না-হয় অনেকেই বিশেষ আদর যত্নও পাইয়াছেন, শুধু সেই জন্যই তাঁহাতে জগন্মাতৃত্বের আরোপ করা কি করিয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়, যাহা আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয় কোন না কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই আদর্শ লাভ করা কোন সময়ে নিশ্চয়ই সম্ভব হইয়াছিল, আর যাহা এক জনের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই অন্য সময়েও অন্যের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। এই দেবীর নিজ জীবন দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহাতে জগন্মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

আমরা সংসারে সমস্ত জিনিস কোনকালেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। কোন জিনিস নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাস করি, কোন জিনিস বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে শুনিয়া বিশ্বাস করি, আবার কোন জিনিস বিশ্বস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশ্বাস করি। এই ব্যাপারেও একটি কথা আছে, একই জিনিস ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট নানাভাবে প্রতিভাত হয় এবং একজনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই জিনিস নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। কাজেই আমাদের জ্ঞানের মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রীভগবান নিজে অর্জ্জুনের সংশয় দূর করিবার জন্য বার বার কতই না চেষ্টা করিলেন। আবার অর্জ্জুন নিজের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীভগবানকে বলিলেন:

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।

অর্থাৎ তোমার পরব্রহ্মত্ব বিষয়ে সকল ঋষিগণ দেবর্ষি নারদ অসিত দেবল ব্যাসদেবও বলেন এবং তুমি নিজেও আমাকে এই কথা বলিতেছ।

এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় উল্লিখিত মুনিঋষিদিগের বাক্য-বিষয়ে অর্জ্জুন শ্রদ্ধাবান রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের বাক্য-বিষয়ে নিজের বিশ্বাস দৃঢ় করিলেন শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হইতে। যাঁহারা শ্রীভগবানের নিজ উক্তি শ্রবণের ভাগ্যলাভ করেন নাই তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের বাক্যের উপরই নির্ভর করেন। তাই আমরা বলিতে চাই, যেহেতু আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী আমরা তাঁহার নিজবাক্য এবং তাঁহার

অন্তরঙ্গ লীলাসহচর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিপ্রবরগণের বাক্যেও বিশ্বাসী, এবং সেই জন্যই তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাদের মাতাঠাকুরাণীর উক্তি সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ।

গর্ভধারিণী মাতার নিকট হইতে যে প্রকার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পাইয়া মানুষ শান্তি পায়, এই দেবীর নিকট হইতে ততোধিক সান্ত্বনা পাইয়া তাঁহার সন্তানগণ কত শান্তি পাইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দানস্বভাব বিশিষ্ট হইলেও দরিদ্র দাতার নিকট হইতে যেমন ভিখারী উল্লেখযোগ্য কিছু পাইতে পাবে না, অপরপক্ষে যেমন রাজরাজেশ্বর দাতা সাজিয়া অকাতরে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই দশ হাতে দান করিয়া যাইতে পারেন—এই মহাশক্তিময়ী দেবীর সঙ্গেও জাগতিক মাতার ঐ প্রকারই তুলনা হইতে পাবে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা লইয়া মানুষ স্ব-আয়ত্তের বাহিরে কিছুই করিতে পারে না। অসীম ক্ষমতার উৎস হইতে অবিরাম দান করিলেও অসীম কখনও সসীমের তুল্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে কিন্তু সীমাবদ্ধ ষড়বিকারযুক্ত দেহেতেও অনন্ত ক্ষমতার বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুগে যুগে নরনারীর মধ্যে ধর্ম্মভাবের বিশেষ হানি ঘটিলে শ্রীভগবান নবদেহে আসিয়া প্রথমাবস্থায় কঠোর তপস্যা করিয়া ধর্ম্মলাভের যুগোপযোগী পথ আবিষ্কার করেন, এবং পরে সকলের নিকট সেই পথ উন্মুক্ত করিয়া চলিয়া যান। তাই ধর্ম্মলাভের সুযোগ সকলেরই আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শের সঙ্গে মাতাঠাকুরাণীর আদর্শ সম্পূর্ণ অভেদ। তাঁহার চরিত্রে ও ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণই ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। বয়সে জ্যেষ্ঠ ও সামাজিক সম্বন্ধে স্বামী সর্ব্বদাই স্ত্রীর গুরু বলিয়া আমাদের সমাজে প্রচলিত, আবার অপরপক্ষে অশেষগুণশালিনী স্ত্রীও স্বামীর শ্রদ্ধার পাত্রী ইহাও সমাজ-জীবনে দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন উক্ত আদর্শের চূড়ান্ত নিদর্শন, ইহা তাঁহার জীবনী পাঠক সবিশেষ জ্ঞাত আছেন।

মাতাঠাকুরাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার সকলের প্রতি মাতৃস্নেহ এবং অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তি বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

তাঁহার সম্বন্ধে নিজেদের মন্তব্য না বলিয়া শুধু যাঁহারা তাঁহাকে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের উক্তি উল্লেখ করাই সমীচীন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজমুখেই মাতাঠাকুরাণীর অলৌকিক চরিত্র বিষয়ে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন এবং নিজ সাধক-জীবনের পরিপূর্ণতা লাভে তাঁহাকে প্রধান সহায় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ও যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা কে বলিতে পারে? বিবাহের পর মাকে (জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে, মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে—ওর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।' অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ও সারদা সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাক্‌লে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।' দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার কালে একবার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' তদুত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন,'* * * সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।' শ্রীভগবানের নরলীলা বিচিত্র!

স্বামী বিবেকানন্দেরও দুই একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৮৯৫ খৃঃ এক স্থানে তিনি বলিয়াছিলেন, 'মাঠাকুরাণী যে কি বস্তু তা আজও বুঝতে পারি নি; এখনও কেউ

পারবে না, ক্রমে ক্রমে পারবে * * মাঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন কোরে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।' এই প্রকার তাঁহার আরও অনেক উক্তি রহিয়াছে। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ঈশ্বরকোটি সন্তানগণ এবং তাঁহার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লীলাসহচরগণ মাতাঠাকুরাণীর বিষয় একই প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন এবং তাঁহার সেবা করিয়া নিজেরা ধন্য বোধ করিয়াছেন।

মাতাঠাকুরাণীর নিজ উক্তি দুই একটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করাও অযৌক্তিক নহে। জনৈক ভক্ত একবার তাঁহাকে বলিলেন, 'মা তোমাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ কালী আদ্যাশক্তি ভগবতী এসব বলেন * * * তোমার কথা যা শুনেছি তা, আমি বিশ্বাস করি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তা হলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখেই শুনতে চাই ওকথা সত্য কি না।' তদুত্তরে মা বলিলেন, 'হাঁ সত্য।' অন্য এক সময়ে মাতাঠাকুরাণীর ঈশ্বরীয়ভাবের কতকটা ধারণা করিয়া অপর একজন ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন, 'তবে যে তোমাকে এই দেখ্‌ছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বসে রুটি বেলছ, এ সব কি? মায়া নাকি?' তদুত্তরে মা বলিলেন, 'মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এদশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম। ভগবান নরলীলা করতে ভালবাসেন কিনা। শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে ছিলেন, রাম দশরথের বেটা।'

এখন কথা হইতে পারে তাঁহার গভীর অধ্যাত্ম-জীবন-বিষয়ে না হয় আমরা নিজ নিজ সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী কতকটা বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারি, সেই জন্য আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবনের কি প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে? জননেতাদের জীবন এবং নিত্য নূতন উপদেশ হইতে উহার মূল্য বেশী কি? আমরা বলি, জননেতারা বাস্তবিকই অনেক সময় ভাল কাজ করেন; সংসারে যাহারা আহার নিদ্রা এবং ইন্দ্রিয় সেবার বাহিরে যাইতে চান না তাহাদের তুলনায় জননেতার স্থান অনেক উচ্চে। জননেতা দিন দিন কর্ম্ম-বিপাকে পড়িয়া নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কখনও সুপথে আবার কখন বা ভ্রান্ত পথেও নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সমাজকে চালাইতে চান। যাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা তিনি সেই প্রকার অনুচর লাভ করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার প্রভাব খুবই বেশী, অনন্ত কালের তুলনায় কিন্তু উহা একটা মুহূর্ত্তের চেয়েও নগণ্য। অপর পক্ষে জগতে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু মহম্মদ শঙ্কর প্রভৃতি এক একজন মহাপুরুষ বা অবতার যে প্রকার জীবন ও মতবাদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে সূক্ষ্ম দেহেও তাঁহাদের নেতৃত্বের প্রভাব কত বেশী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ীর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিলেও কথায় কথায় তাঁহাদের নাম আজও আদর্শ বলিয়াই লোকে উল্লেখ করিতেছে। তাই আমরা বলিতে চাই অন্যান্য মহাপুরুষদের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা-দেবীর জীবন মানুষের নিকট সমান মূল্যবান। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের বর্ণনায় স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন, 'যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিনরাত দেখ্‌লে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু চৈতন্য প্রভৃতিতে এককণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি। বুদ্ধ কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই ত নয়, * * অমন ঠাকুরের দয়া ভোল!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এত বড় শক্তির আধার ছিলেন যে মানব সমাজের নিকট তাঁহার জীবন ব্যক্ত করার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল মাতাঠাকুরাণীর ন্যায় সর্ব্বশক্তিময়ী দেবীর এবং ত্যাগবৈরাগ্যের মানবীয়রূপ

স্বামী বিবেকানন্দের। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সমাজের মধ্যে বাস করিয়া নারীর জীবন কি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে সেই আদর্শ স্থাপন করিবার জন্যই সম্ভবত মাতাঠাকুরাণী লজ্জাশীলা বধূর ন্যায় সংসারের সকল অবস্থায় নিখুঁত ভাবে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিলেন আবার কদাচিৎ দুই একটি ভাগ্য-বানের মনে ধর্ম্মভাব সঞ্চারের জন্য সাধারণ ভাষায় সংক্ষেপে ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া দিয়া জন্ম জন্মান্তরের অজ্ঞান দূর করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষোচিত গৌরবে সভ্যতার সকল কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দের মনে প্রকৃত ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব বিচার ও অনুভূতি দ্বারা দৃঢ় করাইয়া ছিলেন। মা তাঁহার অশেষ গুণশালী ছেলেকে কত আদর করিতেছেন, আর ছেলে দশদিক জয় করিয়া আসিয়া মায়ের জন্য মঠ করিয়া সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, মহাশক্তির কেন্দ্র সৃষ্টি করিলেন।

গার্হস্থ্যাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম মানুষেরই জীবনের অবস্থা বিশেষ। প্রথমত মানুষ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী আদর্শ নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। প্রত্যেকের পক্ষেই আদর্শ নির্ব্বাচনের সমস্যা পদে পদে আসিয়া পড়ে। ক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ আদর্শও পরিবর্ত্তন করে। অবতার-জীবন কিন্তু মানুষের সর্ব্বাবস্থায়ই আদর্শ—যদিও তাঁহার জীবনের সকল দিক বুঝিতে মানুষ সমর্থ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামকাঞ্চন ত্যাগের যথাযথ অনুকরণ মানুষ করিতে গেলে আত্মপ্রতারণাই হইবে। তবে তাঁহার জীবনের দুই একটি কথাও পালন করিতে চেষ্টা মাত্র করিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়। মাতাঠাকুরাণীর জীবনও একই প্রকার।

ধর্ম্মজীবন কোন কোন মতবাদীর নিকট একে-বারেই মূল্যহীন। বাস্তব জগতের সঙ্গে ধর্ম্মকে কোন প্রকারেই তাঁহারা প্রয়োজনীয় মনে করিতে পারেন না, বরং তাঁহারা ধর্ম্মকে জীবন-সংগ্রামের পরিপন্থী মনে করেন। একটা সমগ্র জাতি যখন বাহ্যতঃ অন্যান্য জাতির সমক্ষে কোন প্রকারেই শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে পারেনা—যখন মানুষের ন্যায় কোন প্রকারেই জগতে স্থান পায় না, তখন যদি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কেহ সেই জাতিটাকে ইচ্ছামত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া আরও পঙ্গু, আরও হীন করিতে প্রয়াস পায় তবে নিশ্চয়ই আমরাও বলিব—ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, অধার্ম্মিক হইয়াই আমাদিগকে বাঁচিতে দাও, আমরা ধর্ম্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাই না। এখন কথা হইতেছে, ধর্ম্মের বিকৃত অর্থের জন্য ধর্ম্ম দায়ী কোন কালেই নহে, ধর্ম্মহীন ধর্ম্মপ্রচারকই সর্ব্বতোভাবে সেই জন্য দায়ী। যে ধর্ম্ম মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া একটা তামসিক সমাজ সৃষ্টি করে অথবা উচ্চ আদর্শহীন মাত্র কর্ম্মবহুল সমাজ গড়িয়া তুলে তাহা কোন কালেই মানুষের ধর্ম্ম হইতে পারে না।

হাজার বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর জীবব্রহ্মের অভেদত্ব প্রচার করিয়া যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে গৌতমবুদ্ধ যে ধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বগুণান্বিত সমাজ তৈয়ার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারও পূর্ব্বে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ যে সমন্বয়ের ধর্ম্ম চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সেই সনাতন ধর্ম্মেরই বিগ্রহ স্বরূপ।

কামকাঞ্চনের আসক্তি ও নাম যশের স্পৃহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম লাভের বিঘ্ন। স্বভাবতই যাঁহাদের মন কথঞ্চিৎ সত্ত্বগুণান্বিত এবং ঐহিক ভোগের স্পৃহা যাঁহাদের মন হইতে ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে শুধু তাঁহারাই বিচার, অভ্যাস ও অধ্যবসায় সহকারে ক্রমাগত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। আর যাঁহারা দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে সামান্য চেষ্টা করিয়া পরাভূত হইতেছেন এবং মনে মনে অশেষ ভোগবাসনা পোষণ করিতেছেন, অথচ আত্মবিশ্বাস

হারাইয়া কোন প্রকারেই অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহেন, এমন কি জীবনের বিফলতাকে ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া যাঁহারা সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে চান, তাঁহাদের চূড়ান্ত ত্যাগধর্ম্ম গ্রহণীয় নহে। কলিকাতার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশে যাইতে হইলে যেমন মধ্য-কলিকাতা না হইয়া যাওয়া চলে না তেমনই তমস্বভাবকে দূর করিতে হইলে মানুষকে প্রথমত রজোগুণ বা সুসংযত কর্ম্মপ্রেরণাকে জাগরিত করিতে হইবে তৎপর সত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়—স্বাভাবিক। তম ও সত্ত্বের মধ্য অবস্থা হইতেই মানবীয় সম্পদ—শিল্প বাণিজ্য ভাস্করবিদ্যা সাহিত্য বিজ্ঞান দার্শনিক মতবাদ পর্য্যন্ত যত কিছু সকলই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রথমেই শিশুকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক দেওয়া যায় তবে যেমন উহা হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়, নির্জ্জীব জাতির নিকট চূড়ান্ত ত্যাগের ধর্ম্মও তেমনই সর্ব্বপ্রকারে প্রতিক্রিয়াশীল হইবে নিশ্চয়। চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া সুসংযত বিচারশীল ও কর্ম্মময় গার্হস্থ্য জীবনই অধিকাংশের পক্ষে কল্যাণজনক।

জন্ম জন্মান্তরের যে অজ্ঞান মানুষকে একেবারে তাহার স্বরূপ ভুলাইয়া রাখিয়াছে সেই অজ্ঞান দূর করিবার জন্য কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের মত তাহাকে বিরাট আয়োজন করিতে হয়। সকল প্রকার মূল সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সমষ্টি মানবের অজ্ঞান দূর করিবার নিমিত্ত গুণকর্ম্মের বহির্ভূত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নিজ মায়ায় স্বেচ্ছায় নরলীলা করিবার জন্যই নরদেহে আসেন। দেহীর অনন্ত শক্তি থাকিলেও দেহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তাই তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাঁহার অসাধারণ শক্তি সংক্রামণের উপযুক্ত শুদ্ধ পবিত্র আধার তিনিই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সেই জন্যই তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার লোককল্যাণরূপ মহৎ কার্য্যের সহায়ক হেতু তাঁহার মতের ও জীবনের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করিয়াই চলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমি নিজে জন্মরহিত অক্ষীণ জ্ঞানশক্তি স্বভাব এবং ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতনিবহের ঈশ্বর, আমি নিজ বৈষ্ণবী শক্তিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়াবশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি; জন্ম গ্রহণান্তর দেহাভিমানী জীবের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি, বাস্তব পক্ষে জীবের ন্যায় আমার জন্ম সত্য নহে।" সর্ব্বযুগেই অবতারের উদ্দেশ্য একই। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারেও উদ্দেশ্য সেই প্রকার।

সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ স্বরূপ মাতাঠাকুরাণীর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যাশ্রম এক একটি অবস্থা মাত্র, স্বরূপতঃ মানুষ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভেদ, আবার সকলের মধ্যেই জীবত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান। অনাদি ভ্রান্তি অপসারিত হইলেই সচ্চিদানন্দ প্রতিভাত হন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে হইবে: কোন প্রকার বাসনা মনে উদয় হইলে যাঁহারা কষ্ট বোধ করেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, বাসনাই ক্লেশদায়ক এবং বাসনাই প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান। 'বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। * * * বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু'একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না'—মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরব্ধ কার্য্যের জন্য তিনি যে সমাজ-জীবনে উচ্চ আদর্শ স্থাপনের জন্যই জোর করিয়া নিজেকে স্থূলদেহে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'আমার যে মন রাতদিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নীচে নামিয়ে রাখি দয়ায়, এদের জন্য'।

আবার এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 'যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, "না, তুমি থাক, অনেক কাজ বাকী আছে," শেষে দেখলুম তাইত অনেক কাজ বাকী। তিনি বলতেন, "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখবে"।'

কামগন্ধহীন পবিত্রতম তাঁহার অপরূপ জীবন আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারীর নিকট দয়া ক্ষমা সহনশীলতা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শ অভিব্যক্ত করিতেছে, আবার 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' তাঁহার গভীর অধ্যাত্মজীবন সন্ন্যাসীকে পথ-প্রদর্শন করিতেছে। দৃশ্যত সংসারেই তিনি ছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবন সতত মানুষ মাত্রেরই আদর্শ। যিনি অল্প সময়ের জন্যও তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে দুই একটি কথা শুনিতে পারিয়াছেন, তিনিই সারা-জীবনের জন্য তাহা বিশেষ শ্রদ্ধা ও গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন 'দেখ, মা কাকেও ছুঁয়ে দিলেই তার সব হয়ে যেত'। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনেও ঐ প্রকার অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য অবতারের জীবনেও এই প্রকার হইয়াছে। যদিও শেষজীবন পর্য্যন্ত তিনি নিজকে লজ্জাশীলা বধূর ন্যায়ই রাখিতেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার সময় ও দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথাপি কত লোকই যে তাঁহার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। নানাপ্রকারে শোকগ্রস্ত বিপন্ন নর-নারী তাঁহার নিকট আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও অকৃত্রিম ভালবাসা পাইয়া শান্ত মনে গৃহে ফিরিয়াছেন। ছোটখাট বাসনা পূরণের প্রার্থনা লইয়া কতজন তাঁহার নিকট গিয়াছেন, অশেষ করুণারূপিণী মায়ের নিকট সেই প্রার্থনা জানাইয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে আশা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া হয়তো ধর্ম্মজীবনের জন্যও প্রেরণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বহুকালের সংসার যাতনায় ক্লিষ্ট মুমুক্ষু মানব সংসার-চক্র হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে গুরুরূপে লাভ করিয়া তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভের আশা পাইয়া দুঃখকষ্ট-বহুল সংসারেও অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছেন। আর জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ করজোড়ে তাঁহার শরণাগত হইয়া দিনরাত তাঁহার প্রীত্যর্থে যাবতীয় কাজ করিয়া যাইতেছেন। এই প্রকার ঘটনাবলীর সমাবেশে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

অবতারগণ এবং তাঁহার সঙ্গীয় সকল মহা-পুরুষই বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই জগতে আসেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদের দেহান্তেই তাঁহাদের আরব্ধ কর্ম্ম শেষ হয় না, বহুকাল তাঁহাদের জীবন আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়—'যেমন একজন ছাঁচ করলে, তা থেকে অনেক গড়ন হয়'। মানুষ কোন পথে চলিবে, কেন সেই পথে চলিবে এবং সেই পথের কি কি বিঘ্ন বা সুযোগ এই সকল দেখাইবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবতারের উদ্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মাতাঠাকুরাণীর জীবনও নানা ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয়। তাই তিনি বলিয়াছেন, 'ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী নির্ধন সকলকে উদ্ধার করতে'। আবার বলিয়াছেন, 'বাবা এ যুগে তাঁর (ঠাকুরের) ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ও রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে?' সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ও ব্যবহারিক জগতের যোগসূত্রে হইল অবতার জীবন। মানুষ অনেক সময়ই মস্ত ভুল করিয়া বসে, অবতার জীবনের শুধু অলৌকিকত্বটুকুই আলোচনা করে, নিজের জীবন কি করিয়া গঠন করা যায় সেই দিকে লক্ষ্যই করিতে চায় না। সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব চলিয়া গেলেও মাতাঠাকুরাণী এতকাল মানুষের

সঙ্গেই রহিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য হইতে তিনি কখনও বিমুখ হন নাই, অথচ তাঁহার সন্ন্যাসি-সন্তানগণের প্রতি আচরণও অদ্ভুত। যাঁহারা তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার কৃপালাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন এমন সন্ন্যাসীদিগকে বলিয়াছেন, 'আমি তোমার আর কি করেছি? মার কোলে ছেলে বাছে করে কত কি করে। তোমরা দেবের দুর্লভ ধন।' সন্ন্যাসী ছেলের আসন পায়ে লাগিলে মাথায় স্পর্শ করিলেন। অপর পক্ষে সন্ন্যাস জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিয়া সন্তানকে রক্ষা করিতেন। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'হাঁ বড় অভিমান (সন্ন্যাস নিলে) আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না। তার চেয়ে বরং (নিজের সাদা কাপড় লক্ষ্য করিয়া) এই আছি বেশ (অর্থাৎ অন্তরে ত্যাগ)। ** রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, সাধুর অভিমান কি যায় বাছা?'' যাঁহার পদধূলি হইতে কত সন্ন্যাসী জন্মিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও কত জন্মিবেন সকলের জন্য তাঁহার জ্ঞান ভক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সম্মুখে রহিল।

জগদ্গুরু সাধারণতঃ মানুষের দোষ দেখিতে পারেন না। ইচ্ছা করিয়া বা জোর করিয়া নীতি হিসাবে মানুষের গুণ দেখা নয়, স্বভাবতই তাঁহারা খারাপ দিকটা দেখিতে পারেন না। মনে হয় দোষ-দর্শনের অভ্যাস মন হইতে শুধু তখনই তিরোহিত হয় যখন মানুষ সকলের মধ্যে সৎ-স্বরূপ শুদ্ধ আত্মাকে দর্শন করিতে পারে। একবার মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, 'বাবা আমি যে কারও দোষ দেখতে পারি না।' সকলের মধ্যে আত্মার সাক্ষাৎকার না হইলে প্রকৃত পক্ষে মানুষের দোষ-দর্শন প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট হয় না। তাহা না হইলে সর্ব্বজীবের প্রতি মাতৃভাবও সম্ভব হয় না। দুইটিই পূর্ণ জ্ঞানের অভিব্যক্তি। মা একবার ইহাও বলিয়াছিলেন, 'বাবা জানত ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল, সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে-গেছেন'।

বায়ুহীন স্থানে যেমন চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু আসিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে, সেই প্রকার আদর্শ-বিস্মৃত সমাজে নানা দেশের কলুষিত মতবাদ আসিয়া প্রাচীনতম সভ্যতাকে বহুকালের জন্য দূষিত করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এখনই দেশের পক্ষে নিজ আদর্শ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিবার সময়। বিলম্বে অশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। বর্ত্তমান যুগে চতুর্দ্দিকে প্রাণের স্পন্দন লক্ষিত হইতেছে, সকল দেশ, সকল জাতি নূতন নূতন প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হইতে চলিয়াছে, আমাদের দেশও স্বদেশোদ্ভূত ও বিদেশাগত ভাবরাশিতে পূর্ণ হইতেছে। রূপকের ভাষায় বলিতে হয়, মানব জাতি নূতন নূতন ছাঁচে গঠিত হইতে চাহিতেছে। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আদর্শ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমাদের মাতাঠাকুরাণী শ্রীসারদাদেবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। দেশপ্রেমিক, কর্ম্মী, ভক্ত, তত্ত্বান্বেষী, জ্ঞানী সকলের নিকট তাঁহাদের জীবনী ও বাণী সমানভাবে আদর্শ হউক ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

দেশের বর্ত্তমান সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ

সূচনা

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার কথা ভাবতে বসলে, আজ একে একে অনেক কথাই মনে পড়ে। একটা জাতি, যে ঐহিক সুখ, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের প্রতি চিরদিন উদাসীন,—যার রক্তে রক্তে "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্" এই মহামন্ত্র প্রবাহিত হচ্ছে,—যার দেশের আকাশে বাতাসে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই প্রণব বাণী এখনও ধ্বনিত হচ্ছে,—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই অভয় মন্ত্র যে জাতির অঙ্গের ভূষণ ও বর্ম্মস্বরূপ,—দেশের কোটি কোটি নরনারীর দুঃখ-বিমোচনে যেখানে "রাজার ছেলে ফকির হয়,"—যেখানে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য মহাত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী "লাখবার নরকে যেতেও প্রস্তুত",—সে জাতিরও বুকের ওপর আজ দুঃস্বপনের পাথর চাপান। ছোট, বড, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, প্রত্যেকেরই মুখের'পরে যেন এক শোকাচ্ছন্ন পরিবারের থমথমে গাম্ভীর্য্য, দুঃখের ও হতাশার কলঙ্ক কালিমা, মুমূর্ষুর মুখের মত যেন কালো মৃত্যুর ছায়া। যে দিকেই চোক ফেরান যায় সেদিকেই সমস্যা,—দেশের সমস্যা, দশের সমস্যা, সারা জাতির সমস্যা। দেশব্যাপী চারিদিকেই হাহাকার, যেন এক মহাশ্মশানের বিরাট শূন্যতা সারা দেশকে পরিব্যাপ্ত ক'রেছে, "শবলুব্ধ গৃধ্রদের বীভৎস চিৎকারে" আর কাড়াকাড়িতে দেশের মাটি কলুষিত হয়ে উঠেছে। এত সমস্যার সৃষ্টি হ'ল কবে থেকে?

কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ও জাতীয় লক্ষ্য

মানুষের প্রত্যেক অবস্থারই একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, ইংরাজিতে যাকে বলে cause and effect আমাদের আজ বর্ত্তমান অবস্থার কথা সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে দেখতে গেলে স্বামিজীর একটা কথা মনের মাঝে বিশেষভাবে ঘা দেয়। দেশের দুর্দ্দশা দেখে একদিন তিনি দুঃখ ক'রে ব'লেছিলেন, "আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখ কষ্ট" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৩)। সাধারণ জনমানবের বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হ'ল সেদিন থেকে যেদিন তারা ভুলে গেল নিজেদের জাতিগত ও মাটিগত বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য। যদি একটু স্থিরভাবে বর্ত্তমানের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জাতিকে পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে—প্রত্যেক জাতিতেই জাতিগত তিনটি লক্ষণ বিদ্যমান: প্রথমটি হল প্রত্যেকেরই জাতিগত সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বব্যাপক একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির থাকে—এবং সেই নির্দ্দিষ্ট পথে তারা এগিয়ে চলে। রুশজাতির যেমন বর্ত্তমানে জাতিগত লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী সমূহবাদ প্রচার করা (universal communism), সারা জাতির সেইটিই হ'ল ধ্যেয় বস্তু। দ্বিতীয় লক্ষণ হ'ল জাতির প্রাণ-সাধনায় সেই লক্ষ্যকেই সাধ্য বস্তু ক'রে তোলা এবং জাতির প্রত্যেকটি ব্যষ্টি মানবকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলা। আর তৃতীয় হ'ল জাতির ইষ্টদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় এক কেন্দ্রশক্তি সৃষ্টি করা এবং তাকে দৃঢ় ক'রে তোলা।

ভারতের লক্ষ্য

সুদূর অতীতের কোন শুভলগ্নে ভারতের আর্য্য ঋষিরা অন্তর্মুখীন বৃত্তির সহায়ে জাতির লক্ষ্যনির্দ্দেশ

ক'রেছিলেন—বেদবিহিত ব্রহ্মের সাধনা। তৎকার প্রচলিত "স্রকচন্দনাদি" ঐহিক সুখ সম্পদ ধন ঐশ্বর্য্য জাতির কাম্য ও ধ্যেয় বস্তু হ'য়ে ওঠেনি, দুর্ব্বল জাতিকে নিষ্পেষিত ও পদদলিত ক'রে বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনাও তখন জাতির লক্ষ্য ছিল না। রাজার কর্ত্তব্য ছিল প্রজাপালন ও প্রজা-রঞ্জন,—বরং যেখানে ক্ষাত্রশক্তি প্রবলতর হ'য়ে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম ক'রেছে, সেখানেই হ'য়েছে তার পরিসমাপ্তি ও মৃত্যু। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-লীলাই এই সত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ গ'ড়ে উঠেছিল বহির্মুখীন বৃত্তি নিয়ে—ঐহিক প্রতিপত্তির ওপর দৃষ্টি স্থির ক'রে। তাই তাদের সাধনার বস্তু হয়েছিলো 'বণিকের মাণদণ্ড'। তাদের প্রয়োজন হ'য়ে-ছিলো ধন, মান, বিজয়লিপ্সা, জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় ক'রে তুলতে। তাই উদার খৃষ্টধর্ম্মের নীতিগুলি দুদিনেই বিদায় নিল ইউরোপের মাটি থেকে। ঐহিক প্রতিপত্তির প্রতীকরূপে দেখা দিলেন ইউরোপের রাজশক্তি, রাজনীতির ওপরেই জাতির শুভাশুভ অর্পিত হল। সেখানে রাজ-নীতি হ'য়ে উঠল জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ। আর রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজাপ্রজার সংঘর্ষ স্থায়ীভাবে বাসা বাধল ইউরোপের প্রতি ধূলিকণার সাথে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, ভারতের লক্ষ্যভ্রষ্টতা

ভারত ছিলো চিরদিনই রাজনৈতিক আন্দোলনে নিরপেক্ষ—কারণ বর্ত্তমানের রাজা প্রজার ও ধনী দরিদ্রের যে স্বার্থের সংঘর্ষ তা কোন যুগেই ভারতে এমনভাবে দেখা দেয়নি এবং জাতীয় জীবনে বিশেষভাবে রেখাপাতও ক'রে নি। কারণ ভারতের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ছিলো স্বতন্ত্র। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সকলেরই লক্ষ্য ছিলো স্থির, এবং তারা একযোগে ছুটে চ'লে ছিলো সেই লক্ষ্যের দিকে। তাই জনকরাজার আদর্শ ভারতেই সম্ভব হ'য়েছিলো, বিশ্বের অন্য কোন মাটিতে হয় নি। যদি আমাদের জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনেরই প্রয়োজন হ'ত, তাহলে Thomas Paine (টমাস্ পেইনের) এর জন্ম হ'ত আমাদের দেশেই, কারণ এদেশের জাতীয় জীবনে সময়ানু-যায়ী যে দাবী তা পূরণ করতে সব সময়েই এক এক অতিমানবের অবির্ভাব হ'য়েছে। এই সকল কারণেই ভারতের জাতীয় মঙ্গলোৎসবের পূজারী স্বামী বিবেকানন্দজীও জাতির প্রাণ-সাধনায় রাজনীতির প্রতি উদাসীন ছিলেন। আজ যদি জাতির জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়ো-জনীয়তা উপস্থিত হ'য়ে থাকে, তাহলে জাতির রাজনৈতিক গুরুরও অভাব হ'বে না। মূল কথা, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও ঐতিহাসিক নানা কারণে জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। নানা সমস্যার উদ্ভব হ'ল।

সমস্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেদিন ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের জাতীয় জীবনের সাথে সম্পর্ক পাতাল, সেইদিন থেকে দেখা দিল বিবিধ সমস্যা। বর্ত্তমান ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের যে সংঘর্ষ, যন্ত্রযুগের গোড়াপত্তন;—শ্রেণীভেদ ও বৈষম্যবাদ, পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অশান্তি এ সকল সমস্যাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবপ্রসূত।

রাষ্ট্র ও সমাজের সংঘর্ষ

রাষ্ট্র ও সমাজের প্রথম সংঘর্ষ হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়, সে আগুন আপাতদৃষ্টিতে সেদিন নির্ব্বাপিত হয়েছিলো সত্য, কিন্তু তার বীজ দেশের মাটি থেকে নষ্ট হ'য়ে যায় নি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেই বীজের প্রথম অঙ্কুর আবার দেখা দিল অন্যরূপ নিয়ে,—জাতীয়

কংগ্রেসের জন্ম হল। দারিদ্র প্রপীড়িত নিষ্পেষিত জাতির অর্থ-সমস্যা যতই প্রবলতর হ'তে লাগল, সমাজে পুঁজিবাদী রাজশক্তির স্বার্থের সাথে সাধারণ অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গাল জনমানবের স্বার্থের সংঘাত যতই সৃষ্টি হ'তে লাগল, ভারতে যন্ত্রযুগের গোড়াপত্তনে যতই শ্রেণীভেদ ও বৈষম্যবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই এই জাতীয় সঙ্ঘশক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। জাতির মঙ্গল-কামী যুগাচার্য্য স্বামিজীর মনেও ভাবী অমঙ্গলের কথা মনে হয়েছিলো, তাই তিনি "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বইখানি রচনা ক'রে ভারতের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সমাবেশ করতে নির্দ্দেশ করেন; কারণ বর্ত্তমানে বাঁচতে হ'লে ঐহিক শক্তির প্রতি উদাসীন হলে, বস্তুবাদের আসুরিক বলে নিষ্পেষিত হ'তে হবে। অবশ্য স্বামিজী বিশ্বাস করতেন যে, এই জড়বাদী রাজশক্তিকে তিনি মুগ্ধ করবেন ভারতের সনাতন বেদান্ত দর্শন দিয়ে, কারণ জড়বাদ একদিন ইংরাজ প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতির দেহে ও মনে অবসাদ আনবেই, তাই তিনি বলেছিলেন—

স্বামিজীর উক্তি

"ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের সন্তান, ওদের শক্তিতে পঞ্চভূত ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ হইয়া কার্য্য করিতেছে—আপনারা যদি মনে করেন—আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে ঐ স্থূল পাঞ্চভৌতিক শক্তির প্রয়োগ করিয়াই একদিন স্বাধীন হইব, তবে আপনারা নেহাৎ ভুল বুঝিতেছেন। ·· ·· ·· ·· আমার মতে—বেদান্তোক্ত ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিয়া ঐ মহাশক্তিধরগণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা চিরদিন গুরুস্থানীয় থাকিব এবং ওরা ইহলৌকিক অন্যান্য বিষয়ে আমাদের গুরু থাকিবে" (স্বামিশিষ্য সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, পৃঃ-৫)। কিন্তু তাই বলে তাঁর ভাবধারায় কোথাও গোঁড়ামী ছিল না,—তিনি কোথাও বলেননি যে শুধু এই একই উপায়ে জাতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে সংঘর্ষের মীমাংসা বা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। বরং যখন তাঁকে "মিরর" সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় জাতির এই সমস্যা সমাধানের বিষয় প্রশ্ন করেন, তিনি উত্তরে বলেন—"আমি এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করতে জীবন ক্ষয় করবো। আপনারা ভারতের কল্যাণ অন্যভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন ত অন্যভাবে কার্য্য ক'রে যান" (স্বামিশিষ্য-সংবাদ পৃঃ ৮)।

দেশকে তিনি ভালবাসতেন, দেশের মঙ্গল যাতে হয় তাই তিনি চেয়েছিলেন। দেশের জড়তা দূর ক'রে চেয়েছিলেন তিনি রজোগুণ সঞ্চার করতে। তিনি বলতেন, "সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতরে রয়েছে, একথা বিশ্বাস কর, তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে" (স্বামিশিষ্য সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, পৃঃ ১৩)। মানুষের চেতনশক্তির উল্লেখ ক'রে বলতেন, "একটা সামান্য পিঁপড়ে মারতে যা, সে-ও জীবনরক্ষার জন্য একবার rebel করবে,—যেখানে struggle, যেখানে rebellion সেখানেই জীবনের চিহ্ন ·· ·· তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস" (স্বামিশিষ্য সংবাদ, পূর্ব্বকাণ্ড, পৃঃ ১২)। পাশ্চাত্যের যন্ত্রযুগ এখানেও তিনি চেয়েছিলেন প্রবর্ত্তন করতে—দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে। তিনি তাঁর গুরুবাক্য উদ্ধৃত ক'রে প্রায়ই বলতেন—"খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না"।

ধনী দরিদ্র শ্রেণীভেদ ও বৈষম্যবাদ

বর্ত্তমান ভারতে অর্থের অসম বণ্টনে (unequal *distribution of wealth*) ধনী দরিদ্র শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করেছে। ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি নিয়ে চারিদিকেই অশান্তির দাবানল জ্বলেছে—অবশ্য

ভারতে যন্ত্রযুগের গোড়া পত্তনই এর জন্য দায়ী। তাই আজ তরুণের মনে মহামতি কার্লমার্ক্সের উদার নীতি জুড়ে ব'সেছে। তারা চায়, সমাজের মাঝে এক অপূর্ব্ব সমতা সৃষ্টি ক'রে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই জড়বাদের অমৃতটুকু সমানভাবে ভাগ করে দিতে। তাই তারা আজ হৃদয়-দেউলে কার্ল-মার্ক্সকে ব'সিয়েছে গুরুস্থানে,—রুশজাতিকে ধরেছে সামনে আদর্শ ক'রে। অবশ্য আজ যদি সমগ্র জাতির কল্যাণযজ্ঞে প্রয়োজন হয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সমূহবাদ, তাতেই যদি জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয়, সমূহবাদ যদি আজ জাতির অর্থসমস্যা দূর ক'রে জাতিকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মের সাধনার দিকে নিয়ে যায়, তা হলে স্বামিজীর অবিনশ্বর আত্মা জাতির এই যজ্ঞে আবার পৌরোহিত্য করবেন,—আমাদেরই ভিতর দিয়ে। তবে জাতিকে মনে রাখতে হ'বে যন্ত্রই আমাদের সব নয়। জড়বাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করাই আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের জাতীয় আদর্শ বিশ্বের সকল আদর্শ হ'তে অনেক উপরে।

পাশ্চাত্য-জড়বাদের প্রভাবে যান্ত্রিকযুগ প্রবর্ত্তনে যে একদিন অশান্তির দাবানল জ্বলবে সে বিষয় স্বামিজী সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। অতুল ঐহিক ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও আমেরিকাকে শান্তির কাঙ্গাল হতে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে জড়বাদ কোন দিনই মানুষকে তার লক্ষ্যপথে পৌঁছে দেবে না, প্রাণে তার স্বর্গীয় আনন্দ-উৎস উন্মুক্ত করবে না, হৃদয়ে তার তৃপ্তি ও শান্তি দেবে না, তাই তিনি বলেছিলেন, 'ত্যাগের পথ, শান্তির পথ, অবলম্বন কর নতুবা মরিবে" (ভারতে বিবেকানন্দ)।

ভারতে যন্ত্রযুগ ও কার্লমার্ক্স

কার্লমার্ক্সের বাণী জড়বাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে। বস্তুজগতে মানুষকে এমনভাবে সম আসনে বসাতে অন্য কোন মতবাদ পারে নি। দরিদ্রের প্রাণে তাঁর সাম্যের বাণী এনেছে এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্ফুরণ। Mr. Kirkup (মিঃ কারকুপ) বলেন—"Socialism has brought the cause of the poor most powerfully before the civilized world It is one of the enduring results of Socialistic agitation and discussion that the interest of the suffering members of the human race so long ignored and so fearfully neglected have become a question of the first magnitude." (*History of Socialism by* T. Kirkup, pp 409)। প্লেহানফ (Plehanoff) একদিন কার্লমার্ক্সের সম্বন্ধে বলেছিলেন—"Marx was a revolutionist to the finger tips He was in revolt against God and capital just as Promethus was in revolt against Zeus Like Promethus he could say of himself that his task was to educate persons who knowing human sorrow and human joy would have no respect for a diety hostile to human beings". (Karl Marx Man thinker, Revolutionist by D Riazanoff, pp 89)। স্বামিজীও জীবের দুঃখ দেখে ঠিক এই কথাই বলছেন—"যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, বিধবার চোখের জল মোছায় না, মানুষকে দেবতা করে না, সেকি আবার ধর্ম্ম ?" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১০)। তিনি আবার বলছেন "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" ("সখার প্রতি" কবিতা—স্বামী বিবেকানন্দ)। জীবদুঃখে কাতর এই দুটি মহাপ্রাণের চিন্তাধারা একই, তবে পার্থক্য এই যে একজন জড়জগতের সুখশান্তির ব্যবস্থা করতে তৎপর।

বুখারিন (Bukherin) বলেন যে, "Marx started from the premise of the objective reality of the outer world independent of the subject Marx was the adversary of objective idealism and philosophical identity when he stood the Hegelian philosophical conception on its feet. Hence Marx was a materialist" (Marxism and Modern Thought by N I Bukherin and others, translated by Ralph Fox, p p 12)। আর, আর একজন ছিলেন অধ্যাত্মবাদী—জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তৎপর, তাই তিনি বলছেন—"আমাদের সকলকে বিদ্যা দান, জ্ঞানদান ও ধর্ম্মদান করতে হবে।"

স্বামিজী ও কাল´মাক্স´

স্বামিজী বিশ্বাস করতেন কাল´মার্ক্সের মতবাদ যতই উদার হোক, তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের পথ সমবণ্টন নীতির (equal distribution) দ্বারা যতই সুনিয়ন্ত্রিত করুন, সমাজে আর্থিক স্বাচ্ছল্য যতই বিরাজ করুক, তাঁর মন্ত্রগুলি যতই লোকহিতকর হোক, তবুও তিনি মানুষের প্রাণে পবিত্র আনন্দ ও শান্তির ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁর মত ঐহিক, অভাব অভিযোগের খানিকটা সমস্যা সমাধান করে বটে কিন্তু যেখানে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক, তৃপ্তি ও শান্তির কথা, আনন্দের অভিলাষ, সেখানে তিনি একেবারে নির্ব্বাক। মার্ক্সের বিশ্বাস ছিল সমাজে শ্রেণীভেদ অপসারিত করে, সকলকে সমআসনে সমাসীন করলেই মানুষ সুখী হবে, তৃপ্তি পাবে। মানুষের ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই ছিলো তাঁর চরম লক্ষ্য। স্বামিজীও মানুষকে সমদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন মার্ক্সের মতই, কিন্তু তা জড়বাদের দিক দিয়ে নয়,—বেদান্তের দিক দিয়ে। তাঁর বাণী ছিল বেদান্তের অমোঘ-বাণী "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। তিনি ঘোষণা ক'রেছিলেন "চণ্ডাল আমার ভাই, শূদ্র আমার ভাই।" স্বামিজী জড়বাদের উৎকর্ষকে ততটুকু মর্য্যাদা দিয়েছিলেন, যতটা ঐহিক অভাব অভিযোগ পূর্ণ ক'রে মানুষকে অন্তর্মুখীন হ'তে সাহায্য করে। মার্ক্সের নীতি এত উদার হওয়া সত্ত্বেও আজ জড়বাদের উপর স্থাপিত ব'লে সে মানুষের প্রাণে শান্তি আনছে না। তাই যদি সম্ভব হ'ত তাহলে আজ যে দৃষ্টান্ত বিশ্বের চোকে ধাঁধাঁ লাগায়, যুবকের প্রাণ নাচিয়ে তোলে দরিদ্রের বুকে মাতন আনে—সেখানে, সেই রাশিয়াতেও আজ নূতন ধাঁচের শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হ'ত না, জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে আইন কানুন বদলাবার ব্যবস্থা হ'ত না, লেনিনের মৃত্যুর পর চাষী বিদ্রোহ হ'ত না। তাদের প্রাণেই বা শান্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়?

যন্ত্রসভ্যতা, জড়বাদের পরিণাম ও স্বামিজীর মীমাংসা

পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, যেখানকার লোক টাকা দিয়ে গগন স্পর্শ করবার প্রচেষ্টা করে, টাকার নদীতে সোনার তরী ভাসিয়ে যেখানে স্বপ্নের দেশে ছুটে চলে, রূপের দরিয়ায় নিত্য স্নান করে—সে দেশে, সেই আমেরিকাতেই বা শান্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? শুধু আনন্দের তৃষ্ণাতেই ত মানুষ ছুটে চ'লেছে,—অজানার পানে। এই আমেরিকাবাসী নিত্য নতুন সৃষ্টি করে একটু আনন্দ পেতো। পাশ্চাত্যের আজ যত কিছু সৃষ্টি সে শুধু অপার্থিব নির্ম্মল আনন্দের এক কণা হৃদয়ে অনুভব করিবার আশায়। কিন্তু জড়বাদ তা তাদের দিয়ে উঠতে পারছে না—রূপের নেশা, টাকার নেশা, মদের নেশা, নানা বৈচিত্র্যের নেশায় মত্ত হ'য়ে যখন তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে তখন তারা

আত্মহত্যা করে। জড়বাদী পাশ্চাত্যের এই বৈচিত্র্যের নেশা দেখে একদিন Bertrand Russell বলেছিলেন "Man is flying away from himself" অর্থাৎ মানুষ নিজের স্বরূপ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা চার্লী চাপলীন (Charlie Chaplin) তাঁর Modern Times নামক ব্যঙ্গচিত্রে সেদিন যন্ত্রযুগের প্রতি কটাক্ষ ক'রে বলেছেন, "Modern machine-civilization is mechanising man but a man is greater than machine" অর্থাৎ বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে যন্ত্রে প্রবর্ত্তিত ক'রেছে কিন্তু মানুষ যন্ত্রের চাইতে অনেক বড়। আজ এ সমস্যার সমাধান হয় না কার্ল মার্ক্সের বাণীতে। এখানেই মনে পড়ে স্বামিজীর কথা, তিনি বলেছেন "অমৃতত্বই মানুষের চরম লক্ষ্য"। যন্ত্রযুগ ও জড়বাদের গরল আকণ্ঠ পান ক'রে মানুষের প্রাণ অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত ক'রে তুলতে পারে একমাত্র বেদান্ত, এইটিই ছিলো তাঁর বিশ্বাস। কার্ল মার্ক্স যেভাবে সমদৃষ্টি দিয়ে দেখে মানুষকে ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের সমান অধিকারী ক'রেছিলেন, সেভাবে মানুষকে সমতায় উন্নীত করা জড়বাদের সাধ্য নয়—জড়বাদ বৈষম্য সৃষ্টি করবেই। কিন্তু স্বামিজীর "ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং সমতা সর্ব্বভূতেষু" এই মন্ত্রই মানুষকে সম আসনে সমাসীন করতে সক্ষম।

স্বামিজীর অধ্যাত্মিক সমূহবাদ ও ভারতে জড়বাদ গ্রহণ

অধ্যাত্মিক জগতে সকলেই সমান। স্বামিজীর এই বিশ্বাসই হল তাঁর "অধ্যাত্মিক জগতে সমূহবাদের" এক নূতন পরিকল্পনা—ইংরাজিতে যাকে বলে (spiritual communism)। বর্ত্তমান যুগের যুগমানব মহাত্মা গান্ধীজীর জীবনে স্বামিজীর "সমতা সর্ব্বভূতেষু" মূর্ত্ত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর অহিংসা নীতির মূলেও সেই একই বাণী। আত্মার কাছে শত্রু মিত্র ভেদ নাই। বর্ত্তমান ভারতে যন্ত্রযুগ ও শ্রেণীভেদ সমস্যায় স্বামিজীর প্রচারিত বেদান্ত ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন শান্তির পথ নাই। সমাজে সমূহবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ ঐহিক সমতার সৃষ্টি করুক, কিন্তু অবশেষে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মের সাধনা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যরূপে গৃহীত না হ'লে শান্তি হ'য়ে উঠবে অশান্তির নামান্তর। তাই ত স্বামিজী একধারে যেমন বলছেন "ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না," অন্যদিকে আবার বলছেন "ত্যাগের পথ অবলম্বন কর নয়ত মরিবি"। মূল কথা আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থসমস্যা সমাধানের জন্য জড়বাদের খানিকটা গ্রহণ করতে হ'বে, শঙ্করাচার্য্যের মত কেবল "মায়াইব কেবলম্" ও "নেতি নেতি" বিচার করলে চলবে না, বিশ্বপ্রপঞ্চের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস ও যন্ত্রের সাহায্যে দেশের শিল্প বাণিজ্য জাগিয়ে তুলতে হবে। স্বামিজী বলেছেন—"জাতির ঐহিক জীবনে বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিয়ে জীবন-সংগ্রামে জাতিকে অধিকতর পটু ক'রে তুলতে হ'বে"। কিন্তু তাঁর মতে আমাদের বিশেষত্ব এই হবে যে আমরা শুধু ঐহিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিয়েই ব্যস্ত থাকব না, আমাদের ঐহিক প্রতিপত্তি হ'বে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মসাধনার সহায়ক।

পতিতজাতি সমস্যা, স্বামিজীর মীমাংসা ও গান্ধীজী

বর্ত্তমানে দেশের মাঝে আর এক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলেছে। মহাত্মাজী নিজের জীবনে ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন হরিজন আন্দোলন। হরিজনদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, দাবী ও অধিকারের মীমাংসা আজও বিশদভাবে হয় নি। স্বামিজী জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় ব'লেছিলেন "এই নীচ

জাতিকে তুলতে হবে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে" (পত্রাবলী, ২য় ভাগ,পৃঃ ১২)। .....“we have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses” এই পতিত জাতির মাঝে শিক্ষার ও জ্ঞানের আলোক বিস্তার করাই ছিলো তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য। আজ মহাত্মাজীর "বিদ্যামন্দির" স্থাপন সেই উদ্দেশ্য সাধনেরই পরিকল্পনা। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সাফল্য কোথায়, সারাদেশ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন? তাইত স্বামিজী বলেছিলেন—"দরিদ্রের নিকট আলোক পৌছাইয়া দাও, ধনীর নিকট আরও আলোক পৌছাইয়া দাও, মূর্খ অজ্ঞানীকে আলোক দান কর" (প্রশ্নোত্তর সভায় উক্তি)।

নারী আন্দোলন ও স্বামিজী—

আজ সারা দেশময় জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে—সুপ্ত ভারত আজ জাগ্রত হয়েছে, তাই নানা সমস্যার মাঝেও এক অপূর্ব্ব আনন্দের বারতা এসেছে। এ সবার মাঝে আজ অনুসন্ধান করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে স্বামিজীরই প্রেরণাবাণী। বর্ত্তমান নারীজাগরণের মূলেও তাই। "সেদিন আমেরিকাবাসিনীদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, এদেশে বরফ যেমন সাদা তেমন হাজার হাজার মেয়ে আছে যাদের মন তেমনি পবিত্র। স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট, নরক মার্গ ব'লে বলে আমাদের অধোগতি হয়েছে।" তিনি চেয়েছিলেন মেয়েদের মাঝে শিক্ষাবিস্তার করে জাতির মেরুদণ্ড ও বাল্যবিবাহাদি সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে। অনেকদিন তারা অত্যাচারে নিষ্পেষিত হ'য়েছে, আজ তাই দিকে দিকে জাগরণের সাড়া। তাঁর বাণী ছিলো "মেয়েদের আগে তুলতে হবে, massকে জাগাতে হবে, তবেত দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ"।

সাহিত্য

ভারতের আজ যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে, তাই দিকে দিকে এত সমস্যা। সাহিত্যেও প'ড়েছে তার ছায়া। স্বর্গীয় সাহিত্যসম্রাট শরৎ চন্দ্রের "শেষ-প্রশ্নে" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংঘর্ষে এক অদ্ভুত চরিত্রের সৃষ্টি হ'য়েছে—শিবানীর (কমলের) নারীমূর্ত্তিতে। তার ভাব ও ভাষা আজ তরুণের মনে ধাঁধার সৃষ্টি ক'রে ক্ষীণ ক'রে দেয় তার জাতীয় আদর্শের প্রতি আস্থা, যখন সে বলে, "গেলই বা বিশেষত্ব আশুবাবু···কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার আদর" (শেষপ্রশ্ন, পৃ ১১৪)।

ভারতের লক্ষ্য জড়বাদ নয়, অধ্যাত্মবাদে পরিসমাপ্তি

বর্ত্তমান যুগে সমস্যার প্রারম্ভেই তাই স্বামিজী এসেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সৃষ্টি করতে, হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম্মের মতামতের তর্ক দূরে সরিয়ে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করতে। আজ সকল সমস্যার পশ্চাতে রয়েছে এই যুগমানবের অভয়বাণী। সেই বেদান্ত-কেশরীর বেদান্তের মাভৈঃ বাণী আজও মেঘমন্দ্র স্বরে আমাদের সম্মুখে নিনাদিত হচ্ছে। আমরা যেন জাতীয় আদর্শ না ভুলি। তাহলে আমরাও এই জগৎ প্রপঞ্চের সমস্ত দাবী মেটাবার পর সমাহিত চিত্তে এই যুগমানবের মত একদিন বলতে পারব—"আমার সামনে অপার নির্ব্বাণ সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময় সময় উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি—সেই অসীম অনন্ত শান্তি সমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা

ঢেউ পর্য্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ করছে না ;—আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি,—এত যে দুঃখ ভুগিছি তাতেও খুসী—জীবনে কখন কখন বড বড় ভুল যে করিছি তাতেও খুসী—আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডু'ব দিতে যাচ্ছি তাতেও খুসী।···প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়।···এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হ'চ্ছে না, কুৎসিতও বোধ হ'চ্ছে না।······সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় ব'লে এই শরীরটার প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে।"

নীরেট পাথর

শ্রীজগৎশান্তি চৌধুরী

ঝড়দোলা দেয় পূব আকাশে
পশ্চিমে মেঘ হ'চ্ছে জমা—
মাঝ খানে তোর ঘর খানি যে,
ঝগড়া ঝাটি একটু কমা।
ভাইগুলো তোর বেপরওয়া—
নিজের তরেই ব্যাকুল অতি,
তাই ব'লে কি তোর অভিমান
চল্‌বে বাধা ওদের প্রতি ?
অভাব অভিযোগের বোঝা
বুঝছি ধীরে উঠ্‌ছে জমে,
স্বভাব তবু নষ্ট করা
চলবে না ত কোন ক্রমে।
বুদ্ধি তোদের আছে শুনি,
কিন্তু অতিবুদ্ধি সেটা ;
একটু যদি কম হ'ত হায়,
চুকেই যেত অনেক লেঠা।

—ইতিহাসের পাতার কালি
হয়ত যেত অনেক ক'মে,—
ব্যক্তিগত সুখের আশায়
হ'তনা আর প'ড়তে ভ্রমে।
স্বার্থ তারা বোঝেনা কম
যাদের তোরা বলিস্ বোকা,
অতিবড় বুদ্ধি ব'লেই
তাদের কাছে বন্‌লি খোকা।
বিশ্ব যখন ব্যস্ত অতি
পরের কাছে কেড়ে নিতে,
তখন তোরা ব্যস্ত দেখি
নিজের ঘরে আগুন দিতে।
ঘরে যখন বাঘ ঢুকেছে
—ছেলে মেয়ে মরণ কাতর
তখনও হায়, ঠোকাঠুকি
—এমনি তোরা নীরেট পাথর।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতার কলুটোলাস্থ বিখ্যাত সেন-বংশে ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর (বাংলা ১২৪৫ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ) শুক্লাদ্বিতীয়া সোমবার প্রাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকীর এই শুভ সময়ে আসুন আমরা তাঁহার জীবনী ও বাণী অনুধ্যান করি।

১৮৩৮ খ্রীঃ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রও জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই সহপাঠী ও সুহৃদ্ ছিলেন। কেশবের পিতামহ রামকমল কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক্ সোসাইটীর সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুবৃহৎ ইংরাজি -বাংলা অভিধান (৭০০ পৃষ্ঠাযুক্ত) প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। যখন পাদ্রী আলেকজেণ্ডার ডফ্ রামমোহনের সহায়তায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, উইলসন ও রামকমল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন এবং প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র। পিতামহ ও পিতার ন্যায় কেশবচন্দ্র 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে' কাজ করিতেন। কেশবচন্দ্র নামটী জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন কর্ত্তৃক প্রদত্ত। কেশবচন্দ্র অতিশয় প্রিয়দর্শন ও সুপুরুষ ছিলেন এবং একাদশবর্ষ বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবের পুণ্যশীলা জননী সারদা সুন্দরীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, তোর যত নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে এর পরে পৃথিবীর লোকে নাচ্‌বে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে ঐ ছেলে বেরিয়েছে।" সারদাদেবী তাঁহার আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন— "এই কলুটোলায় তেতালার ঘরে আমি পরমহংস দেবকে দেখি। কেশবের কাছে আসিয়া তিনি কেশবের হাত ধরিয়া নাচিতেন ও গাহিতেন। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার মনে নাই"। পরিবারের অন্যান্য বালকের ন্যায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু কেশবকে রামকমল একছড়া তুলসীর মালা দিয়া হরিনাম করিতে উপদেশ দেন। যে হরিনামে কেশবচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনে বাংলাদেশ মাতাইয়াছিলেন তাহা তিনি শিশুকাল হইতেই জপ করিতেন। একবার বিজয়া দশমীর দিন বালক কেশব বয়স্যদিগের সহিত নগর সংকীর্ত্তনের বহির্গত হন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিনাম কীর্ত্তনের প্রচলন তিনিই করিয়াছেন এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বপ্রথম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। অনাবৃত পদে, একতন্ত্রী হস্তে গৈরিক অঙ্গে কেশবচন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের ক্রীড়া কৌতুকও অদ্ভুতরকমের ছিল। তিনি কখনও কখনও চিকিৎসালয় বা ডাকঘর খুলিয়া তাহাতে ডাক্তার বা পোষ্টমাষ্টার হইয়া বসিতেন এবং বন্ধুগণকে তাঁহার অধীনে অন্যান্য কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। তিনি অতিশয় অনুকরণপ্রিয় ছিলেন এবং কোন বিষয় দুই এক বার দেখিয়াই তাহা হুবহু নকল করিতে পারিতেন। একবার তাঁহার কলেজে গিলবার্ট নামক জনৈক

সাহেব ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। কেশব তাহা দুই এক দিন দেখিয়া সহপাঠীদিগকে নানাপ্রকার ম্যাজিক্ দেখাইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে খুব ভালবাসিতেন এবং প্রত্যহ সন্দেশ দিবার জন্য মাতাকে অনুরোধ করিতেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার একবার মূর্চ্ছারোগ হয়, উহা প্রায় দুই বৎসর ছিল। একদিন স্কুলে শিক্ষক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন উত্তর দেন নাই, কারণ তাঁহার ঐ রোগের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। শিক্ষক উহা বালকের হঠকারিতা ও অবাধ্যতা মনে করিয়া একটী ছুরী দিয়া তাঁহার হাতের চেটো চিরিয়া দেন এবং তাহাতে কেশব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হন। পরে তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় গৃহে আনা হয় এবং তিনি কয়েক দিনের পর সুস্থ হন।

সাত বৎসর বয়সে কেশব হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন এবং মাঝখানে কিছুদিন মেট্রোপলিটান কলেজে পড়িয়া পুনরায় হিন্দুকলেজেই আসেন এবং ১৬ বৎসর বয়সে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন। ১২ বৎসর বয়সে তিনি কলেজে একখানি এত বৃহৎ গণিতগ্রন্থ উপহার পান যে, তাহা তিনি বহনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ট্রেবজিয়ন্ নামক জনৈক সাহেব তদ্দর্শনে বলিয়াছিলেন, "বৃহৎ পুস্তকবাহী ক্ষুদ্র-বালক"। কলেজে পড়িবার সময় তিনি সেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' নামক নাটকাভিনয়কালে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন। রোমাঁ্যা রোলাঁ বলেন,

"In point of fact Keshab remained the young Prince of Denmark to the end of his life,"

পরিণত বয়সে ধর্ম্ম-প্রচার মানসে সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ওরফে চিরঞ্জীব শর্ম্মা রচিত 'নববৃন্দাবন' নাটক অভিনয় কালে কেশব চৈতন্যদেবের ভূমিকা লইয়াছিলেন। যৌবনেই তিনি জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া একবার একখানি কাগজে 'জগৎ অসার দুঃখময়' এইরূপ লিখিয়া সকলকে এই সত্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রাস্তার দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দেন। তিনি হিন্দুকলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিয়োর ছাত্র ছিলেন কিন্তু অপর সকলের ন্যায় তিনি তাঁহার প্রভাবে অভিভূত হন নাই। ডিরোজিয়োর ভাবে ভাবিত যুবকগণকে তখন 'Young Bengal' বলিত। কারণ, তাঁহারা আধুনিকতায় উন্মত্ত হইয়া গোমাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। কেশবচন্দ্র আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন এবং তিনি কখনও—এমনকি বিলাতেও ইউরোপীয় পোষাক পরিধান করেন নাই। সংস্কার-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া তিনি প্রথমেই 'মদ্যপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন এবং যুবকগণের নৈতিক জীবন গঠনে মনোযোগী হন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না, তাই ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু তিনি বাইবেল ও পাশ্চাত্য দর্শন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি পারিবারিক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গোপনে ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করেন। বাড়ীতে পারিবারিক (কৌল) গুরু উপস্থিত—দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে কিন্তু সেদিন কেশব গৃহে ফিরিলেন না। পরদিন কেশব কয়েকখানি ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক আনিয়া জননীর নিকট দেন। জননী তাহা পাঠে মুগ্ধ হন এবং পারিবারিক গুরুও কেশবকে এই উদার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহ দেন।

১৮৫৭ খ্রীঃ কেশব ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কের' কাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ও প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সপরিবারে আশ্রয়গ্রহণ করেন। মহর্ষি তাঁহাকে

পুত্র হইতে প্রিয়তর মনে করিতেন এবং কেশবচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল ভ্রমণে গিয়াছিলেন। মহর্ষি কেশবকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি যে ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিয়া ছিলেন তাহাতে কেশব ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। রামমোহন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, দেবেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্ত্তক এবং কেশবচন্দ্র তাহার প্রচারক ছিলেন। এই মহাপুরুষত্রয় ব্রাহ্মসমাজের Trinity এবং তদানীন্তন ভারতের প্রধান সমাজসংস্কারক ছিলেন।[১] আদি ব্রাহ্মসমাজ ১৮৩০ খ্রীঃ, ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং ১৮৭৮ খ্রীঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী, আর কেশব ছিলেন উদার নবীনপন্থী। কেশবচন্দ্র সমাজের আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রুসেট (crusade) আরম্ভ করেন এবং অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি উগ্র সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ফলে মহর্ষির সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং তিনি ১৮৬২ খৃঃ আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া ১৮৬৬ খৃঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু এখানেও তিনি বেশী দিন সহকর্ম্মীদের সহিত অধিকাংশ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কেশব ব্রাহ্মবিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া বিবাহের বয়স বালকদের জন্য ১৮ এবং বালিকাদের জন্য ১৪ নির্দ্দিষ্ট করেন। কিন্তু তিনি কুচবিহারের রাজকুমারের সহিত স্বীয় কন্যার আরও অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ায় তাঁহার বন্ধুগণ পৃথক হইয়া ১৮৭৮ খৃঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হইয়াছে; উহাতে আদি, ভারতবর্ষীয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে উনবিংশ শতাব্দীতে বোম্বাইতে প্রার্থনা সমাজ, লাহোরে দেবসমাজ এবং আর্য্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজগুলির অন্যান্য বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকিলেও ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত ভারতীয় মহাপুরুষগণের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা সাধারণ (Common) ছিল। রোমাঁ রোলাঁ তাই লিখিয়াছেন—

"Ideas are the natural outcome of the age and are born in different minds"

ভারতের ন্যায় অন্যান্য দেশেও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এক এক যুগের এক একটী ভাব-স্রোত কোন দেশে আবদ্ধ না থাকিয়া বায়ুর ন্যায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়। এই জাতীয় আন্দোলনগুলিকে ধ্বংসমূলক মনে করা ভুল ধারণা। কারণ, ধর্ম্মের সামাজিক ও সেবার দিকটা জাগ্রত ও জীবন্ত করাই উহাদের মিশন। প্রাচীনতার তিরোভাব ও নবীনতার আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণে যখন ধর্ম্ম সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রস্তরীভূত হয়, তখনই এইরূপ আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্মকে নবজীবন দান করে। যুগে যুগে এইরূপ হইয়াছে ও হইবে। যাঁহারা জীবনের ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা সর্ব্বদা প্রাচীনতাকে বিদায় এবং আধুনিকতাকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবেন—কেশবচন্দ্রের জীবনের ইহাই আমার মতে একটী প্রধান শিক্ষা।

আদি সমাজে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব সমধিক ছিল এবং উপনিষদ ছিল প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। ব্রাহ্মণগণ উপবীত ত্যাগ না করিয়া এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন—কেবল তাঁহারা মূর্ত্তি

(১) আলেকজাণ্ডার ডফ্ রামমোহনকে ভারতের 'লুথার' বলিতেন।

পূজার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কেশব তাঁহার সমাজে নবভাব সঞ্চার করিলেন। তিনি ১৮৮০খৃঃ তাঁহার সমাজকে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া উহাকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয়-ভূমিরূপে প্রচার করিলেন।

"True mission of Brahmo Samaj was the Harmony of Religions".

অর্থাৎ তাঁহার মতে ধর্ম্মসমূহের সমন্বয় সাধনই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। এই বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহনেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন সহরে প্রচারকল্পে গমন করিয়া কেশব অনেক বক্তৃতাদি প্রদান করেন। সেই সময় তাঁহার প্রভাবে নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় ছয় মাস অবস্থান কালে চল্লিশ হাজার নরনারীর সম্মুখে প্রায় ৭০টী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় সকলে মুগ্ধ হন এবং ইংরাজগণ তাঁহাকে গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'Burke of Bengal' এবং কেহ বা তাঁহাকে 'Indian Demonsthenes' বলিয়াছেন। বিলাতে গ্লাডষ্টোন, জন ষ্টুয়ার্টমিল, মোক্ষমূলার, ম্যার্টিনো প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারাণী শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুত্রের নিকট পত্র দিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে "England's Duties to India" নামক বক্তৃতায় সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"Let England always remember that she is responsible to God for the future of India"

কেশবের "Lectures in England" পুস্তকখানি আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে বিলাতে যান নাই। তিনি ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত স্বদেশপ্রীতি ছিল। তিনি লণ্ডনে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"I come here as an Indian and return a confirmed Indian".

তখন জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই—সুতরাং তাঁহাকে তখনকার দিনের political extremist বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিলাতের একেশ্বরবাদী ইউনিটেরিয়ানগণ তাঁহাকে একটী বৃহৎ ও বহুমূল্য বাদ্যযন্ত্র উপহার দেন। ইহা অদ্যাপিও কেশবচন্দ্রের নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে আছে।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাশক্তি ছিল অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তিনি সমানভাবে বক্তৃতা দিতে পারিতেন। রাজা রামমোহনের পর এতবড় বাগ্মী আর হয় নাই বলিলেই চলে। তখন সবেমাত্র ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। সাহেবেরা ভারতীয় ও বাঙ্গালীদের ইংরাজীকে ইংরাজী বলিয়াই মনে করিতেন না। রো ও ওয়ের সাহেব দেশীয় লোকের ইংরাজীকে 'Babu English' বলিতেন। বিলাতে তাঁহার বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতিপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়া এদেশের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। বোম্বাইএর জনৈক ইংরাজ প্রচার করিলেন যে, তিনি যখন চাবুক হস্তে দাঁড়াইবেন, তাঁহার সম্মুখে যদি কেহ কেশবচন্দ্রের লণ্ডন প্রদত্ত "England's Duties to India" নামক বক্তৃতা পাঠ করিতে সাহস করেন, তাঁহাকে তিনি ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন! কেশবের অদ্ভুত বাগ্মিতার বিষয় সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া ভারতের তখনকার রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। লর্ড লরেন্সের পর যত রাজপ্রতিনিধি ভারতে আগমন করিয়াছেন, সকলেই কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে কেশবের

ফটো সঙ্গে লইয়া যান। একবার কেশব ঢাকায় বক্তৃতা করিতে যাইয়া জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে অসামান্য উত্তেজনা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইত এবং সভাস্থল অশ্রুসিক্ত করিত। কেশবের বাগ্মিতা সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছে। একবার কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতাকালে ভগবানের নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন, তাহাতে সভাস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে জনৈক বাবাজী অশ্রুপাত করেন। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং সকলে বাবাজীকে সমাজচ্যুত করিতে চাহিল। বাবাজীর প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল। তিনি বলিলেন, "আমি কেশবের ব্যাখ্যা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য কাঁদি নাই, বক্তৃতার মধ্যে পরম ভক্ত প্রহ্লাদের নাম হয়েছিল, তাই কেঁদেছিলাম"। এইরূপে সে যাত্রায় বাবাজী রক্ষা পান। একবার একটী যুবক মাতুলালয়ে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ তাঁহাদের বাড়ীর যুবকদিগকে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে নিষেধ করিতেন। কারণ, তাহারা কেশবের বক্তৃতা শুনিলে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে। যুবকগণ নিষেধ অমান্য করিয়া গোপনে বক্তৃতা শুনিতে যাইত। উপরোক্ত যুবক মাতুলের কথা না শুনিয়াই বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। মাতুল জানিতে পারিয়া ভাগিনেয়কে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দেন। যুবকটী ছিল খুব চতুর। সে বক্তৃতা শ্রবণান্তে গৃহে ফিরিয়া মাতুলের আদেশ শুনিয়া—মাতুলের নিকটে গমন করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, বুঝিয়াছি, আমার গৃহে থাকিতে পারিবে না।" যুবক বলিল "না, মামা আমি তোমাকে সে কথা বলিতে আসি নাই। আমি তোমাকে আর একটী গোপনীয় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমি সেদিন এক মুসলমানের সঙ্গে আহার করিয়াছি।" মাতুল চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "চুপ, চুপ, একথা আর কাহাকেও বলিস্ না। আচ্ছা তুই কেশবের বক্তৃতা শুনিতে যাস্, কিন্তু সঙ্গে কাহাকে নিস্না।" কেশবচন্দ্র ঢাকায় এলান প্রমুখ পাদ্রীদের সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। তখনকার পাদ্রীগণ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সময় হিন্দুধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের মহাদান নব্যবাংলার যুবকগণকে সদা স্মরণ করিতে হইবে। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ,জগদীশ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। নব্যবাংলা তথা ভারতের প্রত্যেক হিন্দুযুবকই ব্রাহ্ম। যে উদার ভাব ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আজ প্রত্যেক হিন্দু ব্রাহ্মের মতই উদার হইয়াছে, আজ হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মতই উদার হইয়াছে। ১৯২১ খৃঃ সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা ছিল ৬৪০০, তাহার মধ্যে প্রায় ৪০০০ই বাংলাদেশে। ইহার দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্ম সমাজের মিশন পূর্ণ হইয়াছে—ব্রাহ্ম সমাজ ও হিন্দু সমাজের মধ্যে আর তফাৎ নাই। প্রয়োজন ব্যতীত কোন কিছুর উৎপত্তি হয় না। সমাজের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্ম সমাজের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। সেমিটিক্ সভ্যতার স্রোত বন্ধ করাই সংস্কার সমাজগুলির উদ্দেশ্য। বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের স্রোত এবং আর্য্য সমাজ পাঞ্জাবের ইসলাম-স্রোত বন্ধ করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ ব্যতীত হিন্দুসমাজ সেমিটিক্ সভ্যতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত না।

কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কেশবের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থে সিমলায় গমন করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন শরীরে কলিকাতায় ফিরিলেন। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার

মহেন্দ্রলাল সরকার (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার অন্তিম অসুখে 'চিকিৎসা করিয়াছিলেন) তাঁহাকে চিকিৎসা করিলেন। কেশবের মৃত্যু-শয্যায় কলিকাতার বিশপ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে আসেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার তিনি 'মা' 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে অমর লোকে গমন করেন। তাঁহার শেষ বাণী—'জগৎ মিথ্যা ও মায়া'। মৃত্যুর পর তাঁহার মুখ সমুজ্জ্বল ও অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় কেশবের মুখে স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া শোকাতুরা জননী বলিয়াছিলেন 'এ যে মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিতেছি'। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান, ইংরাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোক শ্মশানে কেশবের মৃতদেহের অনুগমন করিলেন। শ্বেত চন্দনের চিতায় মহাপুরুষের স্থূল দেহ ভস্মীভূত হইল। নিমতলার ঘাট কেশবচন্দ্রের ব্রহ্ম মন্দিরে পরিণত হইল। কেশব দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য মহর্ষি দধীচির ন্যায় স্বীয় অস্থি প্রদান করিলেন। কেশব অগ্নিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। আহিতাগ্নি ঋষিগণ যেমন তাঁহাদের প্রজ্বালিত অগ্নিশিখা জীবনে নির্ব্বাপিত হইতে দেন না—তেমনি কেশব তাঁহার সাধন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেওয়া দূরের কথা, তাহা নিষ্প্রভ হইতেও দেন নাই। কেশবের ধর্ম্ম-জীবনে প্রধান অবলম্বন ছিল প্রার্থনা। তিনি তাঁহার 'জীবন বেদ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের প্রধান কথা ছিল প্রার্থনা। জীবনের উষাকালে যখন তিনি গুরু গ্রহণ করেন নাই, ঈশ্বর বা ধর্ম্ম কি তাহা জানিতেন না, তখন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই জাগ্রত বাণী উচ্চারিত হইত 'প্রার্থনা কর', 'প্রার্থনা কর'। তাঁহাকে যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় 'Prophet of Prayer' বা প্রার্থনাচার্য্য বলা যাইতে পারে। প্রার্থনা হইতেই তিনি জীবনে সাহস, শক্তি, পবিত্রতা, ও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যোগী অঘোর নাথ ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে উপদেশ দিবার সময় তিনি একটু চঞ্চল হইলেন। কারণ, তাঁহারা শাস্ত্র-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রার্থনায় ডুবিয়া গেলেন এবং তদুত্তরে এই অনাহত বাণী শুনিলেন, 'যখন যাহা আবশ্যক তোমাকে বলিয়া দিব, তুমি চিন্তা করিও না'। তাঁহার প্রার্থনার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়। স্বর্গীয় পুরুষগণই কেবল প্রার্থনার উত্তর এত শীঘ্র পাইতে পারেন। জর্জ্জ মূলারের সহিত কেশবকে এই বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। আশ্রমের ক্ষুধিত বালকগণ তাঁহার নিকট আহার চাহিলে তিনি প্রার্থনায় বসিলেন এবং বলিয়া গেলেন, 'তোমরা প্লেট পাড়িয়া বস, ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই আহার প্রেরণ করিবেন'। প্রার্থনার ফল ফলিল, বিশ্বাসীর জয় হইল। কোন ধনী অনাথ বালকগণের জন্য অচিরে বহু আহার প্রেরণ করিলেন।

কেশবচন্দ্র অতিশয় সাধুভক্ত ছিলেন ও সর্ব্ব-ধর্ম্মের সাধুদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের নিকট প্রায়ই যাইতেন এবং পরমহংসদেবও কেশবের নিকট ও কেশবের সমাজে ঘন ঘন আগমন করিতেন। রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন,

"In the whole of Keshab's life so worthy of respect and affection there, is nothing more deservedly dearto us than the attitude of respect and affection adopted from the first by this great man at the height of his fame and climax of his thought, and maintained until the end towards the little poor man of Dakshineswar then either obscure or misrepresented."

কেশবচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সমাজে প্রচার করেন। তিনি ১২৮৮ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখে দৈনিক 'সুলভ সমাচারে' পরমহংসদেব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার উচ্চ জীবন দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। আমরা দেখিয়াছি তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, যোগবলে তাঁহার মন সর্ব্বদাই ভগবানেতে সংযুক্ত থাকে। তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত হন। তিনি কখনও 'হরি' বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য করেন, কখনও বা 'মা কালী' বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্ত ধর্ম্মের আদর্শ কি তাহা দেখান্। আবার কখনও নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান্।" ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে কেশবচন্দ্রের সহিত পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। একবার শারদীয়া উৎসবোপলক্ষে গঙ্গাবক্ষে সজ্জিত বাষ্পীয়পোতে ব্রাহ্মগণের সহিত হরিনাম করিতে করিতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করেন। আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ঘরে বরিশালের অশ্বিনীকুমারের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, দূর হইতে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া দৌড়াইয়া গঙ্গাতীরে যান এবং ষ্টীমার তীরে আসিবামাত্র তাহাতে উঠিয়া কেশবকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃতদেহের সহিত ব্রাহ্মগণ শ্মশানে গিয়াছিলেন এবং শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল একটী সময়োপযোগী সঙ্গীত করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিয়াছেন—

"Many of my most beautiful songs were inspired by the ecstasies of Ramakrishna."

কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনা কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছেন,—

"The sweet, simple, charming and child-like nature of Ramakrishna coloured the Joga of Keshab and his immaculate conception of religion."

ত্রৈলোক্যনাথের ন্যায় কেশবের অন্যতম শিষ্য গিরিশচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের বৎসর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'পরমহংসদেবের জীবনী ও উক্তি' নামক একটী পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম প্রকাশিত জীবনী। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"It was from Ramakrishna that Keshab received the idea of invoking God by the sweet name of mother with the simplicity of a child The shadow of Ramakrishna softened the rather hard cult of the Brahmos"

কেশবচন্দ্র শেষ অসুখের সময় মাতৃভক্তিতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। অন্তিমশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে দর্শন করিতে আসিলে কেশব তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন এবং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন। মণিলাল পারেক্ নামক কেশবের জনৈক খৃষ্টান শিষ্য লিখিয়াছেন,—

"Keshab owed much to Ramakrishna, probably more than Ramakrishna owed to him"

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং বহুদিন তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন। কেশবের শেষ অসুখের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা কালী'র নিকট 'ডাব-চিনি' মানিয়াছিলেন এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"মা, কেশব না থাকলে কলিকাতায় আমি কার সঙ্গে কথা কইব?" কেশবের মৃত্যুশয্যায় রোগযন্ত্রণা দেখিয়া তিনি অধীর হন এবং তাঁহাকে

এইভাবে সান্ত্বনা দেন,—'মালী যেমন বস্‌রাই গোলাপের ডাল কেটে গোড়া খুঁড়ে দেন,—বড় গোলাপ হবার জন্য, মা তোমাকে কৃপা কর্‌বার জন্যই এই কষ্ট দিচ্ছেন'। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজে ইঁহারই প্রকৃত ধ্যান হয়। যে বৎসর কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই বৎসর তিনি 'নববিধান' প্রচার করেন।

ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মসমন্বয়ের বীজ রামমোহন কর্তৃক অঙ্কুরিত হইলেও উহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয় রামকৃষ্ণের প্রভাবে। মূর্ত্তিপূজার প্রতি কেশবের অবজ্ঞা খানিকটা রামকৃষ্ণের সঙ্গগুণেই দূর হয় এবং তাঁহার নিকটেই কেশব হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখের Indian Mirror পত্রিকায় কেশবচন্দ্র The Philosophy of Idol-Worship শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"*Hindu idolatry is nothing but worship* of Divine attributes materialized. The believer in the Naba Bidhan or New Dispensation is required to worship God as the possessor of all those attributes, represented by the Hindu as innumerable or three hundred and thirty millions If we are to worship Him in all His Manifestations we shall name one attribute Lakshmi, another *Saraswati, another Mahadev etc.*"

ঊনবিংশ শতাব্দী একটী age of transition বা যুগসন্ধিক্ষণ। ইস্‌লামের গৌরব-রবি অস্তমিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার তরুণ রবি উদিতপ্রায়। ঐ জন্য যে সকল মহাপুরুষ এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে changeability ও heterogeneity বর্ত্তমান। বিশেষরূপে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিরোধী ভাব ও বৈচিত্র্যসঙ্কুল ছিল। রোমঁ্যা রোলাঁ বলিয়াছেন,—

'Keshab oscillated between the East and the West His nature was divided between the East and the West and his character was compounded of diverse and incompatible elements of the East and the West".

রোমঁ্যা রোলাঁ আরও বলেন যে, কেশব-চরিত্রে Intellectual European এবং Inspired Indian এই দুই ভাবই সমানভাবে প্রবল ছিল। তাঁহার মধ্যে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের অভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভারতবাসী বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবে উপনীত হইবার জন্য যাহা করে কেশবের জীবন তাঁহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কেশবের জীবনে ধর্ম্মভাবের ক্রমবিকাশ সদাই চলিয়াছিল। তাঁহার মস্তিষ্ক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার অন্তরাত্মা ভারতীয়ভাবে পূর্ণ ছিল। তাই রোমঁ্যা রোলাঁ বলিয়াছেন,—"Though his spirit like his face was tinged with the tender sun of the West, the depth of his soul ever remained Indian" রোমঁ্যা রোলাঁ বলিয়াছিলেন,—"Keshab was prince of intellectuals but an Anglo maniac intellectual." মনে হয়, কেশব, পাশ্চাত্যের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। কেশব ছিলেন hyper individualist by nature, তাই তিনি জীবনে এত স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। Ibsen সত্যই বলিয়াছিলেন,—

"Those who have a mission in life must be independent".

কেশবচন্দ্র ক্ষমতাশালী সংস্কারক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান নিবারণ, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, শিক্ষাবিস্তার, প্রেস প্রভৃতি নানা সংস্কার তিনি আরম্ভ করেন। এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ এক-দিকে সমাজ সেবা এবং অন্যদিকে কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগও অনুকরণীয়।

তিনি বাঙ্গালী জাতি, বাংলা ভাষা এবং বাংলা দেশকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তিনি মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও সাধক ছিলেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে প্রচলন করিবার জন্য তিনি প্রয়াসী হন। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। এতগুলি সংগুণ একাধারে দেখা যায় না। ১৮৭০ খ্রীঃ তিনি 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র এবং ১৮৭১ খ্রীঃ 'Indian Mirror' নামক প্রথম ইংরাজী দৈনিক প্রকাশ করেন। 'সুলভ সমাচার' ১ম সপ্তাহে ২ হাজার, পর সপ্তাহে ৪০০০ ছাপা হয় এবং শেষে উহার বিক্রয় সংখ্যা ৮০০০ অবধি উঠিয়াছিল। 'Indian Mirror' এর সম্পাদক হন হরীশ মুখার্জি। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে এক সাপ্তাহিক গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়—ইহা অদ্যাপি চলিতেছে। কেশবের Religion of Harmony প্রমুখ দশখানি ইংরাজী বই এবং 'জীবনবেদ' প্রমুখ প্রায় ২৫ খানি বাংলা বই আমাদের পাঠ করা উচিত। তাঁহার 'সেবকের নিবেদন,' 'আচার্য্যের উপদেশ' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

কেশবের জীবনীলেখক প্রতাপচন্দ্র বলেন যে, কেশব বাল্যকালেই ভক্তির আতিশয্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। তিনি যৌবনে কার্লাইল ও ইমার্সনের গ্রন্থাবলী ও বাইবেল আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু খ্রীষ্টেরও পরম ভক্ত ছিলেন। সেণ্টপল, যিশুখ্রীষ্ট ও জন দি ব্যাপটিষ্টের দর্শন যৌবনেই সৌভাগ্যক্রমে পান। তাঁহাকে 'যিশুদাস' নামে ডাকিতে তিনি বন্ধুগণকে বলিতেন। উপবাস দ্বারা তিনি বড়দিন উদ্‌যাপন করিতেন এবং রুটী ও মদের পরিবর্ত্তে ভাত ও জল দিয়া Blessed sacrament সম্পন্ন করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

"Christ lodges in my heart. For twenty years have I cherished Thee in my miserable heart where his words find lasting lodgement."

তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ক্রাইষ্ট দ্বারা চালিত হইত। তিনি বলিয়াছিলেন,

"The Lord Christ my will, Socrates my head, Chaitanya my heart, the Hindu Rishi my soul and the Philanthropist Howard my right hand,"

কেশবচন্দ্র ক্রাইষ্টের পরমভক্ত হইলেও তিনি নিজেকে কখনও খ্রীষ্টান বলিতেন না বা মনে করিতেন না। তিনি বলেন,—

"Honour Christ but be not a Christian in the popular acceptation of the term Christ is not Christianity We belong to no Christian sect. We disclaim Christian name. Did the immediate disciples of Christ call themselves Christian? Is any Christian greater than Christ?"

লিউক রিভিংটন নামক জনৈক রোমান-কাথলিক এংলিকান সাধুকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার নিকট খ্রীষ্টতত্ত্ব শিক্ষা করিতে যাইতেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রচারিত নববিধান ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ এইভাবে প্রকাশ করিতেন—

"Christian Europe has not accepted one half of Christ's Gospel. She has comprehended Christ and God are one but not that Christ and humanity are one. Revelation of Nava Vidhan to the world is not reconciliation of man with God but that of man with man"

ক্রাইষ্ট বলিয়াছিলেন—

"I and my father are one".

কেশব কিন্তু বলিলেন—

"I and my brother are one."

কেশব সর্ব্বধর্ম্মের মহাপুরুষদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং বলিতেন—

"I am a born disciple. Honour and love all saints and sages... of all religions and all countries. Let their flesh be your flesh, let their blood be your blood Every good and great man is the personification of some special element of Truth and Divine goodness

ধর্ম্মমতের এইরূপ সার্ব্বভৌমিকতা অসাধারণ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মমন্দিরের চূড়া মসজিদ, গির্জ্জা, মন্দির ও বিহারের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। নববিধানের প্রতীকে ক্রশ, ক্রিসেণ্ট, স্বস্তিক ও ত্রিশূলের সমন্বয় হইয়াছে।

কেশবের আদেশ ও অনুপ্রেরণায় অঘোরনাথ বৌদ্ধশাস্ত্র, গৌরগোবিন্দ হিন্দুশাস্ত্র, প্রতাপচন্দ্র খ্রীষ্টান শাস্ত্র এবং গিরিশচন্দ্র মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। সৌর মণ্ডলে যেমন নানাগ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে, কেশবকে কেন্দ্র করিয়া সেইরূপ ত্রৈলোক্যনাথ, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি দিক্‌পাল মহাপুরুষগণকে লইয়া একটী কেশব মণ্ডলী গঠিত হয়। ইহাই কেশবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন। তিনি ছিলেন স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হইয়া যায়, তেমনি কেশবের অগ্নিময় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে বহু সাধারণ ব্যক্তি অসাধারণ হইয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার মণ্ডলী সাহিত্য-সেবা, সমাজ-সংস্কার, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা এবং ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি সকল কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংস্কার ও সেবার মূলমন্ত্র ছিল ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই যে ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল কার্য্য করিতে হইবে কেশব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের সংস্কারক ও সেবকগণ কেশবচন্দ্রের এই বাণীর গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। কেশব ছিলেন সংস্কার ও সংগঠনের অগ্রদূত। তাঁহার জীবন ও বাণী শিরে ধারণ করিয়াই আমাদিগকে ভবিষ্যতের পথে চলিতে হইবে। অতীতের এই আচার্য্যগণকে উপেক্ষা করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকারময় হইবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

(যেমনটী দেখিয়াছি)

শ্রীগোকুল—

ইংরাজী ১৯০৯ সাল অক্টোবর মাস, তখন সবে মাত্র উদ্বোধন আফিসের গোপাল নিয়োগী লেনস্থ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আমি ১০।১২ দিন যাবৎ তথায় আসা যাওয়া করিতেছি। আজ কয়েক মাস হইল শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই নব বাটীতে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ নীচে আফিসের সম্মুখের ঘরে আছেন, স্বামী স— উদ্বোধনের কার্য্যাধ্যক্ষ, জ্ঞা—মহারাজ সহযোগী কার্য্যাধ্যক্ষ এবং ব্রহ্মচারী গ—মহারাজ সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক।

আমি সকাল ৯।১০ টার সময় আসিয়া জ্ঞা—মহারাজের নিকট হইতে কার্ত্তিক মাসের উদ্বোধন লইয়া পাঠ করিতেছি, এমন সময় স—মহারাজ বলিলেন—'যাঁরা যাঁরা মাকে প্রণাম কর্‌বেন, এইবার যান'। কয়েকজন ভক্ত নীচে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, তাঁহারা এইবার উপরে গেলেন। পরে, আমার দিকে চাহিয়া স—মহারাজ বলিলেন—'তুমিও মাকে প্রণাম করে এস।' তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর হইবে এবং আমি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করিতেছি।

শ্রীশ্রীমা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরের প্রাতঃকালীন পূজা সমাপ্ত করিয়া তিনি দ্বিতলে দক্ষিণের গৃহে অবগুণ্ঠনে আবৃতা থাকিয়া দণ্ডায়মানা হইয়াই সকলের প্রণাম গ্রহণ করিতে-ছেন। ভক্তেদের প্রণামান্তে আমি তাঁর দুটী পদে মস্তকরক্ষা করিলাম। উঠিতেই তাঁহার সেবায়েৎ ব্রহ্মচারী ল—মহারাজ আমায় চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। যখন আমরা সিঁড়িতে নামিতেছিলাম তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'যাঁহাকে প্রণাম করিলাম উনি কে?' ব্রহ্মচারীজী উত্তর করিলেন—'পরমহংসদেবের নাম শুনেছেন? উনি তাঁর স্ত্রী।' আমি ধারণা করিতে পারি নাই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্ত্রী এতদিন বর্ত্তমান থাকিতে পারেন। অল্পদিন মধ্যেই শ্রীশ্রীমা জয়রাম-বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎপূর্ব্বে আমি ২।১ বার তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবা'র সুবিধা পাইয়া-ছিলাম কিন্তু কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। ঐ সময় তাঁহাকে খুব রুগ্ন দেখাইত এবং আমার চক্ষে তিনি অতি নিরীহ সজ্জন বিধবা বলিয়া প্রতীয়মানা হইয়াছিলেন। ভক্তেরা তাঁহাকে জগজ্জননী বলিতেন কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল একটী সরলা বালিকাকে জগজ্জননী আখ্যা দিয়া এবং তাঁহাকেও ঐরূপ বিশ্বাস করাইয়া সকলে 'জগতের মা' খাড়া করিয়া দিয়াছেন।

পরবর্ত্তী দর্শন ইংরাজী ১৯১১ সাল মে কি জুন মাস হইবে। শ্রীশ্রীমা সম্প্রতি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও তীর্থাদি দর্শন করিয়া উদ্বোধনে আসিয়াছেন। ঐ সময় শ্রীমৎ স্বামী শর্ব্বানন্দজীও মাদ্রাজ হইতে আসিয়া উদ্বোধনে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত আমার অল্পবিস্তর আলাপ পরিচয়ও হইয়াছে। উদ্বোধনে আসিয়া মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমাকে প্রণামাদি করিতেছি, তবে ধারণার পরিবর্ত্তন হয় নাই। গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছি, স্নানের ঘাটে

শর্ব্বানন্দজীকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'মা উদ্বোধনে কি করিতেছেন ?' তিনি বলিলেন—'মা ধ্যানস্থা হইয়া জগতের অণুপরমাণুর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করছেন।' শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু আঘাত প্রাপ্ত হইল। শ্রীশ্রীমার ফটো লইব বলিয়া শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর নিকট প্রার্থনা করিলাম, কারণ তখন তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ ছবি পাইতেন না। তিনি বলিলেন—'তুই ত এম্‌নি টাঙ্গিয়ে রাখবি, পূজো করতে পারবি ? যদি না পারিস ত ছবি নিস্‌নি। মায়ের ছবি পূজো করতে হয়, এমনি রাখ্‌লে অপরাধ হয়।' আমার ছবি লওয়া হইল না, তবে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে ধারণা ক্রমে গভীরতর হইল। সারদানন্দজী ও শর্ব্বানন্দজীর কথার উপর আমার অত্যন্ত বিশ্বাস থাকায় তাঁহাদের এই দুইটী উত্তর আমাকে শ্রীশ্রীমার চিন্তায় নিগূঢ় ভাবে মগ্ন করাইল।

মনে করিলাম শ্রীশ্রীমার কোন কাজ করিতে পারিলে ধন্য হইব। উদ্বোধনে আসিয়াছি বেলা ১০।১০॥০ হইবে, গোলাপ মা আমায় আদেশ করিলেন—'অ ছেলে, মায়ের তরে এক পয়সার মুড়ি এনে দাও ত।' আমি নিকটস্থ দোকান হইতে ঠোঙ্গায় করিয়া উহা আনিয়া দাঁড়াইতেই স্বামী সারদানন্দজী বলিলেন—'যা উপরে গিয়ে দিয়ে আয়।' উপরে উঠিয়া দেখি শ্রীশ্রীমার অবগুণ্ঠন নাই, ঠাকুর ঘরে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া প্রবেশদরজার দিকে পা ছড়াইয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। আমার খুবই আনন্দ হইল। আমি তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া যেমন বলিব 'মা মুড়ি এনেছি', অমনি তাঁহার মুখ বা চক্ষু হইতে একটা তীব্র শক্তি আসিয়া আমার বাক্যকে রুদ্ধ করিয়া দিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলাম—'মা এটী কোথায় রাখব ?' শ্রীশ্রীমা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং আমি তথায় উহা রক্ষা করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, মায়ের কাছে আমার সাধারণভাবে কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। একটু জোরে কথা কহিতে গিয়া আমি আঁক্‌ করিয়া উঠিয়াছিলাম—অথচ সেই করুণাময়ী করুণার দৃষ্টিতেই আমার দিকে চাহিয়াছিলেন! আবার দর্শন-পিপাসা বলবতী হইল। এই কি ঠাকুরের গিরীশবাবুকে কথিত জাত সাপে ধরা ? তাঁহাকে সাধারণ চক্ষে দেখিবার ক্ষমতা আমার চলিয়া গেল।

ঐ সময় আমি রেঙ্গুনে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছি—গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতায় আসিয়া রেঙ্গুনে ফিরিয়া যাইবার পর সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আমার কঠিন পীড়া হইল এবং সেই পীড়া ১০।১২ দিনের পর দেহকে শীতল ও নিশ্চল করিয়া ক্ষান্ত হইল। সেই শীতল নিস্পন্দতার মধ্যে যখন মৃত্যুর দারুণ অন্ধকারের দিকে যাইতেছিলাম, তখন শ্রীশ্রীমার সেই শক্তি প্রবাহ অনুভব করিলাম। আমার দেহত্যাগ ঘটিল না, তবে দেহ আর সবল হইল না। অগত্যা ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসের শেষে কলিকাতায় মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। পরবর্ত্তী বি-এ পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা বন্ধ হইল।

কলিকাতায় দেহ আরও অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তথাপি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি এই আনন্দের জন্য শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের নিকট কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইলাম। যাহা হউক, ডাক্তারের[১] সুচিকিৎসায় বা ঠাকুরের কৃপায় অল্পদিন মধ্যে সামান্য উঠিয়া বেড়াইবার সামর্থ আসিল।

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিলেন। সন ১৩১৮ সাল কার্ত্তিক মাসের শেষ বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে। শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় 'গীতা' এবং 'চণ্ডী' হইতে বিশিষ্ট শ্লোকগুলি আমায় মধুর সুরে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রাণে শান্তি এবং বলের

১। ৺গণেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্‌-ডি।

সঞ্চার হইল। তিনি গীতা এমনভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাই আমায় বলিতেছেন এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকগুলি এমন সুরে বলিলেন যেন ঐ স্তবগুলি শ্রীশ্রীমারই স্তব।

শ্রীশ্রীমাকে উদ্বোধনে যাইয়া মাঝে মাঝে প্রণাম করিয়া আসিতেছি এবং আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহারি কৃপায় আমার দেহ আবার সুস্থ হইতেছে। একদিন সকালে গঙ্গাতীরে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলাম, শ্রীশ্রীমা ঘাটের সর্ব্বনিম্ন ধাপে জপে বসিয়া আছেন। আমি ঐ স্নানের ঘাট হইতে কিছুদূর ছিলাম। মাষ্টার মহাশয়ের সুরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তবগুলি আবৃত্তি করিতেছি—তাঁহার নিকটে শুনিয়া উহা যেন আমার স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল কিন্তু এত আস্তে যে, অতি নিকটে অবস্থিত কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না। যেমনি বলিয়াছি—'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষাসৌম্যেভ্যস্ত্বতি-সুন্দরী' ইত্যাদি, দেখি—শ্রীশ্রীমা পিছন ফিরিয়া আমার দিকে দেখিলেন এবং দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আবার জপে মগ্ন হইলেন। আমি করজোড়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার অল্পদিন মধ্যে আবার ইচ্ছা হইল গ—মহারাজ যেরূপ সারথির মত কোচবাক্সে বসিয়া শ্রীশ্রীমাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যান আমিও সেইরূপ যাইব। বৈকাল ৫টা হইবে আমি গঙ্গাতীরে বেড়াইয়া বলরাম বাবুর বাটীর সম্মুখ দিয়া বাটী ফিরিতেছি, দেখি—গোলাপ মা বলরাম বাবুর বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন এবং একখানি ঘোড়ার গাড়ীও বর্ত্তমান। আমায় দেখিতে পাইয়াই বলিলেন—'অ ছেলে, মা উদ্বোধনে যাবেন, তুমি রেখে আস্‌বে চল ত'। আমি কোচবক্সে উঠিলাম এবং শ্রীশ্রীমাকে উদ্বোধনে পৌঁছাইয়া দিয়া বাটী ফিরিলাম। বুঝিলাম, শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী আমার অন্তরের বেদনা বুঝিয়াছেন এবং তাহা দূর করিতেছেন।

তখনও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া সম্ভবপর হয় নাই, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশমত বৈকালে এক আধ দিন প্রণাম করিয়া আসি মাত্র। এইভাবে আমার দিন যাইতেছিল। ডাক্তার বাবু প্রত্যহ বুক পরীক্ষা করেন এবং আমায় খুব বেড়াইয়া বেড়াইতে বলেন। থাইসিস্‌ রোগীকে যে ঔষধ দেওয়া হয় আমাকেও সেই ঔষধ খাইতে দিয়াছেন। ক্রমে ডিসেম্বর মাসের প্রথমে আমি অনেকটা সবল ও সুস্থ হইলাম, বৈকালে একটু আধটু জ্বর আসিত মাত্র। সকালে উঠিয়া বেড়াইতে যাইব এমন সময় ছোট ভাই বলিল—'ন মেজদা, যেখানে সেখানে যেও না—ব'দাদাকেও গণেন মিত্র ঐ ঔষধ দিছলেন। সে-ও বেড়াত কিন্তু মারা গেল।' চকিতের মধ্যে মনে আর এক ছবি উঠিল। আমায় শ্রীশ্রীমা, মাষ্টার মহাশয়, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি সকলে এত স্নেহ করিতেছেন, কারণ আমার জীবনের শেষ দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। ঐদিন সকালেই শ্রীশ্রীমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল। তখন বেলা ৯টা হইবে, উদ্বোধনে আসিলাম। অতি কাতর ভাবে প্রার্থনা জানাইলেও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ এবং গ—মহারাজ আমায় উপরে যাইয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন না।[১]

চক্ষে জল আসিল। গঙ্গাতীরে যাইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অশ্রুধারা আপনি বহিয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল এই ভাবনায়—'তবে শেষের দিনে কে দেখিবে?'

তখন বেলা প্রায় ৯টা কি তাহার কিছু পরে, আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। দিবাভাগে বিদ্যুৎ পড়িলে যেমন দেখায় এইরূপ বিদ্যুৎপাতের ন্যায় দর্শন হইল। যেন উহা জগতের সমস্ত শব্দকে নিস্তব্ধ করিয়া দিল। পরে কোন শব্দই আর আমার শ্রুত হইল না। অশ্রুজল বন্ধ হইল ও তৎপরিবর্ত্তে মুখে

১। ঐ সময় শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পূজায় নিযুক্তা থাকেন, সেই জন্য সাধারণের দর্শন নিষিদ্ধ ছিল।

অকারণসঞ্জাত হাসি ফুটিল! আমি নিজেই অবাক হইলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি জলের কিনারায় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় একটি অদ্ভুত শক্তিমূর্ত্তি সমাগতা।

ঐ মূর্ত্তি জলের প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখে যেন জগতের যত দুঃখ আসিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু চক্ষে প্রবল তেজ দীপ্তিমান এবং তাহা অতি ভীষণভাবেই চারিদিকে নিঃসৃত হইতেছিল। সেই নিঃসৃত তেজের একটী ধারা আমার দেহকে কম্পিত ও প্লাবিত করিয়া মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ তেজের স্পর্শই আমার বেদনা দূর করিয়া আমায় আনন্দময় করিয়াছিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই মূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া আমারি সম্মুখে আসিল, আমি তখন রীতিমত কাঁপিতেছিলাম এবং দাঁড়াইবার ক্ষমতা না পাইয়া বসিয়া পড়িলাম।

কিঞ্চিৎ জড়ানস্বরে কতকটা উড়িয়ার ন্যায় সেই মূর্ত্তি আমায় বলিল—'ভাই, আমি দক্ষিণেশ্বর যাব, পথ কোন দিকে?'

শ্রীশ্রীমা কি শ্রীরাধার ভাবে রাখাল বেশে আসিয়াছেন? ভাবিয়া আমি হাত বাড়াইয়া পথ দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু কোথাও না যাইয়া মিটি মিটি হাসিয়া সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল ও শক্তির স্রোতে আমার দেহকে ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। আমি থর থর করিয়া কাঁপিতেছি আর মনে অপার আনন্দ ও ভরসা লাভ করিতেছি।

যাঁহার এতদিন স্তব করিতেছিলাম এই কি তিনি? শ্রীশ্রীচণ্ডীর সেই স্তবগুলি আপনি মনে উদিত হইয়া উচ্চারিত হইল এবং হস্ত আপনা আপনিই তাঁহার শ্রীপদ স্পর্শ করিল! স্পর্শমাত্র আমি কোথায় উপিয়া গেলাম—দেখিলাম, একটী অণুপরমাণুর মত বিশ্বজগতে ঘুরিতেছি, যেরূপ ধূলিকণাকে অন্ধকার গৃহে সূর্য্যের কিরণ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যায়। ঐ শক্তি পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত ধরিয়া আছেন, নতুবা তাহারা কক্ষচ্যুত হইবে! তাঁহারি ইচ্ছায় যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে, দুঃখ করিবার কিছু নাই। জগৎ ব্যাপিয়া যে শ্রীশ্রীমা বিরাজমানা। আমি কোথায় উদ্বোধনে তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়াছি! জগৎপ্রপঞ্চ অহর্নিশি তাঁহারি পূজা করিতেছে। ব্যাকুল নয়নে আরাধনা শেষ করিলাম। আমার অভিমান দুঃখ চিরতরে অপসারিত হইল।

তিনি আমায় গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার হস্তে এবং মুখে প্রদান করিতে বলিলেন। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে অঞ্জলি পুরিয়া গঙ্গাজল আনিতেছি। আর অদ্ভুত দর্শন নাই। দেখিলাম, তাঁহার অবয়ব যদিও শ্রীশ্রীমার সঠিক অবয়ব নহে তবুও মুখের গঠন অনেকটা সেইরূপ। কেশদাম আলুলায়িত, নহে তবে দীর্ঘ ও কুণ্ডলাকৃতি। সমস্ত দেহ একটা সাদা বস্ত্রে আবৃত। বর্ণ সাধারণ হইলেও কিঞ্চিৎ মলিন। হস্তপদ বৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কৃশ কিন্তু মাঝে মাঝে গৌরবর্ণ ও স্থূলভাব ধারণ করিতেছিল। নর কি নারী বুঝিবার উপায় নাই। কথা একটু জড়ান এবং দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ। আমার দিকে ফিরিবামাত্রই আমি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছিলাম, উহা এত ভীষণ ও তেজপূর্ণ! আমার মনে হইয়াছিল যদি কোন মৃত শরীরে নিবদ্ধ হয় তাহা তৎক্ষণাৎ জীবিত হইবে।

অতঃপর কম্পিত কলেবরে সেই মূর্ত্তির পার্শ্বে বসিলাম এবং দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম:—আপনি কি উদ্বোধনের মাতাঠাকুরাণীর সহিত পরিচিত?—সেই মূর্ত্তি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। আমি জানাইলাম, 'আজ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সহিত দর্শন করিতে আমায় দেন নাই'। উত্তর পাইলাম—'আর কখনও তিনি তোমায় নিষেধ করবেন না'। মনের মত উত্তর পাইয়া

অন্য কিছু চাহিবার প্রয়োজন বুঝিলাম না। প্রার্থনা করিলাম 'যেন আমি শ্রীশ্রীমায়ের আপনার জন হইতে পারি।' 'তাই হবে, আর একদিন আসিব' বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের মতই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গঙ্গার ধার দিয়া উত্তরমুখে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, মনে হইল যেন যত দূরে যাইতেছেন দীর্ঘতর হইতেছেন! দুই শত বা ততোধিক হস্ত দূরে গিয়া আমার দিকে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। আমি ভীষণ কালীমূর্ত্তির মত তাঁহাকে দেখিয়া সভয়ে তথা হইতে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

তখনও সেই শক্তিস্রোত আমার দেহমধ্যে গর্‌গর্‌ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। দেহের জড়তা অপগত হইয়াছে এবং মন এক অদ্ভুত উন্মাদনায় আচ্ছন্ন ও আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। তখনি উদ্বোধনে আসিয়া নীচের সদর দরজার নিকট হইতেই শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিলাম।

অতঃপর আমার আচার ব্যবহার পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে কিছু চিন্তান্বিত করাইয়াছিল। উপরোক্ত দর্শনাদির বিষয় তাঁহাদের আদৌ জানিতে দিই নাই, তাঁহারা বায়ুরোগ স্থির করিলেন। ঐ সময় আমি গঙ্গার ধার বা উদ্বোধন হইতে বাটী আসিতে অস্বীকার করিতাম এবং এক প্রকার অনুভূতি উপস্থিত হইয়া আমায় সাংসারিক জ্ঞান বা কর্ত্তব্য একেবারে ভুলাইয়া দিত। দেখিলাম —এক স্নিগ্ধ শান্ত শুভ্র আলোক বিশ্ব জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে, উহাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য জাগ্রত ও চৈতন্যময় স্বরূপ, আমার সহিত সাদরে কথা কহিতেছেন, আমিও তাঁহাতে মিশিয়া যাইব বলিয়া চেষ্টা করিতেছি। ইহার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলেই আমার বিষম বিরক্তি ও যন্ত্রণার কারণ হইত। এই অবস্থায় একদিন মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং আমার হাত ধরিয়া বাটীতে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার দ্বারা আনীত হইয়া প্রায় ৮।৯ মাস কাল (ডিসেম্বর হইতে আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত) আর বাহিরে আসি নাই। ঐ নবাগত শক্তি ক্রমশঃ অপগত হইলে আমি সুস্থির ও সজ্ঞান হইলাম। ডাক্তার বাবু পিতাঠাকুর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—'যাহাই হউক, আপনার পুত্র এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল'।

ইংরাজী ১৯১২ সাল আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাস হইবে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখনও উদ্বোধনে অবস্থান করিতেছেন। গৃহ হইতে প্রথম নিষ্ক্রান্ত হইয়াই উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার দর্শনে আসিলাম, সঙ্গে আমার পিতৃদেব ছিলেন। বেলা ১ কি ১॥০ সময় আহারাদির পর শ্রীশ্রীমা একটু বিশ্রাম করিতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিবার আদৌ সময় নয় কিন্তু নীচের ঘরে স্বামী সারদানন্দজীকে দর্শন করিবার পরই তিনি আপনা হইতেই আমায় অনুমতি দিলেন 'যা মাকে প্রণাম করে আয়', আর যেন কত আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিলেন! তখন গঙ্গার ধারের সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতে দেখিলাম।

শ্রীশ্রীমার আর আমার সম্মুখে অবগুণ্ঠন নাই, স্মিতমুখে সেই ঠাকুরঘরের তক্তাপোষের উপর বসিয়া চরণদ্বয় মেজেতে স্থাপন করিয়া আছেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেই আমার চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং যেন পুরাতন ভক্তদিগের একজন এইরূপ জ্ঞান করিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। ইচ্ছা হইলে তাঁহার দর্শন পাইব কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সজোরেই 'হাঁ তুমি আসবে' বলিয়া আমায় ভরসা দিলেন। তাঁহার সন্নিকটে আমার আগমন আর কাহারও আজ্ঞাধীন রহিল না। শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে সেই বিভীষিকা বা বিদ্যুৎ-প্রবাহ আর বোধ করিতে পারিলাম না। তিনি

যেন স্নেহভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া আমার আপন মায়ের মতই সদা সর্ব্বদা বসিয়া আছেন।

অতঃপর তাঁহার উদ্বোধনে অবস্থান কালীন প্রায় প্রত্যহই সকালে এবং সময় পাইলে বিকালে দর্শনাদি করিতাম। তাঁহার সকল কথা বা ভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব, কেবল যেগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনায় প্রকট হইয়াছিল এবং চিরতরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, মাত্র সেগুলিই বলিবার চেষ্টা করিব।

ইং ১৯১৪ সালের জুন কি জুলাই মাস হইবে, পিতৃদেব স্বর্গগত হইয়াছেন। আমি তখনও তাঁহার বিয়োগ দুঃখ ভুলিতে পারি নাই। শ্রীশ্রীমার দর্শনে আসিলাম। তিনি সেই তক্তাপোষটীর উপর মেজেতে পা রাখিয়া বসিয়া আছেন। আমার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন—'আহা বাপ্‌টী চলে গেছে।' এবং বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণের ভিতরকার অভাবটী পূর্ণ হইয়া গেল।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার কনিষ্ঠা সহোদরা টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হয়, ৩ সপ্তাহের পর সকালে ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিয়া গেলেন—'আর আধঘণ্টা মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে।' আমি লোকজন আনিবার জন্য উদ্বোধনে আসিলাম। উপরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখি ঠাকুরের প্রাতঃকালীন পূজা হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রসাদ দিলেন এবং দাঁড়াইয়া বলিলেন—'তোমায় পাগলের মত দেখ্‌ছি কেন?' আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন—'যাও ঠাকুরের ইচ্ছায় ভাল হবে।' বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে এবং বেশ জ্ঞান হইয়াছে। ১০।১২ দিন মধ্যে সে সুস্থ হইল।

১৯১৬ সালের শেষভাগে শ্রীমতী রাধারাণী (রাধু) এবং তাহার স্বামী শ্রীযুত মন্মথনাথের মনস্তুষ্টির জন্য শ্রীশ্রীমা আমায় মন্মথ বাবুকে হারমোনিয়ম শিখাইতে বলেন। মন্মথবাবু একটী বক্সহারমোনিয়াম যোগাড় করিয়া আমায় উদ্বোধনেই উহা ব্যবহার করিতে বলেন কিন্তু আমি সাধুদিগের শান্তিভঙ্গ হইবে এই ভয়ে উহাতে অস্বীকৃত হই। একদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেছি এবং মন্মথ বাবুর অনুরোধ রক্ষা করা উচিত কি না ভাবিতেছি, শ্রীশ্রীমা অমনি বলিলেন—'তুমি এখানে হারমোনিয়াম বাজাবে, শরৎ কিছুটী বল্‌বেক না।' বাস্তবিকই সেই অতি ধীর এবং গম্ভীর স্বামী সারদানন্দজী আমার হারমোনিয়াম ব্যবহার করিবার জন্য কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই বরং রঙ্গরসই করিয়াছিলেন।

একদিন বেলা ২টা ২৷৷০টার সময় দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দ্বিতলের দক্ষিণের ঘরে মন্মথবাবু ও আমি হারমোনিয়াম সহযোগে সঙ্গীত ধরিয়াছি, 'মার কাছে আর যাব না, ক্ষুধা পেলে আর চাব না', দেখি কোথা হইতে 'মা' রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—শ্রীমুখে যেন জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে—দরজা খুলিয়া ফেলিলেন এবং দুই হস্তে জলখাবারের দুই থালা লইয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া 'এখন জল খাও' বলিয়া দুটী জলের গ্লাসও দিয়া গেলেন। সেদিন শ্রীশ্রীমার কার্য্য এত সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, সে সারা জীবন তাহা আমার মনে নিখাত থাকিবে।

১৯১৭ সালের প্রারম্ভে একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে বেলা ১টা ১৷৷০টার সময় গিয়াছি, আহারের পর তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইবে এইরূপ আশঙ্কাও হইতেছে। কিন্তু যখন তাঁহার নিকটে আসিলাম, বিরক্ত হওয়া ত দূরের কথা আমায় ঠাকুর ঘরের পার্শ্বের ঘরে দণ্ডায়মানা হইয়া সহাস্য বদনে নেড়ার (শ্রীমতী মাকুর পুত্র) জন্য এক জোড়া মোজা আনিতে আদেশ দিলেন। বাটীতে আমিই আমার মায়ের ঐরূপ ফরমাইস্ খাটিতাম, শ্রীশ্রীমা ঠিক যেন আমার 'মা'ই হইয়া গিয়াছেন!

১৯১৭ সালের বড়দিনে সকালে প্রণাম করিতে গিয়াছি, শ্রীশ্রীমা নেড়াকে দেখাইয়া বলিতেছেন—'দেখ, এই ছেলেটীকে আমি যখন যা বলি তাই করে, বোস্ বস্‌ছে, ওঠ্ উঠ্‌ছে'। আমি মনে মনে বলিলাম—'ও আপনাকে চিন্‌তে পেরেছে তাই ওরূপ করে।' অমনি অন্তর্যামিনী বলিলেন—'কাল (ললিত বাবু) আমাদের সার্কাস দেখিয়ে আন্‌লে, বাঁদরগুলিকে দেখ্‌লুম যা বল্‌ছে তাই কর্‌ছে, ওরা সেই জাত ত!'—আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না।

১৯১৮ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাসে প্রথম কর্ম্ম পাইয়া শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। শ্রীপদে যৎসামান্য মুদ্রা প্রণামী দিয়াছি, তিনি তাহা মুঠার মধ্যে ধরিয়া একটু উত্তোলন করিয়া বলিলেন—'এ ত অনেক ভারী। এ্যাতো কি হবে।' যেন ঠিক একটী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা!

মালীর নিকট হইতে অল্প সল্প ফুল লইয়া শ্রীশ্রীমার নিকট প্রদান করিলে তিনি সানন্দে তাহা ঠাকুর সেবায় দিতেন। একবার মার্‌কেট (Hogg Market) হইতে সন্ধ্যার সময় দুইটী বড় বড় সদ্যঃ প্রস্ফুটিত গোলাপের তোড়া আনিয়া তাঁর হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি তাহা লইয়া তক্তাপোষের নীচে ঠেলিয়া রাখিয়া দিলেন। পরদিন সকালে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখি, তোড়া দুইটী সেই অবস্থায়ই পড়িয়া আছে, ঠাকুরসেবায় দেওয়া হয় নাই। বুঝিতে পারিলাম ঐরূপ তোড়া দেওয়া অন্যায় হইয়াছে, কারণ তাহা অনাঘ্রাত নহে।

শ্রীমতী রাধারাণীর শরীর বাল্যকাল হইতে রুগ্ন হওয়ায় শ্রীশ্রীমা রাত্রে একাকী নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিতে পারিতেন না, রাধুর পার্শ্বে থাকিতেন। একবার রাধুর অসুখের সময় ডাক্তার মহাশয়কে লইয়া রাত্র ১০ ঘটিকায় উপস্থিত হইয়া দেখি শ্রীশ্রীমা একটী অতি দীন দরিদ্রের মত মলিন বিছানায় রাধুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। কে বলিবে ইনি সেই ভক্তদের শ্রীশ্রীমা, যাঁহার চরণে কত লক্ষপতির মস্তক নিয়ত অবনত হইতেছে!

দিবসে দেখিয়াছি, তিনি আহারাদির পর বিশ্রাম করিবেন এমন সময় কোন ভক্ত ত্রস্ত হইয়া হাজির হইয়াছেন। 'ওই আবার এসেছে', বলিয়াই তখনি তিনি তাঁহার নিকট কথাবার্ত্তা কহিতে গমন করিলেন, তাঁহার আর বিশ্রাম হইল না। এইরূপ দিনের পর দিন গত হইয়াছে।

সকল ভক্তই জয়রামবাটীতে গমন করিয়া আত্মীয়তার মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন, আমিও সেইরূপ করিব ভাবিয়া যখন একদিন বলিলাম—'মা, আমি আপনার দেশে যাব,' তিনি উত্তর করিলেন—'আগে রেল হ—গ তার পর তুমি যাবে', তখন ঠাকুর ঘরের পার্শ্বের ঘরে আমায় প্রসাদ দিতেছিলেন। তদবধি আমার আর জয়রামবাটী যাওয়া হয় নাই। কবে রেল হইবে ইহাই ভাবিতেছি।

তাঁহার প্রসাদ দানের শেষ দেখি নাই। প্রসাদ দিবার সময় দুটা হাত এক করিয়া বসিতে হইত এবং শ্রীশ্রীমা সেই যুক্ত হস্তের মধ্যে নানাবিধ মিষ্টান্ন ফল মূল দিতে থাকিতেন যতক্ষণ না হস্ত পূর্ণ হইয়া প্রসাদ পড়িয়া যাইত। এই কথা পরে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীকে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন—'ওরে, আমরা কি ঐরূপ পারি, মা-ই পাবেন।'

যে কয় বৎসর তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে আমার বাটী কোথা, আমি কি কর্ম্ম করি, আমরা কয় সহোদর বা পিতার নাম কি ইত্যাদি প্রশ্ন কখন জিজ্ঞাসা করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় একবার প্রণাম করিবার সময় আমার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম করিয়া তাঁহারা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে একজনের নাম 'ললিত' না বলিয়া 'নলিন' বলিয়াছিলেন। তাঁহাতে তাঁহার উচ্চারণ দোষ মনে করিয়া আমি হাস্য করিয়াছিলাম।

বাটীতে আসিয়া আমার মাকে ঐ কথা বলায় তিনি বলিলেন—'জগজ্জননী ঠিকই বলিয়াছেন, ছেলে বেলায় নলিনই নাম ছিল, পরে ললিত হইয়াছে।'

যে ভাবে সাধারণের মন্ত্র হইয়া থাকে তাঁহার নিকট হইতে আমি সেই ভাবে মন্ত্র লই নাই অথচ তিনি বরাবরই মন্ত্রশিষ্যের মত বা ততোধিক আত্মীয়ের মতই আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। দর্শনাদি সম্বন্ধে কখনও আমার ভ্রম প্রকাশ করেন নাই বরং তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা জ্ঞান হইয়াছিল তাহার স্বপক্ষেই কথা কহিয়াছেন। আমি মন্ত্রাদির দ্বারা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারি নাই বা পরিবও না। তাঁহার অসীম কৃপায় তিনিই আমায় ধরিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিতেছি। সকল সময়েই মনে হইয়াছে আমার পক্ষে যেটী প্রয়োজন তাহা তিনি করাইয়া লইতেছেন এবং লইবেন। উপদেশাদি দিয়া সময় নষ্টকরার স্বপক্ষে তিনি ছিলেন না। ধর্ম্মকথার মধ্যে একবার মাত্র বলিয়াছিলেন—'ঠাকুরের উপর নির্ভর কর তিনি সমস্ত করিয়া দিবেন।'

এখানে বলিলে অযুক্তিকর হইবে না যে, একদিন আমার দর্শনাদির বিষয় স্বামী সারদানন্দজীকে নিবেদন করি, তিনি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'ওরে ওই সব দর্শন নিয়েই ত পুরাণ হয়। তুই এক রকম দেখ্‌লি, এর পর একটা পুরাণ হয়ে যাবে।' ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পড়িয়া যখন জানিলাম যে, লোকোত্তর পুরুষগণ মন্ত্রদীক্ষা ব্যতীত শিষ্যের ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়া 'শাক্তী' এবং 'সাম্ভবী' দীক্ষাও দেন, তখন আমার শ্রীশ্রীমায়ের দেওয়া রীতিমত দীক্ষা হইয়াছে বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

•১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভাব-উত্তরার্দ্ধে) পৃ ২০৩-৪।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্কপটূনমূন্।
আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেঽস্মিন্‌সদা-
ত্মনি ॥ ৩০

অন্বয়—ভগবৎপূজ্যপাদাঃ চ শুষ্কতর্কপটূন্ অমূন্ মাধ্যমিকান্ অচিন্ত্যে অস্মিন্ সদাত্মনি ভ্রান্তান্ আহুঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতিবাহ্য কুতর্কনিপুণ এই মাধ্যমিকসম্প্রদায়ভুক্ত সাকারধ্যানপরায়ণ বৌদ্ধগণকে অচিন্তনীয় সৎস্বরূপ পরমাত্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা—"ভগবৎপূজ্যপাদাঃ"—ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সেইহেতু পূজনীয়চরণ, অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির অবতার পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণদ্বারা পূজিতচরণ; অথবা নিজগুরু ভগবান্ গোবিন্দপাদের চরণ যাঁহার পূজনীয় ছিল, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য। গৌরবার্থে বহুবচন। "শুষ্কতর্কপটূন্"—"তর্কোঽনিষ্টপ্রসঞ্জনম্"—

অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত অর্থের কল্পনা বা সম্ভবতা-প্রতিপাদন তর্ক শব্দের অর্থ। যেমন পর্ব্বতে অগ্নি থাকিতে পারে না, এইরূপে পর্ব্বতে অগ্নির স্থিতি অস্বীকৃত হইলে, যদি বলা হয়, পর্ব্বতে অগ্নি যদি না থাকিত তাহা হইলে ধূম থাকিত না,—তাহা হইলে এইরূপ উক্তিকে তর্ক বলা যায়। সেই তর্ক যদি অভ্রান্ত বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে সেই তর্ক শ্রুতিরসবিবর্জ্জিত বলিয়া তাহাকে শুষ্কতর্ক বলা হয়। বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের অবিরুদ্ধ হইলেই তর্ক সুতর্ক হয়। যাহারা এইরূপ শুষ্ক তর্ক করতে কুশল, সেইরূপ "মাধ্যমিকান্"—মাধ্যমিকসম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণকে, "অচিন্ত্যে অস্মিন্ সদাত্মনি"—অনাত্মবস্তুর ন্যায় যাহাকে চিন্তার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করা যায় না অথচ যাহা মিথ্যা নহে, পরমার্থতঃ সৎস্বরূপ, সেই ব্রহ্মবিষয়ে, "ভ্রান্তান্ আহুঃ"—সগুণ অথবা নির্গুণ কোনও বস্তুতে স্থিতি বা নিশ্চয় লাভ করিতে না পারিয়া শূন্যে স্থিতিলাভ করে এবং এইরূপে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়, এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ৩০।

এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য কৃত সেই বার্ত্তিক পাঠ করিতেছেন—

অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥৩১

অন্বয়—তপস্বিনঃ (বা তমস্বিনঃ ইতি বা পাঠঃ) অনুমানৈকচক্ষুষঃ ইমে বৌদ্ধাঃ মৌর্খ্যাৎ শ্রুতিম্ অনাদৃত্য নিরাত্মত্বম্ আপেদিরেঃ।

অনুবাদ—এই (বেচারা) বৌদ্ধগণ অনুকম্পার পাত্র। ('তমস্বিনঃ' পাঠে—অজ্ঞানাচ্ছন্ন) ; অনুমান প্রমাণই তাহাদের একমাত্র দর্শনোপায়। এই অনুমানজনিত অল্পজ্ঞতাকে তাহারা সর্ব্বজ্ঞতা মনে করে বলিয়া, সেই মূর্খতাবশতঃ, তাহারা শ্রুতিকে অনাদর করে এবং এই কারণে তাহারা শূন্যভাব বা অসারতা লাভ করিয়া বসিয়া আছে।

টীকা—নিষ্প্রয়োজন।

৩। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্যই ছিল'—এইরূপ শূন্যবাদে বিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন।

এক্ষণে বিকল্প করিয়া শূন্যবাদে দোষ দেখাইতেছেন :—

শূন্য মাসীদিতি ব্রূষে সদ্যোগং বা সদাত্মতাম্।
শূন্যস্য ন তু তদ্যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ ॥৩২

অন্বয়—"শূন্যম্ আসীৎ" ইতি—সদ্-যোগম্ ব্রূষে বা সদাত্মতাম্ (ব্রূষে)? তৎ উভয়ং, শূন্যস্য ব্যাহতত্বতঃ ন তু যুক্তম্।

অনুবাদ—হে শূন্যবাদিন্, তুমি যে বল "শূন্য ছিল" (২৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য), সেই বাক্যে 'ছিল' শব্দ দ্বারা কি বুঝাইতে চাও? শূন্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ হইল? অথবা শূন্যই সদ্রূপ? উভয় পক্ষেই শূন্যের অর্থাৎ শূন্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে। এই হেতু সেইরূপ উক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ। সেই ব্যাঘাতদোষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ।
সচ্ছূন্যযোর্বিরোধিত্বাচ্ছূন্যমাসীৎ কথং বদ ॥৩৩

অন্বয়—সূর্য্যঃ তমসা ন যুক্তঃ, অপি চ অসৌ ন তমোময়ঃ। সচ্ছূন্যয়োঃ বিরোধিত্বাৎ "শূন্যম্ আসীৎ" কথম্ বদ?

অনুবাদ—সূর্য্য অন্ধকার দ্বারা জড়িত নহেন এবং অন্ধকাররূপও নহেন। সেইরূপ সৎ ও শূন্য পরস্পর বিরোধী বলিয়া 'পূর্ব্বে শূন্য ছিল' এইরূপ শূন্যের সদ্ভাব উক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, বল?

টীকা—ব্যাঘাতদোষযুক্ত বলিয়া ঐরূপ উক্তি কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। ৩৩

তদুত্তরে শূন্যবাদী পূর্ব্বপক্ষী কহিতেছেন—হে বেদান্তিন্ আপনিও ত' বলিয়া থাকেন—'আকাশ আছে', (অহঙ্কার আছে) ইত্যাদি ; এবং 'কোথায় আছে'? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—'সর্ব্ববিকল্পশূন্য

ব্রহ্মে'। আপনার এইরূপ উক্তিও ত' ব্যাঘাতদোষ-যুক্ত।

তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সুবিকল্পিতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চিরম্॥

অন্বয়—বিয়দাদেঃ নামরূপে মায়য়া সুবিকল্পিতে (ভবতঃ)। শূন্যস্য নামরূপে চ তথা (ইতি) চেৎ, ত্বয়া চিরম্ জীব্যতাম্।

অনুবাদ—'আপনিও ত' আকাশ প্রভৃতির নাম ও রূপ মায়াদ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত, এইরূপ বলিয়া থাকেন। শূন্যেরও নামরূপ সেই প্রকার সৎস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত'—যদি এইরূপ বল তবে তুমি চিরজীবী হও, (যেহেতু তুমি স্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এই আশীর্ব্বাদ পরিহাসোক্তি।)

(৪) 'সৎই ছিল'—এই শ্রুত্যর্থ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ভাল, তাহা হইলে শূন্যের ন্যায় আপনার সেই সদ্বস্তুরও নাম এবং রূপ কল্পিত—এইরূপ মানিতে হইবে, কেন না আপনার অদ্বৈত মতে নাম ও রূপ বলিয়া কোনও (পারমার্থিক মতে) বাস্তব পদার্থ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষী যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন, সেই হেতু বলিতেছেন—

সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেত্তদা বদ।
কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষ্যতে॥৩৫

অন্বয়—সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) দ্বে কল্পিতে চেৎ, তদা কুত্র ইতি বদ, (যতঃ) নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিৎ ন ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ—হে পূর্ব্বপক্ষিন্, যদি বল ব্রহ্মেরও 'সৎ' এই নাম বা বাচকশব্দ এবং 'সৎ'-রূপ বা স্থূলাদি আকারও মায়াকল্পিত, তাহা হইলে বল দেখি, কোন্ অধিষ্ঠানে সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে? কেন না অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম ত' কোথাও দেখা যায় না।

টীকা—'হে আশঙ্কাকারিন্, তুমি যে আশঙ্কা উঠাইলে, তাহা যুক্তিহীন বলিয়া টিকিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বিবিধ পক্ষের বিচার করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে।' এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন করিতেছেন :— "সতঃ অপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেৎ"—যদি বল, নাম ও রূপ এই দুইটি সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুরই; (ভ্রমবশতঃ) সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে, "তদা বদ কুত্র ইতি"—তাহা হইলে বল সেই নাম এবং রূপ কোন্ আধারে কল্পিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুর নাম ও রূপ সেই সৎ ব্রহ্মরূপ আধারে কল্পিত হইয়াছে? অথবা কোনও অসৎ আধারে? অথবা (ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট) জগতে? এই তিন পক্ষই সম্ভব। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি যুক্তিসহ নহে, কেন না যখন শুক্তি প্রভৃতিতে রজত প্রভৃতির ভ্রম হয়, তখন রজত প্রভৃতির নাম ও রজতাদির রূপ শুক্তি হইতে ভিন্ন রজতাদিরূপ কল্পিত আধারেই (ভ্রান্তিবশতঃ) কল্পিত হয়; সেই শুক্তি প্রভৃতি সদ্বস্তুতে সেই নামরূপের কল্পনা বা অসৎ-আরোপ সম্ভবপর হয় না, কেন না সৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা আর 'কল্পনা' রহিল না। আর দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না, কেন না অসৎ আধার শব্দের অর্থ শূন্য, তাহা কোন কালেই আধার হইতে পারে না। আবার তৃতীয় পক্ষ টিকে না, কেন না জগৎ যাহা সেই সৎ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন, তাহা সেই 'সৎ'-বস্তুর নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইতেই পারে না, কেন না তাহা হইলে বলিতে হয়, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুর নামরূপ কল্পনা হইয়া গিয়াছে। আর নামরূপ কল্পনার নামই জগৎসৃষ্টি। যদি বল অধিষ্ঠান নাই রহিল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? নামরূপের কল্পনা কেন হইবে না? তবে এই

আশঙ্কার উত্তরে বলি, "নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিৎ ন ঈক্ষ্যতে"—ভ্রম একেবারেই আশ্রয় বিহীন ইহা কখনও দেখা যায় না। ৩৫।

ভাল "উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অসদ্রূপই ছিল"—এই শ্রুত্যর্থে যেমন ব্যাঘাত দোষ দেখান হইল, সেই রূপ "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসদ্রূপই ছিল" এই শ্রুত্যর্থে ত' দোষ রহিয়াছে—এই রূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন :—

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ। *
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যান্মৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ॥ ৩৬

অন্বয়—'সৎ আসীৎ' ইতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ; অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ, এবম্ মা, লোকে তথা ঈক্ষণাৎ।

অনুবাদ—'সৎ (সৎবস্তু ব্রহ্ম) আসীৎ (ছিলেন) এই শ্রুতি-বচনে 'সৎ' শব্দ দ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, এবং 'আসীৎ' বা ছিলেন শব্দ দ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয় তদুভয় অস্তিত্ব, পরস্পর ভিন্ন হইলে অস্তিত্ব দ্বিগুণ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয়; (তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে; এক বৈ দুই নাই, এরূপ বলা চলে না)। আবার সেই দুই অস্তিত্ব যদি একই হয় তবে "সৎ আসীৎ" এই বাক্যে পুনরুক্তি ঘটে। ইহা শব্দ—পুনরুক্তি নহে, যে ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের প্রয়োগ বলিয়া ইহাকে যমকাদি 'অলঙ্কার' বলিবে। ইহা সমানাকার বা ভিন্নাকার শব্দের প্রয়োগ দ্বারা একই অর্থের বোধক হইলে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সেই 'দোষ'-রূপ পুনরুক্তি,—এই শঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'এরূপ বলিও না,' ইহা দোষ নহে; এরূপ পুনরুক্তি সংসারে প্রচলিত আছে; দেখিতে পাওয়া যায়।

* "দ্বৈগুণ্য" স্থলে 'বৈগুণ্য' পাঠও আছে, কিন্তু "দ্বৈগুণ্য" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

টীকা—পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই "সৎ" (সৎ বস্তু ব্রহ্ম) ও "আসীৎ" (ছিল)—এই দুই শব্দের অর্থে দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা একই সত্তাকে বুঝাইতেছে? যদি বলেন 'দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে' তবে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়, কেননা দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয়। আর যদি বলেন—'ভেদ নাই' তবে উক্ত শব্দদুইটি (ভিন্নাকার হইলেও) একার্থ বোধক হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইতেছে। এই হেতু 'আসীৎ' (ছিল) এই শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই দ্বিতীয় পক্ষ বা পুনরুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্তী ইহাকে দোষ বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন :—"এবম্ মা"—ইহা দোষ, এরূপ বলিও না। তাহা হইলে কি প্রকারে প্রতীত দোষের পরিহার হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "লোকে তথা ঈক্ষণাৎ"—এই প্রকার প্রয়োগ সংসারে দেখা যায়, (তাহাতে ব্যবহারের বা উপদেশের কোনও বাধা হয় না)। ৩৬।

ভাল, সংসারে এই প্রকার পুনরুক্তিপ্রয়োগে দোষাভাব অর্থাৎ 'সৎ' 'ছিল'—এইরূপ একার্থ-বিশিষ্ট দুই শব্দের প্রয়োগে দোষ হইল না,—কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্॥ ৩৭।

অন্বয়—কর্ত্তব্যম্ কুরুতে, বাক্যম্ ব্রূতে, ধার্য্যস্য-ধারণম্ ইত্যাদি বাসনাবিষ্টম্ প্রতি "সৎ আসীৎ" ইতি ঈরণম্।

অনুবাদ—(লোক সমাজে) 'কর্ত্তব্য করিতেছে' 'বাক্য বলিতেছে', 'ধারণীয় বস্তুর ধারণ' ইত্যাদি প্রয়োগের সংস্কার যাহার চিত্তে বিদ্যমান, সেইরূপ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, "সৎ ছিল" এইরূপ বাক্য, শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছেন।

টীকা—লোক সমাজে এই দ্বিরুক্তিপ্রয়োগ আরও অনেক প্রকারের আছে বটে (যথা পাণিনিঃ ৮।১।৮,১০ আমন্ত্রিত, অসূয়া, সম্মতি, কোপ, কুৎসন, ভৎর্সন, আবাধ (পীড়া) ইত্যাদি অর্থে), কিন্তু তাহাতে কি হইল ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার প্রয়োগের সংস্কারবিশিষ্ট শ্রোতার প্রতি শ্রুতি বলিতেছেন—"সৎ আসীৎ" সদ্বস্তু ছিল। ৩৭।

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া মানা হইতেছে আবার 'ছিল' এই অতীতকাল সূচক ক্রিয়ার প্রয়োগে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে, ইহার দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ত' ব্যাঘাত দোষ ঘটিতেছে, কেননা কালরহিত ব্রহ্মে কাল আছে ? অথবা কালবিশিষ্ট ব্রহ্মে কাল আছে ? এই রূপ বিকল্প করিলে, প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত, দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে, যেমন পূর্ব্বাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ (৫০) সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সদ্বস্তু ব্রহ্ম 'ছিলেন' এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনযা যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৮।

অন্বয়—কালাভাবে পুরা ইতি উক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্ শিষ্যম্ প্রতি এব (ভবতি)। তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন হি শঙ্ক্যতে।

অনুবাদ—কাল নামক বস্তু না থাকিলেও, 'পূর্ব্বে' এই শব্দ দ্বারা যে অতীত কালের সূচনা হইয়াছে, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের সংস্কারবিশিষ্ট শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। তদ্দ্বারা একপ বুঝিতে হইবে না যে 'কাল' বলিয়া কোনও দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ আছে। সেই হেতু এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মবিষয়ে দ্বৈতের আশঙ্কা করা অসঙ্গত।

টীকা—ভাল কালাদিরূপ দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ নাই থাকুক, (নৈয়ায়িকসম্মত) অভাব পদার্থ ত' ছিলই, অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের প্রাগভাবরূপ অভাব ত' ছিল। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেই প্রাগভাবের অনুযোগী বা আধার এবং জগৎ সেই অভাবের প্রতিযোগী। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবচনে দ্বৈতের শঙ্কা ত' থাকিয়াই গেল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উক্ত শ্রুতিবচন, যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রোতার ভাব ও অভাবরূপ দ্বৈতের সংস্কার রহিয়াছে, তাহা তাহাকে ভূতের (প্রেতের) ন্যায় পাইয়া বসিয়াছে, এইরূপ শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতির ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ। অতএব অদ্বৈততত্ত্বে এইরূপ অত্যুৎকট আশঙ্কার অবসর নাই। এই কারণে বলিতেছেন —"তেন অত্র দ্বিতীয়ং ন শঙ্ক্যতে"—সেই হেতু উক্ত শ্রুতি-বচনে দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না।

সমালোচনা

Vedic Prayers—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, খার, বোম্বাই। পৃষ্ঠা ৯৩—বোর্ড বাঁধাই। পকেট সংস্করণ, মূল্য আট আনা।

খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হইতে না হইতে মহাসমরের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া য়ুরোপখণ্ডে অতীব শোচনীয় এক বিনাশলীলা আমাদের চক্ষের সমক্ষেই প্রকটিত করিয়াছিল। তাহা আজ অতীত কাহিনী। চতুর্থ দশকের উপকণ্ঠে আমরা আবার সমাগত। ইতিমধ্যেই য়ুরোপ ও এসিয়া দুই মহাদেশেই খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়াছে। আবার বৃহদাকার একটি খণ্ড প্রলয় ঘটিবার উপক্রম অনেকে অনুমান করেন। এবার পূর্ব্ব পশ্চিম, কেহই বাদ যাইবেন না। ক্রমোন্নত বৈজ্ঞানিক বিমান-যুগে বিনাশব্যাপার আরও ভীষণ, ব্যাপক এবং স্বল্পকাল মধ্যে প্রভূত ক্ষতিসাধন-শক্তি-সম্পন্ন হইয়াছে।

এইরূপ অশান্ত আবহাওয়ায় বর্ত্তমান যুগের সন্ন্যাসী প্রাচীন ভারতের চাবি বেদের সংহিতাভাগ ও উপনিষদ্ অংশ হইতে শান্তি প্রবচন ও কতিপয় প্রার্থনা-মন্ত্রমালা সংগ্রহ করিয়া সকলের নিকট সমুপস্থিত। আজ হৃদয়ে হৃদয়ে, মনে মনে অমিল। নিত্য বেদের সত্যবাণী—"সমানা হৃদয়ানি বঃ"। "তোমাদের সকলের হৃদয়ে একতা বিরাজ করুক।" বৈদিক ভাবনাধারার অভিষেকে বর্ত্তমান মানব-মন উন্নত, সম্প্রসারিত হউক—উপস্থিত জাতিতে জাতিতে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সব গরমিলের মধ্যেও, ইহাই বলিতে হইবে।

আজিকার দিনে সর্ব্বোপরি মন উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন—মনোভাবের আমূল পরিবর্ত্তন চাই। এই কল্পে বৈদিকসাধনের সকাম ও নিষ্কাম ব্রহ্মোপাসনা দুই চিন্তাধারারই সার্থকতা দেখিতেছি। বর্ত্তমান পুস্তিকায় এই দুই ভাবোদ্দীপক মহামূল্য মন্ত্রনিচয় সংগৃহীত। মহৌষধ নিত্য সেবনের ন্যায় নিত্যপাঠের ও নিত্য তত্ত্বাভ্যাসের মধ্য দিয়া এইগুলি জীবনে কার্য্যকরী হউক, ইহাই প্রার্থনা। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স উভয়েরই সন্ধান ইহাতে আছে।

নাগরী হরফে মূল—ইংরাজীতে শব্দার্থ ও ইংরাজী সরল অনুবাদ প্রত্যেক মন্ত্রের নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদ প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। দুইটি সামমন্ত্রের (১৩, ১৪ পৃঃ) আধিযাজ্ঞিক ও আধ্যাত্মিক—দুই অর্থই দেওয়াতে তাৎপর্য্য সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মূল শব্দগুলির অনুবাদ-মধ্যে ভাষান্তর চিহ্ন Transliteration mark দিতে পারিলে ইংরাজীভাষাভাষীদিগের সঠিক মূল শব্দোচ্চারণে সহায় হইত। ছাপাই, কাগজ, বোর্ড বাঁধাই ভালই হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক। স্বামিজীবনের প্রচেষ্টা সার্থক হউক। ইহার সাহায্যে তথাকথিত সভ্যমানব প্রকৃত সভ্য হইবে। বৈদিক প্রার্থনার অনুরণন যাঁহারই অন্তর অধিকার করিবে তিনিই কু-ভাবনার অন্তে সু-ভাবনায় ভরিয়া উঠিবেন। দেশে দেশে প্রকৃত উদার বেদপন্থিকুলের অভ্যুদয় তখনই সম্ভব।

স্বামী নির্লেপানন্দ

হেগেল ও মার্ক্স—রেবতীমোহন বর্ম্মন প্রণীত। প্রকাশক আর্য পাবলিশিং কোং, ২২ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৮ পৃষ্ঠা, দাম আট আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে চারিটি প্রবন্ধ আছে।

(১) মার্কসের বিচার নীতি, (২) হেগেল ও বিশ্ব-ইতিহাস, (৩) ভাববাদী দর্শন ও ডায়ালেকটীক, এবং (৪) মার্কসের সমাজতত্ত্ব।

হেগেল ও মার্কস্ তত্ত্ব সাধারণত দুর্বোধ্য এবং ইহার আলোচনা বাংলায় নাই বলিলেই চলে। এত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধ কয়টিতে গ্রন্থকারের প্রচুর বিদ্যা ও প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাই। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই প্রবন্ধ কয়টি পাঠ করিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের কোন উপকারই হইবে না। হেগেল চর্চা আমাদের দেশে কিছু কিছু ছিল এবং আছে। কিন্তু মার্কসিজম্ পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত হয় ১৯১৭ এর রুশ বিপ্লবের পর। বর্তমানে ইহার আদর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক ও দার্শনিক মার্কসের আলোচনা করিয়াছেন, অর্থনীতিক মার্কসের আলোচনা একেবারেই করেন নাই।

বাংলাগ্রন্থে ইংরাজী নাম বাংলা অক্ষরে লিখিলেই ভাল হয়। কোন কোন স্থানে ইংরাজী তর্জমা সুন্দর হয় নাই। ভবিষ্যতে গ্রন্থকারের নিকট হইতে অনেক আশা করি। পুস্তকের ছাপা প্রচ্ছদপট প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীকেশব চক্রবর্তী, এম্-এ

সুরহারা বাঁশী—অমিয়া সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আর্য পাবলিশিং কোং, ২২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১২ পৃষ্ঠা, দাম এক টাকা।

সুরহারা বাঁশী একখানি উপন্যাস। ইহা 'যে শাখে ফোটে না ফুল' নামে দেশ কাগজে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। মাতৃত্বই ভারতনারীর আদর্শ এবং মাতৃত্বেই নারীজীবনের পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা। এই আদর্শ সামনে রেখে লেখিকা তাঁর পুস্তকখানা রচনা করেছেন। সন্তানহীনা নারীর জীবনের ব্যর্থতা ও ব্যথা নিপুণতার সহিত লেখিকা বর্ণনা করেছেন এবং হিন্দুর পারিবারিক জীবনের অতি সত্য অতি কঠোর ও অতি করুণ একটি সমস্যার ছবিও এঁকেছেন নিখুঁত ভাবে। লেখিকার লেখনভঙ্গি সহজ সরল ও সাবলীল।

সমাজ-মনে ভাব সঞ্চার করতে গল্প উপন্যাস প্রভৃতির শক্তি অসীম। ইতিহাসে দেখা যায় এক একখানা উপন্যাস এক এক দেশে বিপ্লব এনেছে। বাংলা সাহিত্যে করুণ রসের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। বাঙালী জাতি যে ভাবে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে তাতে বর্তমানে এমন কথাসাহিত্য গড়ে তোলা দরকার হয়েছে, যার অমোঘ প্রেরণায় সমগ্র জাতি আবার বলে বীর্যে বীরত্বে জেগে উঠতে পারে।

পুস্তকের ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য হয়েছে।

অরূপ

পরলোকে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গত ২রা ডিসেম্বর, শুক্রবার, রাত্রি ৪টা ১০ মিনিটের সময় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ল্যান্সডাউন রোডস্থিত বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গত ৪ঠা নভেম্বর তারিখে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। পরে উহা নিউমোনিয়ায় পরিণত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ দেখা যায় এবং ইহাতেই তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্গদেশের যে কয়েকজন মনীষীর প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে বিশ্বজগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই অশেষগুণসম্পন্ন মহাপুরুষকে জ্ঞান-সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, আইন প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান সমুদ্রের মত গভীর ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞানরাজ্যের উচ্চ শিখরে আরূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের অতলস্পর্শ গভীরতা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার কর্ম্মশক্তি কম ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন কার্য্যে বাংলার শিক্ষা-নায়ক স্যার্ আশুতোষকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় গঠন এবং তথাকার নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ দেখা গিয়াছিল। ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়নেও বিলাতের বিশিষ্ট রাজনীতিকগণ তাঁহার লেখা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

১৯২৬ সনে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুদিন বোম্বাই সহরে অবস্থান করেন, পরে কলিকাতায় আসেন। ১৯৩৬ সনের মার্চ্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনের মূল সভাপতিরূপে তিনি এক জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের অনুষ্ঠানে ইহাই তাঁহার সর্ব্বশেষ যোগদান।

আমরা এই অশেষ গুণালঙ্কৃত মনীষীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবনির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ

সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবনির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের মহাসমাধি লাভের পর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের প্রিয়শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সপ্তদশ বর্ষ বয়সে স্বামী বিরজানন্দ সংসার ত্যাগ করেন এবং বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগ দেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিলে স্বামী বিরজানন্দ তাঁহার সংস্পর্শে আসেন এবং এই বৎসরই তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর প্রচার-কার্য্যের জন্য তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন।

পরে কয়েক বৎসর তিনি উত্তর ভারতের নানা স্থানে—বিশেষ করিয়া মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তপস্যায় অতিবাহিত করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি নির্ব্বাচিত হন এবং এই বৎসরই মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ দেহত্যাগ করিলে তিনি উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইংরাজী মাসিক পত্রিকা "প্রবুদ্ধ ভারতে"র সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই সময়ে মায়াবতী আশ্রম হইতে ইংরাজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ আলমোড়া জেলার শ্যামলাতল নামক স্থানে "বিবেকানন্দ আশ্রম" স্থাপন করেন এবং বহু বৎসর প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ হিমালয়ের এই মনোরম স্থানে সাধনায় অতিবাহিত করেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য বেলুড় মঠে আসেন এবং মঠ-মিশনের কাজ দেখিতে আরম্ভ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক এবং গত মে মাসে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কাল্‌চার কলিকাতা—গত ১লা নভেম্বর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার দিন এই ইন্‌ষ্টিটিউট্ কলিকাতাস্থ ১৯নং কেশব সেন ষ্ট্রীটে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বাড়ীটির সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি জড়িত আছে। তিনি এই বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পরমভক্ত স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বসতবাটী ছিল। সম্প্রতি এখানে সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পাঠাগার এবং গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে। এই ইন্‌ষ্টিটিউটে নিম্ন লিখিত বক্তৃতা হইয়াছে :—

১২ই নভেম্বর। সভাপতি—ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, এম্-এ, ডি-লিট্। বক্তা—ডক্টর মেরিও কেরেল্লি। বিষয়—"আমরা ইটালীবাসীরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে কি ভাবে দেখি"। এই সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার মহাশয়ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

১৯শে নভেম্বর। সভাপতি—ডক্টর পি, ডি, শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, আই-ই-এস্। বক্তা—মেজর পি, বৰ্দ্ধন, এম্-বি, এম্-আর্-সি-পি, এফ্-আর্-সি-এস্। বিষয়—"আধুনিক ইউরোপ

ভ্রমণের স্মৃতি"। এই সভায় ডক্টর ডি, এন্ মৈত্র এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহাদের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

২০শে নভেম্বর। সভাপতি—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি। বক্তা—স্বামী শ্রীবাসানন্দ। বিষয়—"পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ"।

২৭শে নভেম্বর। সভাপতি—মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জি, বার্-য়্যাট্-ল। বক্তা—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি। বিষয়—"কেশবচন্দ্র সেনের আধ্যাত্মিক প্রতিভা"।

৩রা ডিসেম্বর। সভাপতি—মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্লিয়োড্। বক্তা—ডক্টর কালিদাস নাগ, এম্-এ, ডি-লিট্। বিষয়—"ওসেনিয়ার (অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ) সংস্কৃতি-কেন্দ্র সমূহ"। এই সভার পর সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধ্রুপদ গান করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু পাখোয়াজ ও শ্রীযুক্ত সত্যেন চাটার্জ্জি সুরবাহার বাজান।

১০ই ডিসেম্বর। সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি সি,সি, বিশ্বাস, সি-আই-ই। বক্তা—ডক্টর পি, ডি, শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, আই-ই-এস্। বিষয়—"যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে জার্ম্মাণী সম্বন্ধে আমার ধারণা"।

ইন্ষ্টিটিউট্ অব্ কাল্চার ও কলিকাতার অন্যান্য স্থানে সাপ্তাহিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল ক্লাসে দার্শনিক বিষয় ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্ফ্র্যান্সিস্কো—

গত নভেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরী ক্লাব ও বেদান্ত সোসাইটিতে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন ;—(১) "রাহস্যিক প্রতীক", (২) "অদৃষ্টের শক্তি", (৩) "বাহ্য ও আভ্যন্তর রাহস্যিক অভিজ্ঞতা", (৪) "নিগূঢ়া কুলকুণ্ডলিনী", (৫) "মায়া বা জাগতিক ভ্রম, ইহার প্রকৃতি ও উৎপত্তি," (৬) "ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিও না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখ," (৭) "আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মূল," (৮) "দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ," (৯) "অনুভূতির মনস্তত্ত্ব"।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে সমাগত ভক্তগণকে তিনি ধ্যান ও বেদান্ত-তত্ত্ব সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া—গত ১৩ই নভেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪-৩০টায় ৬নং নস্করপাড়া লেনস্থ হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য এক সভার অনুষ্ঠান হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলেন যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম এবং ইহার পরিচালিত বিদ্যালয়—বিবেকানন্দ ইন্ষ্টিটিউশনের সঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এজন্য এই আশ্রমে তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের ব্যবস্থা খুবই উপযোগী হইয়াছে।

ইহার পর বেলুড় মঠের স্বামী ওঙ্কারানন্দ স্বামী শুদ্ধানন্দজীর সম্পর্কে আসিয়া যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করেন। ওঙ্কারানন্দজী বলেন যে, তিনি যখন মঠে যোগদান করেন, তখন প্রতিদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর তাঁহাদের একটি ক্লাস হইত এবং উহাতে অনেকে শুদ্ধানন্দজীর নিকট ঠাকুর এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতেন। ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর যেরূপ পরিষ্কার ধারণা ছিল, সেরূপ তিনি আর কাহারও মধ্যে দেখেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যে, ঠাকুর তাঁহাকে জগতে পাঠাইয়াছিলেন স্বামীজীর শিষ্যরূপে, বাঙ্গালা দেশে

ঠাকুর স্বামীজীর ভাব ঠিক ঠিক ভাবে প্রচার করিবার জন্ত। ঠাকুর স্বামীজীর ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল বলিয়াই তাঁহার ইংরাজী লেখা ও বক্তৃতার অত সুন্দর অনুবাদ তিনি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবাদ সময় সময় মূল লেখা অপেক্ষাও সুন্দর মনে হয়। ঠাকুর স্বামীজীর ভাবধারা বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার করিবার জন্ত তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল।

স্বামী ওঙ্কারানন্দ আরও বলেন যে, নিষ্কামকর্ম্মে ছিল শুদ্ধানন্দজীর প্রগাঢ় আস্থা। নিষ্কাম কর্ম্মকে তিনি চরিত্র গঠনের এবং ঈশ্বর লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। এক সময়ে সমস্ত রাত্রি 'উদ্বোধন' পত্রের 'প্রুফ' সংশোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"আমার মনে হচ্ছে আমি যেন সমস্ত রাত কালীপূজা করেছি"।

অতঃপর সভাপতি স্বামী মাধবানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, স্বামীজীর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের ভাব ছিল, তাহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল স্বামী শুদ্ধানন্দজীর ভিতর। তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ধ্যান এবং ভক্তির সামঞ্জস্য। তিনি অসাধারণ কর্ম্মী ছিলেন, খুব পড়াশুনা এবং চিন্তা করিতেন। আবার তিনি ভক্তিমার্গের সাধকও ছিলেন, ধ্যান ধারণাও তাঁহার ছিল যথেষ্ট। তিনি ছিলেন একাধারে গুরু এবং বন্ধু। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট যে সকল উপদেশ শুনিয়া বক্তা ভাল বুঝিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইতেন না, সেই সকল বিষয়ে প্রশ্ন এবং তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝিবার সুবিধা তাঁহার হইত স্বামী শুদ্ধানন্দজীর নিকট হইতে।

রাত্রি প্রায় ৭-৩০টার সময় ভজন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

বাংলা ও উড়িষ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ফরিদপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলার ৭৮ খানি গ্রামের ৩০০৫ জন অধিবাসীর মধ্যে ১২৬ মণ ২৩ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কেদারচাঁদপুর ও পরেশনাথপুর কেন্দ্রে সাময়িকভাবে যে চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে তথায় চিকিৎসিত ১৩৩৭ জন রোগীর মধ্যে ৪৮৬ জন ম্যালেরিয়ার রোগী ছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা ৫০০ শত খানা নূতন কম্বল এবং ৭০০ শত খানা নূতন কাপড় দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠাইয়াছি। ইহা ব্যতীত বহু পুরানো কাপড়ও পাঠান হইয়াছে। পরবর্ত্তী রিপোর্টে এই সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

উড়িষ্যায় ঘূর্ণিবাত্যা সেবাকার্য্য

পুরী জেলার পারিকুদ তালুকের অন্তর্গত ২৬ খানি গ্রামের ২৬৩টী পরিবারের ১০৬৬ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩৮ মণ ২ সের চাউল ২৯শে নভেম্বর বিতরণ করা হইয়াছে। ৫ মাইল পর্য্যন্ত ঘূর্ণিবাত্যা প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হওয়ায় অকর্ত্তিত ফসল, গৃহাদি ও বীজধান্য প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং এতদঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের নিরাশ্রয় করিয়া দিয়াছে। লবণাক্ত জলে কূপ তড়াগাদি পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় পানীয় জলেরও একান্ত অভাব হইয়াছে।

বিধ্বস্ত গ্রাম সমূহ পরিদর্শন ও অধিকসংখ্যক লোক তালিকাভুক্ত করা হইলে অন্যূন ১০০ মণ চাউল প্রতি সপ্তাহে বিতরণ করিতে হইবে। এতদঞ্চলের জন্য আরও ২ মাস কাল সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে। গঞ্জাম জেলার পালুর নামক ইউনিয়ন ঘূর্ণিবাত্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তথায় যাবতীয় গৃহাদি ঝঞ্ঝার প্রকোপে উড়িয়া গিয়াছে। দরিদ্র অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও আশ্রয়শূন্য অবস্থায় কষ্টের শেষ সীমায় উপনীত। তাহাদের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া না দিলে এই দারুণ শীতের সময় তাহাদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। পালুরে ১৮ খানি গ্রামের প্রতিগৃহ বাবদ গড়ে ১০৲ টাকা হিসাবে ন্যূনকল্পে ৩০০ খানি গৃহ তৈয়ারী করিতে হইবে।

এতজ্জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন এবং সদাশয় জনসাধারণের বদান্যতার উপরই আমাদের সেবাকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আমাদের সহৃদয় দেশবাসীর নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা শত শত নিরন্ন, নিরাশ্রয় ভ্রাতা ভগিনীদের এই দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণ করিতে অগ্রসর হউন। যে-কোন প্রকারের সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে ও তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

১। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া।

২। ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।

স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ
সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন
৭।১২।৩৮